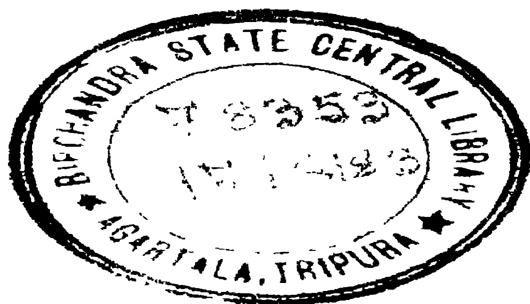
বঙ্কিম-অভিধান

(উপন্যাস খণ্ড)

অশোক কুণ্ডু



ভারতী বুক স্টল
প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা
রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
শ্রীহৃষীকেশ বারিক
৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ

মূল্য কুড়ি টাকা মাত্র

মুদ্রক :
শ্রীতুলসীচরণ বক্সী
ন্যাশনাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৩৩-ডি, মদন মিত্র লেন
কলিকাতা-৬

জীবনে দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে যাঁরা আমার জ্ঞানার্জনের
পাথেয় জুগিয়েছেন সেই পরম শ্রদ্ধেয় পিতৃদেব
শ্রীবিভূতিভূষণ কুণ্ডু ও মাতৃদেবী
শ্রীঅসীমা কুণ্ডুর পাদপদ্মে
গ্রন্থখানি অর্পিত হ'ল।

অভিমত

আমাদের সমালোচনা-সাহিত্যে রসবিশ্লেষণমূলক আলোচনার অভাব নেই। যা কিছু অভাব তা শ্রমসাধ্য, লেখক সম্বন্ধে বিবিধ জ্ঞাতব্য তথ্য পরিপূর্ণ কোষগ্রন্থের। আমাদের তরুণ গবেষকসম্প্রদায় গবেষণা ডিগ্রী-অর্জনের জন্যই তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করতে ব্যস্ত। কিন্তু লেখকের পশ্চাৎপট ও পরিবেশ সম্বন্ধে ও তথ্যসঙ্কলন বিষয়ে সেরূপ আগ্রহান্বিত নয়। তারা মালীর কাজে নিরুৎসাহ, কিন্তু বৃক্ষের উচ্চতম ডালে যে পক্ক ফলটি রসাস্বাদনের প্রতীক্ষা করছে সে বিষয়েই অতি উৎসুক। মন্দিরের সিঁড়ি অতিক্রম না করলে মন্দিরাধিষ্ঠাত্রী দেবতার স্পর্শযোগ্য নৈকট্যে পৌঁছান যায় না। বহু বৎসর পূর্বে কথাসাহিত্য সম্পাদক আমার উপরেই বঙ্কিমজীবনী বিষয়ে ভার ন্যস্ত করতে চেয়েছিলেন। কর্মব্যস্ততার ও বহুধা-বিভক্ত মনোযোগের জন্য আমি তখন তাঁদের আহ্বানে সাড়া দিতে পারি নাই। তার পর দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বর্তমান প্রধান ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত এই ভার গ্রহণ করে কয়েক কিস্তী এই পত্রিকাতেই প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তার পর পদমর্যাদা ও দায়িত্বভার বৃদ্ধির চাপেই এই কাজটি অসম্পূর্ণ রেখেছিলেন। আমরা উভয়েই বাংলা উপন্যাসের জনক বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে এই কর্তব্য অসম্পূর্ণ রেখে প্রত্যবায়গ্রস্ত হয়েছি বলে আমার ধারণা।

যাই হোক এতদিন পরে এক তরুণ শিক্ষাব্রতী শ্রীমান অশোক কুণ্ডু প্রথম ঔপন্যাসিকের প্রতি এই অসমাপ্ত পূজা সম্পূর্ণ করে আমাদের লজ্জা নিবারণ করেছে। সে 'বঙ্কিম-অভিধান' নাম দিয়ে বঙ্কিম সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্য সমাবেশ করে এক কোষগ্রন্থ বঙ্কিমভক্তমণ্ডলীর ও বঙ্গীয় সরস্বতীর হাতে উপহার দিয়েছে। এ এক নীরব ভক্তের নিষ্কাম পূজাঞ্জলি। এতে লেখকের নিজ পাণ্ডিত্য ও মৌলিক রসবোধ প্রকাশের কোন চেষ্টা নাই। এ নিজেকে সম্পূর্ণ আড়ালে রেখে নিজ ব্রত উদযাপিত করেছে। সে কোথায় কোথায় এই অর্ঘ্যের পূজা সংগ্রহ করেছে তা ঢাক-ঢোল পিটিয়ে প্রচার করে নি, কোন প্রশংসার জন্য ঔৎসুক্য দেখায় নি। আশা করি এই নীরব ভক্তের উপহার সকলেই কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করবেন ও অযাচিত সাধুবাদে এই তরুণ সারস্বত পথিককে উৎসাহিত করবেন।

ইতি শুভার্থী

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রশস্তি পত্র

বাঙালী বঙ্কিম বিস্মৃত জাতি। বাঙালী মনীষীগণের মধ্যে নিঃসংশয়রূপে শ্রেষ্ঠ এই বীর সাহিত্যিককে যে পরিমাণে বাঙালী বিস্মৃত হয়েছে সেই পরিমাণে সে দুর্দ্দশাগ্রস্ত। বঙ্কিমচন্দ্র প্রদত্ত শিক্ষা ও প্রদর্শিত পথ ছাড়া আমাদের বাঁচবার উপায় নেই।

বড়ই আশার বিষয় যে তরুণ সাহিত্যিক শ্রীঅশোক কুণ্ডু অশেষ অধ্যবসায় সহকারে বঙ্কিম গবেষণায় মনোনিবেশ করেছেন। অনেকের ধারণা তরুণ সম্প্রদায় বঙ্কিম সম্বন্ধে উদাসীন। বর্ত্তমান গ্রন্থ সেই ধারণা খণ্ডন করেছে।

বইখানি যখন ধারাবাহিক ভাবে সমকালীন মাসিকে প্রকাশিত হচ্ছিল আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, অন্য অনেকেরও করে থাকবে। বইখানির কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমতঃ, এ বই ডি. ফিল ডিগ্রি লাভার্থে তথাকথিত গবেষণা নয়। দ্বিতীয়তঃ, বঙ্কিম সম্বন্ধে লেখকের আত্মগত চিন্তা নয়, যার মূল্য দুতিন বছরের মধ্যেই পরিবর্ত্তন হওয়া অসম্ভব নয়। অন্য নামের অভাবে একে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য ও জীবন সম্বন্ধীয় অভিধান বলা যেতে পারে। এ হচ্ছে বইখানির শ্রেষ্ঠ পরিচয় এবং অনপনেয় বৈশিষ্ট্য। বর্ত্তমান খণ্ডে কেবল বঙ্কিমের উপন্যাস সমূহ আভিধানিক আলোচনার বিষয়। লেখক আশা দিয়েছেন যে পরবর্ত্তী খণ্ডে তাঁর প্রবন্ধাদি সম্বন্ধে অনুরূপ আলোচনা করবেন।

বলা বাহুল্য এ জাতীয় বই বাংলাতে আর নাই। বঙ্কিম সম্বন্ধে যাঁরা গবেষণা করেন, সে গবেষণা ব্যক্তিগত বা বস্তুগত যেমনি হোক, গবেষক তরুণ বা প্রবীণ যেমনি হোন, তাঁদের সকলেরই পক্ষে এ বই অপরিহার্য্য ভাবে অত্যাবশ্যক। এমন একখানি বই হাতের কাছে থাকলে বঙ্কিম সাহিত্যে প্রবেশের পথ সুগম হয়। এ বই আগে প্রকাশিত হলে বঙ্কিম সাহিত্য পাঠ ও আলোচনায় আমার অনেক উপকার হ'তো। অবশ্য ভবিষ্যতেও কাজে লাগবে আশা রাখি।

অপরের কথা জানিনা, আমার কাছে অভিধান সুখপাঠ্য গ্রন্থ। হাতে কাজ না থাকলে পাতা উল্টে যাই, শিক্ষা ও আনন্দ দু-ই লাভ করি। এ বই সম্বন্ধে সে কথা আরও অনেক বেশি সত্য। বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর সঙ্গেই এ বই আমার গ্রন্থাগারে বিরাজ ক'রে বঙ্কিম সাহিত্য পাঠের পথ আলোকিত করবে। বইখানার প্রচার হওয়া আবশ্যক। বর্ত্তমান ও অনাগত পাঠক সম্প্রদায়ের জন্য গ্রন্থকার যে পরিশ্রম স্বীকার ক'রেছেন সেজন্য তিনি বাঙালী সমাজের ধন্যবাদের পাত্র।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

নিবেদন

সাহিত্যিক অভিধান বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত নয়। তাই এ জাতীয় গ্রন্থের উপযোগিতা সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা দরকার। প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের নিয়ে রচিত প্রবন্ধগ্রন্থে কখনো বা তাঁদের জীবন-সংক্রান্ত আলোচনা, কখনো বা তাঁদের সাহিত্য-কৃতিত্বের আলোচনা স্থান পায়। এই জাতীয় গ্রন্থগুলি আলোচকের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাবজাত। তাই একই লেখক সম্বন্ধে দুটি সমালোচনা গ্রন্থের মধ্যে পার্থক্য দুস্তর। তাছাড়া, একমাত্র কোন গ্রন্থই একজন লেখক সম্বন্ধে সম্পূর্ণ কৌতূহল নিবৃত্ত করতে অক্ষম। কিন্তু সাহিত্যিক অভিধান সে অসুবিধা দূর করে। কারণ—প্রথমতঃ, এ জাতীয় গ্রন্থে আলোচ্য লেখকের জীবন-সংক্রান্ত তথ্যাবলী যেমন সন্নিবেশিত হয়, তেমনি তাঁর সাহিত্যের খুঁটিনাটি বিষয়ের ওপরেও আলোকপাত করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, অভিধান-রচয়িতা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে আলোচনার সূত্রটি ধরিয়ে দিতে চেষ্টা করেন বলে পাঠককে তা প্রভাবিত করা অপেক্ষা, নিজস্ব বুদ্ধি ও বোধের সমন্বয়ে রসোপলব্ধির সুবিধা ক'রে দেয়। সর্বোপরি, কোন সাহিত্যিক সম্বন্ধে বহু তথ্যসম্বলিত একটিমাত্র আকরগ্রন্থ পাঠকদের বহুপঠনের পরিশ্রমকে লাঘব করে।

তাই বাংলা ভাষায় সাহিত্যিক অভিধান রচনার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। কিন্তু অদ্যাবধি এই পথের একমাত্র পথিকৃৎ আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মহাশয় শ্রীযুক্ত সোমেন্দ্রনাথ বসু 'রবীন্দ্র-অভিধান' খণ্ডানুসারে প্রকাশ ক'রে চলেছেন ; তিনিই আমাকে 'বঙ্কিম-অভিধান' রচনার প্রেরণা যোগান। তারপর থেকেই দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে এই গ্রন্থ রচনার জন্য আমি অক্লান্ত পরিশ্রম করতে সুরু করি। যতই গভীরে যাই, ততই মনে হয়—এ কাজ বুঝি একার দ্বারা সমাধা করা সম্ভব নয়। কিন্তু সোমেনবাবু নিজেও যেমন অক্লান্তকর্মা হয়ে রবীন্দ্র-সাগর মন্থন ক'রে চলেছেন, আমাকেও তেমনি বারবার উৎসাহ দিয়ে এ পথে এগিয়ে দিয়েছেন। আজ এই গ্রন্থ প্রকাশকালে কিঞ্চিৎ গুরু-দক্ষিণাস্বরূপ তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

বাংলা দেশে প্রবন্ধের পুস্তক প্রকাশ যে কি কঠিন আর্থিক ঝুঁকির ব্যাপার, তা সহজেই অনুমেয়। কবিতার বই কিনে পড়ার লোক অল্প হলেও, অনেকে সখ ক'রে বিয়েবাড়ীতে বা অন্য কোন অনুষ্ঠানে তা উপহার দিয়ে থাকেন। কিন্তু কোনদিন কেউ প্রবন্ধের বই সহজে উপহার দিয়েছেন কি ? ছাত্রপাঠ্য প্রবন্ধ-পুস্তক যদি হয়, তাহলেও তবু কিছু বিক্রী হয়, কিন্তু নিছক ছাত্রপাঠ্য নয় এমন প্রবন্ধ-পুস্তকের দশা শোচনীয়।

কিন্তু তবুও বাংলা দেশে এখনো এমন কয়েকজন প্রকাশক আছেন, যাঁরা এরকম ঝুঁকি নিয়েও গবেষণা-পুস্তক প্রকাশ ক'রে থাকেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ বারিক মহাশয়কে আমি সেরকম একজন প্রকাশক বলেই মনে করি। আমার প্রতি তাঁর যে স্নেহের মনোভাব রয়েছে, তাকে কৃতজ্ঞতার বিশেষণ দিয়ে ছোট করতে চাই না। কিন্তু তাঁকে উপলক্ষ ক'রে কয়েকটি কথা না বললেও বাংলা সাহিত্যের একটি সমস্যাকে চিহ্নিত করা যাবে না।

বানান সমস্যা বর্তমান বাংলা ভাষার একটি বিশেষ সমস্যা। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বেশী সমস্যা দেখা দেয় পুরাতন লেখকদের উদ্ধৃতি-ব্যবহারের ক্ষেত্রে বানান নিয়ে। শ্রদ্ধেয় হৃষীবাবু যখন উদ্ধৃতির শুদ্ধতা রক্ষার জন্য প্রাচীন লেখকদের বানান বিষয়ে আমাকে সতর্ক হতে বললেন, তখন আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলাম—অনেক গ্রন্থাবলী বা পরবর্তী সংস্করণের পুস্তকে বিনা কারণেই আধুনিক বানান সংযোজিত হয়েছে। আবার সাময়িক পত্র থেকে পুস্তকে বা সংকলনে উদ্ধৃত করার সময় সংকলক খুশিমত বানান ব্যবহার করেছেন। যদি এভাবে আমরা চলতে থাকি, তাহলে প্রাচীন সাহিত্যিকদের শব্দগঠন ও লিপিভঙ্গী অচিরেই লোপ পাবে। সেটা কি সমর্থনযোগ্য? তাছাড়া, পরবর্তী কালের গবেষকদেরও অনেক অসুবিধা হবে। আমাদের মনে হয়, সম্ভব হলে এখনও বঙ্কিম-গ্রন্থাবলীর এমন একটি সংস্করণ প্রকাশ করা দরকার, যাতে বঙ্কিম-সমকালের বানানের বৈশিষ্ট্যটি বজায় থাকে। এই গ্রন্থে উদ্ধৃতিগুলিতে যথাসম্ভব প্রাচীন বানান রক্ষা করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু যেখানে 'উদ্ধৃতির উদ্ধৃতি' দিতে হয়েছে সেখানে আমি নিরুপায়।

বঙ্কিম সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আরো একটি বিষয় আমার নজরে পড়েছে যা সত্যই দুঃখজনক। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ'-সংস্করণ গ্রন্থাবলী বা অন্যান্য যে সমস্ত বঙ্কিম-গ্রন্থাবলী প্রচলিত আছে, তাতে বঙ্কিমের অধিকাংশ রচনা সন্নিবেশিত হলেও সমস্ত রচনা স্থানলাভ করেনি। এটি যে সবসময় অনিচ্ছাকৃত নয় তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি।

'বঙ্গদর্শনে'র আবির্ভাবের পর বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ রচনাই প্রথমে এই পত্রিকায় প্রকাশিত হত। 'ভ্রমর', 'প্রচার' প্রভৃতি অন্যান্য পত্রিকাতেও তিনি রচনা প্রকাশ করতেন। তারপর সেগুলির মধ্য থেকে বাছাই ক'রে টুক্‌রো-রচনাগুলিকে তিনি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো সদা-সচেতন সমালোচক-মনা লেখক স্বভাবতঃই দুর্বল রচনাগুলিকে বাদ দিতেন। তাই 'প্রবন্ধ পুস্তকে'র বিজ্ঞাপনে লিখলেন—"এই গ্রন্থে যে কয়টি প্রবন্ধ সংগৃহীত হইল তাহা সকলই 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত

হইয়াছিল। কোন কোন প্রবন্ধের স্থানে স্থানে কিছু কিছু পরিত্যাগ করা গিয়াছে। কখনও বা প্রবন্ধের নাম পরিবর্ত্তন করা গিয়াছে।

"এ জাতীয় আরও কয়েকটি মৎপ্রণীত প্রবন্ধ 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হইয়াছিল। নানা কারণে সেগুলি এক্ষণে পুনর্মুদ্রাঙ্কনের অযোগ্য বিবেচনা করিলাম।"

আবার "বিবিধ প্রবন্ধে"র দ্বিতীয় ভাগের বিজ্ঞাপনে লিখলেন—"যে সকল প্রবন্ধ এই সংগ্রহে পুনর্মুদ্রিত হইল, তাহার অধিকাংশ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল; অল্পভাগ প্রচারে।

"১২৭৯ সালে আমি বঙ্গদর্শন প্রকাশ আরম্ভ করি। চারি বৎসর আমি উহার সম্পাদকতা নির্ব্বাহ করি। ঐ চারি বৎসরের বঙ্গদর্শন আর পাওয়া যায় না। কিন্তু ঐ চারি বৎসরের বঙ্গদর্শন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে—যেমন সামান্যই হউক, একটু স্থান লাভ করিয়াছে। এজন্য অনেকে উহা পাইবার অভিলাষ করেন। অনেকে আমাকে সে জন্য পত্র লেখেন; কিন্তু যাহা নাই তাহা আমি দিতে পারি না। অনেকে পরামর্শ দেন যে, বঙ্গদর্শন পুনর্মুদ্রিত করি। কিন্তু বঙ্গদর্শনের আমি একমাত্র লেখক ছিলাম না। অন্যের রচনা আমি কি প্রকারে পুনর্মুদ্রিত করিব? যাহা পারি, তাহা করিয়াছি। আমার নিজের রচনার অধিকাংশই ইতিপূর্ব্বে পুনর্মুদ্রিত করিয়াছি। যাহা বাকি ছিল, তাহার মধ্যে কতকগুলি এই প্রবন্ধে পুনর্মুদ্রিত করিলাম।

"সকলগুলি পুনর্মুদ্রিত করিবার যোগ্যও নহে। যাহা এ পর্য্যন্ত পুনর্মুদ্রিত হয় নাই, তাহা হইতে বাছিয়া বাছিয়া কয়েকটি মাত্র পুনর্মুদ্রিত করিলাম। ইহার সঙ্গে প্রচার নামক পত্রে প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধও পুনর্মুদ্রিত করিলাম। অবশিষ্ট প্রবন্ধগুলি পুনর্মুদ্রিত করিব কিনা, তাহা এক্ষণে বলিতে পারি না।"

বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে এ জাতীয় অযোগ্যতা নির্বাচনের প্রয়োজন থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের কি উচিত নয় বঙ্কিমচন্দ্রের সামগ্রিক রচনার পরিচয়লাভের জন্য সবগুলি রচনাকেই সংরক্ষিত করা!

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর বঙ্কিম গ্রন্থাবলীর সম্পাদকদ্বয়—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস 'বিবিধ' বিভাগে বঙ্কিমচন্দ্রের যে রচনাগুলি সন্নিবিষ্ট করেছেন, সে সম্বন্ধে ভূমিকায় বলেছেন—

"বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী প্রকাশ এই খণ্ডে সমাপ্ত হইল; সম্পূর্ণ সমাপ্ত হইল বলা ঠিক হইবে না, আমরা সমাপ্ত করিলাম। সাময়িক-পত্রে এবং অন্যত্র প্রকাশিত এবং এখনও পাণ্ডুলিপি আকারে রক্ষিত অনেক সাময়িক ও অসাময়িক সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ রচনা আমরা জানিয়া-শুনিয়াও এই সংগ্রহ মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিতে পারিলাম না।

'বঙ্গদর্শন', 'ভ্রমর', 'নবজীবন', 'প্রচার' প্রভৃতিতে এখনও বঙ্কিমচন্দ্রের বেনামী বহু রচনা রহিয়া গেল। সকলগুলি প্রকাশ করিতে হইলে আমাদের সামর্থ্যে কুলাইবে না। আমরা বিভিন্ন বিষয়ে ও ভঙ্গীতে লেখা তাঁহার রচনার নমুনা মাত্র দিবার চেষ্টা করিলাম।

"যে বেনামী রচনাগুলি আমরা বর্ত্তমান খণ্ডে প্রকাশ করিলাম, অনুমান ও পারিপার্শ্বিক প্রমাণের সাহায্যে আমরা সেগুলি বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা বলিয়া বুঝিয়াছি ; দুই এক স্থলে ভুল হওয়াও অসম্ভব নহে।"

বলা বাহুল্য, এ জাতীয় নির্বাচনের যৌক্তিকতা স্বীকার করা যায় না। কারণ, বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র রচনার পরিচয় তুলে ধরতে গেলে তাঁর সব রচনারই পুনর্মুদ্রণ প্রয়োজন। ভুলবশতঃ কিছু বেশী বা অন্যের রচনাও প্রবেশ করলে ক্ষতি নেই, কালক্রমে সেগুলির উত্তরাধিকার হয়তো নির্বাচন করা যেতে পারে, কিন্তু জেনেশুনে কোন রচনাই বাদ দিয়ে যাওয়া ঠিক নয়। আমরা সযত্নে এই সমস্ত অপ্রকাশিত রচনাগুলির উদ্ধারকার্যে ব্যাপৃত আছি। সম্ভব হলে 'বঙ্কিম-অভিধান'-এর দ্বিতীয় খণ্ডে তা সন্নিবেশিত হবে।

'বঙ্কিম-অভিধান'-এর বর্তমান খণ্ডে কেবলমাত্র উপন্যাসগুলিই স্থান পেয়েছে। পাঠকদের সুবিধার জন্য কয়েকটি বিষয়ে ভাগ ক'রে তথ্যগুলি আলোচিত হয়েছে। প্রথমেই বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের মোটামুটি একটি পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছি। তারপর "বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন ও জীবনী সংক্রান্ত তথ্য"-এ তাঁর জীবনের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন ব্যক্তির, স্থানের বা প্রতিষ্ঠানের পরিচয় বর্ণানুক্রমে দেওয়া হয়েছে। এখানে বহুল-পরিচিত বিষয়গুলিই স্থান পেয়েছে।

"বঙ্কিম-উপন্যাসের নাম ও পরিচ্ছেদের নাম সম্বন্ধীয় আলোচনা"য় বঙ্কিম-প্রদত্ত গ্রন্থ ও পরিচ্ছেদ সম্বন্ধে বর্ণানুক্রমে আলোচনা স্থান পেয়েছে। গ্রন্থনামের আলোচনাগুলিকে বাঁদিকে তারকা-চিহ্ন দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। গ্রন্থ আলোচনায়—রচনাকাল, প্রকাশকাল, প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র, সংস্করণভেদ, সংক্ষিপ্ত কাহিনী ও অন্যান্য আলোচনা স্থান পেয়েছে। চরিত্রগুলি পরে আলোচিত হওয়ায় এখানে স্থান পায়নি। পরিচ্ছেদের নামের ক্ষেত্রে পাশে খণ্ড ও পরিচ্ছেদের সঙ্কেত দেওয়া আছে। যেমন—"অগাধ জলে সাঁতার (চন্দ্রঃ ৩/১৬)" বলতে 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের তৃতীয় খণ্ড ষোড়শ পরিচ্ছেদ বুঝতে হবে। যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে পরিচ্ছেদের কাহিনী ও বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে।

"বঙ্কিম-উপন্যাসের চরিত্র ও নাম সম্বন্ধীয় আলোচনা" আরম্ভ হয়েছে ১৭৭ পৃষ্ঠা

থেকে। কিন্তু অনবধানতাবশতঃ শিরোনাম দ্বারা তা চিহ্নিত হয়নি। ১৭৭ পৃষ্ঠার মাঝামাঝি থেকে বর্ণানুক্রমে চরিত্র আলোচনার সুরু বলে গণ্য করতে হবে।

বঙ্কিম-উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রের আলোচনা ছাড়াও উপন্যাসের উল্লিখিত নাম গুলিও এই পরিচ্ছেদে সন্নিবেশিত। নামের ডানদিকে উপন্যাসের যেখানে সেই চরিত্রটির প্রথম উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে, তা চিহ্নিত করা হয়েছে। যেমন—"অগ্নিবর্ণ (রাজঃ ৭/২)" বলতে 'রাজসিংহ' উপন্যাসের সপ্তম খণ্ড দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে 'অগ্নিবর্ণ' চরিত্রটির সর্বপ্রথম উল্লেখ আছে বুঝতে হবে। "বঙ্কিম-উপন্যাসের দুরূহ শব্দ, ভৌগোলিক স্থান ও বিবিধ বিষয়"—আলোচনাতেও অনুরূপভাবে ডানদিকে উৎসনির্দেশ করা আছে। "বঙ্কিম সুভাষিত"—বঙ্কিম-উপন্যাসের বিবিধ পাত্র-পাত্রীর মুখে প্রযুক্ত ও লেখকের বিবৃত আর্ষ-প্রয়োগের সঙ্কলন। এগুলির মূল্য চিরন্তন এবং স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহারযোগ্য। "বঙ্কিম-সম্বন্ধীয় আলোচনা-গ্রন্থের তালিকা"টি যতদূর সম্ভব পূর্ণাঙ্গরূপে প্রকাশ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

সবশেষে "নির্দেশিকা" অংশে বর্ণানুক্রমে সমস্ত আলোচনাগুলির সূচী প্রস্তুত করা হয়েছে, যাতে পাঠকদের দ্রষ্টব্য বিষয়টি খুঁজে নিতে কোন অসুবিধা না হয়। আলোচনায় দুটি জিনিসের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে—সংক্ষেপে সমস্ত তথ্যের উল্লেখ এবং ভাব-প্রবণতা বা উচ্ছ্বাসবাহুল্যের সংযম। সেজন্য রসের হয়ত কিছুটা কম্‌তি হতে পারে।

এই অভিধানের তথ্যসংগ্রহে যতদূর সম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। তবুও অনবধানতাবশতঃ যদি দু'একটি ত্রুটি থেকে যায় সেগুলি সহৃদয় পাঠকদের লেখকের নামে ও প্রকাশকের ঠিকানায় জানিয়ে দিতে অনুরোধ করি। "বঙ্কিম-অভিধানে"র দ্বিতীয় খণ্ডে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যের সমাবেশ করা হবে। প্রথম খণ্ডটি যাঁরা সংগ্রহ করবেন, তাঁরা যদি দ্বিতীয় খণ্ডের চাহিদা জানিয়ে প্রকাশকের ঠিকানায় জানিয়ে দেন, তাহলে আমাদের উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে।

এই গ্রন্থের অনেক তথ্যসংগ্রহে সহযোগিতা করেছেন আমার সহধর্মিণী শ্রীমতী স্বপ্না কুণ্ডু, এম. এ। জীবনের সকলক্ষেত্রেই তাঁর অর্ধাংশ বরাদ্দ থাকার জন্য বিশেষ কিছু বলার দরকার করে না।

"বঙ্কিম-উপন্যাসের চরিত্র ও নাম সম্বন্ধীয় আলোচনা" অংশটি দীর্ঘকাল ধরে 'সমকালীন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলা ভাষায় একমাত্র প্রথম শ্রেণীর প্রবন্ধ মাসিক 'সমকালীন' সম্পাদক শ্রদ্ধেয় আনন্দগোপাল সেনগুপ্তের সহৃদয় ব্যবহার ও প্রবন্ধ-রচনায় উৎসাহদানের জন্য এই উপলক্ষে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাই।

বিশ্ববিদ্যালয়-জীবনে যাঁর সরস ও মৌলিক পাঠনভঙ্গী আমাদের মুগ্ধ করেছিল, সাহিত্যের সব্যসাচী সেই শ্রদ্ধেয় প্রমথনাথ বিশী মহাশয় তাঁর অমূল্য সময় ব্যয় ক'রে এই গ্রন্থ সম্বন্ধে মতামত দিয়ে গ্রন্থটির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। ভাষাচার্য ডঃ সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ও বাংলা উপন্যাসের ঐতিহাসিক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও গ্রন্থটি সম্বন্ধে অনুকূল মতামত প্রকাশ ক'রে আমাকে ঋণবদ্ধ করেছেন। তাঁদের সকলকে সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি।

তাছাড়া, বাংলা সাহিত্যের খ্যাতনামা পণ্ডিতগণ এই গ্রন্থটি সম্বন্ধে যেভাবে অনুকূল মতামত প্রকাশ করেছেন, তাতে আমি অভিভূত। সকলেই আমার শ্রদ্ধেয়, তাই কৃতজ্ঞতার বিশেষণে তাকে খর্ব করতে চাই না।

বঙ্কিমচন্দ্র বর্তমান বাঙালী পাঠকের কাছে যে পরিমাণ শ্রুত, সে পরিমাণ পঠিত নয়। কিন্তু তিনিই বাংলা গদ্যের যথার্থ পথ প্রস্তুত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও সে ঋণ স্বীকার করতে ভোলেননি। প্রত্যেক বাঙালীর বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য পাঠ করা অবশ্যকর্তব্য। সে কর্তব্যপথে আজও যে আনন্দের শিহরণ বিদ্যমান, অভিজ্ঞ পাঠকরা অবশ্যই তা স্বীকার করবেন। এই গ্রন্থ বঙ্কিম-পাঠকদের সাহায্য করলে, বাংলা সাহিত্য-চর্চায় আমার প্রথম পরিশ্রম সার্থক হবে।

অশোক কুণ্ডু

সূচীপত্র

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন ও জীবনীসংক্রান্ত তথ্য

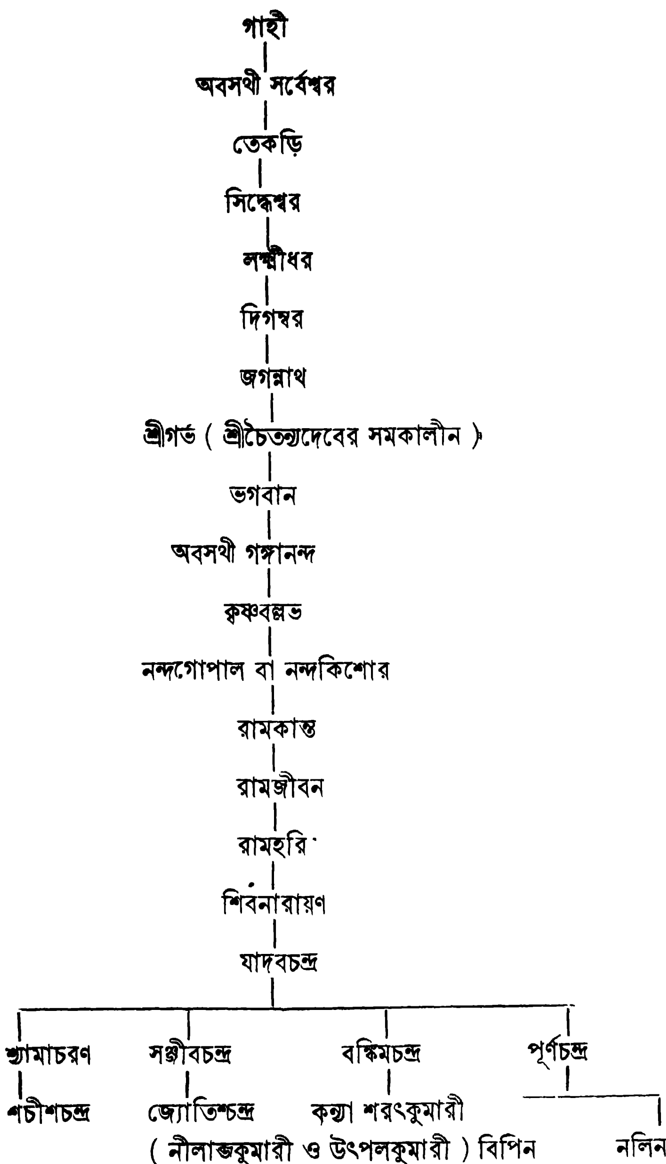
বঙ্কিমচন্দ্র। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশ রত্নপ্রসূ। বঙ্কিমচন্দ্র সেই মহামূল্য রত্নের অন্যতম। বাংলাসাহিত্যে বিশিষ্ট অবদানের জন্যই শুধু নয়, জাতীয়তাবোধের মন্ত্রের উদ্গাতা হিসাবে, সমাজসংস্কারক হিসাবে এবং দৃঢ়চেতা পুরুষ হিসাবেও তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ শে জুন, ১৩ই আষাঢ় ১২৪৫ সাল, রাত্রি ন'টার সময় কাঁটালপাড়ার বাড়ীতে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম হয়। পিতার নাম যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মাতা দুর্গা দেবী। বঙ্কিমচন্দ্র পিতা-মাতার তৃতীয় সন্তান।

ভ্রাতা সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনী আলোচনা-প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র যে বংশপরিচয় দিয়েছেন, তা তাঁর নিজের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। "অবসাথী গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায় এক শ্রেণীর ফুলিয়া কুলীনদিগের পূর্বপুরুষ। তাঁহার বাস ছিল হুগলী জেলার অন্তঃপাতী দেশমুখো। তাঁহার বংশীয় রামজীবন চট্টোপাধ্যায় গঙ্গার পূর্বতীরস্থ কাঁটালপাড়া গ্রাম নিবাসী রঘুদেব ঘোষালের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র রামহরি চট্টোপাধ্যায়ের বংশীয় সকলেই কাঁটালপাড়ায় বাস করিতেছেন।"

শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "বঙ্কিম-জীবনী"-তে যে বিস্তারিত বংশপরিচয় দিয়েছেন তা উদ্ধৃত করা হল।—

দক্ষ
|
সুলোচন
|
বাসুদেব
|
নায়ি
|
নারো (মতান্তরে কৃষ্ণদেব)
|
বরাহ
|
শ্রীকর অধ্বর্য্যু (মতান্তরে শ্রীধর)
|
বহুরূপ
|
গাহী



দেশ ও কাল। বঙ্কিমচন্দ্র যে যুগে বাংলাদেশে আবির্ভূত হন, সে সময়ের দেশ-কাল সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ অবহিত হওয়া প্রয়োজন। ইংরাজ-রাজত্ব সে সময় বাংলাদেশে মোটামুটি স্থায়িত্ব লাভ করেছে। সুতরাং রাজনৈতিক আন্দোলনের কোনো সুযোগ তখনো গড়ে ওঠেনি। বিশেষ করে দীর্ঘকাল মুসলমান-শাসনের অধীন থাকায়

ফলে যথার্থ দেশপ্রেমের সূচনা তখনো দেখা দেয়নি। বরং মুসলমান-শাসনের বাংলাদেশে বিভিন্ন অনাচারের স্মৃতি নিয়ে বাঙালীদের ইংরেজ-আনুগত্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত নবনগরী কোলকাতায় বাণিজ্যসূত্রে অর্থ উপার্জন করে, কিছু লোক যেমন ভাগ্যলক্ষ্মীর আশীর্বাদ লাভ করেছিল, তেমনি ইংরেজ-সরকারের চাকুরী-গ্রহণের জন্যও সাধারণ লোক আগ্রহী হয়। এ সময়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা হল ইংরাজী ভাষার। এ ভাষার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার ফলে বাঙালীর চিত্তবৃত্তি সাগরপার পর্যন্ত প্রসারিত হয়। ইংরাজী-সাহিত্যের বিপুল সম্পদ এই জাতির প্রতি শিক্ষিত বাঙালীর শ্রদ্ধা জাগিয়ে তোলে। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে বাংলা গদ্য-চর্চার সূত্রপাত ঘটে। এই গদ্য-চর্চা যখন ক্রমে ক্রমে বাঙালী জনসাধারণের মধ্যে বিস্তার লাভ করে, তখন চিন্তার রাজ্যে এক নূতন দিগন্তের সূচনা হয়। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। এই কলেজের ছাত্র, 'ইয়ং বেঙ্গল', ইংরেজীয়ানার অন্ধ অনুকারক বললে ক্ষতি হয় না। ইংরাজ পাদ্রীরা শহর কোলকাতার বুকেই খ্রীষ্টধর্ম প্রচার ও ধর্মান্তরিত করার যে প্রচেষ্টা চালাতে লাগলেন, তাতে ধর্মপ্রিয় বাঙালীর মনে বোধহয় প্রথম ইংরাজবিদ্বেষ জাগলো। হিন্দুধর্ম এবং খ্রীষ্টধর্মের মধ্যবর্তী ধর্ম রামমোহন রায় প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্ম। সেকালের অধিকাংশ চিন্তাশীল বাঙালীই এই ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে তাই আর এই ধর্মের তেমন প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়নি। আর একদিকে খ্রীষ্টধর্মের ব্যাপকতাকে রোধ করার জন্যই গোঁড়া হিন্দুধর্ম পুনরুজ্জীবিত হতে থাকল। হিন্দুকলেজের ছাত্র হয়েও ভূদেব মুখোপাধ্যায় রক্ষণশীল হিন্দুধর্মের পোষকতা করলেন। এমনি নানাভাবের আকর্ষণ বিকর্ষণে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের ইতিহাস চমকপ্রদ। এ সময়ের ইতিহাস মূলত সমাজ-আন্দোলনেরই ইতিহাস। এ ইতিহাসের মূলকথা—বাঙালীর আত্মচেতনার উদ্বোধন। তার ফলেই ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহীবিদ্রোহকে কেন্দ্র করে প্রথম ইংরাজ সিংহাসনের বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন জেগে উঠল। যদিও এই বিদ্রোহকে অনেকে স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রপাত বলে স্বীকার করেন না। তবুএকথা স্বীকার করতে হবে, সিপাহীবিদ্রোহ দমিত হলেও,—ইংরাজ বিদেশী, এদেশে তাদের অধিকার নেই—বাঙালীর এই মনভাব ক্রমে ক্রমে পুষ্ট হতে লাগল।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইতিহাসের নতুন আবর্তনে বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যজীবন গড়ে উঠেছে। কারণ ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে, বঙ্কিমচন্দ্র এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেন এবং পরবর্তী বৎসরে বি. এ পাশ করেন। অতএব এই সময়কে বঙ্কিমচন্দ্রের যথার্থ মানস-গঠনের যুগ বলা যেতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মস্থান নৈহাটী

কোলকাতার নিকটবর্তী। তাঁর ছাত্রজীবন যেখানে সুরু হয় সেই হুগলী কলেজও কোলকাতার কাছেই। বিশেষতঃ 'সংবাদপ্রভাকরে'র সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকাল থেকেই যোগাযোগ থাকায় উনবিংশ শতাব্দীর আন্দোলনের নানা প্রক্রিয়া তাঁর মনে অবচেতনভাবে নিশ্চয়ই কার্যকরী হয়েছিল।

লেখাপড়া। পাঁচ বছর বয়সে, কুল-পুরোহিত বিশ্বম্ভর ভট্টাচার্যের কাছে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে খড়ি হয়। তারপর তিনি গ্রামেরই পাঠশালায় রামপ্রাণ সরকার নামক জনৈক গুরুমশায়ের কাছে আট-দশ মাস পড়াশোনা কবেন।

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিচন্দ্রের বয়স যখন ছয় বছর, তখন তিনি তাঁহাব পিতার কর্মস্থল মেদিনীপুরে যান এব সেখানে এক ইংরাজী স্কুলে ভর্তি হন এবং পড়াশোনায় তিনি অত্যন্ত দক্ষতা দেখান। মেদিনীপুরে বঙ্কিমচন্দ্র পাঁচ বছর পড়াশোনা করেন। সেখান থেকে স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করার পর ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়াবী মাসে এক পঞ্চমবর্ষীয়া সুন্দরী কন্যার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রেব বিবাহ হয়। বঙ্কিমের বযস তখন এগার বছর।

ছেলেবেলায় বঙ্কিমচন্দ্র। বাল্যকালে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বভাব কিরূপ ছিল, সে সম্পর্কে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—"বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যকালে খেলার মধ্যে কেবল তাস খেলিতেন···। বালকদিগের দৌড়াদৌড়ি এবং অন্যান্য খেলা—যাহাতে শরীরের পুষ্টিসাধন কবে—তাহা খেলিতেন না। খেলিতে ভাল লাগিত না, সেইজন্য দুর্বল ও ক্ষীণদেহ ছিলেন।···বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা বাল্যকালে দিন দিন প্রস্ফুটিত হইতেছিল, উহার প্রভাবে অন্যান্য বালকেরা তাঁহাকে ভক্তি করিত, সকলে তাঁহার নিকট ঘেঁসিতে পারিত না। তিনি কাহাকেও ভাল বলিলে তাহার আনন্দ ও উৎসাহ বর্ধিত হইত।"

"যখন বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স দশ কি এগার বৎসর, তখন একদিন সংবাদ আসিল যে, একদল ডাকাত আমাদের বাটিতে ডাকাতি করিবে। পিতৃদেব তখন বাটিতে ছিলেন না, জেঠামহাশয়, খুড়ামহাশয়, পিসেমহাশয় প্রভৃতি মুরুব্বিগণ বন্দোবস্ত করিলেন যে, স্ত্রীলোকেরা ও আমার চার ভ্রাতা কয়েক রাত্রের জন্য প্রতিবাসীর গৃহে বাস করিব। ইহা শুনিবামাত্র বালক বঙ্কিম বাঁকিয়া বসিলেন, কুঞ্চিত কেশরাশি দুলাইয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, 'তাহা কখনই হইতে পারে না, বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাইব না।' পিসেমহাশয় বলিলেন, 'তবে ডাকাত আসিয়া সকলকে কাটিয়া যাক।' বঙ্কিম বলিলেন 'কেন কেটে যাবে? আমাদের বাড়ীতে ত অনেক লোক আছে, আর গ্রামের তেওর বাগদি যাহারা এক একজন লাঠিয়াল ও বোম্বেটেগিরি করে, তাহাদের নিযুক্ত করুন, সাধ্য কি যে ডাকাতেরা আমাদের কেটে যায়।' তাঁহার অগ্রজদ্বয়েরও ঐ মতে মত

হওয়াতে, বালক বঙ্কিমেরই পরামর্শ মতে কার্য হইল। কয় রাত্রি ধরিয়া অনেক লোক আমাদের বাড়ি পাহারা দিত। ডাকাত আসিয়া ফিরিয়া গেল। ঐ দিন হইতে গুরুজনেরা বঙ্কিমচন্দ্রকে 'বাঁকা' বলিয়া ডাকিতেন।"

হুগলী কলেজে শিক্ষা। সাড়ে এগার বছর বয়সে, ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ শে অক্টোবর বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজে ভর্তি হন। তখন কলেজেও স্কুল বিভাগ ছিল। স্কুলের দু'টি ভাগ—সিনিয়র ডিভিসনে তিনটি শ্রেণী এবং জুনিয়র ডিভিশনে চারটি শ্রেণী। বঙ্কিমচন্দ্র জুনিয়র ডিভিশনের প্রথম শ্রেণীর 'এ' সেক্শনে ভর্তি হন। মাসিক দু' টাকা বেতন দিয়ে তিনি পড়তেন। প্রথম বছরেই বঙ্কিমচন্দ্র বার্ষিক পরীক্ষায় কৃতিত্ব দেখাবার জন্য পুরস্কার পান। তখন জুনিয়র বিভাগেব ফাইন্যাল পরীক্ষা জুনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষা নামে প্রচলিত ছিল। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হয় ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে। বঙ্কিমচন্দ্র ঐ পরীক্ষা দেন এবং হুগলী কলেজ ও তার অধীনে ৭৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেন। তখন বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স ষোল বছরেও কম।

জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় বঙ্কিমচন্দ্র মাসিক ৮ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিনি সিনিয়র বৃত্তি-পরীক্ষা দেন এবং দু' বছর মাসিক ২০ টাকা হিসাবে বৃত্তি লাভ করেন। তারপর বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জুন, হুগলী কলেজ থেকে ট্রান্সফারের দরখাস্ত করেন ও ১২ই জুলাই এই কলেজ ত্যাগ করেন।

হুগলী কলেজের সাহিত্যজীবন। হুগলী কলেজে থাকাকালীন বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যচর্চা প্রকাশ্যে স্বীকৃতিলাভ করে। "সংবাদপ্রভাকরে" কবিতা রচনা করে তিনি কুড়ি টাকা পুরস্কার লাভ করেন। দীনবন্ধু মিত্র এবং দ্বারকানাথ অধিকারী নামে অন্য কলেজের দু'জন ছাত্রের সঙ্গে কবিতাযুদ্ধেও বঙ্কিমচন্দ্র আবির্ভূত হন। এই যুদ্ধ সংবাদ-প্রভাকরে "কালেজীয় কবিতা যুদ্ধ" নামে খ্যাত। হুগলী কলেজে আমরা কবি বঙ্কিমের পরিচয় পাই।

প্রেসিডেন্সি কলেজ। হুগলী কলেজ থেকে ট্রান্সফার নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র কোলকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন পড়ার জন্য ভর্তি হলেন। কাঁটালপাড়া থেকে যাতায়াতের অসুবিধার জন্য কোলকাতায় বাড়ীভাড়া করলেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এনট্রান্স পরীক্ষার প্রবর্তন হল। বঙ্কিমচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজের আইনবিভাগ থেকে এই পরীক্ষা দিলেন। সেবার ২৪৪ জন ছাত্র পরীক্ষা দেন। তার মধ্যে প্রথম বিভাগে ১১৫ জন ও দ্বিতীয় বিভাগে ৪৭ জন উত্তীর্ণ হন। বঙ্কিমচন্দ্রও প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

পরবৎসর ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের প্রথমদিকে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বপ্রথম বি এ. পরীক্ষার প্রবর্তন হল। সেবার ১০ জন ছাত্র পরীক্ষা দিলেন। কিন্তু কেউ সববিষয়ে পাশ করতে পারেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র ও যদুনাথ বসু নামে অন্য একজন পরীক্ষার্থী ৫টি বিষয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। কিন্তু Mental and Moral Sciences'-এ অনধিক সাত নম্বর কম পেয়ে ফেল করেন। এই বিষয়ের পরীক্ষক ছিলেন The Revd. A. Duff, D D.। কিন্তু সিনেটের অধিবেশনে এঁদের সাত নম্বর অতিরিক্ত দিয়ে পাশ করিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হয়।

বি. এ. পরীক্ষার পরও ৭ই আগস্ট পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন পড়েছিলেন। তারপর চাকুরীলাভ করে তিনি অন্যত্র গমন করেন। কিন্তু ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বি. এল. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে তিনি তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

চাকুরী জীবন। বঙ্কিমচন্দ্র কিভাবে চাকুরী পেলেন, সেবিষয়ে শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "বঙ্কিমজীবনী"তে লেখেন, "বি এ. পরীক্ষার ফল প্রকাশ হইল, মে মাসের শেষ ভাগে। পরীক্ষার ফল দেখিয়া ছোটলাট হ্যালিডে সাহেব, বঙ্কিমচন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বঙ্কিমচন্দ্র আসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য গ্রহণ করিবে ?'

বঙ্কিমচন্দ্র। পিতাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া উত্তর দিতে পারি না।

ছোটলাট। এতদপেক্ষা কি বড় চাকৃরি তুমি প্রত্যাশা কর ?

বঙ্কিমচন্দ্র। যত বড় চাকৃরি আপনি আমাকে দিন্ না কেন, পিতার অভিপ্রায় না বুঝিয়া আমি কোন কার্য গ্রহণ করিতে পারি না।

ছোটলাট, বঙ্কিমচন্দ্রের পিতৃভক্তি দর্শনে প্রীত হইলেন ; বলিলেন, 'ভাল, তোমায় আমি কিছু দিনের সময় দিলাম ; তোমার পিতার সহিত পরামর্শ করিয়া সত্বর আমায় সংবাদ দিবে।'

চাকৃরি গ্রহণ করিতে বঙ্কিমচন্দ্রের বড় বেশী ইচ্ছা ছিল না ; কিন্তু পিতার আদেশে তাহা গ্রহণ করিতে হইল।

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ২৩-এ আগস্ট তারিখে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইলেন। তখন তাঁহার বয়স কুড়ি বৎসর দুই মাস।"

বঙ্কিমচন্দ্রের এই চাকুরীলাভের কাহিনী কতদূর সত্য সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কারণ শচীশচন্দ্র প্রদত্ত সাল তারিখ অনেক ক্ষেত্রেই নির্ভরযোগ্য নয়। বঙ্কিমচন্দ্র দীর্ঘ চাকুরীজীবনে যে বিভিন্ন স্থানে নিযুক্ত হয়েছিলেন তার তালিকা "সাহিত্যসাধক চরিতমালা" থেকে উদ্ধৃত করা হল।

স্থান	স্থায়ী বা অস্থায়ী পদ	নিয়োগের তারিখ
যশোহর	ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টর	১৮৫৮, ৭ আগস্ট
নেগুয়াঁ	ঐ	১৮৬০, ২১ জানুয়ারী
(মেদিনীপুর)	ঐ (৫ম শ্রেণী)	১৮৬০, ৭ নভেম্বর
খুলনা	ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টর	১৮৬০, ৯ নবেম্বর
ছুটি : ব্যক্তিগত কাজে ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৬১ হইতে ১৫ দিন।		
	ঐ	১৮৬১, ৫ অক্টোবর
	ঐ (৪র্থ শ্রেণী)	১৮৬৩, ১৩ জানুয়ারি
বারুইপুর (২৪-পরগনা)	ঐ	১৮৬৪, ৫ মার্চ
	ঐ (অস্থায়ী) ডায়মণ্ডহারবার	১৮৬৪, ২৪ অক্টোবর
	ঐ (৩য় শ্রেণী)	১৮৬৬, ৫ মার্চ
অসুস্থতাবশতঃ ২২ জুন ১৮৬৬ হইতে ১ মাস ১৬ দিন		
	ঐ	১৮৬৬, ৭ আগষ্ট
গবর্মেণ্ট আমলাদের বেতন-নির্দ্ধারণ জন্য কমিশনের কাজ		১৮৬৭, ৩১ মে
	ঐ (অস্থায়ী) আলিপুর, ২৪-পরগনা	১৮৬৭, ১৪ আগষ্ট
ছুটি : ব্যক্তিগত কাজে ৫ জুন ১৮৬৯ হইতে ৬ মাস		
	ঐ	১৮৬৯, ৫ ডিসেম্বর
মুর্শিদাবাদ	ঐ	১৮৬৯, ১৫ ডিসেম্বর
	ঐ (২য় শ্রেণী)	১৮৭০, ২৫ নবেম্বর
বহরমপুরস্থ রাজশাহী কমিশনারের পার্সন্যাল অ্যাসিষ্টাণ্ট (অস্থায়ী)		১৮৭১, ২৫ এপ্রিল
	ঐ	১৮৭১, ২৮ মে
মুর্শিদাবাদে কলেক্টরের ক্ষমতাপ্রাপ্তি		১৮৭১, ১০ জুন
ছুটি : বিনা-মঞ্জুরীতে দুই দিন—১৭ ও ১৮ এপ্রিল ১৮৭৩		
ছুটি : অসুস্থতাবশতঃ ৩ ফেব্রুয়ারী ১৮৭৪ হইতে ৩ মাস		
বারাসাত (২৪-পরগনা)	ঐ	১৮৭৪, ৪ মে
মালদহে রোড-সেস কার্য্যে (অস্থায়ী)		১৮৭৪, ২৫ অক্টোবর
ছুটি : অসুস্থতাবশতঃ ২৪ জুন ১৮৭৫ হইতে ৮ মাস ২৬ দিন		
হুগলী	ঐ	১৮৭৬, ২০ মার্চ
ছুটি : অসুস্থতাবশতঃ ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৯ হইতে ১১ দিন		

স্থান	স্থায়ী বা অস্থায়ী পদ	নিয়োগের তারিখ
হুগলী	ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টর	১৮৭৯, ২৮ ফেব্রুয়ারী
ঐ	এবং বর্দ্ধমান-ডিবিসন কমিশনারের অস্থায়ী পার্সন্যাল অ্যাসিষ্টাণ্ট	১৮৮০, ৬ নবেম্বর
হাবড়া	ঐ	১৮৮১, ১৪ ফেব্রুয়ারী
কলিকাতা	বেঙ্গল গবর্মেণ্টের অ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী (অস্থায়ী)	১৮৮১, ৪ সেপ্টেম্বর
	ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টর	
আলিপুর (২৪-পরগনা)	২য় শ্রেণী (অস্থায়ী)	১৮৮২, ২৬ জানুয়ারি
বারাসত	ঐ (অস্থায়ী)	১৮৮২, ৪ মে
আলিপুর (২৪-পরগনা)	ঐ (অস্থায়ী)	১৮৮২, ১৭ মে
জাজপুর (কটক)	ঐ (অস্থায়ী)	১৮৮২, ৮ আগষ্ট
হাবড়া	ঐ	১৮৮৩, ১৪ ফেব্রুয়ারী
	ছুটি : প্রিভিলেজ লীভ ২০ নবেম্বর ১৮৮৩ হইতে ১৩ দিন	
	ঐ (১ম শ্রেণী)	১৮৮৪, ১ নবেম্বর
ঝিনাদহ (যশোহর)	ঐ	১৮৮৫, ১জুলাই
	ছুটি : অসুস্থতারশতঃ ৫ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৬ হইতে ৩ মাস	
ভদ্রক (কটক)	ঐ (অস্থায়ী)	১৮৮৬, ১৭ মে
হাবড়া	ঐ	১৮৮৬, ১০ জুলাই
	ছুটি : ব্যক্তিগত কাজে ১৯ নবেম্বর ১৮৮৬ হইতে ৬ মাস	
মেদিনীপুর	ঐ	১৮৮৭, ১৯ মে
	ছুটি : বিনা-বেতনে ২৭ ডিসেম্বর ১৮৮৭ হইতে ৩ মাস ২০ দিন	
আলিপুর (২৪ পরগনা)	ঐ	১৮৮৮, ১৬ এপ্রিল
	ছুটি : প্রিভিলেজ লীভ ৩১ মার্চ ১৮৯০ হইতে ১ মাস ১৭ দিন	

অবসর গ্রহণ—১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৯১।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই সুদীর্ঘ ৩৩ বছরের কর্মজীবন যেমন বৈচিত্র্যময়, তেমনি ফলপ্রসূ। এই চাকুরী জীবনই বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনার সময়। কর্মময় জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁর সাহিত্যে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে তা চিন্তার বিষয়। চাকুরী উপলক্ষে তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তা ও চরিত্রবলের পরিচয় দিয়েছেন। নিঃসঙ্কোচে তিনি অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন। কোন কোন উদারচেতা উচ্চপদস্থ ইংরাজের কাছ থেকে

তিনি যেমন প্রশংসা অর্জন করেছেন, তেমনি কোন কোন ক্ষেত্রে বিরোধিতাও পেয়েছেন। মোটের উপর বঙ্কিমচন্দ্র ওপরওয়ালাদের খুব খুশী করতে পারেন নি। তাই যথেষ্ট যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তিনি কোনেদিন ম্যাজিস্ট্রেট হতে পারলেন না।

প্রথম কর্মোপলক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র যশোহরে গেলেন। সেখানে থাকাকালীন ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের পত্নীবিয়োগ হয়। প্রথমা পত্নীর মৃত্যুতে বঙ্কিমচন্দ্র সাতিশয় দুঃখিত হন। আর তাঁর বিবাহ করার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু পিতা-মাতার অনুরোধে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে হালিশহরের বিখ্যাত চৌধুরি-বাড়ীর কন্যা রাজলক্ষ্মী দেবীকে বিবাহ করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের এই স্ত্রী তাঁর মৃত্যুর পরও বেঁচেছিলেন। এঁর গর্ভে বঙ্কিমচন্দ্রের তিনটি কন্যাসন্তান জন্মে। তাঁদের নাম শরৎকুমারী, নীলাব্জকুমারী ও উৎপলকুমারী। এর মধ্যে শরৎকুমারীই দীর্ঘজীবি। এঁর সঙ্গে রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিম-পরিবারে সাংসারিক নানা গোলযোগের সূত্রপাত হয়। এই গোলযোগের বিস্তৃত ইতিহাস জানা যায় নি। এই সময় যাদবচন্দ্র উইল করে কাঁটালপাড়ার বাড়ী মধ্যমপুত্র সঞ্জীবচন্দ্র এবং কনিষ্ঠপুত্র পূর্ণচন্দ্রকে দেন।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে (বৈশাখ ১২৭৯) কোলকাতার ভবানীপুর থেকে বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত "বঙ্গদর্শন" পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এ পত্রিকা শুধু বাংলা-সাহিত্য জগতেই নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনাতেও এক যুগান্তর আনয়ন করে।

চাকরী থেকে অবসর গ্রহণের পর বঙ্কিমচন্দ্র কোলকাতার বাড়ীতে অবস্থান করেন। এই সময় তিনি বিভিন্ন সভা-সমিতিতে যোগদান করেন ও বিভিন্ন বক্তৃতা প্রদান করেন।

"১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ে তাঁহার বহুমূত্র রোগ অসম্ভবরূপ বৃদ্ধি পায়। তিনি শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন ; ২৩ দিন সাংঘাতিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ৫ই এপ্রিল হইতে তিনি জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়েন। পরে জ্ঞান ফিরিয়া পাইয়াছিলেন, কিন্তু বাক্‌রোধ হইয়াছিল। ৮ই এপ্রিল (২৬ চৈত্র ১৩০০) বেলা তিনটা ২৫ মিনিটের সময় তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র (শ্যামাচরণের পুত্র) কৃষ্ণবাবু মুখাগ্নি করেন।" (সাহিত্য সাধক চরিতমালা)

শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "বঙ্কিম-জীবনী"তে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর শোকযাত্রার এরূপ বর্ণনা দিয়াছেন—"মৃত্যুর সময় তাঁহার কক্ষে পাঁচ জন লোক উপস্থিত ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের স্ত্রী ও জ্যেষ্ঠা কন্যা, ভ্রাতা শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ও বাবু যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ।

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ মুহূর্তমধ্যে চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইল। অনেকেই ছুটিয়া

আসিলেন। সাহিত্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশ সমাজপতি ও কবিবর শ্রীযুক্ত অক্ষয় বড়াল তখন সুরেশবাবুর বাড়ীতে তাস খেলিতেছিলেন। তাঁহারা সংবাদ পাইবামাত্র তাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সুরেশবাবুর ছাপাখানা ছিল; তিনি তৎক্ষণাৎ একটা স্লিপ ছাপাইয়া, সহরময় বিলি করিবার জন্য চারিদিকে লোক পাঠাইলেন। সুরেশবাবু, অক্ষয়বাবু প্রভৃতি অনেকেই শকটারোহণে নগ্নপদে বঙ্কিম-মন্দিরে আসিয়া সমুপস্থিত। সে মন্দির তখন ক্রন্দনরোলে প্রতিধ্বনিত। বন্ধুবান্ধব ও ভক্তবৃন্দ যখন আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন বেলা সাড়ে চারিটা। লোক ক্রমান্বয়ে আসিতে লাগিল; অবশেষে বাড়ীতে লোক আর ধরে না।

কিন্তু দেহ লইয়া যাইতে অনেক বিলম্ব হইয়া পড়িল। যাহাকে খাট আনিতে পাঠান হইয়াছিল, সে আর ফিরে না। তাহার সন্ধানে যাহারা গেল, তাহারাও নিরুদ্দেশ হইল। অবশেষে বেলা ৬টাব সময় পাঁড়ে এক বৃহৎ খাট আনিয়া উপস্থিত কবিল। খাটের উপর উত্তম শয্যা বিস্তৃত হইল। শয্যোপবি পুষ্পরাশি বিকীর্ণ হইল। তাবপর—তারপর যে পঞ্চভৌতিক দেহে বঙ্কিমচন্দ্র কিছুকালেব জন্য বাস কবিযাছিলেন, যে মৃন্ময় ঘটমধ্যে দেবতা এতদিন অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন, সে ক্ষণভঙ্গুর আধার ত্রিতল হইতে আনীত হইয়া খট্টাঙ্গোপরি রক্ষিত হইল। বঙ্কিমচন্দ্রের মুখমণ্ডলে কোনও কষ্ট-চিহ্ন নাই—কোনও বিকার নাই। অপূর্ব শান্তি, চিবপ্রফুল্লতা বদনমণ্ডলে প্রতিভাত হইতেছিল। সে প্রফুল্লতা যেন এ সংসারের নয়,—তিনি যেন জ্ঞানদৃষ্টিতে কোনও অজ্ঞাত রাজ্যের সুখময় ছবি দেখিতে দেখিতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিযাছিলেন। যাঁহারা তখন তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা বলিয়াছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখিয়া মৃত বলিযা মনে হয় নাই, মনে হইয়াছিল, যেন তিনি নিদ্রিত—যেন তিনি সুপ্তাবস্থায় সুখময স্বপ্ন দেখিতেছিলেন।

গগনভেদী হাহাকারের মধ্যে 'অনিন্দ্যজ্যোতি স্বর্ণতরু'কে গৃহের বাহিরে আনা হইল। পরে কলেজ ষ্ট্রীট ও কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট দিয়া তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হয়। পুরমহিলাদের অনুরোধে ব্রাহ্ম-মন্দিরের সম্মুখে খাট নামান হয়। ব্রাহ্মমহিলারা গবাক্ষ হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের দেহ দর্শন করেন। সুরেশবাবু, রাখালবাবু প্রভৃতি অনেকেই খাট ধরিয়াছিলেন। খাট হাতে ঝুলাইয়া লইয়া যাওয়া হইতেছিল। তাঁহারা যত অগ্রসর হইতে লাগিলেন—তত জনস্রোত বাড়িতে লাগিল। সুরেশবাবুর স্লিপ পড়িয়া অনেকেই তখন বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখিতে ছুটিয়া আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে যিনি শুনিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের দেহ লইয়া যাওয়া হইতেছে, তিনি তৎক্ষণাৎ যে কোনও একটা দোকানে জুতা খুলিয়া শবদেহের অনুগমন করিতে লাগিলেন। গৃহচূড়া হইতে যিনি এ সংবাদ

পাইলেন, তিনি ঝটিতি জুতা খুলিয়া জন-স্রোতে সম্মিলিত হইলেন। যাঁহার পদতল কখনও ধূলিসংশ্লিষ্ট হয় নাই, তিনি গাড়ী ছাড়িয়া নগ্নপদে শবদেহের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন। এইরূপে যখন শব-বাহকেরা হেদুয়ার মোড় ভাঙ্গিয়া বীডন ষ্ট্রীটে পড়িলেন, তখন জন-সঙ্ঘ বিপুল আকার ধারণ করিয়াছে। বীডন ষ্ট্রীটে উপেন্দ্রবাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। বসুমতী অফিস তখন বীডন ষ্ট্রীটে। উপেনবাবু একটি মুদির দোকানে জুতা ফেলিয়া শবের অনুগমন করিলেন। থিয়েটারের সম্মুখে খাট আবার নামান হইল। সেদিন সন্ধ্যাকালে অভিনয়। অনেক লোক অভিনয়-দর্শনার্থ আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ থিয়েটার ছাড়িয়া শবদেহের অনুগমন করিলেন। যখন সকলে নিমতলা ঘাটে পৌছিলেন, তখন সহস্র সহস্র ব্যক্তি চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া সেই বিপুল জনতার কলেবর বর্ধিত করিতে লাগিলেন। কেহ বঙ্কিমচন্দ্রকে একবার শেষ দেখা দেখিয়া লইলেন, কেহ প্রণাম করিলেন, কেহ বা পুষ্পোহার প্রদান করিলেন। সে দৃশ্য মর্ম্মস্পর্শী!

ইহার পূর্বে বাঙ্গালী মৃত সাহিত্যিককে এমন করিয়া আর সম্মান দেখায় নাই। এই তাহার প্রথম আত্মসম্মান-বোধ, এই তাহার প্রথম জাতীয় ভাবের উন্মেষ।”

বঙ্কিমচন্দ্রের রূপ। বাল্যকালে বঙ্কিমচন্দ্র দুর্বল ছিলেন। যৌবনে বঙ্কিমচন্দ্র দৃপ্ততেজসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। মাথায় চেরা সিঁথি, সুপুষ্ট গোঁফ, চাপা ঠোঁট এবং উন্নত নাসিকায় দৃঢ়তার ভাব। প্রৌঢ়ের বঙ্কিমচন্দ্র ঋষিতুল্য। তখন তাঁর গোঁফ ছিল না। ফলে সমগ্র মুখমণ্ডলটি সৌমতার নিদর্শনরূপে বিরাজ করত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম দর্শনের অভিজ্ঞতা-বর্ণনায় বঙ্কিমের বিশিষ্ট মূর্তির কথা বলেছেন—“আর সকলে জনতার অংশ, কেবল তিনি যেন একাকী একজন।”

আচার-আচরণ। “বঙ্কিমবাবু ‘সৌখীন’ ছিলেন। তাঁহার আশেপাশে সবই বেশ পরিপাটি, পরিচ্ছন্ন, সাজানো দেখিতাম। অগোছালো, বিশৃঙ্খল কিছু চোখে পড়িত না। বঙ্কিমবাবুর পরিচ্ছদে বিলাসিতা বা বাবুগিরি ছিল না, কিন্তু পরিচ্ছন্নতা ও পারিপাট্য ছিল। বাড়িতেও বঙ্কিমবাবুর পিরানের বুকের বোতামের দু'একটা খোলা দেখি নাই। শেষ বয়সে বঙ্কিমবাবু দাড়ী গোঁফ ফেলিয়া দিয়াছিলেন; প্রত্যহ কামাইতেন। পরামাণিকের অনুপস্থিতির পরিচয় বঙ্কিমবাবুর মুখে কখনও দেখিয়াছি, এমন ত মনে হয় না। সোনার চশমাখানি ঝক্ ঝক্ চক্ চক্ করিত। খাপখানিও সেইরূপ। ঘরের আসবাব সুবিন্যস্ত পরিচ্ছন্ন। টেবিলে দোয়াত, কলম, কাগজপত্র, কেতাব প্রভৃতি যথাস্থানে সুরক্ষিত; কোথাও এক বিন্দু ধূলি নাই। বঙ্কিমবাবু লিখিয়া কলমটি মুছিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিতেন। গুড়গুড়িটি মাজা, নলটি ধোয়া মোছা;

মুরলী বড় কলিকায় 'তাওয়া' দিয়া উৎকৃষ্ট সুরভি মিঠে তামাক সাজিয়া দিত। বঙ্কিমবাবু বেশ থিতাইয়া জিরাইয়া, ধীরে ধীরে তামাক টানিবার আয়াস ভোগ করিতেন। বাড়ীতে ঢুকিলে ঘরের চারিদিকে চাহিলে মনে হইত, কোথাও কোন বিশৃঙ্খলা নাই।

সাহিত্যেও বঙ্কিমবাবুর 'সৌখীনতা'র পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র সৌন্দর্যের কবি ছিলেন। তাঁহার কল্পনায় সৌন্দর্য, রচনায় সৌন্দর্য, বাক্য-বিন্যাসে সৌন্দর্য, শব্দ চয়নে সৌন্দর্য। তাঁহার উপন্যাসের অনেক পাত্র-পাত্রীও সৌখীন, সৌন্দর্যপ্রিয়। তাঁহার আদর্শও সৌন্দর্য। তাঁহার অনেক ক্ষুদ্র সৃষ্টির 'রচনারীতি' খুব সৌখীন।" (বঙ্কিমচন্দ্র ঃ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি)।

পড়াশোনা। "কাব্যের উপর বঙ্কিমবাবুর খুব ঝোঁক ছিল। তিনি কলেজ হইতে বাহির হইয়া ভাটপাড়ার শ্রীরাম শিরোমণি মহাশয়ের নিকট রঘুবংশ কুমারসম্ভব মেঘদূত শকুন্তলা পড়িয়াছিলেন। ······সেকালে লোকে যে সকল ইংরাজি কাব্য পড়িত, সে সকলই বঙ্কিমবাবুর পড়া ছিল। বাঙ্গালায় তিনি কীর্তনের বড় অনুরাগী ছিলেন। একবার শুনিয়াছি কীর্তনওয়ালাকে পেলা দিতে দিতে তিনি বঙ্গদর্শনের তহবিল খালি করিয়া দিয়াছিলেন। গানের উপর তাঁহার বেশ ঝোঁক ছিল। তিনি কয়েক বৎসর যদু ভট্টের নিকট গান শিখিতেন, একটি হারমোনিয়মও কিনিয়াছিলেন। বসিয়া বসিয়া তিনি তাহা বাজাইতেন, ইহাও দেখিয়াছি ; কিন্তু তাঁহাকে দলনী বেগমের ন্যায় গুন্ গুন্ করিয়া ছাড়া গলা ছাড়িয়া গাহিতে কখনও শুনি নাই। তিনি ছাপাইয়াও বাল্যকালে কবিতা লিখিতেন। বাল্যকালের কবিতাগুলি তিনি একত্র করিয়াছিলেন। কিন্তু বয়স হইলে তিনি কবিতা লেখা একরকম ছাড়িয়াই দিয়াছিলেন।

কাব্যের চেয়েও ইতিহাসেই তাঁহার বেশি সখ ছিল। ইউরোপের ইতিহাস তিনি খুব পড়িয়াছিলেন। তিনি সর্বদাই ফ্লরেন্সের মেডিচিদের কথা কহিতেন। "রিনাইসেন্স (Renaissance) ইতিহাস তিনি খুব আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং সেই পথ ধরিয়া বাঙ্গালারও আবার যাহাতে নবজীবন সঞ্চার হয়, তাহার জন্য তিনি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন।" (বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ায় ঃ শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী)

মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র। "লেখক বঙ্কিমকে অনেকেই জানেন, কিন্তু মানুষ বঙ্কিমটি সকলের পরিচিত নহেন। তাঁর হৃদয়ের চারু শোভা সকলের বিদিত নহে। মাতাপিতার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ, স্বাধীনতা-প্রিয়তা ও ন্যায়ানুরাগ তাঁহার হৃদয়ের উজ্জ্বল অলঙ্কারস্বরূপ ছিল। তোষামোদ ও অযথা স্তুতিবাদে রাজ পুরুষগণের মনোরঞ্জনে তিনি চিরকাল সমভাবে ঘৃণা ও অনাস্থা প্রকাশ করিতেন, এজন্য তিনি দুই একবার

দুই একজন উদ্ধত-স্বভাব দাম্ভিক রাজকর্ম-চারীর একান্ত অপ্রিয়ভাজন হইয়াছিলেন তাহাতেও তাঁহার স্বাধীনতা ও সাহিত্যানুরাগ খর্ব হয় নাই। ন্যায়-বিচার ও কার্য বিচক্ষণতা প্রভাবে তিনি কি স্বদেশীয় কি বিদেশীয়, সকলেরই সমানভাবে শ্রদ্ধা ও সম্মান-ভাজন হইয়াছিলেন।

তিনি চিরদিন নির্ভয়ে ও অসঙ্কোচে উদার মত প্রকাশে আনন্দ অনুভব করিতেন। ······বন্ধুর প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগ ও গভীর ভালবাসা ছিল।······অপরিচিত লোকের প্রতিও তিনি কখনও বিনয়, নম্রতা ও সদ্ব্যবহার প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হন নাই। সকলের প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন ও গুণীর প্রতি সমাদর ও সম্মান প্রকাশ তাঁহার চরিত্রের আর একটি প্রধান গুণ ছিল।" (বঙ্কিমচন্দ্র : বিজয়লাল দত্ত)

বঙ্কিমচন্দ্র যে রাগী ছিলেন এবং নিয়মের কোন ত্রুটি হলেই রাগে অধীর হয়ে উঠতেন, তার পরিচয় শচীশচন্দ্র "বঙ্কিম-জীবনী"তে দিয়েছেন।

সাহিত্যসাধনা। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যসাধনার বিস্তৃত ইতিহাস এই গ্রন্থের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে বলে এখানে আর স্বতন্ত্রভাবে দেওয়া হল না। প্রত্যেক গ্রন্থের (উপন্যাস) বিস্তারিত ইতিহাসও এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হয়েছে। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থতালিকা "সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা" অনুসরণে যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে এখানে সন্নিবেশিত হল। প্রথমে গ্রন্থের নাম, তারপর পুস্তকটির শ্রেণী, তারপর প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশের তারিখ, সম্ভব হলে প্রথম সংস্করণের পৃষ্ঠা-সংখ্যা দেওয়া হল।

১। **ললিতা। পুরাকালিক গল্প। তথা মানস।** (কাব্যগ্রন্থ) ইং ১৮৫৬। পৃঃ ৪১।

২। **দুর্গেশনন্দিনী।** (ইতিবৃত্ত-মূলক উপন্যাস)। ইং ১৮৬৫। পৃঃ ৩০৭।

৩। **কপালকুণ্ডলা।** (কাব্যোপন্যাস)। ইং ১৮৬৬। পৃঃ ১২৪।

৪। **মৃণালিনী।** (উপন্যাস)। সংবৎ ১৯২৬ (১০ নবেম্বর ১৮৬৯) পৃঃ ২৪১।

৫। **বিষবৃক্ষ।** (সামাজিক উপন্যাস)। ১২৮০ সাল (১ জুন ১৮৭৩)। পৃঃ ২১৩।

৬। **ইন্দিরা।** (উপন্যাস)। ১২৮০ সাল (২৫ আগষ্ট ১৮৭৩)। পৃঃ ৪৫। পঞ্চম সংস্করণ থেকে (১৮৯৩, পৃঃ ১৭৭) 'ইন্দিরা' বড় হয়।

৭। **যুগলাঙ্গুরীয়।** (ক্ষুদ্র কাহিনী)। ১২৮১ সাল (২ জুন ১৮৭৪)। পৃঃ ৩৬।

৮। **লোকরহস্য।** (কৌতুক ও রহস্য)। ইং ১৮৭৪ (২৬ নবেম্বর) পৃঃ ৯৯।

৯। **বিজ্ঞানরহস্য।** (বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ-সংগ্রহ)। ইং ১৮৭৫ (১৯ এপ্রিল)। পৃঃ ১৭০।

১০। **চন্দ্রশেখর।** (উপন্যাস)। ১২৮২ সাল (১ জুন ১৮৭৫)। পৃঃ ১৯৫।

১১। **কমলাকান্তের দপ্তর।** (রম্যরচনা)। ইং ১৮৭৫ (২ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬)। পৃঃ ১৬২। ১২৯২ সালে (সেপ্টেম্বর ১৮৮৫) 'কমলাকান্ত' (পৃঃ ২৫০) নামে গ্রন্থটি পরিবর্ধিত হয়।

১২। **বিবিধ সমালোচন।** (সাহিত্য সমালোচনা)। ইং ১৮৭৬ (১৬ জুলাই)। পৃঃ ১৪৪।

১৩। **রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী।** (জীবনী ও সাহিত্য-সমালোচনা)। ইং ১৮৭৭। পৃঃ ১॥০। দীনবন্ধু গ্রন্থাবলীর সঙ্গে ১৮৮৩ সালে (এপ্রিল ১৮৭৭) প্রথম প্রকাশিত হয়।

১৪। **রজনী।** (উপন্যাস)। ১২৮৪ সাল (২ জুন ১৮৭৭)। পৃঃ ১২২।

১৫। **উপকথা।** (অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস সংগ্রহ)। ইং ১৮৭৭ (২৪ নবেম্বর)। পৃঃ ৮৩। 'ইন্দিরা', 'যুগালাঙ্গুরীয়' ও 'রাধারাণী' একত্রে মুদ্রিত হয়।

১৬। **কবিতাপুস্তক।** (কবিতা)। ইং ১৮৭৮ (১৮ আগষ্ট)। পৃঃ ১১২।

১৭। **কৃষ্ণকান্তের উইল।** (সামাজিক উপন্যাস)। ইং ১৮৭৮ (২৯ আগস্ট) পৃঃ ১৭০।

১৮। **সাম্য।** (প্রবন্ধ)। ইং ১৮৭৯ (৬ ফেব্রুয়ারি)। পৃঃ ৬৮।

১৯। **প্রবন্ধ-পুস্তক।** (প্রবন্ধ)। (২৭ এপ্রিল ১৮৮৯)। পৃঃ ১৫৮।

২০। **রাজসিংহ।** (ক্ষুদ্র কথা)। ১২৮৮ সাল (৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৮২)। পৃঃ ৮৩। ১৮৯৩ খ্রীঃ প্রকাশিত চতুর্থ সংস্করণ (পৃঃ ৪৩৪) বিপুল আকার ধারণ করে।

২১। **আনন্দমঠ।** (উপন্যাস)। ১২৮৯ সাল (১৫ ডিসেম্বর ১৮৮২) পৃঃ ১৯১।

২২। **মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত।** (রস রচনা)। ১২৯০ সাল (২৮ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৪)। পৃঃ ৪৭।

২৩। **দেবী চৌধুরাণী।** (উপন্যাস)। ১২৯১ সাল (২০ মে ১৮৮৪) পৃঃ ২০৬।

২৪। **ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস।** ইং ১৮৮৬। 'ইন্দিরা', 'যুগালাঙ্গুরীয়', 'রাধারাণী' ও 'রাজসিংহ' একত্রে।

২৫। **রাধারাণী।** ইং ১৮৮৬ (২৫ জুন)। পৃঃ ৩৮।

২৬। **কৃষ্ণ চরিত্র।** প্রথম ভাগ। (প্রবন্ধ)। (১২ আগষ্ট ১৮৮৬)। পৃঃ ১৯৮।

২৭। **সীতারাম**। (উপন্যাস)। ১২৯৩ সাল (৪ মার্চ ১৮৮৭)। পৃঃ ৪১৯।

২৮। **বিবিধ প্রবন্ধ**। প্রথম ভাগ। (প্রবন্ধ)। ১২৯৪ সাল (৭ জুলাই ১৮৮৭)। পৃঃ ২৮০।

২৯। **ধর্ম্মতত্ত্ব**। প্রথম ভাগ। **অনুশীলন**। (প্রবন্ধ)। ১২৯৫ সাল (১৭ মে ১৮৮৮)। পৃঃ ৩৫৯।

৩০। **বিবিধ প্রবন্ধ**। দ্বিতীয় ভাগ। (প্রবন্ধ)। ইং ১৮৯২ (২৫ মে)। পৃঃ ৩৫৬।

৩১। **সহজ রচনাশিক্ষা**। (পাঠ্য পুস্তক)। ১ম সংস্করণ পাওয়া যায়নি। ১৮৯৪ খ্রীঃ ২য় সংস্করণ হয়। ৪র্থ সংস্করণের (১৮৯৮ খ্রীঃ) পৃষ্ঠা ৩২।

৩২। **সহজ ইংরেজী শিক্ষা**। (পাঠ্যপুস্তক)। ৩য় সংস্করণ হয় ১৮৯৪ খ্রীঃ-র ডিসেম্বর মাসে। পুস্তক দৃষ্ট হয় না।

৩৩। **শ্রীমগভবদ্গীতা**। (অনুবাদ ও ব্যাখ্যা)। ইং ১৯০২ (১ নবেম্বর) পৃঃ ৩৭৮-৯।

৩৪। **RAJMOHAN'S WIFE**। (ইংরাজী উপন্যাস) ইং ১৯৩৫। পৃঃ ১৫৬।

৩৫। **বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী**। (জন্ম-শতবার্ষিকী সংস্করণ) ইং ১৯৩৮-৪২। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে প্রকাশিত।

৩৬। **বঙ্কিম রচনাবলী** (২ খণ্ড)। সাহিত্য-সংসদ থেকে প্রকাশিত।

গ্রন্থাবলীগুলিতে বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র রচনা সন্নিবেশিত আছে।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বিষয়-সম্পত্তির ভাগবাঁটোয়ারা সম্পর্কে যে উইল করে যান তা সুধীরকুমার মিত্রের "হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ" নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে আছে "১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র একখানি দলিল সম্পাদন করিয়া তাঁহার সম্পত্তি কি ভাবে বণ্টন করা হইবে তাহার নির্দেশ দিয়া যান। তাঁহার স্বহস্তে লিখিত এই দলিলখানি এযাবৎ লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল। ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এই দলিলখানি বঙ্কিমচন্দ্রের দৌহিত্র স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট হইতে সংগ্রহ করেন। আমরা এই অপ্রকাশিত মূল্যবান দলিলখানি ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও শ্রীসুধীরকুমার মিত্র সম্পাদিত "বঙ্গদর্শন" মাসিকপত্রে ১৩৬১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে সর্বপ্রথম প্রকাশ করি।" তারপর বঙ্কিমচন্দ্রের স্বহস্তলিখিত দলিলটির প্রতিলিপি মুদ্রিত আছে। দলিলটি এরূপ—"লিখিতং শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাং কাঁটালপাড়া, থানা নৈহাটি, জেলা ২৪ পরগণা, সবরেজিষ্ট্রি নৈহাটি হাল মোকাম শহর কলিকাতা এবং

প্রতাপচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গলি কস্য উইল পত্রমিদং কার্য্যনঞ্চোগে যে হেতু আমার প্রাচীন বয়স উপস্থিত এক্ষণে আমার সম্পত্তি সম্বন্ধে আমার উইল করা বিধেয় এজন্য আমি স্বেচ্ছাক্রমে সুস্থ শরীরে সজ্ঞানে নিম্নলিখিত মত উইল করিতেছি :

১। অমার মৃত্যুর পর আমার যে কিছু স্থাবর অস্থাবর পুস্তকের কপিরাইট বা অপর যে কিছু সম্পত্তি আছে, বা থাকিবে তাহাতে আমার বনিতা শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী সম্পূর্ণ অধিকারিণী হইবেন। এবং ঐ সকল সম্পত্তি সম্বন্ধে তিনি নিজে উইল করিতে পারিবেন।

২। কেবল এই সকল সম্পত্তির মধ্যে শহর কলিকাতা পটলডাঙ্গার অন্তর্গত প্রতাপচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গলিতে ৫ নম্বরের যে খরিদা পোক্তাবাটি ও ৪ নম্বরের যে খরিদা জমি আছে তাহা আমার উক্ত বনিতা শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী দান, বিক্রয় বা হস্তান্তর করিতে পারিবেন না, বা তৎসম্বন্ধে উইল করিতে পারিবেন না। তাঁহার মৃত্যুর পর ঐ ৫ নম্বরের বাটি ও ৪ নম্বরের ভূমি আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী প্রাপ্ত হইবেন। তখন উক্ত শরৎকুমারী দেবী উহাতে সম্পূর্ণ স্বত্বশালিনী হইবেন, এবং তাঁহার উহাতে দান বিক্রয় বা অন্য প্রকার হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে। যদি আমার বনিতা শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবীর মৃত্যুকালে আমার জ্যেষ্ঠাকন্যা (ঈশ্বর না করুন) বিদ্যমান না থাকেন, তবে উক্ত ৫ নম্বরের ভবন ও ৪ নম্বরের ভূমি শরৎকুমারী দেবীর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রাপ্ত হইবেন।

৩। যদি আমার মৃত্যুর পর কোন সময়ে আমার বনিতা শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী বিবেচনা করেন যে উক্ত ৫ নম্বরের বাটী বা ৪ নম্বরের ভূমি বিক্রয় করা আবশ্যক তবে আমার উক্তা জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবীর লিখিত সম্মতি লইয়া বিক্রয় করিতে পারিবেন নচেৎ পারিবেন না। ঈশ্বর না করুন ঐ সময়ে যদি শরৎকুমারী দেবী বিদ্যমান না থাকেন তবে শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী আপন স্বেচ্ছাক্রমে ঐ ৫ নম্বরের ভবন ও ৪ নম্বরের ভূমি বিক্রয় করিতে পারিবেন। কাহারও সম্মতির অপেক্ষা করিবে না।

৪। যদি আমার মৃত্যুর পূর্ব্বেই আমার উক্তা বনিতা শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবীর মৃত্যু হয় তবে আমার মৃত্যুর পরে আমার ত্যক্ত সম্পত্তিতে যে যে প্রকারে অধিকারী ও স্বত্ববান হইবে তাহা নিম্নে ক, খ, গ, ঘ দফাওয়ারিতে লিখিলাম।

(ক) আমার সমস্ত সম্পত্তির মধ্যে যাহা স্থাবর সম্পত্তি তাহাতে আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারিণী হইবেন। তাঁহার দান বিক্রয়ের অধিকার থাকিবে। ইহার মধ্যে আমার কাঁঠালপাড়ায় যে পৈত্রিক ভদ্রাসন বাটী

আছে তাহাতে আমার দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী নীলাব্জকুমারী দেবী এবং শ্রীমতী উৎপল কুমারী দেবীর যাবজ্জীবন বাস করিবার অধিকার রহিল।

(খ) আমার অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে আমার শাল, রুমাল, ইলবাস, পোষাক, গাড়ী, ঘোড়া, ঘড়ি, ঝাড় লণ্ঠন, আসবার ও লাইব্রেরী আমার জ্যেষ্ঠ জামাতা শ্রীমান রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাপ্ত হইবেন। অবশিষ্ঠ অস্থাবর সম্পত্তি আমার তিন কন্যা তুল্যাংশে পাইবেন।

(গ) আমার লিখিত পুস্তকের কপিরাইটে আমার যে স্বত্ব তাহা আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী প্রাপ্ত হইবেন। তাহাতে যে লভ্য হইবে অন্যান্য পুস্তক ছাপান ও বিক্রয় করার খরচ-খরচা বাদে যে লাভ থাকিবে, তাহার মধ্যে ফি টাকায় তিন আনা তিনি আমার দ্বিতীয় কন্যা শ্রীমতী নীলাব্জকুমারীকে দিবেন, এবং ফি টাকায় তিন আনা আমার কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী উৎপলকুমারীকে দিবেন। এবং তাঁহারা চাহিলে তিন মাস অন্তর তাহাদের এক এক খণ্ড হিসাব দিবেন। শরৎকুমারী স্বয়ং ফি টাকায় দশ আনা লইবেন।

(ঘ) ঈশ্বর না করুন যদি আমার মৃত্যুকালে আমার বনিতা শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী, এবং আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী উভয়েরই অভাব হয় তবে এই উইলের দ্বারা যে অধিকার আমি শ্রীমতী শরৎকুমারীকে দিলাম তাহা তদভাবে তাঁহার পুত্রগণ প্রাপ্ত হইবেন। আর এই উইলের দ্বারা যে অধিকার আমার অপর দুই কন্যাকে দিলাম তাঁহাদের অবর্ত্তমানে তাঁহাদের পুত্রগণ আপন আপন মাতার অংশ তুল্যাংশে পাইবেন। যদি (ঈশ্বর না করুন) ঐ দুই কন্যার কাহারও পুত্র বর্ত্তমান না থাকে তবে সেই কন্যার অবর্ত্তমানে শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবীর পুত্রগণ তাঁহার স্বত্বে স্বত্ববান্ হইবেন। ইতি তারিখ, ১৮৬৭, ২১ ফিব্রুয়ারী।

এই দলিলের প্রথম পৃষ্ঠায় ১১ ছত্রে "তাহার" শব্দ কাটা আছে। দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ১৬ ছত্রে "না" শব্দ তোলা আছে। আর ৪র্থ পৃষ্ঠায় ১ ছত্রে "জ্যেষ্ঠ" শব্দ কাটা আছে। ইতি—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

Executed in my presence,

Bepin Chandra Chatterjee of Kantalpara,

Anukul Chandra Chatterjee of Kantalpara

আমার সম্মুখে দস্তখত হইল

শ্রীউমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সাং—ভাটপাড়া,

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দাস সাং—অস্পষ্ট, জেলা—বাঁকুড়া।"

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন ও জীবনী-সংক্রান্ত তথ্য

অক্ষয়চন্দ্র সরকার। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনে'র লেখক হিসাবে এঁর সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার ১২৫৩ সালের (১৮৪৬ খ্রীঃ) ২রা অগ্রহায়ণ হুগলী জেলার চুঁচুড়া নগরে পৈতৃক বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন সাবজজ রায় বাহাদুর গঙ্গাচরণ সরকার। ইনিও সুলেখক ছিলেন। "ঋতুবর্ণন" নামে তাঁর একটি কাব্য-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। অক্ষয়চন্দ্র পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জুন তিনি হুগলী কলিজিয়েট্ স্কুলে ভর্তি হন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শীর্ষস্থান লাভ করেন। তারপব হুগলী কলেজ থেকে ১৮৬৮ খ্রীঃ বি এ. এবং প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ১৮৬৮ খ্রীঃ বি এল. পাশ করেন।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ কবার পব মাত্র ১৭ বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়। তাঁর পত্নী অতিশয় বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে আদর কবে "অসাধারনী" বলে ডাকতেন। ১২৯৭ সালে তিনি অকালে পরলোকগমন কবেন।

ওকালতি পাশ করার পর তিনি প্রথমে ৪ বছব বহরমপুরে ওকালতি কবেন। সে সময়েই 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশিত হয় এবং তিনি 'বঙ্গদর্শনে'র সঙ্গে যুক্ত হন। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে অক্ষয়চন্দ্রের যেমন হৃদ্যতা ছিল, তেমনি 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশেও তিনি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ। তিনি 'বঙ্গদর্শনে' নিয়মিতভাবে "প্রাপ্ত পুস্তকের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা" লিখতেন। কমলাকান্ত নামে বঙ্কিমচন্দ্র যখন প্রবন্ধ প্রকাশ করতেন, তখন তার মধ্যে অক্ষয়চন্দ্রের কযেকটি রচনাও প্রবেশলাভ করে। বঙ্কিমচন্দ্র অক্ষয়চন্দ্র সম্বন্ধে লিখেছেন, "বঙ্গদর্শনেব কতকগুলি অত্যুৎকৃষ্ট প্রবন্ধ ইঁহারই রচিত। সেগুলি ইনি স্বনামযুক্তে পুনর্মুদ্রিত করিবেন, এইরূপ ভরসা আছে। ইঁহার রচিত সেই প্রবন্ধগুলির সবিশেষ আলোচনা করিলে, অনেকেই স্বীকার করিবেন যে, বঙ্গদেশে অক্ষয়বাবুর ন্যায় প্রতিভাশালী গদ্যলেখক অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।"

অক্ষয়চন্দ্র নিজেও পত্রিকা পরিচালনা করতেন। তিনি "সাধারনী" নামে একটি সাপ্তাহিক এবং "নবজীবন" নামে একটি মাসিক পত্রিকার স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক ছিলেন। "সাধারনী"তে সরল ভাষায় রাজনীতির আলোচনা থাকত। হিন্দুধর্মে

নবজীবন সঞ্চারের উদ্দেশ্যে "নবজীবন" পত্রিকায় আবির্ভাব। 'সাধারণী' পত্রিকা ১২৯৩ সালে "নববিভাকর" পত্রিকার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে "নববিভাকর-সাধারণী" নাম গ্রহণ করে। তিনি ষোল বছর 'সাধারণী' এবং ছয় বছর 'নবজীবন' পত্রিকা পরিচালনা করেন। ইংলণ্ডের রানী ভিক্টোরিয়া "ভারত-রাজরাজেশ্বরী" উপাধি গ্রহণ করলে ১৮৭৭ খ্রীঃ লর্ড লিটনের অধিনায়কত্বে দিল্লীতে যে প্রথম দরবার অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে 'সাধারণী' সম্পাদকের নিমন্ত্রণ হয়েছিল।

বহু বছর তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্-এর সহকারী সভাপতি ছিলেন। চুঁচুড়ায় অনুষ্ঠিত পঞ্চম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে তিনি ছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। পরবৎসর চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত ঐ সম্মেলনের তিনি মূল সভাপতি হন।

তিনি সারদাচরণ মিত্রের সহযোগিতায় মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল এবং বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতির পদাবলী "প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহ" নামে প্রকাশ করেন। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থ—যুক্তহরপ বর্জিত পয়ারছন্দে রচিত "গোচারনের মাঠ", "সংক্ষিপ্ত রামায়ণ", বিদ্যালয়-পাঠ্য-পুস্তক "আলোচনা", "শিক্ষানবিশের পদ্য", "হাতে হাতে ফল" নামক প্রহসন, "পিতা-পুত্র", নিজের ও পিতার সাহিত্য-জীবন, "সনাতনী", হিন্দুধর্ম সম্বন্ধীয় আলোচনা, সমালোচনাগ্রন্থ "কবি হেমচন্দ্র" প্রভৃতি। মৃত্যুর পরে তাঁর প্রবন্ধগুলি—"মোতিকুমারী", "মহাপূজা" "সাহিত্য-পাঠ" "সাহিত্য-সাধনা" এবং "রূপক ও রহস্য" নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের গ্রন্থাবলীও প্রকাশিত হয়েছে।

অক্ষয়চন্দ্র ছিলেন নিষ্ঠাবান হিন্দু এবং তেজস্বী ও স্পষ্টবাদী পুরুষ। ১৩২৪ সালের (১৯১৭ খ্রীঃ) ১৬ই আশ্বিন তিনি চুঁচুড়ার বাড়ীতেই পরলোকগমন করেন।

আলিপুর। চব্বিশ-পরগণা জেলার সদর মহকুমা, থানা ও সদর। এটি বর্তমানে কোলকাতা কর্পোরেশন ও শহরেরই অঙ্গ। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে কয়েকবার চাকুরীকার্যে নিযুক্ত হন। প্রথম তিনি এখানে অস্থায়ীভাবে আসেন ১৮৬৭ সালের ১৪ই অগস্ট, গর্বমেন্ট আমলাদের বেতন-নির্ধারণ জন্য কমিশনের কাজে। সে-সময় তিনি এখানে দশ মাস ছিলেন। শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতে এই দশ মাসে তিনি 'মৃণালিনী' লিখে শেষ করেন। এরপর ১৮৮২ খ্রীঃ-এ ২৬শে জানুয়ারী তিনি ২য় শ্রেণীর অস্থায়ী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর-রূপে আসেন। তারপর ঐ একই পদে আসেন ১৮৮২ খ্রীঃ-র ১৭ই মে। চতুর্থবার আলিপুরে আসেন ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল। ১৮৯০-এর ৩১শে মার্চ থেকে তিনি ১ মাস ১৭ দিন 'প্রিভিলেজ লীভ' নেন। এখান থেকেই ১৮৯১ খ্রীঃ-র ১৪ই সেপ্টেম্বর তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট। কোলকাতার কলেজ স্ট্রীটে অবস্থিত গোলদিঘী (কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-এর সম্মুখ)-র পার্শ্বে অবস্থিত সংস্কৃতিচর্চার এক প্রাচীন কেন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গেও এই ইনষ্টিটিউট-এর যোগাযোগ ছিল। এ সম্পর্কে শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "বঙ্কিম-জীবনী"তে লিখেছেন—"অবসর লইয়া বঙ্কিমচন্দ্র একটি সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সভার নাম, Society for the Higher Training of Young Men—এক্ষণে ইহার নাম University Institute হইয়াছে। এই সভায় বঙ্কিমচন্দ্র ছয়টি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। চারিটি তাঁহার গৃহে, দুইটি ইনষ্টিটিউট মন্দিরে। গৃহে যে কয়টি বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহা শরীরের উন্নতি সম্বন্ধে; মন্দিরে যে দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন তাহা উপনিষদ-সম্বন্ধীয়। যাঁহারা এই বক্তৃতা-নিচয় শুনিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই এক্ষণে জীবিত। (গ্রন্থের প্রকাশকাল ১৩১৮ সাল)। কিন্তু শেষের দুইটি ছাড়া অন্য বক্তৃতাগুলি মরিয়া গিয়াছে—এক্ষণে তাহা কোথাও পাওয়া যায় না। শেষোক্ত বক্তৃতা দুইটি ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের University Magazineএ প্রকাশিত হইয়াছিল।"

অন্যত্র তিনি আরো লিখেছেন—"ইনষ্টিটিয়ুট-মন্দিরে ১৮৯৩ সালের ১০ই অক্টোবর অপরাহ্নে Society for the Higher Training of Young Men-র একটি অধিবেশন হয়। বঙ্কিমচন্দ্র সে সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সেই সভায় জাতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে একটি সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন।

ইহার পর ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারী তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র আর একবার উক্ত সোসাইটীর একটি সভায় যোগদান করেন। সে সভায় তদানীন্তন ছোটলাট ইলিয়ট সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার পর বঙ্কিমচন্দ্র আর কোনও প্রকাশ্য সভায় যোগদান করিয়াছিলেন বলিয়া শুনি নাই। তবে ইনষ্টিটিয়ুট-মন্দিরে ইহার পরেও দুইবার আসিয়াছিলেন। প্রথমবার, ৯ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবারে—দ্বিতীয়-বার, মৃত্যুশয্যা গ্রহণ করিবার সপ্তাহ-খানেক পূর্ব্বে। সে দুইবার বৈদিক সাহিত্য সম্বন্ধে দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন।" (বঙ্কিম-জীবনী; ৪৫৪ পৃঃ।)

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।—বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে সাহিত্যিক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায়ের কিছু কিছু পরিচয় ছিল। ইন্দ্রনাথের উপন্যাস "কল্পতরু"র বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র প্রশংসা করেছিলেন। ১২৯২ সালে বঙ্কিমচন্দ্র [illegible] বাড়ীতে থাকতেন, তখন অন্যান্য সাহিত্যিকদের সঙ্গে ইন্দ্রনাথও সেখানে মাঝে মাঝে উপস্থিত হতেন।

ইন্দ্রনাথের পিতা বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন পূর্ণিয়ার [illegible]। মাতুলালয়

পাণ্ডুগ্রামে ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মে ইন্দ্রনাথের জন্ম হয়। কোলকাতা ক্যাথিড্রাল মিশন কলেজ থেকে তিনি ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে বি.এ. পাশ করেন। তারপর কিছুদিন বীরভূম ও বর্ধমানের গ্রামে প্রধান শিক্ষকের কাজ করেন। ১৮৭১ খ্রীঃ বি. এল. পাশ করে ওকালতীতে প্রবেশ করেন। প্রথমে পূর্ণিয়া ও দিনাজপুর, তারপর কোলকাতা হাইকোর্ট ও সর্বশেষে বর্ধমান তাঁর কর্মস্থান ছিল।

ব্যঙ্গরচনাতেই ইন্দ্রনাথের দক্ষতা সর্বাধিক। পাচুঠাকুর ছদ্মনামে লেখা শ্লেষ ও ব্যঙ্গমূলক গদ্য-পদ্য রচনা "পঞ্চানন্দ" তাঁর বিখ্যাত রচনা। এছাড়া তিনি ভণ্ড দেশ-প্রেমিকদের ব্যঙ্গ করে "ভারত উদ্ধার" (১৮৭৮ খ্রীঃ) নামে একটি ব্যঙ্গকাব্য রচনা করেন। তাঁর অন্যান্যগ্রন্থ 'উৎকৃষ্ট কাব্যম্' (১৮৭০) ক্ষুদ্র ব্যঙ্গকাব্য, 'কল্পতরু' (১৮৭৪)—উপন্যাস, 'ক্ষুদিরাম' (১৮৮৮)—উপন্যাস ইত্যাদি।

ইন্দ্রনাথের ব্যঙ্গরচনায় কমলাকান্তী সরসতা অপেক্ষা আক্রমণের ভাগটিই অধিক। (ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'ইন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী')।

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। হুগলী কলেজের একজন খ্যাতনামা শিক্ষক। বঙ্কিমচন্দ্র এঁর কাছে ইংরাজী শিক্ষা করেছিলেন। এ সম্বন্ধে শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "বঙ্কিমজীবনী"তে আছে—"বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী-কলেজে একজন দেশ-বিশ্রুত শিক্ষকের সাহায্য পাইয়াছিলেন। তাঁহার নাম অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। আমি যশস্বী ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা বলিতেছি। তিনি ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে হুগলী কলেজের হেডমাষ্টারের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার সহোদর ভ্রাতা মহেশচন্দ্র কলিকাতা হিন্দু কলেজে শিক্ষক ছিলেন। তাঁহারা—ঈশান ও মহেশ—বহু পূর্ব্বে লোকান্তরে গমন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের যশ, কীর্ত্তি আজও অন্তর্হিত হয় নাই। তাঁহারা দুই ভাই দুই কলেজে থাকিয়া যে দুইজন মহাপণ্ডিত গড়িয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের কীর্ত্তিস্তম্ভ-রূপে চিরকাল পরিগণিত হইবে।

ঈশানবাবুর নিকট বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজি সাহিত্য শিখিয়াছিলেন।"

"...(ইং ১৮৫১-৫২) দ্বিতীয় শ্রেণীর "এ" সেকশনে বিখ্যাত শিক্ষক ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট বঙ্কিমচন্দ্র পড়েন,—"বি" সেকশনের ক্লারমণ্ট (F. W. Clermont) সাহেবের নিকট পড়েন নাই। তখনও শিক্ষা-বিভাগে বহু সাহেব শিক্ষকতা করিতেন। বন্দ্যোপাধ্যায় ভ্রাতৃযুগল দেশীয় শিক্ষকদের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন, কিন্তু সাহেবের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইহাদের পদোন্নতি বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিল সন্দেহ

নাই। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে কাশীপ্রসাদ ঘোষ-সম্পাদিত 'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার' পত্রিকায় হুগলী কলেজের প্রধান শিক্ষক গ্রেভস Graves ও নবনিযুক্ত ব্রেন্যাণ্ড (Brennand) সাহেবের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনাপূর্ণ কয়েকখানি পত্র প্রকাশিত হয় এবং প্রকাশ্যে অস্বীকৃত হইলেও, কলেজের অধ্যক্ষ কার্ (Kerr) সাহেব তাঁহার ১৯।৯।৫০ তারিখের সুদীর্ঘ পত্রে ঐগুলি বন্দ্যোপাধ্যায়-ভ্রাতৃদ্বয়েরই লেখা বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।…"প্রথম শ্রেণীতে বঙ্কিমচন্দ্র যে সকল শিক্ষকের নিকট পড়েন, তাঁহারা—Head Master J. Graves B A. : Literature and History. Second Master W. Brennand: Mathematics and Geography. ইহারা উভয়েই কলেজেও পড়াইতেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে ব্রেন্যাণ্ড সাহেব ঢাকায় বদলি হইয়া যান—তাঁহার স্থলে প্রায় এক বৎসর পরে (১৮-২-৫৪ তারিখে) ফোগো (D Foggo, B A.) নিযুক্ত হন। ইতিমধ্যে ব্রেন্যাণ্ড সাহেবের কার্য্যভার অধস্তন ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ক্লারমণ্ট সাহেব ভাগাভাগি করিয়া লন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ঈশানবাবু বদলি হইয়া যান এবং তাঁহার জায়গায় বীন্‌ল্যাণ্ড (S. G Beanland) সাহেব আসেন।" (সাহিত্য-সাধক চরিতমালা)

ঈশ্বর গুপ্ত। ঈশ্বর গুপ্তকে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যগুরু বললে কিছু অতিরিক্ত বলা হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই একথা স্বীকার করেছেন এবং পরবর্তীকালে ঈশ্বর গুপ্তের গ্রন্থাবলী সম্পাদন করে এবং ভূমিকায় জীবনী ও কবিত্ব আলোচনা করে গুরুদক্ষিণা দিয়েছেন।

নদীয়া (অধুনা ২৪ পরগণা) জেলার কাঁচড়াপাড়ায় ২৫শে ফাল্গুন ১২১৮ সনে ঈশ্বরগুপ্তের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম হরিনারায়ণ দাশগুপ্ত, মাতা শ্রীমতী। তিনি ছিলেন পিতামাতার দ্বিতীয় পুত্র। দশ বৎসর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্রের মাতৃবিয়োগের পর, পিতা দ্বিতীয়বার বিবাহ করলে, তিনি জোড়াসাঁকোয় মামার বাড়ীতে চলে আসেন। বাল্যকাল থেকেই তাঁর স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল এবং স্বাভাবিক কবিত্বশক্তি ছিল। অনেকে বলেন তিনি কোলকাতায় ইংরাজী শিখতে এসেছিলেন। কিন্তু পুঁথিগত শিক্ষা বা ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে তাঁর পরিচয় না ঘটলেও, জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি যে শিক্ষা সঞ্চয় করেছিলেন, তা অতুলনীয়।

যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সাহায্যে ১২৩৭ সালে (২৮শে জানুয়ারী, ১৮৩১ খ্রীঃ) 'সংবাদপ্রভাকর' নামে একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। কিন্তু ১২৩৯ সালে যোগেন্দ্রমোহনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ঐ পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। তারপর ঈশ্বরচন্দ্র কিছুদিন তীর্থ-পর্যটনে বের হন। তীর্থ থেকে ফিরে পাথুরিয়াঘাটার কানাইলাল

ঠাকুরের সাহায্যে ১২৪৩ সালে (১০ই অগস্ট ১৮৩৬ খ্রীঃ) তিনি 'সংবাদ প্রভাকর, পুনঃ প্রকাশ করেন। ১২৪৬ সালের ১লা আষাঢ় (১৪ই জুন, ১৮৩৯ খ্রীঃ) থেকে 'সংবাদ প্রভাকর' দৈনিক পত্রিকারূপে আত্মপ্রকাশ করে। বাংলাভাষায় প্রকাশিত এটিই প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র। 'সংবাদ প্রভাকর' বাংলা সাময়িক পত্রিকার জগতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু এই পত্রিকাতেই প্রথম সাহিত্যরচনা আরম্ভ করেন। এ ছাড়া আরও বহু কবি ও লেখক সৃষ্টি হয়েছেন এর মাধ্যমে।

ঈশ্বর গুপ্ত আরো দু'টি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জুন থেকে 'পাষাণ্ডপীড়ন' ও ১২৫৪ (১৮৪৭ খ্রীঃ) সালে 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' নামক পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

দীর্ঘ বারো বৎসরকাল গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঈশ্বর গুপ্ত প্রাচীন কবিওয়ালাদের গান ও পাঁচালী এবং কবিদের জীবনী সংগ্রহ করেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের জীবিতকালে তাঁর তিনটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। রামপ্রসাদ সেন কৃত কালীকীর্তন (১৮৩৩ খ্রীঃ), কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত (১৮৫৫ খ্রীঃ) এবং 'প্রবোধ প্রভাকর' (১৮৫৮ খ্রীঃ)। এছাড়া তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'হিত প্রভাকর', 'বোধেন্দু বিকাশ', 'কলি নাটক', 'নাটক', 'গুপ্ত রত্নোদ্ধার' প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের ভূমিকা-সম্বলিত ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ-ই তাঁর কাব্যের জনপ্রিয় সংকলন। ঈশ্বর গুপ্তের বহু রচনা কালগর্ভে বিলুপ্ত হয়েছে।

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার ব্যঙ্গ প্রবণতাই সবচেয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সমসাময়িক সমাজের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাঁর ব্যাঙ্গাত্মক রচনা অত্যন্ত জনপ্রিয়। তাঁর কবিতায় অনুপ্রাস, যমক ইত্যাদি শব্দালংকারের বাহুল্য দেখা যায়।

ঈশ্বর গুপ্তকে বলা হয় যুগসন্ধির কবি। একদিকে প্রাচীন কবিতার রীতি, স্থূল রুচি প্রভৃতির দ্বারা তিনি যেমন প্রাচীন কাব্যধারার পোষকতা করেছেন, অন্যদিকে তেমনি স্বদেশচেতনা, ব্যঙ্গপ্রবণতার দ্বারা আধুনিকতারও সূত্রপাত করেছেন। প্রাচীন কবিদের জীবনী সংগ্রহ করে এবং নবীন কবিদের সৃষ্টি করেও তিনি দুই যুগের সমন্বয়-সাধন করেছেন।

১২৬৫ সালের ১০ই মাঘ (২৩শে জানুয়ারী, ১৮৫৯ খ্রীঃ) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যু হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনে ঈশ্বর গুপ্তের ভূমিকা যথেষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্র ছাত্রাবস্থায় যখন 'সংবাদ প্রভাকরে' কবিতা রচনা করতেন, তখন ঈশ্বর গুপ্ত উৎসাহ দিতেন। একবার তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে পুরস্কৃতও করেন। ১৮৫৩ খ্রীঃ, 'সংবাদ প্রভাকর'-এর কবিতা প্রতিযোগিতায় যোগদান করে, বঙ্কিমচন্দ্র "কামিনীর প্রতি উক্তি। তোমাতে লো

ষড়ঋতু" কবিতার জন্য ২০ টাকা পুরস্কৃত হন। এ সম্পর্কে হুগলী কলেজের অধ্যক্ষের পত্রটি এইরূপ—

To the Secy.

To the Council of Education, Fort William

Hooghly the 20th Feb,, 1854.

Sir,

I have the honour to report for the inforn.ation of the Council of Education that I have received twenty rupees to be awarded to Bunkim Chunder Chatterjee, a pupil of the first class of the Senior School, for some good Poetical Compositions in Bengalee. The Poetical Compositions apeared in Probakur Newspaper. The prize of twenty rupees was awarded by Baboos Romonymohun Roy and Hally Churn Roy Choudhury, Zemindars of Rungpore and was sent through Baboo Isser Chunder Goopto, the Editor of abovementioned Journal.

J. Kerr
Principal

বঙ্কিমচন্দ্র প্রভাকরে গদ্য-পদ্য উভয় রচনাই লিখতেন। শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতে ঈশ্বরগুপ্তের পরামর্শানুসারেই নাকি বঙ্কিমচন্দ্র গদ্যরচনায় হস্তক্ষেপ করেন। যদি একথা সত্য হয়, তাহলে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তেরই হাতে গড়া শিষ্য। বঙ্কিমের 'কমলাকান্ত' ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গপ্রবণ দৃষ্টিভঙ্গীরই মার্জিত সংস্করণ কিনা কে বলতে পারে!

ঈশ্বর গুপ্ত তরুণ কবি বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে বলেছিলেন—"বঙ্কিমচন্দ্রের বিরচিত কবিতার সুবঙ্কিম ভাব কৌশলসকল অতিশয় সন্তোষজনক, ইনি রূপক বর্ণনা স্থলে নায়ক নায়িকার কথোপকথন ছলে যে সমস্ত প্রগাঢ় ভাব ব্যক্ত করেন তদ্দৃষ্টে সুপণ্ডিত ভাবুক মাত্রেই প্রীত হইয়া থাকেন। ইনি অতি তরুণ বয়সে অতি প্রবীণ সুরসিক জনের ন্যায় মন হইতে অতি আশ্চর্য নূতন নূতন ভাবসকল উদ্ভূত করিতেছেন। এ অংশে ইহার প্রশংসা বর্ণনে বর্ণাবলী বলহীনা, ফলে এই স্থলে একটি অনুরোধ এই যে, বঙ্কিম পদরচনায় আর সমুদয় বঙ্কিম করুন, তাহা যশের জন্যই হইবে, কিন্তু ভাবগুলীন্ প্রকাশার্থ যেন বঙ্কিম ভাষা ব্যবহার না করেন, যত ললিত শব্দে পদ-বিন্যাস করিতে পারিবেন ততই উত্তম হইবেক।"

"বঙ্কিম জীবনী"তে আছে—"ইহা অনেকেই বিদিত আছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র চিরদিন গুপ্ত-কবির প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। কিন্তু ইহা অনেকে জানেন না, বঙ্কিমচন্দ্র, ঈশ্বর-চন্দ্রের মৃত্যুর দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে কাঁচরাপাড়ায় তাঁহার গৃহ একবার জন্মের মতন দেখিতে গিয়াছিলেন ; সেখানে গিয়া ঈশ্বরচন্দ্রের আত্মীয়স্বজনের নিকট বসিয়া কত অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। এতৎপূর্ব্বেও বঙ্কিমচন্দ্র, কবির সে আশ্রম দেখিতে—সে আশ্রমে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে একবার গিয়াছিলেন। তখন তিনি ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনী লিখিতেছিলেন। যিনি এমন করিয়া নীরবে অশ্রু বর্ষণ করিতে পারেন—এমন করিয়া শ্রদ্ধা দেখাইতে পারেন, তিনি কত উচ্চে অধিষ্ঠিত।"

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের বি. এ. পরীক্ষার পরীক্ষক। সেই প্রথমবার কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.এ. পরীক্ষার প্রবর্তন হয় এবং সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর মহাশয় ছিলেন সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী এবং ওড়িয়ার পরীক্ষক।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর, তৎকালীন, হুগলী এবং বর্তমানে মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতার নাম ভগবতী দেবী। বাল্যকালে গ্রামের পাঠশালায় কিছুদিন পড়াশোনা করার পর তিনি কোলকাতায় আসেন এবং সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। সাতাশ বৎসর বয়সে সংস্কৃত কলেজের পাঠ শেষ করে বিদ্যাসাগর উপাধি প্রাপ্ত হন।

১৮৪১ সালের ২৯শে ডিসেম্বর, ৫০ টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা বিভাগের প্রধান নিযুক্ত হন। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল তিনি সংস্কৃত কলেজের সহকারী সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। পর বৎসরই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় তিনি ঐ চাকরী ত্যাগ করেন। পুনরায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রধান কর্মচারীর পদ গ্রহণ করেন। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং পর বৎসর ঐ কলেজের অধ্যক্ষ হন।

সমাজ-সংস্কারক হিসাবে বিদ্যাসাগরের নাম সুবিদিত। বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন, বহুবিবাহ নিরোধ, স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে তাঁর অবদান সকলেরই স্মরণে আছে। বিদ্যাসাগর করুণার সাগর হিসাবে সর্বজন-বিদিত। তাঁর অকৃপণ দানে অনেকে অনেক বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছেন।

বাংলাসাহিত্যে বিদ্যাসাগরের দান অপরিসীম। রামমোহন রায়ের হাতে যে বাংলা গদ্য কঠিন ভিত্তিতে স্থাপিত হয়েছিল, বিদ্যাসাগরের হাতে তা ললিত ও মধুর রূপ লাভ

করে। বাংলা গদ্যের ছন্দ আবিষ্কার করে এবং যতি-স্থাপনে তাকে সুনিয়মিত করে তিনি বাংলা ভাষার নবরূপ দান করলেন। বিদ্যাসাগর 'জীবন-চরিত' ও বিবিধ বিষয়ক তর্ক ছাড়া মৌলিক রচনা বেশি না লিখলেও তাঁর সৃষ্টিক্ষমতা ছিল সম্ভাবনাময়। 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', 'কথামালা', 'ভ্রান্তিবিলাস' প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থকে বাংলাভাষায় অনুবাদ করে তিনি নবরসে সঞ্জীবিত করেন।

বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের সকল বিষয়ে মিল ছিল বলে মনে হয় না। বিশেষ করে বিধবা-বিবাহ ও কোন কোন ক্ষেত্রে বহু বিবাহ ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত গ্রহণ করতে পারেননি। তাই বোধহয় 'বিষবৃক্ষে'র বিধবা কুন্দনন্দিনীকে পুনর্বার বিবাহ দিয়েও বঙ্কিমচন্দ্র তাকে সুখী করতে পারেননি।

বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্রের মনোভাব বিষয়ে 'বঙ্কিম-জীবনী' থেকে এক ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে—"একদা মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট এক ব্যক্তি বঙ্কিমচন্দ্রের নানাবিধ কুৎসা করিতে থাকে। বিদ্যাসাগর মহাশয় ঈষদ্ধাস্যের সহিত তাহার কথা শেষ পর্য্যন্ত শুনিলেন। শুনিয়া অবশেষে বলিলেন, 'তোমার কথা শুনিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি আমার শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল। যে ব্যক্তি সমস্ত দিন গভর্ণমেণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া দিবারাত্রি এই সকল কার্য্যে লিপ্ত থাকে, সে বই লিখিতে সময় পায় কখন? তাহার কেতাবে আমার আলমারির একটা সেল্‌ফ ভরিয়া গিয়াছে।"

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ২৯শে জুলাই, কোলকাতায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পরলোকগমন করেন।

কমলাপতি ঘোষাল। শ্রীকালীনাথ দত্তের স্মৃতিচারণ "বঙ্কিমচন্দ্র"-এ আছে—"বাইসহাটার ও হাটপাড়ার দুর্ভিক্ষ ও তাহাতে অনাহারে মৃত ব্যক্তিদের অনুসন্ধানান্তে বঙ্কিমবাবু সেদিন মধ্যাহ্নে এখানকার সব-রেজিষ্ট্রার রায় কমলাপতি ঘোষাল বাহাদুরের বাসায় স্নান আহারাদি করেন। আমি বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে সেখানে সাক্ষাৎ করি। ঘোষাল মহাশয়ের নিবাস—বঙ্কিমবাবুর স্বগ্রামে—কাঁঠালপাড়ায়। উভয়ের মধ্যে কুটুম্ব-সম্বন্ধ আছে। উভয়ের কথাবার্ত্তার মধ্যে জানিতে পারিলাম, বঙ্কিমবাবু বাল্যকালে কমলাপতিবাবুর নিকট ইংরাজি পড়িতেন।"

কালীনাথ দত্ত। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে চাকুরী করাকালে কালীনাথ দত্তের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। কালীনাথ বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে যেসব স্মৃতিচারণ করেছেন, তাতে নিরপেক্ষদৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্রের দোষগুণ বিচার করা হয়েছে।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুলাই (৮ই শ্রাবণ, ১২৫০ সাল) ঢাকা জেলার ভরাকর গ্রামে কালীপ্রসন্ন ঘোষের জন্ম হয়। পিতার নাম শিবনাথ

ঘোষ। তিনি এণ্ট্রান্স পর্য্যন্ত পড়লেও সংস্কৃত, ইংরাজী ও বাংলাসাহিত্যে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার আদর্শে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'বান্ধব' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকা অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। প্রবন্ধ রচনাতেই তিনি দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। তাঁর প্রভাত-চিন্তা (১৮৭৭ খ্রীঃ), নিভৃত চিন্তা (১৮৮৩ খ্রীঃ) ও নিশীথ-চিন্তা (১৮৯৬ খ্রীঃ) প্রভৃতি গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য। রচনারীতিতে তিনি অনেকক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র দ্বারা প্রভাবিত। বঙ্কিমচন্দ্রের সানকিভাঙার বাড়ীতে ইনি মাঝে মাঝে আসতেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই তাঁর মৃত্যু হয়। (সাহিত্য সাধক চরিতমালা)

কাঁটালপাড়া, বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ী। কাঁটালপাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের পুণ্য জন্মস্থান। কোলকাতার শিয়ালদ স্টেশন থেকে ট্রেনে করে নৈহাটী স্টেশনে এসে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মস্থানে যাওয়া যায়।

সেকালে কাঁটালপাড়া ও বঙ্কিমচন্দ্রেব বাড়ী সম্বন্ধে দু'টি বর্ণনা এখানে উদ্ধৃত করা হল।

"জেলা চব্বিশ পবগণার নাম অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। এই জেলাব অন্তর্গত বারাসত। পূর্ব্বে বারসত একটি জেলা ছিল, এক্ষণে একটি মহকুমা মাত্র। বারাসত হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে কাঁটালপাড়া অবস্থিত।

কাঁটালপাড়া একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। কলিকাতা হইতে বেশী দূর নয়, বার ক্রোশ মাত্র। রেলে এক ঘণ্টার পথ। কাঁটালপাড়ার পশ্চিম প্রান্তে গঙ্গা, উত্তরে নৈহাটী, দক্ষিণে ভাটপাড়া বা ভট্টপল্লী, পূর্ব্বে দেলপাড়া। ইষ্টার্ণ-বেঙ্গল-ষ্টেট রেলওয়ে, কাঁটাল-পাড়াকে দ্বিখণ্ড করিয়া চলিযা গিযাছে। পূর্ব্বাংশে, চট্টোপাধ্যায় বংশের বাস— পশ্চিমাংশে, গঙ্গার দিকে অন্যান্য ভদ্রলোকেব বাস। এক্ষণে নৈহাটী ষ্টেশন যে স্থানে অবস্থিত, সে স্থান কাঁটালপাড়ারই অন্তর্গত।

কাঁটালপাড়া কতদিনের তা' জানি না। কেমন করিয়া নামের সৃষ্টি হইল, তাহাও বলিতে পারি না। কতকগুলি কাঁটাল গাছ আছে বটে, কিন্তু নিকটবর্ত্তী অন্যান্য গ্রামে যা' আছে, তদপেক্ষা কোন মতে বেশী হইবে না। তবে পুবাকালে কি ছিল, তাহা বলিতে পারি না।

কাঁটালপাড়ায় দ্রষ্টব্য বড় একটা কিছুই নাই। অজ্জুর্না দীঘী সম্বন্ধে একটা কিম্বদন্তী আছে। আমরা পুরুষানুক্রমে শুনিয়া আসিতেছি, নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতা জয় করিতে যাইবার সময় অজ্জুর্নার সন্নিকটে সসৈন্যে ছাউনি করিয়াছিলেন। রঘুদেব ঘোষাল, নবাব সৈন্যের রসদ সংগ্রহ করিয়া নবাবের আনুকূল্য করিয়াছিলেন।

আর দেখিবার আছে,—রাধাবল্লভ জীউ বিগ্রহ। তাঁহার সম্বন্ধে একটা গল্প আছে। সে আজ বহুদিনের কথা। আমি দেড়শত বর্ষের অগেকার কথা বলিতেছি। তখন বাঙ্গালার সিংহাসনে আলিবর্দ্দি খাঁ অধিষ্ঠান করিতেছেন। ইংরাজ কলিকাতায় কুঠিনির্ম্মাণ করিয়া ভারতব্যাপী রাজ্যের সূচনা করিতেছেন। মির্জাফর তখন সামান্য সেনানী। সিরাজউদ্দৌলা বালক মাত্র।

সে সময় রঘুদেব ঘোষাল কাঁটালপাড়ার মধ্যে জনৈক সঙ্গতিপন্ন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। কিন্তু তাঁহার গৃহ তখন ক্ষুদ্র, আড়ম্বরশূন্য—বর্ত্তমান চট্টোপাধ্যায়-গৃহ হইতে কিঞ্চিৎ দূরে পূর্ব্বদিকে অবস্থিত ছিল। তাঁহার ঠাকুরমন্দির বা অতিথিশালা ছিল বলিয়া শুনি নাই। কিন্তু বাগান ও পুষ্করিণী যথেষ্ট ছিল। বহুকালের অর্জ্জুনা দীঘী তখন ঘোষাল মহাশয়ের সম্পত্তি।

এমনই দিনে—১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে—একদা অপরাহ্ণে জনৈক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী সশিষ্য কাঁটালপাড়ায় আসিয়া উপনীত হইলেন। অতিথিশালা নাই, সন্ন্যাসী বাধ্য হইয়া অর্জ্জুনার তটে বটচ্ছায়াতলে বিশ্রামার্থ উপবেশন করিলেন। তাঁহার কাঁধের উপর একটী দীর্ঘ বিলম্বিত ঝুলি। ঝুলির ভিতর রাধাবল্লভ জীউ ছিলেন। সন্ন্যাসী ঝুলিটি নামাইয়া তরুচ্ছায়ায় উপবেশন করিলেন।

"বিশ্রামান্তে সন্ন্যাসী যখন ঝুলিটি তুলিতে গেলেন, তখন তাহা আর তুলিতে পারিলেন না; ক্ষুদ্র বিগ্রহ তুলিতে সন্ন্যাসীর সামর্থ্যে কুলাইল না। সন্ন্যাসী বুঝিলেন, ঠাকুরের সে স্থানে থাকিতে ইচ্ছা হইয়াছে। তিনি তখন রঘুদেব ঘোষালকে ঠাকুরের সেবার ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। রঘুদেব তন্মুহূর্ত্তে স্বীকার পাইলেন। সন্ন্যাসী অর্জ্জুনার সন্নিকটে একস্থানে একখানি ক্ষুদ্র চালা তুলিয়া ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন।

কয়েক মাস পরে সন্ন্যাসী ফিরিয়া আসিয়া এক দানপত্র রঘুদেবকে প্রদান করিলেন। দানপত্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কর্ত্তৃক রাধাবল্লভ জীউ বরাবর লিখিত। দানের সম্পত্তি সামান্য,—কয়েক বিঘা ভূমি মাত্র। বর্ত্তমান চট্টোপাধ্যায়-বাটী, রাধাবল্লভ-মন্দির প্রভৃতি এই দানপ্রাপ্ত ভূমির উপর দণ্ডায়মান। আমরা সকলে রাধাবল্লভের প্রজা। কিন্তু এক্ষণে খাজনা দিই না; কেন না, তিনি বাকী খাজনার নালিশ করিতে অসমর্থ।

তা'র কয়েক বৎসর পরে বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হয়। মন্দির-গাত্রে প্রস্তর ফলকে দুই ছত্র লিখিত ছিল।—

বাণ সপ্ত কলা শকে
রঘুদেবেন মন্দিরম্।

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, ১৬৭৫ শকে রঘুদেব কর্ত্তৃক মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। সে আজ ১৫৮ বৎসরের কথা।

এই রাধাবল্লভ কতদিনের তাহা কেহ বলিতে পারে না—কত সন্ন্যাসীর হাত ঘুরিয়া অবশেষে চট্টোপাধ্যায় বংশের হাতে পড়িয়াছেন, তাহা নির্ণয় করিয়া বলা অসম্ভব। বঙ্কিমচন্দ্র মধ্যজীবন হইতে রাধাবল্লভের ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।" [শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : বঙ্কিম-জীবনী]

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী-র "বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ায়" শীর্ষক প্রবন্ধে আছে—"বঙ্কিমবাবুর বাড়ি আমার বাড়ি হইতে বেশি দূর নয়। নৈহাটী ষ্টেশন হতে তাঁর বাটি যতটুকু দক্ষিণ, আমার বাড়ি প্রায় ততটুকু উত্তর-পশ্চিম। তাঁহাদের বাড়িতে রাধাবল্লভ বিগ্রহ আছে, খুব জাঁকাল নিত্যভোগ হয়, রোজ দশ সের চাল রান্না হয়, আর নয় সিকা করিয়া নিত্য বাজার খরচ বন্দোবস্ত আছে। শুনিয়াছি, মুড়াগাছা পরগণায় রাধাবল্লভের খুব বড় একটা তালুক আছে। তারই মুনাফা হতে তাঁহার সেবা চলে। দুই ঘর চাটুয্যে মহাশয়রা রাধাবল্লভের সেবাইত, এক ঘর ফুলে, আর এক ঘর বল্লভী। বঙ্কিমবাবুরা ফুলে। চাটুয্যে মহাশয়দের সেবার জন্য কিছু দিতে হয় না। কেবল উহাদের মধ্যে যাঁহাদের অবস্থা তত ভাল নয়, ভোগের এক অংশ তাঁহাদের বাড়িতে যায়। অনেক গরীব দুঃখী লোক মধ্যে মধ্যে রাধাবল্লভের প্রসাদ পায়। রাধাবল্লভের বারমাসের তের পার্ব্বণ হয়। কিন্তু রথে খুব জাঁক হয়। রথখানি পিতলের, বেশ বড়। বার মাস রথখানি গোলপাতার ছাউনীতে ঢাকা থাকে। রথের সময় উহা বাহির করিয়া ঘষে মেজে চকচকে করিয়া লওয়া হয়। রথের সময় বঙ্কিমবাবুদের বাড়ির দক্ষিণে একটা খোলা জায়গায় বেশ একটা মেলা হয়, প্রচুর পাকা কাঁটাল ও পাকা আনারস বিক্রয় হয়, তেলেভাজা পাঁপোর ও ফুলুরির গাঁদি লাগিয়া যায়, আট-দশখানা বড় বড় ময়রার দোকান বসে ; গজা, জিলিপি, লুচি, কচুরি, মিঠাই, মিহিদানা; মুড়ি-মুড়কি, মটর-ভাজা, চিঁড়ে, চিঁড়ে-ভাজা যথেষ্ট থাকে। আগে ঘিয়ের খাজা থাকিত ; এখন আর সেগুলি দেখিতে পাওয়া যায় না। মেলায় মণিহারী দোকান অনেকগুলি থাকে। তাহাতে নানা রকম বাঁশি, কাগজের পুতুল, কাঠির উপর লাফ দেওয়া হনুমান, কটকটে ব্যাঙ কিনিতে পাওয়া যায়। এ সব তো গেল ছেলেদের। বুড়োদের একটি বড় দরকারী জিনিষ এই মেলায় বিক্রী হয়—নানারকম গাছের কলম। আমাদের দেশে যাহারা বাগান করিতে চায়, তাহাদের চারা কিনিবার এই প্রধান সুযোগ। অনেক নারিকেলের চারা, আমের কলম, লেবুর কলম, সুপারির চারা, লকেট ফলের গাছ, গোলাপ জামের গাছ, পিচের গাছ, সবেদার গাছ, ফলসার গাছ এবং গোলাপ, যুঁই, জাতি,

বেল, নবমালিকা, কামিনী, গন্ধরাজ, মুচুকুন্দ, বক, কুরচ, কাঞ্চন, টগর, সিঁউলি প্রভৃতি নানা ফুলের চারা ও কলম পাওয়া যায়। মেলা আট দিন হয়। প্রথম প্রথম বলিয়া দিলে মালিরা, যে কোন গাছের চারা পাওয়া যায়, আনিয়া দিতে পারে।

আগে পুঁতুল-নাচের খুব ভাল ব্যবস্থা ছিল। প্রকাণ্ড এক দোতলার মধ্যে প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ রকমের পুঁতুল-নাচ হইত। সীতার বিবাহ, লবকুশের যুদ্ধ, কালীদমন, এসব ত ছিলই ; তার উপর একটা মকদ্দমার সঙ ছিল—জজসাহেব বসেছেন, পেশকার কাগজ পেশ করিয়া দিল, কাঠগড়ায় আসামী থাকিল, সাক্ষীর জবানবন্দী হইল, উকিলের বক্তৃতা হইল, জজ সাহেব রায় দিলেন, আসামীর ফাঁসী শাস্তি হইল, ফাঁসীও হইল। ফাঁসীকাঠে ঝুলিলে আসামীর কাপড়ের ভিতর দিয়া এক রকম পদার্থ বাহির হইত দেখিয়া ছেলেরা হাসিয়া খুন হইত। আর এক রকম সঙ ছিল—আহ্লাদে পুতুল। তার একগাল হাসি লাগিয়াই আছে। সে হাত-পা নাড়ে আর হাসে।

রাধাবল্লভের বাটির গেটের বাহিরেই গুঞ্জবাড়ি, একখানা খুব বড় পাঁচচালা ঘর। গুঞ্জবাড়ী বলিলে অনেকেই মনে করেন, কৃষ্ণ রথের সময় মাসীর বাড়ি যাইতেন, সেখানে অনেক ফুলের গাছ ছিল ; কুঞ্জ ছিল ; কুঞ্জ হইতে গুঞ্জবাড়ী হইয়াছে। কিন্তু সে কথাটা ঠিক নয়। গুঞ্জ শব্দের মূল গুণ্ডিচা ; অর্থ কুঁড়ে ঘর, তামিল ভাষার শব্দ। উড়িয়ারা জগন্নাথকে গুণ্ডিচাবাড়ি লইয়া যায়, তাই দেখিয়া বাঙালীরাও কৃষ্ণকে গুঞ্জবাড়ি লইয়া যায়। বঙ্কিমবাবুদের পাঁচচালায় কৃষ্ণ আট দিন থাকেন ; দিনের বেলায় পুরুষেরা দর্শন করে ; সন্ধ্যার পর নানা গ্রামের বৌ, ঝি, গিন্নীবান্নী, আধাবয়সী ও বুড়িরা আসিয়া দেখিয়া যায়। রাধাবল্লভের পূজারি প্রায়ই একজন বেশকার। নীলমণি ঠাকুর যে বেশ করিতেন, তাহা সত্য সত্যই বলিহারী যাই। বড় বড় যুঁইয়ের গড়ে দিয়ে কৃষ্ণ রাধা ত প্রায়ই ঢাকা থাকেন, তাহার উপর নানারকম ফুলের গহনা ফুলের মুকুট ও ফুলের সাজ করিয়া দেওয়া হয়। সে সাজ দেখিয়া দেশশুদ্ধ লোক চমৎকৃত হইয়া যায়। কোন দিন কোন সাজ হবে আগে বলিয়া দেওয়া হয়। যাহার যে সাজ দেখিবার ইচ্ছা, সে সেই দিন আসিয়া তাহা দেখিয়া যায়। তা ছাড়া ঘরটিকেও বেশ করিয়া ফুলের মালাটালা দিয়া সাজান হয়। এই ঘরের সামনে একখানি প্রকাণ্ড আটচালা, চারিদিক খোলা গুটিকতক চোকা থামের উপর দাঁড়াইয়া আছে। চালখানি আগে খড় দিয়া ছাওয়া হইত, এখন গোলপাতা দিয়া ছাওয়া হয়। এই আটচালায় রথের সময় যাত্রা, নাচ, গান, কীর্ত্তন প্রভৃতি হইত। এখন দুই একদিনের যাত্রা হয় মাত্র, আগে আট দিনই খুব জমাজমাট থাকিত।

আটচালার পশ্চিমে একটি শিবমন্দির, পাথরের শিবলিঙ্গ, নিত্য পূজার ব্যবস্থা আছে। মন্দিরটির দক্ষিণদিকে বঙ্কিমবাবুর বসিবার ঘর ও পশ্চিমদিকে একটি ঘর, তাহাকে বঙ্কিমবাবু আদর করিয়া তোষাখানা বলিতেন। সেখানে তামাক খাওয়ার সরঞ্জাম থাকিত; হুকা, কলিকা, বৈঠক, ফর্সি, গড়গড়া, তামাক, টিকা, গুল, আগুন, দেশালাই ইত্যাদি ইত্যাদি। সে ঘরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বঙ্কিমবাবুর চাকর, নাম মুরালী। মুরালীর গলায় তুলসীর মালা, কিন্তু সে যে বিশেষ বৈষ্ণবভক্ত তাহা আমরা দেখি নাই। দক্ষিণদিকে শিবমন্দির সংলগ্ন একটি বড় দালান, উহার পূর্ব্বদিকে দুটি দরজা একেবারে খোলা জমিতে পড়িয়াছে, আর পশ্চিমদিকে দুইটি জানালা, ঘরটি পূব-পশ্চিমে লম্বা। পশ্চিমের ঘরটিতে একখানি খাট থাকিত, পূবের ঘরটিতে একটি ফরাস থাকিত; পশ্চিমের ঘরটিতে বঙ্কিমবাবু দিনের বেলা শুইতেন, পূর্ব্বের ঘরটিতে একা বসিয়া লেখাপড়া করিতেন, দুই একজন বিশেষ আত্মীয়েরও সেখানে যাইবার অধিকার ছিল। কখন কখন সে ঘরটিতে দুই একখানি চেয়ার টেবিল[illegible] [illegible]খিয়াছি। দালানটিতে দালানযোড়া একটি ফরাস পাতা থাকিত। দালানের উত্তর দিকে একটি দরজা থাকিত, সেই দরজা দিয়া তোষাখানায় যাওয়া যাইত।

এতক্ষণ যাহা বলিলাম, যে কোন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের বাড়ীতে এসব হইতে পারে। কিন্তু তিনি যে কবি তাঁহার কোন নিদর্শনই এখনও দিই নাই। সে নিদর্শনটি তাঁহার শুইবার ও বসিবার ঘরের দক্ষিণদিকে দেখা যাইত। সে একটি ছোট্ট ফুলের বাগান, দুকাঠাও পূরা হইবে না। ঘর দুটি একত্রে যতখানি লম্বা, বাগানটিও ততখানি লম্বা, আড়েও ঐরূপ, তিনদিকে পাঁচিল দিয়া ঘেরা, সে পাঁচিলের আগায় একটি আলসে ও তাহার নীচে একটি বেঞ্চি। চারিদিকেই এইরূপ। বাগানের ঠিক মাঝখানে একটি চৌকা গাঁথা, হাতখানেক উচা, তাহার মাঝখানে আবার একটি চৌকা হাতখানেক উচা। চারিদিকেই যেন গ্যালারি মত। এই সমস্ত গ্যালরিতে চারিদিকেই টব সাজানো থাকিত। টবে নানারূপ রঙিন ফুল ও পাতার গাছ। বাগানে আর যেটুকু জমি ছিল, তাহাতে শুরকীর কাঁকর দিয়া রাস্তা করা। বাকী জমিতে যুঁই, জাতি, কুঁদ, মল্লিকা ও নবমালিকার গাছ। বর্ষাকালে ফুল ফুটিলে সব সাদা হইয়া যাইত, এবং বৈঠকখানাটি গন্ধে ভরপুর হইয়া যাইত। বঙ্কিমবাবু বাগানটিকে বড়ই ভালবাসিতেন, যতদিন তিনি বাড়ি থাকিতেন, বাগানটি খুব সাবধানে পরিষ্কার রাখিতেন, এবং মাঝে মাঝে অবসর পাইলে আলসেটিতে হেলান দিয়া বেঞ্চির উপর বসিয়া ফুলের বাহার দেখিতেন।”

কৃষ্ণবিহারী সেন। কেশবচন্দ্র সেনের অনুজ কৃষ্ণবিহারী সেন বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানায় মাঝে মাঝে আসতেন। কৃষ্ণবিহারীর জন্ম ১৮৪৭ খ্রীঃ ও মৃত্যু ১৮৯৫ খ্রীঃ। তিনি চারিত্রিক মহত্ব, পাণ্ডিত্য ও সাহিত্যনিষ্ঠার দ্বারা জনসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন। ঠাকুরবাড়ীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। কৃষ্ণবিহারী ছিলেন 'সাধনা' পত্রিকার একজন বিশিষ্ট লেখক। তাঁর গ্রন্থগুলির মধ্যে 'বুদ্ধচরিত', 'অশোকচরিত', 'কবিতামালা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

কেশবচন্দ্র সেন। কেশবচন্দ্র সেন ছিলেন বঙ্কিমের সহপাঠী। কিন্তু দু'জনের জীবন দুই বিপরীত দিকে ধাবিত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন হিন্দুধর্মের নেতা, কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্মের নেতা।

কেশবচন্দ্র ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে নভেম্বর কোলকাতার কোলুটোলার বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা—প্যারীমোহন সেন। কেশবচন্দ্র হিন্দুকলেজে পড়াশোনা-কালে ইংরাজ অধ্যাপকদের উদার চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত হন। ১৮৫৬ খ্রীঃ জগন্মোহিনী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। কিন্তু সংসারের প্রতি তাঁর আসক্তি বিশেষ ছিল না। ১৮৫৭ খ্রীঃ তিনি ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন। ক্রমে ক্রমে তিনি ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে ব্রাহ্ম ধর্মপ্রচার ও বিভিন্ন কুসংস্কার দূর করবার চেষ্টা করেন। তাঁর অপূর্ব বাগ্মীতা ও চরিত্রের জন্য বহু লোক প্রভাবিত হন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী কেশবচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

কেশবচন্দ্রের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাব সম্পর্কে শ্রীকালীনাথ দত্ত লিখেছেন—"নববিধান প্রবর্ত্তক মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনকে বঙ্কিমবাবু একজন প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি (Genius) মনে করিতেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়নের সময় দুজনে এক শ্রেণীতে পড়িতেন। কলেজ ছাড়িয়া কেশবচন্দ্র অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার অসাধারণ বক্তৃতাশক্তির জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রেই দেশবিখ্যাত হইয়া পড়েন…যখন তাঁহার "দুর্গেশনন্দিনী" আলোকের মুখ দর্শন পর্য্যন্ত করে নাই—যখন তাঁহার যশোস্সূর্য্যের অরুণোদয়ের লেশমাত্রও পরিদৃশ্যমান হয় নাই, সেই সময় কলিকাতার কোন স্থানে একদিন কেশববাবুর সঙ্গে বঙ্কিমবাবুর সাক্ষাৎ হইলে বঙ্কিমচন্দ্র কেশবচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেন 'I wish to know how far you have outgone me' একথা কেশববাবুর নিজ মুখেই শুনিয়াছি।……কেশববাবুরও Leading power তাঁহার মতে খুব বেশী ছিল না। তিনি বলিলেন যে 'অনেক সময় ও শ্রমব্যয়ে কেশববাবু যে অনুগামী দল তাঁহার ধর্মপ্রচারের জন্য সৃষ্টি করিয়া যান, তিনি মানবলীলা সম্বরণ করিতে না করিতে সেই অসংসক্ত দানটি বহুধা বিচ্ছিন্ন হইয়া তাহার গঠন দৌর্ব্বল্যের

পরিচয় প্রদান করিতেছে।” আমি ব্রাহ্ম সমাজের ইতিহাস উল্লেখ করিয়া বলিলাম যে, কেশববাবুর অনুবর্ত্তী প্রচারকদলে অনেকগুলি নিষ্ঠাবান, শ্রদ্ধাস্পদ ও সাধুচরিত্র লোক আছেন, তাঁহাদের স্বার্থত্যাগ ও ধর্ম্মানুরাগ সমধিক প্রশংসনীয়। তাঁহাদের প্রচার-চেষ্টা সমস্তই যে ব্যর্থ হইবে তাহা মনে হয় না। তাঁহারা একদিন কেশববাবুর নাম রক্ষা করিতে সক্ষম হইতে পারেন। ও কথায় তিনি বলিলেন—‘কালীনাথ, তুমি কখনও মনে স্থান দিও না যে ও দল আর কখনও মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে। উহার যে অবসাদ দশা এখন উপস্থিত হইয়াছে, সে দশার আর কখন প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই।” (কালীনাথ দত্ত : ‘বঙ্কিমচন্দ্র’)

খুলনা। বঙ্কিমচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টররূপে খুলনায় কিছুদিন কাজ করেন। খুলনায় বঙ্কিমচন্দ্রের চাকুরিতে নিয়োগের তারিখ—১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই নবেম্বর। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিক পর্যন্ত তিনি এখানে ছিলেন।

বর্তমানে খুলনা পূর্বপাকিস্তানের রাজসাহী বিভাগের একটি জেলা। এই জেলার দক্ষিণে সুন্দর.., পূর্বে বাখরগঞ্জ, উত্তরে যশোহর, পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গের ২৪-পরগনা জেলা। বঙ্কিমচন্দ্র যখন খুলনায় যান, “খুলনা তখন যশোহরের অধীন একটি মহকুমা-মাত্র ; তখনও স্বতন্ত্র জেলায় পরিণত হয় নাই।”

“খুলনায় আসিয়া বঙ্কিমচন্দ্র ঘোর অরাজকতার মধ্যে পড়িলেন। একদিকে নীলকরের অত্যাচাব, অপরদিকে দস্যু তস্করের উপদ্রব। নীলকর সাহেবদের মন যোগাইতে যোগাইতে গভর্ণমেণ্ট হায়রাণ।”

বঙ্কিমচন্দ্র দৃঢ়হাতে অনেক অরাজকতা দমন করেন।

ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য। বঙ্কিমচন্দ্রের একজন অভিন্নহৃদয় বন্ধু। “তাঁহার সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল। কিন্তু ক্ষেত্রবাবু যখন মৃত্যু-শয্যায় শায়িত, তখন বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। সে সাক্ষাৎ হৃদয়স্পর্শী। উভয়ে কাঁদিয়া শয্যা ভাসাইয়াছিলেন।” (বঙ্কিম-কাহিনী)

গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারি। পিতার নাম রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বাল্যকাল থেকেই তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে গণিতে প্রথম শ্রেণীতে এম. এ. পাস করেন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আইন পরীক্ষায় পাস করেন। কিছুদিন বহরমপুর কলেজে আইনের অধ্যাপনা করার পর কোলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি সুরু করেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ‘ডক্টর অব ল’ উপাধি পান। তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক হন। পরে তিনি কোলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতিও হন।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে তিনিই প্রথম ভারতীয় ভাইস-চ্যান্সেলাররূপে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত হন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'স্যার' উপাধি প্রাপ্ত হন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি ছিলেন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থও আছে। সর্বোপরি তিনি ছিলেন অত্যন্ত মাতৃভক্ত ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ।

"একদা শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। উভয়ের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষার তাৎকালিক অবস্থা লইয়া কিছু বাদানুবাদ হয়। গুরুদাসবাবু নাকি বলিয়াছিলেন, 'বাঙ্গালা ভাষা এতটা সরল করিলে চলিবে না—তাহার গাম্ভীর্য্য-রক্ষা আবশ্যক।' বঙ্কিমচন্দ্র সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া শুধু একটু হাসিয়াছিলেন। তার কিছু পরে উভয়ে গাড়ী করিয়া বেড়াইতে বাহির হইলেন। কলিকাতার পথ—দুই পাশে অসংখ্য দোকান। বঙ্কিমচন্দ্র তাহা দেখাইয়া গুরুদাসবাবুকে বলিলেন, 'দুই পার্শ্বে বিপণিশ্রেণী—'

গুরুদাসবাবু একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের মুখপ্রতি চাহিলেন। দেখিলেন, তাঁহার অধরে হাস্য-রেখা। তখন গুরুদাসবাবু ব্যাপারটা কি বুঝিলেন। বুঝিলেন, তিনি যে বাঙ্গালা ভাষার গুরুত্বরক্ষার কথা তুলিয়াছিলেন, এতক্ষণে সে কথার উত্তর প্রদত্ত হইল।" (বঙ্কিম-জীবনী)

গোবিন্দচন্দ্র দাস। কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানার আসরে মাঝে মাঝে যোগদান করতেন। বঙ্কিমচন্দ্র একটি মামলা থেকে একবার তাঁকে রক্ষা করেন।

গোবিন্দচন্দ্র দাসের পৈতৃক নিবাস ঢাকা জেলার ভাওয়াল-জয়দেবপুর গ্রামে। জন্মকাল ১২৬১ সালের ৪ঠা মাঘ। তাঁর পিতার নাম রামনাথ দাস। তিনি বেশীদূর পড়াশোনা করতে পারেননি। তিনি বাল্যকাল থেকেই কবিতা রচনা করতেন এবং স্বভাবকবি নামে পরিচিত হন। তাঁর প্রকাশিত একটি কবিতাকে কেন্দ্র করে তিনি জন্মভূমি থেকে নির্বাসিত হন। এ সম্পর্কে "বঙ্কিম-জীবনী"তে আছে ঃ

"বঙ্গলক্ষ্মী'-প্রণেতা শ্রীযুক্ত বাবু অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের একখানি সাপ্তাহিক পত্র ছিল। পত্রখানির নাম—"প্রকৃতি"। অনুকূলবাবু ইহার সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী ছিলেন। স্বর্গীয় গোবিন্দচন্দ্র দাস উক্ত পত্রে একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন। কবিতাটি ভাওয়ালের রাজা ও স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়কে আক্রমণ করিয়া লিখিত হইয়াছিল। কবিতা পড়িয়াই ত কালীপ্রসন্নবাবু জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট-কোর্টে মকদ্দমা রুজু করিয়া দিলেন। স্থানীয় যাবতীয় উকিল মোক্তার ঘোষ মহাশয়ের পক্ষে নিযুক্ত হইল। খরচ সম্ভবতঃ রাজার। দরিদ্র, সাহিত্যসেবী

অনুকূল বাবু মহাবিপদে পড়লেন। তিনি ভীত হইয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট রামশঙ্কর সেন মহাশয়ের শরণাগত হইলেন। সেন মহাশয় মকদ্দমা মিটাইবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

অবশেষে অনুকূলবাবু বঙ্কিমচন্দ্রকে ধরিলেন। উভয়ের মধ্যে পূর্ব্বে কোনও পরিচয় ছিল না। পরিচয়ের প্রয়োজনও দেখি না। যে সাহিত্যিক, সাহিত্যচর্চ্চায় যাহার আনন্দ, সে বঙ্কিমচন্দ্রের পরমাত্মীয়। বিশেষতঃ যে যুবক ক্ষীণ যষ্টি-সাহায্যে সাহিত্য-সৌধের সোপানাবালী অতিক্রম করিবার প্রয়াস পাইতেছে, সে, বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মীয় হইতেও প্রিয়। অনুকূলবাবুর বিপদের কথা শুনিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ কালীপ্রসন্নবাবুকে পত্র লিখিলেন। লিখিলেন, অনুকূল সাহিত্য-সেবা করিতে গিয়া আজ বিপদ্‌গ্রস্ত। তাহার বিরুদ্ধে যে মকদ্দমা স্থাপন করিয়াছ, তাহা উঠাইয়া লইবে। যদি লও, তাহা হইলে এ অনুগ্রহ আমার প্রতিই করা হইল, জানিবে।

কালীপ্রসন্নবাবু, বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরোধ ঠেলিতে পারিলেন না,—অবিলম্বে মকদ্দমা উঠাইয়া লইলেন। অনুকূলবাবু স্বীয় পত্রে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।"

গোবিন্দচন্দ্র দাসের কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'প্রেম ও ফুল,' 'কুঙ্কুম', 'প্রসূন', 'চন্দন', 'ফুলরেণু' প্রভৃতি উর্ল্লেখযোগ্য। ১৩২৫ সালের ১৩ই আশ্বিন গোবিন্দচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

চন্দ্রনাথ বসু। বঙ্কিম-অনুবর্ত্তী লেখক। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের (১২৫১ সাল) ভাদ্র মাসে চন্দ্রনাথ বসু হুগলী জেলার কৈকালা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইতিহাসে এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম হন। আইন পরীক্ষাতে তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকাব করেন।

ছাত্রাবস্থায় Calcutta University Magazine নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করে তিনি প্রশংসা অর্জন করেন। কিছুদিন হাইকোর্টে আইন-ব্যবসা করে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপকের কাজ করেন। কিছুকাল তিনি ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেটের কাজও করেন। কিছুকাল জয়পুর কলেজের অধ্যক্ষ এবং বেঙ্গল লাইব্রেরীর কর্মাধ্যক্ষের কাজ করেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা সরকারের অনুবাদকের কাজ নেন। ১৭ বছর কাজ করার পর ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

চন্দ্রনাথ বসু 'বঙ্গদর্শনে'র লেখক ছিলেন। তাঁর বাংলা পুস্তকগুলির মধ্যে ত্রিধারা, পৃথিবীর সুখ-দুঃখ, হিন্দুত্ব ; সংযমশিক্ষা, সাবিত্রীতত্ত্ব, বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি ; কঃ পন্থা, বেতালে বহু রহস্য এবং ফুল ও ফল উল্লেখযোগ্য। তিনি কয়েকখানি ইংরেজী গ্রন্থও রচনা করেন। ১৩১৭ সালের আষাঢ় মাসে তাঁর মৃত্যু হয়।

চন্দ্রনাথ বসুর "বন্ধুবৎসল বঙ্কিমচন্দ্র" প্রবন্ধে চন্দ্রনাথের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম পরিচয়ের ঘটনাটি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে :

"যখন স্কুল ও কলেজে পড়িতাম, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সংস্কৃতের ব্যবস্থা ছিল না। ঐ সকল পরীক্ষায় বাঙ্গালাই তখন আমাদের 'দ্বিতীয় ভাষা' ছিল। তথাপি বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের বড়ই অনাদর ছিল। কেবল যে বড় বড় ইংরাজি-ওয়ালারা উহার অবজ্ঞা করিতেন তাহা নহে; যাহাদিগকে উহাতে পরীক্ষা দিতে হইত, তাহারাও অবজ্ঞা করিত।

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের যখন এইরূপ অনাদর, তখন বঙ্কিমবাবুর নাম প্রথম শুনি। শুনি যে তিনি বাঙ্গালাভাষায় ইঙ্গরাজী ধরণের একখানা উপন্যাস লিখিয়াছেন। বাঙ্গালাভাষা আমি কখনই ঘৃণা করি নাই, তথাপি ঐ কথা শুনিয়া একবার মনে হইয়াছিল, এ আবার কি। এত ইঙ্গরাজী পড়িয়া বাঙ্গালায় বহি লেখা কেন! কিন্তু উহা ভিন্ন আর কিছুই ভাবি নাই। মনে বঙ্কিমবাবুর সম্বন্ধে অবজ্ঞার ভাব উদয় হয় নাই। ক্রমে শুনিলাম তিনি ঐরকম আর একখানা উপন্যাস লিখিয়াছেন। এবার কিন্তু প্রথমবারের মত মনে বিস্ময়ের ভাব একেবারেই জন্মে নাই। বরং বাঙ্গালাভাষার উপর আস্থা বাড়িয়াছিল। দিনকতক পরে শুনিলাম বঙ্কিমবাবু আরও একখানা উপন্যাস লিখিয়াছেন। অনেকের মুখে তাঁহার পুস্তকগুলির প্রশংসা শুনিতে লাগিলাম। কাহারও কাহারও মুখে নিন্দাও শুনিলাম। আরও শুনিলাম, কেহ কেহ দুই চারিটি অক্ষর ভুল প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রাণান্ত করিতেছেন এবং বঙ্কিবাবুর বিষয় নিন্দা রটনা করিতেছে। নিন্দা শুনিয়া মনে হইল বুঝিবা বঙ্কিমবাবুর জন্য কাহারও কাহারও গাত্রদাহ আরম্ভ হইয়াছে। তখন 'দুর্গেশনন্দিনী', 'মৃণালিনী' ও 'কপালকুণ্ডলা' কিনিয়া পড়িলাম।

তিনখানি উপন্যাস পড়িয়া বুঝিয়াছিলাম যে, বঙ্কিমবাবু বাঙ্গালা সাহিত্যে বিপ্লবের সৃষ্টি করিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আমি তাঁহার কিঞ্চিৎ পক্ষপাতী হইয়া পড়িলাম। তাঁহার 'বঙ্গদর্শনে'র গ্রাহক হইলাম। কয়েকটি অধ্যায় প্রকাশিত হইলে পর, আমাদের দেশের এক শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি 'বঙ্গদর্শনে'র প্রসঙ্গে অতিশয় ক্রোধ বিরক্তি ও অবজ্ঞা-ব্যঞ্জক স্বরে আমার কাছে বলিয়াছিলেন—"ঐ আবার 'কুন্দনন্দিনী' একটা কি বাহির হইতেছে?" তেমন লোকের মুখে ওরূপ কথা শুনিয়া আমার মনঃকষ্ট হইয়াছিল—সে মনঃকষ্ট এখনও যায় নাই, বোধহয় কখনও যাইবে না। 'বঙ্গদর্শন' পড়িয়া যাহা বুঝিয়াছিলাম উহা পড়িবার পূর্ব্বে তাহা বুঝি নাই। বুঝিয়াছিলাম যে বাঙ্গালা ভাষায় সকলপ্রকার কথাই সুন্দররূপে বলিতে পারা যায়; আর বুঝিয়াছিলাম যে, ভাষা বা

সাহিত্যের দারিদ্র্যের অর্থ মানুষের অভাব। 'বঙ্গদর্শন' বলিয়া দিয়াছিল বঙ্গে মানুষ আসিয়াছে, বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রতিভা প্রবেশ করিয়াছে।

তখনও কিন্তু আমি বঙ্কিমবাবুকে দেখি নাই। না দেখিলে সকলে যাহা করিয়া থাকে আমিও তাহা করিতাম। মনে মনে তাঁহার মূর্ত্তি কল্পনা করিতাম। তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন এমন কেহ কেহ আমায় বলিতেন, 'বঙ্কিমের চেহারায় বুদ্ধি যেন ফাটিয়া বাহির হইতেছে।' আমিও প্রাণপণে মূর্ত্তি কল্পনা করিতাম। কিন্তু তাঁহাকে যখন দেখিলাম তখন আমার কল্পিত মূর্ত্তি লজ্জায় কোথায় লুকাইয়া পড়িল তাহার ঠিকানা রহিল না।.........

আমি দ্বিতীয় কলেজ রি-ইউনিয়নের সহকারী সম্পাদক হইয়াছিলাম। সম্পাদক হইয়াছিলেন রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। সম্পাদক মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার 'মরকতকুঞ্জ' নামক প্রসিদ্ধ উদ্যানে সেবারকার উৎসব হয়। অভ্যাগতদিগের অভ্যর্থনা করিতেছি এমন সময়ে একটা বিদ্যুৎ সভাগৃহে প্রবেশ করিল। অপরকেও যে ভাবে অভ্যর্থনা করিতেছিলাম বিদ্যুৎকেও সেইভাবে অভ্যর্থনা করিলাম বটে কিন্তু তখনই একটু অস্থির হইয়া পড়িলাম। এক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—কে? শুনিলাম—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আমি দৌড়িয়া গিয়া বলিলাম—'আমি জানিতাম না আপনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—আর একবার করমর্দ্দন করিতে পাইব কি?' সুন্দর হাসি হাসিতে হাসিতে বঙ্কিমবাবু হাত বাড়াইয়া দিলেন। দেখিলাম হাত উষ্ণ। সে উষ্ণতা এখনও আমার হাতে লাগিয়া আছে। সে হাত পুড়িয়া যায় নাই—আমার হাতের ভিতরেই আছে। যে ভালবাসাইয়া যায়, আগুনে তাহাকে পুড়াইতে পারে না।"

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শনে' আকৃষ্ট হয়ে যে সকল তরুণ লেখক সাহিত্যচর্চা আরম্ভ করেন, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে অক্টোবর তাঁর জন্ম হয়। পিতার নাম বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি এ. পাস করে তিনি পুটিয়া স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। এখানে তাঁর পত্নীবিয়োগ হলে, তিনি বিখ্যাত গ্রন্থ 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' রচনা করেন। বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রশেখরকে 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' বলে পরিচয় দিতেন। পরবর্তী কালে আইন পাস করে তিনি বহরমপুরে ওকালতি করেন। তিনি 'উপাসনা' পত্রিকা সম্পাদনাও করেছিলেন। 'মশলাবাঁধা কাগজ', 'কুঞ্জলতার মনের কথা' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। বহরমপুরে থাকাকালীন ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে অক্টোবর তাঁর মৃত্যু হয়।

চুঁচুড়া ও হুগলী। ভাগীরথী-তীরে অবস্থিত পাশাপাশি দুটি শহর। অপর তীরে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মস্থান। চুঁচুড়া এবং হুগলীর সঙ্গে ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের আবাল্য পরিচয়। গঙ্গা পার হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যকালে হুগলী কলেজ বা মহম্মদ মহসিনের কলেজে পড়াশোনা করেন।

চাকুরি জীবনে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলীতে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মার্চ আসেন। "হুগলীতে বঙ্কিমচন্দ্র প্রায় পাঁচ বৎসর ছিলেন। এই পাঁচ বৎসর বৃথা যায় নাই। মান, সম্ভ্রম, অর্থসমাগম যথেষ্ট হইয়াছিল। হুগলীর কলেক্টার, বঙ্কিমচন্দ্রের উপর জেলার ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন; ডিবিজন্যাল কমিশনর বঙ্কিমচন্দ্রের কার্য্যে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে Personal Assistant করিয়া লইয়াছিলেন। ছোটলাট ইডেন সাহেব, বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরোধে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্রকে ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রদান করিয়াছিলেন। পুস্তক-বিক্রয়লব্ধ অর্থ প্রচুর পরিমাণে আসিয়া তাঁহার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে লাগিল; সাধের বঙ্গদর্শন আবার মাথা তুলিল; কমলাকান্তের পত্রাবলী, রাজসিংহ, মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত, কমলাকান্তের জবানবন্দী, আনন্দমঠ প্রভৃতি লিখিত হইয়া বঙ্গদর্শনে একে একে প্রকাশিত হইতে লাগিল। আনন্দমঠ বঙ্গদর্শনে বাহির হইবার অনতিপূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী ত্যাগ করিলেন।" (বঙ্কিম-জীবনী)

সম্ভবতঃ বাড়ীতে ভ্রাতাদের সঙ্গে মনোমালিন্যের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র চুঁচুড়ায় কিছুকাল বাস করেন। চুঁচুড়ার বাড়ী সম্বন্ধে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন:—"দেখিলাম চুঁচুড়ায় যোড়াঘাটের উপর দুইটি বাড়ি ভাড়া করিয়াছেন; একটিতে তাঁহার অন্দরমহল, আর একটিতে তিনি নিজে বসেন। যেটিতে তিনি বসেন সেটি একতলা। বাড়িটির একটি গেট আছে। যে ঘরটিতে তিনি বসেন তাহা একটি বড় হল, গঙ্গার দিকে চারিটি জানালা। সে ঘরের পূর্ব্বেও দেওয়ালটি গুটিকতক বড় বড় মোটা গোল থামের উপর, বর্ষাকালে তার নীচেও জল আসে। বঙ্কিমবাবু যেখানে বসিয়াছিলেন সেদিন তার নীচে খুব জল ছিল। এক বৎসরের পর হঠাৎ আমাকে দেখিয়া তিনি খুসী হইলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি ত চুঁচুড়ায় বাসা করিয়াছেন, ইহার ভিতরে কি কিছু 'কৃষ্ণকান্তী' আছে? তিনি বলিলেন, "তুমি ঠিক বুঝিয়াছ। আমি বড় খুসী হইলাম, তোমার কাছে আমার বেশী কৈফিয়ৎ দিতে হইল না।" (বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ায়)

"বঙ্কিম-জীবনী"তেও আছে—"চুঁচুড়ায় যে বাটীতে বঙ্কিমচন্দ্র বাস করিতেন, সে বাটী আজও আছে। বাটীটি প্রশস্ত, দ্বিতল,—ঠিক গঙ্গার উপর। বারান্দার নীচে দিয়া জাহ্নবী বহিয়া চলিয়াছে। মাথার উপরে নীলাকাশ, পদনিম্নে কুলুকুলু ধ্বনি, সম্মুখে ধবলতরঙ্গা জাহ্নবী। বঙ্কিমচন্দ্র সে দৃশ্য সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা নিম্নে

উদ্ধৃত করিলাম। তিনি লিখিয়াছেন,—"একদিন বর্ষাকালে গঙ্গাতীরস্থ কোন ভবনে বসিয়াছিলাম। প্রদোষকাল—প্রস্ফুটিত চন্দ্রালোকে বিশাল বিস্তীর্ণ ভাগীরথী লক্ষ বীচিবিক্ষেপশালিনী—মৃদু পবনহিল্লোলে তরঙ্গভঙ্গচঞ্চল চন্দ্রকরমালা লক্ষ তারকার মত ফুটিতেছিল ও নিবিতেছিল। যে বারেণ্ডায় বসিয়াছিলাম তাহার নীচে দিয়া বর্ষার তীব্রগামী বারিরাশি মৃদুরব করিয়া ছুটিতেছিল। আকাশে নক্ষত্র, নদীবক্ষে নৌকায় আলো, তরঙ্গে চন্দ্ররশ্মি। কাব্যের রাজ্য উপস্থিত হইল।" (ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত)

এই দৃশ্য—কাব্য-রাজ্যের এই মনোরম চিত্রপট বঙ্কিমচন্দ্রের নবোদ্গমপত্র-তুল্য কোমল হৃদয়ে অনপনেয় রাগে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। হুগলী ত্যাগের কিছুদিন পরে বঙ্কিমচন্দ্র যখন "দেবী চৌধুরাণী" লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখনও তাঁহার মানসপটে এ চিত্র অঙ্কিত ছিল। তিনি কোমল তুলিকা লইয়া ভিন্ন বর্ণে সেই কাব্য-রাজ্য অঙ্কিত করিলেন। তবে সে চিত্র যেন আরও সুন্দর—বর্ণ যেন আরও উজ্জ্বল—কুলুকুলুধ্বনি যেন আরও কোমল।"

জগদীশনাথ রায়। বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। বয়সে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা কিছু বড় ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র "বিষবৃক্ষ" উপন্যাসটি এই বন্ধুকে উৎসর্গ করেন। বিষবৃক্ষের হরদেব ঘোষালের পত্রগুলিকে অনেকে জগদীশনাথ রায়ের প্রভাবজাত বলে মনে করেন। ২৪-পরগণা জেলার কাঁচড়াপাড়ায় বৈদ্যবংশে তাঁর জন্ম হয়। পুলিশ বিভাগের সামান্য কর্মচারী থেকে তিনি নিজ প্রতিভাবলে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-এর পদে উন্নীত হন। তাঁর স্মৃতির নিদর্শনস্বরূপ কোলকাতায় জগদীশনাথ রায় লেন আছে।

জাজপুর। কর্মোপলক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র এখানে আসেন ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই আগস্ট। ইহা উড়িষ্যার কটক জেলার মহকুমা, থানা ও শহর।

জ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমভ্রাতা সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র।

ঝিনাদহ। ঝিনাদহ বা ঝিনাইদহ পূর্বপাকিস্তানের যশোহর জেলার এক মহকুমা শহর। নবগঙ্গা নদীর তীরে এই শহর অবস্থিত। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টররূপে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই নিযুক্ত হন। কিন্তু তিনি এখানে বেশীদিন থাকতে পারেননি, জ্বরে ভুগতে থাকায় ছুটি নিয়ে চলে আসেন।

ডায়মণ্ডহারবার। ২৪-পরগনা জেলার মহকুমা ও শহর। হুগলী নদীর পোতাশ্রয়। কোলকাতার শিয়ালদহ স্টেশন থেকে রেলপথে ৩৭ মাইল। বাসেও যাওয়া যায়। "বঙ্কিম-জীবনী"তে আছে—"বারুইপুর হইতে বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে ডায়মণ্ড হারবারে বদলী হইয়া যান। সেখানে কিছুদিন থাকিয়া আবার বারুইপুরে ফিরিয়া আসেন।"

দামোদর মুখোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের ছায়ানুসরণে কাহিনী রচনা করে ইনি খ্যাতি অর্জন করেন।

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে (১২৫৯ সালের ২রা ফাল্গুন) মাতুলালয় নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল শান্তিপুর। ইনি বহরমপুর কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ইংরাজী, বাংলা এবং সংস্কৃত সর্ববিষয়েই তাঁর যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। ইনি 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের উপসংহাররূপে "মৃন্ময়ী" উপন্যাস রচনা করেন। এটিই তাঁর প্রথম উপন্যাস। এছাড়া, মা ও মেয়ে, দুই ভগিনী, বিমলা, কর্মক্ষেত্র, শান্তি, সোনার কমল, যোগেশ্বরী, অন্নপূর্ণা, সপত্নী, ললিতমোহন, অমরাবতী, শুক্লবসনা-সুন্দরী, শম্ভুরাম, নবাবনন্দিনী (দুর্গেশনন্দিনীর শেষাংশ) প্রভৃতি উপন্যাস রচনা করেন। তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এক বৃহৎ সংস্করণ প্রকাশ করেন। 'জ্ঞানাঙ্কুর' ও 'প্রবাহ' নামে দু'খানি পত্রিকাও তিনি কিছুকাল সম্পাদনা করেছিলেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে (১৩১৪ সালের ৩১শে শ্রাবণ), ৫৪ বৎসর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

দামোদর এবং বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে একটি রসিকতা প্রচলিত আছে। একদা দামোদর-বাবু বঙ্কিমচন্দ্রকে অপ্রস্তুত করার জন্য বঙ্কিমের বাঁকা চটিটিকে দেখিয়ে বললেন—দেখ দেখ, বঙ্কিম চট্টো। বঙ্কিম তাতে কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হয়ে বললেন—হ্যাঁ, দামোদর মুখো।

দামোদরের মুখের মত জবাবই হল বটে।

দ্বারকানাথ অধিকারী। জন্মস্থান—নদীয়া জেলার গোস্বামী দুর্গাপুর।

বাল্যকালে বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের "সংবাদ-প্রভাকর"-এ যে কালেজীয় কবিতা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তার মধ্যে অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন দ্বারকানাথ অধিকারী। ইনি বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা বয়সে কিছু বড় ছিলেন এবং কৃষ্ণনগর কলেজে পড়তেন। অল্প বয়সে তিনি মারা যান। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ—'সুধীরঞ্জন'।

"১২৫৯ সালের ২রা চৈত্রের প্রভাকরে বিঘোষিত হইল,—"হিন্দুকালেজের সুপাত্র ছাত্র শ্রীযুত দীনবন্ধু মিত্র, হুগলি কালেজের ছাত্র শ্রীযুত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এবং কৃষ্ণনগর কালেজের ছাত্র শ্রীযুত দ্বারকানাথ অধিকারী এই ছাত্র ত্রয়ের বিরচিত গদ্য পদ্য পরিপূরিত তিনটি প্রবন্ধ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, এই সকল রচনার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন ও সংশোধন না করিয়া অবিকল প্রকাশ করণে প্রবৃত্ত হইলাম। আমারদিগের সহযোগীগণ এবং গুণগ্রাহক গ্রাহকগণ বিশেষাভিনিবেশ পূর্ব্বক দৃষ্টি করিয়া যাঁহার রচনা যে রূপে ও যে ভাবে উৎকৃষ্ট বোধ হইবেক, তাঁহাকে সেইরূপে সেইভাবে পুরস্কৃত করিবেন। আমরা এ বিষয়ে অগ্রে কোন কথাই উল্লেখ করিব না।"

প্রথমে দীনবন্ধুবাবুর "দম্পতি প্রণয়" নামে এক দীর্ঘ কবিতা প্রভাকরে মুদ্রিত হইল।

তারপর দ্বারকানাথের গদ্যকাব্য "সত্যবতীর সহিত পাপিনীর বিবাদ" প্রকাশিত হইল। সর্ব্বশেষে বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতা প্রকাশিত হইল। এ যুদ্ধে, পরীক্ষায় দ্বারকানাথকে শ্রেষ্ঠ আসন ও পুরস্কার প্রদান করা হইয়াছিল।

হায়, সে দ্বারকানাথ আর নাই। যৌবন ফুটিবার পূর্ব্বেই চন্দ্রশেখর বা লীলাবতী-তুল্য পুস্তক লিখিবার পূর্ব্বেই তিনি সহযোগীদের ত্যাগ করিয়া লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন।"

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র। জন্ম ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ। সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতিতে তিনি কৃতিত্ব দেখান। তিনি 'তত্ত্ববোধিনী' এবং 'ভারতী' পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। তিনি মাত্র বিশ বৎসর বয়সে 'মেঘদূতে'র অনুবাদ করে কৃতিত্ব দেখান। 'স্বপ্ন-প্রয়াণ' কাব্য গীতিকাব্যের এক উৎকর্ষ বহন করে। এই কাব্যের প্রথম সর্গটি ১২৮০ সালের (১৮৭৩ খ্রীঃ) শ্রাবণ-সংখ্যা "বঙ্গদর্শন"-এ প্রকাশিত হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথের মৃত্যু সন ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দ।

দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পর্কটি বোঝার জন্য "পুরাতন প্রসঙ্গ" থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথের মন্তব্যটি উদ্ধৃত করলাম।

"তবে ঋণ স্বীকার না করিয়াও এমন ভাবে একটা idea নিজের রচনার মধ্যে চালাইয়া দেওয়া যায় যে, তাহাতে বিস্ময় হইতে পারে কিন্তু রাগ হয় না। আমি যখন প্রথম 'স্বপ্ন-প্রয়াণ' রচনা করিতে আরম্ভ করি, তাহার কোনও অংশ বঙ্কিমবাবুকে পাঠাইয়াছিলাম, তাঁহার 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশ করিবার জন্য। তখনকার 'স্বপ্ন-প্রয়াণ' আর এখনকার 'স্বপ্ন-প্রয়াণে' অনেক তফাৎ। আমার পুস্তকে কতকগুলো কাল্পনিক ছবির সমাবেশ ছিল। বঙ্কিমবাবু বোধ হয় সেগুলো ছাপান নাই, এক-আধটা ছাপাইয়াছিলেন কি না আমার স্মরণ নাই। কিন্তু তাঁহার 'বিষবৃক্ষের' মধ্যে ঠিক সেই রকম ছবির অবতারণা করিয়া বসিলেন। তফাতের মধ্যে দাঁড়াইল এই যে, যাহা স্বপ্নে অশোভন হয় না, তাহা বাস্তব জগতে, গৃহস্থ-চিত্রে, বিশেষতঃ হিন্দু গৃহস্থচিত্রে অত্যন্ত অশোভন হইয়া দাঁড়াইল। নগেন্দ্রনাথের ঘরের মধ্যে সেই রকম ছবি থাকিতে পারে ; কিন্তু বাড়ীর মধ্যে গৃহস্থ-বধু গাড়ী হাঁকাইলেন, এ চিত্র একেবারেই সুশোভন হইল না। কিন্তু এই রকম চিত্র-সমাবেশের idea-টা যে তিনি আমার রচনা হইতে পাইতেছিলেন, সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ধর্ম্ম ও দর্শন সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবু অন্যত্র গুরুশিষ্য খাড়া করিয়া যে ভাবে দার্শনিক আলোচনা করিতে বসিলেন, তাহার বহু পূর্ব্বে ঠিক ঐভাবে ঐরকম আলোচনা আমিও করিয়াছিলাম। বঙ্কিমবাবু ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন যখন তাঁহার 'কৃষ্ণচরিত্রে'র সমালোচনা আমি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য়

করিলাম। তিনি তখন 'প্রচারে'র সম্পাদক, আমি 'পত্রিকা'র সম্পাদক। পত্রিকায় সমালোচনা বাহির হইবার পর তিনি প্রচারে এমনভাবে লিখিলেন যেন সমালোচনা আমার লেখা নহে—কর্ত্তা স্বয়ং লিখিয়া দিয়াছেন। কিন্তু বাবা তখন অত্যন্ত পীড়িত। তাঁহার সঙ্গে তখন আমি চুঁচুড়ায় ছিলাম বটে, কিন্তু তিনি দোতলায় শয্যাগত ছিলেন। তিনি আমাকে এইটুকু মাত্র বলিয়াছিলেন—'দেখ, বঙ্কিম যে রকম করে কৃষ্ণচরিত্রের আলোচনা করচে, তা'র একটা প্রতিবাদ হওয়া আবশ্যক।' তাই আমি প্রতিবাদ করিয়া পত্রিকায় লিখিয়াছিলাম। সে সমালোচনায় কর্ত্তার কোনও হাত ছিল না, আগাগোড়া আমার নিজের।

"কেন বঙ্কিম দুটো কৃষ্ণের অবতারণা করিলেন, এবং এক কৃষ্ণকে আদর্শ পুরুষ বলিয়া দাঁড় করাইতে চেষ্টা করিলেন? বঙ্কিমচন্দ্র শেষাশেষি যতই গীতাভক্ত হউন না কেন, তিনি অনেকদিন ধরিয়া পাকা Positivist ছিলেন। Positive Philosophy যাহাই হৌক না কেন, শুধু মানুষকে লইয়া একটা Positive religion দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিলে চলিবে কেন? Religion কি অমনি গড়িয়া তুলিলেই হয়? Positivist চাহিল একজন Grand man মহাপুরুষ। বঙ্কিমবাবু ভাবিলেন, এই ত আমার হাতের কাছে একজন Grand man রহিয়াছেন, যেমন বিষয়বুদ্ধি, তেমনি পরমার্থজ্ঞান, এই রকম চৌকোস মানুষ দরকার। অতএব আমাদের দেশে Positivist religion দাড় করাইতে হইলে শ্রীকৃষ্ণকে Grand man করিলেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে। তবে বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণকে আর মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণকে এক করিলে চলিবে না। ফলে দাঁড়াইল বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্র।"

দীনবন্ধু মিত্র। বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট নাট্যকার ও বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরঙ্গ বন্ধু।

দীনবন্ধু মিত্র নদীয়া জেলার চৌবেড়িয়া গ্রামে ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম কালাচাঁদ মিত্র। গ্রামে কিছুদিন পড়াশোনা করার পর তিনি প্রথমে কিছুদিন হুগলী কলেজে ও পরে কোলকাতার হিন্দু কলেজে পড়াশোনা করেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে দীনবন্ধু ডাক-বিভাগের চাকুরি গ্রহণ করেন। ডাক-বিভাগের কাজ নিয়েই ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লুসাই যুদ্ধে যান। সেখানে কর্মদক্ষতার পুরস্কারস্বরূপ ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'রায়বাহাদুর' উপাধি লাভ করেন। কিন্তু পরে ইংরাজদের সঙ্গে মতানৈক্যের ফলে ইনি ডাক-বিভাগের সর্বোচ্চ পদ লাভ করতে পারেননি।

বাল্যকাল থেকেই দীনবন্ধু সাহিত্য-রচনায় ব্রতী হন। ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ-প্রভাকর'-এ তিনি ছাত্রাবস্থায় কবিতা লিখতেন। সেখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে কবিতা-যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। পরবর্তী কালে নাট্যকার হিসাবে তিনি খ্যাতি অর্জন

করেন। তাঁর প্রথম নাটক 'নীলদর্পণ' (১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ) এদেশে ইংরাজ নীলকরদের অত্যাচারের মুখোস খুলে দিয়েছিল। এই নাটকটি বাংলা দেশে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তাঁর অন্যান্য নাটকগুলির মধ্যে 'নবীন তপস্বিনী', 'সধবার একাদশী', 'লীলাবতী', 'জামাই বারিক', 'কমলে কামিনী' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তাঁর 'দ্বাদশ কবিতা' ও 'সুরধুনী কাব্য' কাব্য-গ্রন্থ। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর দীনবন্ধুর মৃত্যু হয়।

বাল্যকালে দীনবন্ধু এবং বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে কবিতা-যুদ্ধ হলেও সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম কার্যভার গ্রহণ করে যশোহরে গেলে সেখানে দীনবন্ধুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। দীনবন্ধু তখন ঐ ডিভিসনের পোস্ট অফিস :সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন।

"বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু" প্রবন্ধে শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই দুই বন্ধুর সম্পর্কের কিছু কিছু ঘটনা প্রকাশ করেছেন।

"বঙ্গদর্শনে বিদায় প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—'দীনবন্ধু আমার সাহিত্যের সহায়, সংসারের সুখদুঃখের ভাগী।' লিখিবার অবসর পাইলে দীনবন্ধুও নিশ্চয়ই ঐ কথাই বলিতেন। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে যশোরে ইহাদের প্রথম চাক্ষুষ আলাপের পর ইহারা প্রধান লেখকের ন্যায় কলম ধরিলেন, উভয়ে যেন পরামর্শ করিয়া লিখিতে বসিলেন, ফলতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম তিনখানি পুস্তক দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা ও মৃণালিনী দীনবন্ধুর মতামত লইয়া প্রচারিত হইয়াছিল। বিষবৃক্ষ প্রচারের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি সেই সময় দীনবন্ধুব মৃত্যু হয়। দীনবন্ধুর সমস্ত পুস্তক বঙ্কিমচন্দ্রের মতামত লইয়া প্রচারিত হইয়াছিল। 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' পুস্তকখানি প্রচার করিতে বঙ্কিমচন্দ্র নিষেধ করিয়াছিলেন, সেজন্য উহা অনেক দিবস অপ্রকাশিত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত দীনবন্ধু জীবনীতেও উহার উল্লেখ আছে। দীনবন্ধুর 'লীলাবতী'তে বঙ্কিমচন্দ্র স্থানে স্থানে লিখিয়াছিলেন, বন্ধুত্ব হিসাবে, আমোদ করিয়া লিখিয়াছিলেন কিন্তু হাস্যরসে দীনবন্ধুর লেখার সহিত সুর মিশিয়াছিল কিনা, জানি না। বঙ্কিমচন্দ্রের পুস্তকে কিন্তু দীনবন্ধু কখনও কিছু লেখেন নাই।"

"বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক বন্ধু ছিল, দীনবন্ধুর অসংখ্য বন্ধু ছিল, কিন্তু ইহারা দুইজনে পরস্পরের প্রাণতুল্য বন্ধু ছিলেন। যখন বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হয় তখন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'সাহিত্যের সহায়' দীনবন্ধুর নিকট বিশেষ সাহায্য পাইবেন এমন ভরসা করিয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্গদর্শন প্রকাশের অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইল। এই সময়ে তাঁহার জন্য বঙ্গ সমাজের চারিদিক হইতে ক্রন্দনরোল উঠিল, কেহ বা সংবাদপত্রে, কেহ বা মাসিক

পত্রিকাতে, কেহ বা কবিতাতে কাঁদিতে লাগিলেন। কিন্তু বঙ্গদর্শন মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল, ইহা অনেকে লক্ষ্য করিয়া অনেক কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু দীনবন্ধুর শোকে বঙ্গদর্শনের যে কণ্ঠরোধ হইয়াছিল তাহা কেহ বুঝিতে পারে নাই। প্রায় তিন বৎসর পরে বঙ্গদর্শন যখন বিদায় গ্রহণ করিল তখন বঙ্কিমচন্দ্র ঐ বিদায় প্রবন্ধে বঙ্গদর্শন-লেখকগণের নিকট কৃতজ্ঞতাস্বীকার করিতে গিয়া দীনবন্ধুর কথা উত্থাপন করেন। কিন্তু কিরূপ কাতরতার সহিত উত্থাপন করিয়াছিলেন তাহা নিম্নের কয়েক ছত্রে প্রকাশ পাইবে।

"আর একজন আমার সহায় ছিলেন—সাহিত্যে আমার সহায়, সংসারে আমাব সুখ-দুঃখের ভাগী—তাঁহার নাম উল্লেখ করিব মনে করিয়াও উল্লেখ করিতে পারিতেছি না। এই বঙ্গদর্শনের বয়ঃক্রম অধিক হইতে না হইতেই দীনবন্ধু আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার জন্য তখন বঙ্গসমাজ রোদন করিতেছিল, কিন্তু এই বঙ্গ-দর্শনে তাঁহার নামোল্লেখও করি নাই। কেন, তাহা কেহ বুঝে না। আমার যে দুঃখ, কে তাহার ভাগী হইবে? কাহাব কাছে দীনবন্ধুর জন্য কাঁদিলে প্রাণ জুড়াইবে? অন্যের কাছে দীনবন্ধু সুলেখক, আমার কাছে প্রাণতুল্য বন্ধু—আমার সঙ্গী। সে শোকে পাঠকের সহৃদয়তা হইতে পাবে না বলিয়া, তখনও কিছু বলি নাই, এখনও আব কিছু বলিলাম না।"

"বস্তুতঃ আমরা সকলেই লক্ষ্য করিতাম দীনবন্ধুর মৃত্যুর পব হইতে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কথা উত্থাপন করিতেন না। যদি কেহ দীনবন্ধুর কথা বা তাঁহার রহস্য পটুতার কথা কহিত, তখনই বঙ্কিমচন্দ্রের একটা পবিবর্ত্তন হইত, তিনি মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিতেন। ইহাতে আমরা বুঝিতাম যে তিনি দীনবন্ধুর শোক ভুলিতে পারেন নাই, দীনবন্ধুব স্মৃতি তাঁহার কষ্টকর হইয়াছিল। প্রায় ৮।৯ বৎসর পরে 'আনন্দমঠে'র উৎসর্গ-পত্রে 'কুমারসম্ভব' হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন, 'হে ক্ষণভিন্ন সুহৃদ আমাকে ফেলিয়া কোথায় গেলে!' বঙ্কিমচন্দ্র তাই বলিয়াছিলেন—দীনবন্ধু 'আমার কাছে প্রাণতুল্য বন্ধু।'—বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয় বড় স্নেহপ্রবণ ছিল।"

দেশমুখো। একটি গ্রামের নাম। কোন্নগরের সন্নিকটে হুগলী জেলায় এই গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামে বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বপুরুষেরা বাস করতেন।

নফরচন্দ্র ভট্টাচার্য। "বঙ্কিমচন্দ্রের বহরমপুরে অবস্থানকালে নফরবাবু তথায় মুন্সেফ ছিলেন। নফরবাবু আজও জীবিত আছেন কিনা জানি না। তাঁহার পুরা নাম—নফরচন্দ্র ভট্টাচার্য। এই নফরবাবুর সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের বেশ একটু প্রণয় হইয়াছিল। একদা স্থানীয় কোন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের বাড়ীতে নফরবাবু ও বঙ্কিমচন্দ্রের

নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। উভয়ে যথাসময়ে তথায় উপস্থিত হইলেন। সেখানে গিয়া দেখেন, সহরের অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ ব্যক্তি তথায় উপস্থিত রহিয়াছেন।

সভাতে বসিয়া নফরবাবু একটা প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন; সেটা ডারউইনের থিয়রি। অন্য লোকে কেহ কিছু বলিল না দেখিয়া নফরবাবু এই থিয়রি সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া যাইতে লাগিলেন। যাঁহারা ডারউইন পড়িয়াছিলেন, তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিলেন, নফরবাবু, ডারউইন কোনকালে পড়েন নাই। কিন্তু নফরবাবুর বক্তৃতার বিরাম নাই। তিনি ক্রমেই পঙ্কে নিমজ্জিত হইতে লাগিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি নফরবাবুকে নিরস্ত হইতে ইঙ্গিতে নিষেধ করিলেন। নফরবাবু তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। অবশেষে বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, 'যাহা জান না, পড় নাই, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিও না।'

নফরবাবু নীরব হইলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তখন ডাবউইনের থিয়রি, তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ শক্তিশালী ভাষায় সমবেত ব্যক্তিবৃন্দকে বুঝাইতে লাগিলেন। নফরবাবু সেদিন আর একটিও কথা কহেন নাই,—নীরবে আহারাদি সমাপন করিয়া একাকী প্রস্থান করিয়াছিলেন।

কিছুদিন পরে বঙ্কিমচন্দ্রকে আক্রমণ করিয়া 'সোমপ্রকাশে' এক দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল। বঙ্কিমচন্দ্র সন্দেহ করিলেন, বহবমপুর হইতে কোন ব্যক্তি এই প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইয়াছে। অনুসন্ধানে জানিলেন, নফরবাবুবই কাজ। একদিন তিনি নির্জ্জনে নফরবাবুকে ধরিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, 'নফববাবু, তুমি কি সোমপ্রকাশে প্রবন্ধ লিখিয়াছ?'

নফরবাবু একটুও ইতস্ততঃ না করিয়া তদ্দণ্ডে অপরাধ স্বীকার করিলেন; এবং দুঃখ প্রকাশ করিয়া ক্ষমা চাহিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বিগলিত চিত্তে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। তদবধি তাঁহাদের প্রণয় অক্ষুণ্ণ ছিল।" (বঙ্কিম-কাহিনী)

নবীনচন্দ্র দাস। সাহিত্যসাধক চরিতমালায় আছে—"যাঁহার হস্তে বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ হয়, তাঁহার নাম নবীনচন্দ্র দাস (১-৫-১৮৫০ তারিখে বেতন ১০০৲, বয়স ২৭)। তিনি এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অল্পায়ু যদুনাথ দাস হুগলী কলেজেরই অতি প্রসিদ্ধ কৃতী ছাত্র ছিলেন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে নবীনচন্দ্র ১৫০৲ বেতনে নবপ্রতিষ্ঠিত বীরভূম স্কুলের হেডমাষ্টার নিযুক্ত হন এবং পরবর্ত্তী কালে বহু বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকতা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। ইনি তন্তুবায়-জাতীয় ছিলেন।"

নবীনচন্দ্র সেন। কবি নবীনচন্দ্র সেনের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয় ছিল।

চট্টগ্রাম জেলার নোয়াপাড়া গ্রামে ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারি নবীনচন্দ্র সেনের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম গোপীমোহন সেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে তিনি বি এ. পাস করেন। কিছুদিন হেয়ার স্কুলে শিক্ষকতা করবার পর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেটের চাকুরি পান। দীর্ঘ ছত্রিশ বৎসর তিনি ঐ কাজ করে অবসরগ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থায় 'এডুকেশন গেজেট'-এ কোন এক 'বিধবা কামিনীর প্রতি' নামক কবিতা রচনা করে খ্যাতিলাভ করেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতাগ্রন্থ 'অবকাশরঞ্জিনী' (১২৭৮ সাল)। 'পলাশীর যুদ্ধ' ঐতিহাসিক কাব্য রচনা করে তিনি খ্যাতিলাভ করেন। কৃষ্ণ-জীবন অবলম্বনে 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' ও 'প্রভাস' নামক তিনি ত্রয়ী মহাকাব্য রচনা করেন। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের নাম 'রঙ্গমতী', 'অমিতাভ', 'অমৃতাভ' প্রভৃতি। তিনি 'আমার জীবন' নামে গদ্যে এক বিরাট আত্মজীবনী রচনা করেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারি নবীনচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

নবীনচন্দ্র সেন "আমার জীবনে" বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের ঘটনাটি এরূপভাবে ব্যক্ত করেছেন—"তখন অপরাহ্ন পাঁচটা। সন্ধ্যা রবির মৃদুল কিরণে চুঁচুড়ার কলেজের। হুগলীর ইমামবাড়ির এবং গঙ্গাতীরস্থ অন্যান্য প্রাসাদাবলীর শীর্ষদেশ সুবর্ণে মণ্ডিত হইয়াছে। নদীগর্ভ হইতে সে শোভা যেন একখানি চিত্রের মধ্যে দেখা যাইতেছিল। অর্দ্ধগঙ্গার বক্ষে নগরের ছায়া পড়িয়াছিল এবং অপরার্দ্ধের বক্ষে ক্ষুদ্র হিল্লোলরাশি রবির মৃদুল কিরণে জ্বলিতেছিল, হাসিতেছিল, নাচিতেছিল। মনে পড়িল—

'হাসিছে একটি রবি পশ্চিম গগনে
ভাসিছে সহস্র রবি জাহ্নবী জীবনে।'

কল্পনার চক্ষে যে শোভা দেখিয়াছিলাম, আজ তাহা চর্ম্মচক্ষে দেখিলাম। নদীগর্ভে নগরের ছায়া, এবং ভাগীরথীর এই শোভা দেখিয়া আমরা দুজনেই উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে গাইতেছিলাম,—

'পড়ি জল নীলে ধবল সৌধ ছবি,
অনুকারিছে নভ অঞ্চল ও।'

গাইতে গাইতে নৌকা নৈহাটির ঘাটে পঁহুছিল এবং আমরা বঙ্কিমবাবুর বাড়ির দিকে চলিলাম। রেলের লাইন পার হইবামাত্র সঞ্জীববাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্রের ওলাওঠা হইয়াছিল বলিয়া তিনি প্রাতে ষ্টেশনে যাইতে পারেন নাই বলিয়া, আমার কাছে যথেষ্ট ক্ষমা চাহিলেন। তিনি আমাকে দক্ষিণহস্তে

আদরে জড়াইয়া একটি ঘরে লইলেন, এবং ফরাস বিছানায় বসাইয়া বঙ্কিমবাবুকে খবর দিলেন। শুনিলাম সেটি বঙ্কিমবাবুর বৈঠকখানা। একটি শিবালয়ের সঙ্গে লাগানো একটি হল, এবং তাহার অপর পার্শ্বে দুটি কক্ষ। হলের চারিদিকে প্রাচীরের কাছে কাছে দুই চারিখানি কৌচ ও কুসনওয়ালা চেয়ার, ফরাস বিছানার উপর ছিল। প্রাচীরের গায়ে কয়েকখানি ছবি, এবং হলের এক কোণায় একটি হারমোনিয়ম; আমি কক্ষের সজ্জা দেখিতে দেখিতে সঞ্জীববাবুর সঙ্গে কথা কহিতেছিলাম। অক্ষয়বাবু পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। অকস্মাৎ পশ্চাৎ হইতে কে আসিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিল। আমি চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম, একটি একহারা গৌরবর্ণ পুরুষ। মাথায় কুঞ্চিত ও সজ্জিত কেশ, চক্ষু দুটি নাতিক্ষুদ্র ও নাতিবৃহৎ, কিন্তু সমুজ্জ্বল। নাসিকা উন্নত, অবরোধ ক্ষুদ্র ও রহস্যব্যঞ্জক ঈষৎ হাসিযুক্ত; তাহার উপর দুই প্রকাণ্ড গোঁফের তাড়া,—অগ্রভাগ কুঞ্চিত। দীর্ঘ বঙ্কিম গ্রীবা, মুখও ঈষৎ দীর্ঘ এবং সুগঠিত। অঙ্গে বাহু পর্যন্ত একটি সামান্য পিরান, এবং পরিধানে নয়নসুকের ধুতি; দেখিবামাত্রই মূর্তিখানি সুন্দর, সতেজ এবং প্রতিভান্বিত বোধ হয়। সঞ্জীববাবু হাসিয়া বলিলেন—'বলুন দেখি লোকটি কে ?' আমি ঈষৎ হাসিয়া উঠিয়া প্রণাম করিতে যাইতেছিলাম, তিনি আমাকে নমস্কার করিতে অবসর না দিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং হাসিয়া বলিলেন—'সত্য সত্যই বলুন দেখি আমি কে ?' আমি হাসিয়া বলিলাম, 'বঙ্কিমবাবু'। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনি আমাকে কিরূপে চিনিলেন ?' আমি হাসিয়া কহিলাম—'শিকারী বিড়ালের গোঁফ দেখিলেই চেনা যায়।' সকলে হাসিয়া উঠিলেন, এবং বঙ্কিমবাবু বলিলেন—'বটে ! আমার গোঁফের উপরই আপনার প্রথম নজর পড়িয়াছে ?' আমি বলিলাম—'পড়িবার কথা নয় কি ?' · আবার সকলে হাসিলেন, এবং সঞ্জীববাবু বলিলেন—"দেখা যাক কার জিৎ হয়'। তখন বঙ্কিমবাবু বলিলেন—'ছোকরাদের চিরকাল জিৎ হইয়া থাকে। সত্য সত্যই আপনি যে এত ছেলেমানুষ, আপনার লেখা দেখিয়া ও পত্র পড়িয়া মনে করি নাই।' সঞ্জীববাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন—'আপনি ইঁহার কবিতা পড়িয়াছেন ; ইংরাজি পত্র দেখেন নাই। আমি এমন সুন্দর ইংরাজি অতি অল্প বাঙ্গালীরই দেখিয়াছি।" ··তাহার পর বঙ্গসাহিত্যের কথা 'পলাশীর যুদ্ধ' 'বৃত্রসংহার' ইত্যাদির কথা, 'বঙ্গদর্শনে' উহার প্রথমভাগের সমালোচনার কথা উঠিল। বঙ্কিমবাবু বলিলেন—'এ সমালোচনার জন্য অনেকে আমাকে বিদ্রূপ করিতেছে। তোমার কাছে বৃত্রসংহার কেমন লাগিয়াছে ? আমি বলিলাম—'আমি হেমবাবুর শিষ্য স্থানীয়, আমার আবার মত কি ? আমার বেশ লাগিয়াছে।' অক্ষয়বাবু

নাছোড়বান্দা। তিনি বলিলেন—'মন্দ কাহারও লাগে নাই। তবে 'পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ' এ লাইনে যে কি অদ্ভুত কবিত্ব আছে, অনেকে বুঝে না। এ সমালোচনায় আপনার অগৌরব হইয়াছে।' বঙ্কিমবাবু বড় অপ্রতিভ হইয়া আমার কাছে আপীল করিলে, আমি তাঁহার মত সমর্থন করিয়া আপীল ডিক্রি দিলাম। সন্ধ্যা হইল, ভৃত্য আসিয়া বঙ্কিমবাবুর সম্মুখে তুটি মোমবাতির শেজ রাখিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সুরাদেবী অধিষ্ঠাতা হইলেন, এবং অক্ষয়বাবু ছাড়া আমরা তিনজন তাঁহার সেবা আরম্ভ করিলাম। বঙ্কিমবাবু আমার পড়া শুনিতে চাহিলেন, আমি তাঁহার পড়া শুনিতে চাহিলাম। উভয়ের গ্রন্থাবলী আসিয়া উপস্থিত হইল। জিদ করিয়া প্রথম আমার একটা কবিতা পড়াইলেন, এবং পড়ার সকলেরই বড় প্রশংসা করিলেন। তাহার পর তিনি কি পড়িবেন, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। অক্ষয়বাবু আমাকে আগেই শিখাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমি বলিলাম—'বিষবৃক্ষ'। তিন—'কোনস্থানে পড়িব?' আমি—'যে স্থান আপনার অভিরুচি।' তিনি 'বিষবৃক্ষ' খুলিয়া, যেখানে কমলমণির কাছে সূর্যমুখী তাঁহার পতিপ্রাণতা দেখাইয়া পত্র লিখিয়াছিলেন, সে স্থান পড়িতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পড়িয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন—'বিষবৃক্ষ' আমি পড়িতে পারি না। তুমি অন্য কিছু শুনিতে চাও ত পড়ি।' আমাকে অক্ষয়বাবু সত্যই বলিয়াছিলেন যে, বঙ্কিমবাবুর স্ত্রীর চরিত্রই তাঁহাকে 'নভেলিষ্ট' করিয়াছে, তিনিই সূর্যমুখী। তখন বঙ্কিমবাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণবাবু আসিলেন। আমি 'মৃণালিনী' গানগুলি শুনিতে চাহিয়াছিলাম। পূর্ণবাবু হারমোনিয়মেব সঙ্গে তাহার তুই একটি গান গাহিলেন। কানে যেন অমৃতবর্ষণ করিল।"

বঙ্কিমচন্দ্রও 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশে নবীনচন্দ্রের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন।

নাগোয়া বা **নেগুয়াঁ** (মেদিনীপুর)॥ কাঁথির সন্নিকটে নাগোয়া মহকুমায় বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারি কর্মে নিযুক্ত হন। স্থানটি অস্বাস্থ্যকর হওয়াব জন্য পরবর্তী কালে কাঁথিতে মহকুমা স্থানান্তরিত হয়ে যায়। এখানে থাকাকালেই বঙ্কিমচন্দ্রের মনে 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাস রচনার পরিকল্পনা জাগে।

পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ সহোদর। তিনি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের চেয়ে তিন-চার বছরের ছোট। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিচারণ কবে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছেন। (দ্রঃ সোমেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত "কাছের মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র")। তাঁর তুই পুত্রের নাম বিপিন ও নলিন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যচর্চার সঙ্গে পূর্ণচন্দ্রের কিরূপ যোগাযোগ ছিল, তা তিনি এক স্থানে বর্ণনা করেছেন:

"একদিন বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণকান্তের উইল চুরি পরিচ্ছেদ লিখিতেছিলেন, এমন সময় পাঁচটার ট্রেণে কলিকাতা হইতে তাঁহার দুইটি বন্ধু আসিলেন, তিনি কাগজ কলম ফেলিয়া উঠিলেন, আমি তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম, 'কি লিখিতেছিলেন বলিয়া দিন, আমি উহা লিখিব।' তিনি আমার আবদার রক্ষা করিয়া হাসিতে হাসিতে লিখিতে অনুমতি দিয়া ঐ পরিচ্ছেদে যাহা লিখিতে হইবে বলিয়া দিলেন। আমি তখন ঐ হাসির অর্থ বুঝিতে পারি নাই, পরে লিখিতে বসিয়া বুঝিলাম—দেখিলাম 'ব্রহ্মার বেটা বিষ্ণু আসিয়া বৃষভারূঢ় মহাদেবের কাছে এক কৌটা আফিং কর্জ্জ লইয়া এই দলিল লিখিয়া দিয়াই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বন্ধক রাখিয়াছেন, মহাদেব গাঁজার ঝোঁকে ফোর ক্লোজ করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন।' এই পর্যন্ত লিখিয়াছেন,—এই স্বরে লেখা আমার অসাধ্য বুঝিয়া আমি এই স্থানে 'রোহিণীকে আনিয়া কৃষ্ণকান্তের সহিত সাক্ষাৎ করাইলাম এবং তাঁহাদেব উভয়ের কথোপকথন আমাব সাধ্যমত লিখিলাম।' পরদিন বন্ধুগণ চলিয়া গেলে বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণকান্তের উইল' লিখিতে বসিয়া ঐ পরিচ্ছেদে আমার লেখার প্রথমাংশ অর্থাৎ রোহিণীর সহিত কৃষ্ণকান্তেব আফিমের ঝোঁকে কথোপকথন নূতন কারয়া লিখিলেন। আমাব লেখার অবশিষ্ট অংশতে 'দোমেটেমো' করিতে হয় নাই, তবে এক আধ স্থানে 'মাটী' লাগাইযাছেন।"

প্রেসিডেন্সী কলেজ। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রতিষ্ঠিত কোলকাতার হিন্দু কলেজ ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুন প্রেসিডেন্সী কলেজে রূপলাভ করে।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দেব এপ্রিল মাসে হুগলী কলেজ থেকে বঙ্কিমচন্দ্র সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা দেন এবং সর্ববিষয়ে কৃতিত্ব দেখানর ফলে দু'বৎসবেব জন্য মাসিক কুড়ি টাকা বৃত্তি পান। এব পর তিনি থার্ড ইয়ারে উন্নীত হন। কিন্তু কিছুদিন পড়াশোনার পর তিনি ট্রান্স্ফাবের জন্য দরখাস্ত করেন। জুলাই মাসের ১২ই তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজ ত্যাগ করেন। ঐ বৃত্তির টাকায় তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন-বিভাগে ভর্তি হন। বাড়ী থেকে নিত্য কোলকাতায় যাতায়াত করার অসুবিধার জন্য তিনি বাড়ীভাড়া কবেন এবং সঙ্গে ভৃত্য ও পাচক নিয়ে কোলকাতায় বাস করতে থাকেন।

আইন-বিভাগে পড়তে পড়তে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বঙ্কিমচন্দ্র এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিলেন। এই পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে উন্নীত হন। পর বৎসর ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বি. এ. পরীক্ষা সুরু হল। বঙ্কিমচন্দ্র এই পরীক্ষা দিলেন। সেবার মোট ১০ জন ছাত্র পরীক্ষা দেন। কিন্তু কেউই সববিষয়ে পাস করতে পারেননি। "বঙ্কিমচন্দ্র ও যদুনাথ ছয়টি বিষয়ের মধ্যে

পাঁচটিতে কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন, কিন্তু ষষ্টটিতে তাঁহারা উভয়েই অনধিক ৭ নম্বর কম পাইয়া ফেল হন। ২৪ এপ্রিল ১৮৫৮ তারিখে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের অধিবেশনে পরীক্ষকমণ্ডলীর সুপারিশ অনুযায়ী ঐ দুই জনকে ৭ নম্বর 'গ্রেস' দিয়া বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলিয়া বিবেচিত করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়।"

বি. এ. পাস করার পরও বঙ্কিমচন্দ্র আইন পড়ছিলেন। কিন্তু তাঁর ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ পাওয়ার পরই তিনি ঐ কলেজ ছাড়েন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট পর্যন্ত তিনি কলেজে নিয়মিত হাজিরা দেন। চাকুরি করাকালীন ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি এল পরীক্ষা দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন।

ফিলিপস. এইচ. এ ডি (H. A. D. Phillips) "হুগলীতে অবস্থানকালে বঙ্কিমচন্দ্র একটি বন্ধু লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম, H. A. D. Phillips। তিনি বর্দ্ধমানে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ফিলিপস্ শুধু যে একজন দক্ষ সিবিলিয়ন ছিলেন, তা' নয়—তিনি নানা ভাষাভিজ্ঞ মহাপণ্ডিত ইংরাজ-কুলপ্রদীপ ছিলেন। এই ফিলিপস্ সাহেবই কপালকুণ্ডলা ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিয়া যশ কিনিয়া গিয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার পাণ্ডিত্য ও সাহিত্যানুরাগ জগতে প্রচারিত হইবার পূর্ব্বেই তিনি অকালে লোকান্তরিত হইলেন।" (বঙ্কিম-জীবনী)

বঙ্কিমচন্দ্রের কোলকাতার বাড়ী বা পটলডাঙ্গার বাড়ী। "বঙ্কিমচন্দ্র কলিকাতায় একটি বাটী ক্রয় করিয়া তথায় জীবনের শেষ কয়েক বৎসর বাস করেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে এই বাটীতে উঠিয়া আসেন। বাটীটি পটলডাঙ্গায় মেডিকেল কলেজের সম্মুখে অবস্থিত। ইহা এক্ষণে 'বঙ্কিম-আশ্রম' নামে সাধারণ্যে পরিচিত। বড়লাট লর্ড কর্জ্জনের শাসনকালে গভর্মেণ্ট হইতে একটি প্রস্তরফলক বঙ্কিম-আশ্রমের প্রাচীরে আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে লেখা আছে,—এই স্থানে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র বাস করিতেন। জন্ম—সন ১৮৩৬, মৃত্যু—সন ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ।" (বঙ্কিম-জীবনী)

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথমা ও দ্বিতীয়া স্ত্রী। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বিবাহ হয়। তখন তাঁর বয়স ১১ বৎসর এবং স্ত্রীর বয়স ৫ বৎসর। স্ত্রীর পিত্রালয় ছিল কাঁটালপাড়ার অন্তর্গত নারায়ণপুর গ্রামে। তিনি অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন। প্রথমা পত্নীর নাম মোহিনীদেবী। "বঙ্কিম-কাহিনী"তে এই স্ত্রীর সম্বন্ধে শচীশচন্দ্র একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন।—"বালিকার যখন নয় বৎসর বয়স, তখন তিনি অনবধান প্রযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্রের দুই একটি কবিতার পাণ্ডুলিপি ছিঁড়িয়া পুতুলের শয্যা রচনা করেন। বঙ্কিমচন্দ্র যখন দেখিলেন, তাঁহার শোণিত-তুল্য

পাণ্ডুলিপি এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত, তখন তিনি সাতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, 'তুমি আমার জামা কাপড় ছিঁড়িয়া পুতুলকে শোয়ালে না কেন?' সঙ্কুচিতা বালিকা উত্তর করিল, 'আমি কাগজগুলো আটা দিয়ে জুড়ে দিচ্ছি।' বঙ্কিমচন্দ্র অবজ্ঞার সহিত বলিলেন, 'জোড়া কাগজ লইয়া আমি গলায় গাঁথিব? তুমি কি মনে কর, আমি আর লিখিতে পারি না! আজই লিখিব।'

বঙ্কিমচন্দ্র নির্জ্জন কক্ষে গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া লিখিতে বসিলেন। সেদিন রাত্রি এক প্রহরের পূর্ব্বে কেহ তাঁহার সাক্ষাৎ পায় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র যখন দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিলেন, তখন তাঁহার হাতে কাগজের তাড়া। সেই তাড়া, অনুতপ্ত বালিকার অঙ্কে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, 'দেখ, লিখেছি কিনা।'

বাইশ বছর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র যখন কর্মোপলক্ষে যশোহরে ছিলেন, তখন প্রথমা স্ত্রী ষোল বৎসর বয়সে জ্বররোগে দেহত্যাগ করেন। এই স্ত্রীর মৃত্যুতে বঙ্কিমচন্দ্র সাতিশয় দুঃখিত হয়েছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের পুনর্বার বিয়ে করার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু পিতামাতার ইচ্ছানুসারে তাঁকে সম্মত হতে হয়। তখন দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র ও সঞ্জীবচন্দ্র মেয়ে দেখতে বের হন। হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়াতে একটি মেয়েকে দেখে বঙ্কিমচন্দ্রের পছন্দ হল। প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর আট মাস পরে তিনি দ্বিতীয়া স্ত্রীকে ঘরে আনেন। বঙ্কিমচন্দ্র জীবনসঙ্গিনী বলতে এঁকেই বুঝতেন। তাঁর সাহিত্য-জীবনে এই স্ত্রীর প্রভাব আছে বলে অনেকে মনে করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পরও ইনি কিছুদিন বেঁচেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয়া পত্নীর নাম রাজলক্ষ্মী দেবী।

বঙ্কিমচন্দ্রের মাতা। "বঙ্কিমচন্দ্রের মাতা সাতিশয় স্থূলাঙ্গী ও কৃষ্ণবর্ণা ছিলেন। কিন্তু এমন করুণাময়ী শান্ত মূর্ত্তি জগতে অল্পই দৃষ্ট হয়।" (বঙ্কিম-জীবনী)।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ বঙ্কিমচন্দ্র যখন বহরমপুরে ছিলেন, তখন তাঁর মাতা পরলোক-গমন করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মাতার নাম দুর্গাদেবী।

বহরমপুর। বঙ্কিমচন্দ্র কর্মোপলক্ষে বেশ কিছুদিন বহরমপুরে ছিলেন। বহরমপুর মুর্শিদাবাদ জেলার মহকুমা ও জেলার সদর শহর এবং গঙ্গাতীরে অবস্থিত। কোলকাতা থেকে রেলপথে ১১৫ মাইল। এখানকার কাঁসার বাসন ও হাতীর দাঁতের শিল্প বিখ্যাত। প্রাচীন শিল্প ও সাহিত্য-চর্চার কেন্দ্র হিসাবেও সুনাম আছে।

বারাসত। সরকারী কাজে বঙ্কিমচন্দ্র দু'বার বারাসতে নিযুক্ত হন। প্রথমবার বারাসতে নিযুক্ত হওয়ার তারিখ ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মে। দ্বিতীয়বার আসেন ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মে।

বারাসত চব্বিশ পরগনা জেলার একটি মহকুমা, থানা ও শহর। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এখানে বহু ইংরেজ বণিকের বাগানবাটী ও সৈনিক বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মচারীদের শিক্ষার জন্য কলেজ ছিল। কোলকাতা থেকে রেলপথে ১৪ মাইল।

বারুইপুর। বঙ্কিমচন্দ্র বারুইপুরে প্রথম নিযুক্ত হন ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মার্চ। কিছু ছুটি এবং অল্প কিছুদিনের জন্য কয়েক স্থানে যাওয়া ছাড়া তিনি এখানে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ছিলেন।

বারুইপুর ২৪-পরগনা জেলার আলিপুর মহকুমার একটি থানা ও শহর। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এটি স্বতন্ত্র মহকুমা ছিল। কোলকাতার ১৬ মাইল দক্ষিণে এই শহর অবস্থিত।

বিশ্বম্ভর ভট্টাচার্য। বঙ্কিমচন্দ্রের কুলপুরোহিত। এঁর কাছেই পাঁচ বৎসর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেখড়ি হয়।

বিহারীলাল চক্রবর্তী। কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী কোলকাতার নিমতলা পল্লীতে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে মে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম দীননাথ চক্রবর্তী। সংস্কৃত কলেজে কিছুদিন পড়াশোনা করার পর ইনি কলেজ ছেড়ে দেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি সাহিত্য এবং সঙ্গীত চর্চা করতেন। 'পূর্ণিমা', 'সাহিত্যসংক্রান্তি', 'অবোধ বন্ধু' প্রভৃতি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'বঙ্গসুন্দরী', 'সঙ্গীতশতক', 'সারদামঙ্গল' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আধুনিক বাংলা গীতিকাব্যের জনকহিসাবে বিহারীলালের নাম করা হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালকে গুরু বলে স্বীকার করেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ও বিহারীলালের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি "বঙ্কিমচন্দ্র"-প্রবন্ধে উভয় লেখকের উভয়ের প্রতি মনোভাব সম্বন্ধে লিখেছেন —"বেহারীবাবু বঙ্কিমবাবুর প্রতি বড় প্রসন্ন ছিলেন না। আমি মনে করিয়াছিলাম, বেহারীবাবুর কাছে যেমন বঙ্কিমবাবুর কথা শুনি, বঙ্কিমবাবুর মুখেও হয়ত তত উচ্চগ্রামে না হউক—কিছু শুনিব। কিন্তু বঙ্কিমবাবু বিহারীবাবুর দুই একটি গল্প শুনিয়া বলিলেন, জীবনে ও poet! ইহাকেই বলে কবি। খুব সদানন্দ লোক ত!"

ভদ্রক (কটক)। কর্মোপলক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র এখানে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই মে আসেন। ভদ্রক উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলার মহকুমা, থানা ও শহর। মহকুমার আয়তন ১,০৭৬ বর্গমাইল।

মালদহ। মালদহে রোডসেসের কাজে অস্থায়িভাবে বঙ্কিমচন্দ্র আসেন ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে অক্টোবর। এখানে তিনি বেশীদিন থাকেননি।

মালদহ বা মালদা পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলা ও শহর। অখণ্ড বঙ্গে এটি রাজসাহী বিভাগের জেলা ছিল। এই জেলায় ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গৌড় ও পাণ্ডুয়া অবস্থিত।

মুরলী। বঙ্কিমচন্দ্রের খানসামা। "বঙ্কিমবাবুর মৃত্যুর পর সে ভবানীপুরে উকীল হেমেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের বাড়িতে ছিল।" (সুরেশচন্দ্র সমাজপতি : বঙ্কিমচন্দ্র)

যদুনাথ বসু। ইনি বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে বি. এ. (কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বি. এ. পরীক্ষা) পরীক্ষায় একমাত্র উত্তীর্ণ প্রতিযোগী।

যশোহর। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম কর্মস্থল। এখানে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টররূপে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট নিযুক্ত হন।

যশোহর পূর্বপাকিস্তানের জেলা। দেশ-বিভাগের পূর্বে এই জেলার আয়তন ছিল ২,৯০২ বর্গমাইল। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে বনগাঁ ও গাইঘাটা থানা দুটি পশ্চিমবঙ্গের ২৪-পরগনা জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। যশোহর শহর কোলকাতা থেকে ৭৪ মাইল।

যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা। "যাদবচন্দ্র ১১৯৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার দুই বিবাহ। প্রথমা স্ত্রী নিঃসন্তান অবস্থায় গতাসু হইয়াছিলেন।

যাদবচন্দ্র চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া পদব্রজে যাজপুরে গমন করেন। সেখানে তাঁহার অগ্রজ সহোদর কাশীনাথ, দারোগাগিরি করিতেন। পুলিসের দারোগা নহে, নিমৃকির দারোগা। যাদবচন্দ্র সেখানে ভাইয়ের কাছে থাকিয়া আরব্য ও পারস্য ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন।"

যাদবচন্দ্রও প্রথমে নিমৃকির দারোগা ছিলেন। শচীশচন্দ্রের মতে, তারপর—"তিনি ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ৬ই নভেম্বর তারিখে রিকেটস্ সাহেবের অনুগ্রহে ডেপুটি কালেক্টরের পদ পাইয়াছিলেন।" কিন্তু 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা' অনুসারে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে যাদবচন্দ্র ডেপুটি কলেক্টর নিযুক্ত হন। "১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে (১৩ মাঘ ১২৮৭) ৮৭ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।"

"বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা তপ্তকাঞ্চন গৌরবর্ণ—দীর্ঘকায়—তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন—মহিমা-মণ্ডিত—তেজঃপুঞ্জ পুরুষ ছিলেন।" বঙ্কিমচন্দ্র পিতাকে অত্যন্ত ভক্তি করতেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাংলার দুই দিক্‌পাল সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে যোগাযোগের সুযোগ হয়েছিল, এটি একটি সৌভাগ্যজনক ঘটনা।

রবীন্দ্রনাথ ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মে (২৫শে বৈশাখ) জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাতা সারদাদেবী। বাল্যকাল থেকেই কবিতা রচনা সুরু করেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই নভেম্বর 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের জন্য নোবেল পুরস্কার পান। কাব্য, উপন্যাস, নাটক, সমালোচনা, প্রবন্ধ,

শিল্প, ছোটগল্প প্রভৃতি সাহিত্যের সর্বশাখাতেই তাঁর বিপুল রচনা উৎকর্ষের চরমসীমায় পৌঁচেছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে শান্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠাতা এবং চিন্তার ক্ষেত্রে মহতী আদর্শের ধারক হিসাবেও তিনি স্মরণীয়। 'বিশ্বভারতী' থেকে প্রকাশিত ২৮ খণ্ড 'রবীন্দ্র রচনাবলী'তে তাঁর বিপুল সাহিত্যসম্ভার সন্নিবেশিত হয়েছে। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয় কবির বাল্যকালেই। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর বৎসর চৈতন্য লাইব্রেরীতে পঠিত রবীন্দ্রনাথের "বঙ্কিমচন্দ্র" শীর্ষক শ্রদ্ধার্ঘ্যটিতে কবি বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রথম দেখার ঘটনাটি এভাবে ব্যক্ত করেছেন।—

"সেদিন লেখকের আত্মীয় পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের নিমন্ত্রণে তাঁহাদের মরকতকুঞ্জে কলেজ-রিয়্যুনিয়ন নামক মিলনসভা বসিয়াছিল। ঠিক কতদিনের কথা ভালো স্মরণ নাই কিন্তু আমি তখন বালক ছিলাম। সেদিন সেখানে আমার অপরিচিত বহুতব যশস্বী লোকের সমাগম হইযাছিল। সেই বুধমগুলীব মধ্যে একটি ঋজু দীর্ঘকায় উজ্জ্বল কৌতুকপ্রফুল্লমুখ গুম্ফধারী প্রৌঢ় পুরুষ চাপকানপরিহিত বক্ষের উপর দুই হস্ত আবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। দেখিবামাত্রই যেন তাঁহাকে সকলের হইতে স্বতন্ত্র এবং আত্মসমাহিত বলিয়া বোধ হইল। আব সকলে জনতাব অংশ, কেবল তিনি যেন একাকী একজন। সেদিন আর কাহাবও পরিচয় জানিবাব জন্য আমার কোনোরূপ প্রযাস জন্মে নাই, কিন্তু তাঁহাকে দেখিযা তৎক্ষণাৎ আমি এবং আমার একটি আত্মীয় সঙ্গী একসঙ্গেই কৌতূহলী হইয়া উঠিলাম। সন্ধান লইয়া জানিলাম তিনিই আমাদের বহুদিনের অভিলষিতদর্শন লোকবিশ্রুত বঙ্কিমবাবু। মনে আছে প্রথম দর্শনেই তাঁহার মুখশ্রীতে প্রতিভার প্রখরতা এবং বলিষ্ঠতা এবং সর্বলোক হইতে তাঁহার একটি সুদূর স্বাতন্ত্র্যভাব আমাব মনে অঙ্কিত হইয়া গিযাছিল। তাহার পর অনেকবার তাঁহার সাক্ষাৎলাভ করিয়াছি, তাঁহাব নিকট অনেক উৎসাহ এবং উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং তাঁহার মুখশ্রী স্নেহের কোমলহাস্যে অত্যন্ত কমনীয় হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু প্রথম-দর্শনে সেই যে তাঁহার মুখে উদ্যত খড়্গের ন্যায় একটি উজ্জ্বল সুতীক্ষ্ণ প্রবলতা দেখিতে পাইয়াছিলাম, তাহা আজ পর্যন্ত বিস্মৃত হই নাই।"

বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হবার পর, মাঝে মাঝে তাঁদের মধ্যে নানা আলোচনা হত। শ্রীকালীনাথ দত্ত এক জায়গায় লিখেছেন—"শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাঙ্গালা লেখা সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবু একদিন এই মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে, তিনি সাধু ভাষায় শব্দ বিন্যাস-করিতে করিতে সহসা এক আধটি প্রচলিত ইতর শব্দ স্বেচ্ছা পূর্বক তন্মধ্যে ব্যবহার করিয়া ভাষার লালিত্য নষ্ট করিয়া ফেলেন। দাদার

লিখন প্রণালী সমর্থন করিবার জন্য কবিবর বাবু রবীন্দ্রনাথ একদিন বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে অনেক বিতণ্ডা করিয়াছিলেন।"

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাব সম্বন্ধে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন—"রবীন্দ্রবাবুর কথা উঠিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁর উপন্যাস কি আপনি পড়িয়াছেন? উত্তর—পড়েছি। স্থানে স্থানে অতি সুন্দর সুন্দর উচ্চদরের লেখা আছে, কিন্তু উপন্যাসের হিসাবে সেটা নিষ্ফল হয়েছে। রবিকে সে কথা আমি বলেছি। উদীয়মান লেখকদের মধ্যে হরপ্রসাদ, তুমি ও রবির মধ্যে আমার বোধ হয় রবি বেশী "গিফ্‌টেড্‌" কিন্তু "পৃকোসাছ্‌", এখনি তার বয়স ২২/২৩, সে কথা সে দিন রবিকে বলেছি।"

রবীন্দ্র-জীবনে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব যে কি গভীর, তা রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বর্ণনা করেছেন। —"বর্তমান লেখকের সৌভাগ্যক্রমে আমাদের সহিত যখন বঙ্কিমের প্রথম সাক্ষাৎকার হয় তখন সাহিত্য প্রভৃতি সম্বন্ধে কোনোরূপ পূর্বসংস্কার আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া যায় নাই এবং বর্তমান কালের নূতন ভাবপ্রবাহও আমাদের নিকট অপরিচিত ও অনভ্যস্ত ছিল। তখন বঙ্গসাহিত্যেরও যেমন প্রাতঃসন্ধ্যা উপস্থিত আমাদেরও সেইরূপ বয়ঃসন্ধি-কাল। বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যে প্রভাতের সূর্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃৎপদ্ম সেই প্রথম উদ্‌ঘাটিত হইল।"

রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্ট "বঙ্গদর্শন" পত্রিকা নবপর্যায়ে কিছুদিন সম্পাদনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রথমদিকের 'বৌঠাকুরাণীর হাট', 'রাজর্ষি' প্রভৃতি উপন্যাসে ইতিহাসের অনুসরণ বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসের অনুস্মৃতির কথা মনে জাগায়। 'চোখের বালি' উপন্যাসকে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষে'র সমস্যার নবরূপায়ণ বলা যেতে পারে। অবশ্য, পরবর্তী কালের রবীন্দ্র-উপন্যাস যে বঙ্কিমচন্দ্রকে ছাড়িয়ে অনেকদূরে গিয়ে পৌঁচেছে সে কথাও সত্য।

"বঙ্কিমচন্দ্র" কবিতায় রবীন্দ্রনাথ অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন।—

"যাত্রীর মশাল চাই রাত্রির তিমির হানিবারে,
সুপ্তিশয্যাপার্শ্বে দীপ বাতাসে নিভিছে বারে বারে।
কালের নির্মম বেগ স্থবির কীর্তিরে চলে নাশি'
নিশ্চলের আবর্জনা নিশ্চিহ্ন কোথায় যায় ভাসি'।
যাহার শক্তিতে আছে অনাগত যুগের পাথেয়
সৃষ্টির যাত্রায় সেই দিতে পারে আপনার দেয়।

তাই স্বদেশের তরে তারি লাগি উঠিছে প্রার্থনা
ভাগ্যের যা মুষ্টিভিক্ষা নহে, নহে জীর্ণশস্যকণা
অঙ্কুর ওঠেনা যার, দিনান্তের অবজ্ঞার দান
আরম্ভেই যার অবসান।
সে প্রার্থনা পূরায়েছ, হে বঙ্কিম, কালের যে বর
এনেছ আপন হাতে নহে তাহা নির্জীব স্থাবর।
নবযুগসাহিত্যের উৎস উঠি' মন্ত্রস্পর্শে তব
চিরচলমান স্রোতে জাগাইছে প্রাণ অভিনব
এ বঙ্গের চিত্তক্ষেত্রে, চলিতেছে সম্মুখেব টানে
নিত্যনব প্রত্যাশায় ফলবান ভবিষ্যৎপানে।
তাই ধ্বনিতেছে আজি সে বাণীর তরঙ্গ কল্লোলে,
বঙ্কিম, তোমার নাম, তব কীর্তি সেই স্রোতে দোলে।
বঙ্গভারতীর সাথে মিলাযে তোমার আয়ুগণি,
তাই তব করি জয়ধ্বনি।"

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরাগী ও 'বঙ্গদর্শনে'ব একজন লেখক। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় নদীযা জেলার ত্বর্গাপুর গ্রামে ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে কৃষ্ণনগর ও পরে সংস্কৃত কলেজে পডাশোনা কবেন। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ., বি. এল. পাস করার পর তিনি বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা করেন। শেষে তিনি বাংলা গভর্নমেণ্টের বাংলা অনুবাদকের কাজও করেন। তিনি অনেকগুলি ভাষা জানতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শনে'র তিনি একজন প্রধান লেখক। 'বাঙ্গালার ইতিহাস' তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। 'মিত্রবিলাপ' নামে একখানি কবিতাপুস্তকও তিনি রচনা করেন। মাত্র ৪১ বৎসর বয়সে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয।

এঁর সম্বন্ধে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি "বঙ্কিমচন্দ্র" প্রবন্ধে লিখেছেন—"বঙ্কিমবাবু বলিলেন, ……'আমি এক রাজকৃষ্ণ ছাড়া কারও লেখা ভাল করে না দেখে প্রেসে দিই নি। রাজকৃষ্ণ বড় সুন্দর বাঙ্গলা লিখতেন। দিব্যি ঝরঝরে বাঙ্গালা। জানতুম তাঁর লেখা প্রুফে একটু কেটেকুটে দিলেই যথেষ্ট হবে।'

* * * *

বঙ্কিমবাবুর রাজকৃষ্ণ স্বনামধন্য, বাঙ্গলার প্রথম ইতিহাসকার শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। বঙ্কিমবাবু তাঁহাকে বড় ভালবাসিতেন। রাজকৃষ্ণবাবুর ধীশক্তির, গবেষণার, রচনার, মধুর পবিত্র চরিত্রের প্রশংসা তাঁহার মুখে অনেকবার শুনিয়াছি,

দুই একবার সেই প্রতিভাদীপ্ত উজ্জ্বল নয়নের কোণে দুই এক বিন্দু অশ্রুর উদ্গমও দেখিয়াছি। রাজকৃষ্ণবাবুর ক্ষুদ্র 'বাঙ্গলার ইতিহাস' বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরব। তাহাই আমাদের ইতিহাসের ভাণ্ডারে প্রথম 'বিধিদত্ত ধন'। তাঁহার নানা প্রবন্ধ বাঙ্গালী এখন পড়েন কিনা জানি না। কিন্তু আমরা এখনও পড়ি। রাজকৃষ্ণবাবুই প্রথমে বিদ্যাপতিকে সাহস করিয়া 'বাঙ্গালী' বলিয়াছেন। বিদ্যাপতি তাঁহার বড় প্রিয় ছিল। রাজকৃষ্ণবাবু বিদ্যাপতির মিথিলাকে তখনকার বাঙ্গলার সামিল করিয়া মৈথিল কবিকে বাঙ্গালী বলিতেন। বঙ্কিমের পতাকামূলে স্বদেশের রত্নোদ্ধারের জন্য যাঁহারা সমবেত হইয়াছিলেন রাজকৃষ্ণ তাঁহাদের অন্যতম। আমরা যেন এইসকল পুণ্যশ্লোককে কখনও না ভুলি। বর্তমানের দীপ্তি অত্যন্ত উজ্জ্বল, মনোরম, সন্দেহ নাই কিন্তু অতীতের অন্ধকারও পবিত্র; অতীতকে আবরণ করিয়া যে যবনিকা বিস্তৃত করিতেছে, তাহার অন্তরালে আমাদের পূর্বগামীদের যত্ন সঞ্চিত রত্ন আছে, তাহা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই।"

রাধাবল্লভজিউর বিগ্রহ। কাঁটালপাড়া ও বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ী দ্রষ্টব্য।

রাধামাধব বসু। বঙ্কিমচন্দ্রের একজন বিশিষ্ট বন্ধু। ইনি ছিলেন ভবানীপুর-নিবাসী জনৈক এটর্নি। রাধামাধববাবুর সঙ্গে কোন এক রায়বাহাদুরের বিবাদ বাধলে বঙ্কিমবাবু বন্ধুর পক্ষ গ্রহণ করার ফলে এক প্রবল শত্রুর সৃষ্টি করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পূর্বেই এই বন্ধুর অকালমৃত্যু হয়। (বঙ্কিম-কাহিনী)

রামপ্রাণ সরকার। বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যকালে এই গুরুমশাইয়ের কাছে কিছুদিন পড়েছিলেন। শচীশচন্দ্র এঁর সম্বন্ধে লিখেছেন—"গুরুমহাশয়ের বিদ্যাবুদ্ধি সামান্য; যাদবচন্দ্রের অনুগ্রহের উপর তাঁহার জীবিকা কতকটা নির্ভর করিত। পাঠশালা-গৃহ যাদবচন্দ্রের সম্পত্তি। পাঠশালায় ইতরজাতীয় বালকদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র সাদরে গৃহীত হইলেন।"

এঁর সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের যে বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল এমন মনে হয় না, তাই সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনী লিখতে গিয়ে তিনি বলেছেন—"আমার ভাগ্যোদয়ক্রমেই এই মহাশয়ের (রামপ্রাণ সরকার) শুভাগমন; কেননা আমাকে ক, খ, শিখিতে হইবে, কিন্তু বিপদ্ অনেক সময়েই সংক্রামক। সঞ্জীবচন্দ্রও রামপ্রাণ সরকারের হস্তে সমর্পিত হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে আমরা আট দশ মাসে এই মাহাত্মার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মেদিনীপুর গেলাম।"

রমেশচন্দ্র দত্ত। বঙ্কিমচন্দ্র যে কয়জন সাহিত্যিক সৃষ্টি করে গেছেন, তাঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হলেন রমেশচন্দ্র দত্ত।

ইনি কোলকাতার রামবাগানের বিখ্যাত দত্তপরিবারের সন্তান। জন্ম ১৮৪৮

খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই আগস্ট। পিতার নাম ঈশানচন্দ্র দত্ত। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য ইংলণ্ড যান এবং ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে পাস করেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা দেশে কার্যে নিযুক্ত হন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিভাগীয় কমিশনার নিযুক্ত হন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে সি. আই. ই. উপাধি লাভ করেন। অবসরগ্রহণের পর কিছুদিন লণ্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজে ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যাপনা করেন। কিছুদিন বরোদায় রাজস্ব-সচিবের কাজও করেন। পরে সেখানকার প্রধান রাজমন্ত্রী হন। "বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্"-এর ইনি ছিলেন প্রথম সভাপতি। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে নভেম্বর (১৩১৬ সালের ১৩ই অগ্রহায়ণ) রমেশচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

প্রথমে ইনি রেভারেণ্ড লালবিহারী দে-র Bengal Magazine পত্রিকায় বঙ্গসাহিত্য বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরোধে তিনি বাংলা উপন্যাস রচনায় ব্রতী হন। তাঁর বাংলা উপন্যাসগুলির মধ্যে মাধবীকঙ্কণ, বঙ্গবিজেতা, জীবনপ্রভাত, জীবনসন্ধ্যা, সংসার ও সমাজ উল্লেখযোগ্য। ইংরেজী রচনার মধ্যে **Ancient Civilization in India, Lays of Ancient India, Ramayana and Mahabharata in English Verse, Economic History of British India** প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্রকে কিভাবে বাংলা সাহিত্য রচনায় উৎসাহ দেন, "বঙ্কিম-জীবনী"তে তার উল্লেখ আছে—'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হইবার পর—স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের একবার সাক্ষাৎ হয়। সাক্ষাৎটা সম্ভবতঃ বহরমপুরেই হইয়াছিল। রমেশবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' ও 'বঙ্গদর্শন' পাঠে বিমুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, 'বাঙ্গালা ভাষা এত সুন্দর হইতে পারে, তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না।'

বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর করিলেন, 'বঙ্গসাহিত্যের প্রতি তোমার যদি এতই অনুরাগ হইয়া থাকে, তবে তুমি বাঙ্গালা লেখ না কেন?'

রমেশবাবু। আমি বাঙ্গলা লিখ্‌ব! আমি জীবনে কখনও বাঙ্গলা লিখি নাই—লিখিবার প্রণালীও জানি না।

বঙ্কিমচন্দ্র। লিখিবার প্রণালী আবার কি? তোমার মত শিক্ষিত ব্যক্তি যে ধারায় লিখিবে, সেই ধারাই প্রণালী।"

শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র। ইনি জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্যামাচরণের পুত্র। ইনি "বঙ্কিম-জীবনী" রচনা করে বাংলা সাহিত্যানুরাগীদের কৃতজ্ঞতাভাজন হন।

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে কাঁটালপাড়ায় শচীশচন্দ্রের জন্ম হয়। এফ. এ. পরীক্ষা দিয়ে, পিতার মৃত্যু হওয়ায়, তাঁকে পড়াশোনা ছাড়তে হয়। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র

শচীশচন্দ্রকে সব-রেজিস্ট্রার করে দেন। পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে শচীশচন্দ্র সাহিত্য-রচনা আরম্ভ করেন। ১৩১২ সালে তাঁর 'বীরপূজা' উপন্যাস প্রকাশিত হয়। তারপর 'বঙ্গসংসার, বাঙ্গালীর বল, নীরদা, রাজা গণেশ' প্রভৃতি রচনা করেন।

শরৎকুমারী। শরৎকুমারী বঙ্কিমচন্দ্রের কন্যা। বঙ্কিমচন্দ্র কন্যাকে যে কিরূপ স্নেহ করতেন, "বঙ্কিম-জীবনী"তে তার উল্লেখ আছে।—

"জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শরৎকুমারী বঙ্কিমচন্দ্রের অতিশয় প্রিয়পাত্রী ছিলেন। তাঁহাকে বঙ্কিমচন্দ্র যতটা স্নেহ করিতেন, এ সংসারে বুঝি তিনি কাহাকেও এতটা স্নেহ করিতেন না। আমি দুইটি দিনের কথা তুলিয়া তাঁহার অপরিসীম স্নেহ দেখাইতে চেষ্টা করিব।

বঙ্কিমচন্দ্রের দুই জন পাচক ছিল; কিন্তু তাহারা প্রভুর আহার্য্য থালীতে সাজাইয়া আনিয়া দিত না। সে ভার কন্যা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতৃসেবায় তৃপ্তি, পিতার সে সেবা-গ্রহণে তৃপ্তি। একদিন রাত্রিতে কন্যা আহার্য্য আনিয়া, যথাস্থানে রক্ষা করিয়া পিতাকে ডাকিলেন, 'বাবা, খাবার দিয়াছি—এস।' পিতা উত্তর দিলেন না। তিনি ঘরের ভিতর মুদিতনয়নে চেয়ারে উপবিষ্ট, কন্যা বারাণ্ডায় থালার কাছে দণ্ডায়মান। পিতার উত্তর না পাইয়া কন্যা আবার ডাকিলেন, 'বাবা, এস!' পিতা নিরুত্তর। কন্যা পুনরায় ডাকিলেন। অবশেষে খুড়ীমা উঠিয়া চেয়ারের নিকট দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ঘুমুলে নাকি?' বঙ্কিমচন্দ্র মৃদুকণ্ঠে তখন উত্তর করিলেন, 'চুপ্ কর, শরৎ ডাক্‌ছে—আমায় শুন্‌তে দাও।' একখানি উপন্যাস লিখিয়া যাহা বুঝান যায় না, একটি ক্ষুদ্র কথায় বঙ্কিমচন্দ্র তাহা ব্যক্ত করিলেন।

আর একদিন কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র নিশাকালে শয়ন করিতে গিয়া দেখেন, তাঁহার শয়নকক্ষে কেন্নো বিচরণ করিতেছে। কেন্নো ও কেঁচোকে বঙ্কিমচন্দ্র অতিশয় ভয় করিতেন। কেন্নো দেখিয়া তিনি কিছুতেই আর সে ঘরে শয়ন করিতে চাহিলেন না। বলিলেন, 'আমি নীচে বৈঠকখানায় গিয়া শুইব।' খুড়ীমা কত বুঝাইলেন, কিন্তু তিনি ঘরে আর প্রবেশ করিলেন না—বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। অবশেষে পূজনীয়া ভগিনী শরৎকুমারী আসিয়া বলিলেন, 'বাবা, ঘরে আর কেন্নো নেই; তুমি এস।' বঙ্কিমচন্দ্র তখন আর কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া নিঃসঙ্কোচে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন।"

শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠভ্রাতা। দু'ভাইয়ের সম্পর্ক সম্বন্ধে শ্রীকালীনাথ দত্ত "বঙ্কিমচন্দ্র" প্রবন্ধে লিখেছেন—

"আমাদের বারুইপুরে অবস্থান সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম্বন্ধে উভয়ের ঘনিষ্ঠতার

কতকটা পরিচয় পাই। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সময়ে সময়ে বারুইপুরে আসিয়া কনিষ্ঠের অতিথি হইতেন। উভয়ে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতেন। শ্যামাচরণবাবুতে জ্যেষ্ঠত্বের কোন অভিমান দেখি নাই। বঙ্কিমবাবুতেও কনিষ্ঠত্বের কোন সংস্কার অনুভব করি নাই। তাঁহারা ঠিক যেন পরস্পর পরস্পরের অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাঁহাদের আলাপের মধ্যে কোন লজ্জা শরম প্রকাশ পাইত না। সকল বিষয়ে পরস্পরে খোলাখুলি আলাপ ও আমোদ-আহ্লাদ করিতেন। কোন বিষয়ে গোপনের প্রয়োজনীয়তা তাঁহার উপলব্ধি করিতেন না।"

শিবনাথ শাস্ত্রী। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রীর পরিচয় ছিল। চব্বিশ পরগনা জেলার মজিলপুর গ্রামে তিনি ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম হরানন্দ বিদ্যাসাগর। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি সংস্কৃত কলেজ থেকে সংস্কৃত ভাষায় এম. এ. পাস করেন। কিছুকাল শিক্ষকতার কাজ করেন। ছাত্রাবস্থায় শিবনাথ কেশবচন্দ্র সেনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষিত হন। পরে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে মতানৈক্য হওয়ায় তিনি 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ' গঠন করেন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বিলাত যান।

ছাত্রাবস্থাতেই শিবনাথ সাহিত্যচর্চা সুরু করেন। 'সোমপ্রকাশ' এবং 'সমদর্শী' পত্রিকা তিনি কিছুকাল সম্পাদনা করেন। এঁর রচিত 'আত্মচরিত' এবং 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' বিখ্যাত গ্রন্থ। কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'পুষ্পমালা', 'পুষ্পাঞ্জলি', 'হিমাদ্রিকুসুম', 'ছায়াময়ী পরিণয়', 'নির্বাসিতের বিলাপ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচিত উপন্যাস 'মেজ বউ', 'যুগান্তর', 'নয়নতারা', 'বিধবার ছেলে' প্রভৃতি। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে-র ২৩শে সেপ্টেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

নবীনচন্দ্র সেন তাঁর 'আত্মজীবনী'তে বঙ্কিমচন্দ্র এবং শিবনাথের তিক্ত সম্পর্কের একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন।—

"তখন বঙ্কিমবাবু বলিলেন—'একটি কথা। শিবনাথ শাস্ত্রীকে কখনও বঙ্গদর্শনে লিখিতে দিবে না বল।' আমরা সকলে বিস্মিত হইলাম। আমি বলিলাম—'আপনি এত লোকের মাথায় লঙ্কার হাঁড়ি ঝাড়িলেন। আর শিবনাথ শাস্ত্রী আপনার 'সুন্দরী-সুন্দর' কবিতাটির অনুকরণে একটি বিদ্রূপাত্মক কবিতা লিখিয়াছিল বলিয়া কি তাহার প্রতি এই ক্রোধ উচিত?' তিনি বলিয়াছেন—'বিদ্রূপের জন্য নহে। সে উহা **maliciously** (অসরলভাবে) করিয়াছিল।"

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার। বঙ্কিমচন্দ্রের স্নেহধন্য লেখক এবং বঙ্কিম-প্রবর্তিত "বঙ্গদর্শন" পত্রিকার সাময়িক সম্পাদক।

বর্ধমান জেলার নপাড়া গ্রামে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের জন্ম হয়। পিতার নাম প্রসন্নকুমার মজুমদার। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজশাহীর বোয়ালিয়া স্কুল থেকে তিনি এনট্রান্স পাস করেন। সাহিত্য-জীবনে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যলাভে ধন্য হয়েছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'ফুলজানি, কৃতজ্ঞতা, বিশ্বনাথ' প্রভৃতি উপন্যাস উল্লেখযোগ্য। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই নবেম্বর (২৩শে কার্তিক ১৩১৫ সাল) মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে শ্রীশচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

শ্রীশচন্দ্র চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'মাসিক সমালোচকে'র কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১২৮৬, সংখ্যায় "বর্ত্তমান বঙ্গসমাজ ও চারিজন সংস্কারক" প্রবন্ধে বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এই আলোচনা পড়ে বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীশচন্দ্রকে দেখতে চাইলে তিনি ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের রথযাত্রার দিন চুঁচুড়ায় উপস্থিত হন। এ সম্বন্ধে শ্রীশচন্দ্র "বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ"-এ লিখেছেন—

"১৮৭৯।৮০ খ্রীষ্টাব্দের বর্ষাকালে চুঁচুড়ায় প্রথম বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। মনে পড়িতেছে. সে দিন রথযাত্রা,···আমার জীবনে সে একটা নবযুগ। সাহিত্যচর্চ্চার সেই নবীন উৎসাহের সময় আপনা হইতে বঙ্কিমবাবু আমায় দেখিতে চাহিয়াছিলেন। ···কথায় কথায় বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'এখন আর ইংরেজীতে চিঠিপত্র আদৌ লিখি না—ইংরেজী ভাষাটা ভারি insincere বলিয়া আমার মনে হয়।' আমায় বিশেষ করিয়া বলিলেন, 'মাসিক সমালোচকে আপনার একটি প্রবন্ধ পড়িয়া এর আগে আপনাকে চিঠি লিখিতে ইচ্ছা হয়েছিল, কিন্তু তাতে আমার কথা বেশী করিয়া বলায়, লিখিতে পারি নাই।' প্রবন্ধটিতে আমি বলিয়াছিলাম, 'ইদানীন্তন কালে বঙ্কিমবাবু দেশের সর্ব্বপ্রধান সংস্কারক, তাঁহার সৃষ্টি সৌন্দর্য্যে এবং তৎকৃত সমালোচনায় বঙ্গসমাজের যে মানসিক এবং নৈতিক উন্নতি হইয়াছে, আর কিছুতে ততটা নহে।'···

"ইহার পর মনে হইতেছে, কলিকাতায় প্রায় দুই বৎসর পরে বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে দেখা হয়, তখন তাঁর বাসা বহুবাজারে। আমি প্রিয় সুহৃৎ বাবু নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সঙ্গে মাঝে মাঝে তাঁর কাছে যাইতাম।···ইহার ফলে তাঁহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠ যোগ সঞ্চার হয়। বন্ধুত্ব বলিতে পারি না। গুরু-শিষ্যের যে সম্বন্ধ, একদিকে গাঢ় স্নেহ এবং প্রীতি, অন্যত্র গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা—প্রেমের সেই সম্বন্ধকেই আমি যোগ বলিয়া অভিহিত করিয়াছি।"

বঙ্কিমচন্দ্রের সম্মতি অনুসারে শ্রীশচন্দ্র সঞ্জীবচন্দ্রের হাত থেকে 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদনা-ভার গ্রহণ করে ১২৯০ সালের কার্তিক মাসে (অক্টোবর ১৮৮৩) তাঁর সম্পাদিত ১ম সংখ্যা বের করেন। কিন্তু পরবর্তী মাঘ মাসেই 'বঙ্গদর্শনে'র প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।

এর জন্য শ্রীশবাবুর দুঃখের অন্ত ছিল না। রবীন্দ্রনাথের হাতে 'বঙ্গদর্শনে'র পুনরুজ্জীবন ঘটলে আনন্দিত শ্রীশচন্দ্র লেখেন—

"বঙ্গদর্শন পুনর্জ্জীবিত হওয়ায় আমার চিরন্তন ক্ষোভ দূর হইল। বঙ্গের প্রধান সাময়িক-পত্র যে আমার হস্তে লোপ পাইয়াছিল, ইহাতে আমি বড় লজ্জিত ছিলাম। ইহার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় এতদিনে আমি সাহিত্যসংসারে একটি ঋণমুক্ত হইলাম। সুহৃত্তম শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বঙ্গদর্শনের সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হওয়ায় আমি নিশ্চিন্ত হইয়াছি। তিনি যে উপকার করিলেন, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।"

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যমাগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রও একজন সাহিত্যিক ছিলেন। সঞ্জীবচন্দ্রের প্রকৃত নাম ছিল সঞ্জীবনচন্দ্র। তাই বঙ্কিমচন্দ্র সঞ্জীবচন্দ্রের গ্রন্থের ভূমিকাংশের নাম দিয়েছেন 'সঞ্জীবনীসুধা'। এই 'সঞ্জীবনীসুধা'কেই সঞ্জীবচন্দ্রের প্রামাণ্য জীবনী বলা যেতে পারে।

১৭৫৬ শকাব্দের বৈশাখ মাসে সঞ্জীবচন্দ্রের জন্ম হয়। তিনি প্রথমে মেদিনীপুরে ও পরে হুগলী কলেজে শিক্ষালাভ করেন। কলেজের শিক্ষা বিশেষ না পেলেও, তাঁর পড়াশোনা ছিল প্রচুর। এই পড়াশোনার ফলে তিনি 'Bengal Ryot' নামক একটি মূল্যবান পুস্তক রচনা করেন। তিনি কিছুদিন ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেটের ও সব-রেজিস্ট্রারের কাজ করেন। ১২৮৪ সাল থেকে ১২৮৯ সাল পর্যন্ত তিনি 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ইনি 'ভ্রমর' নামে একখানি মাসিক-পত্রও সম্পাদনা করেছেন। ১৮১১ শকের বৈশাখ মাসে সঞ্জীবচন্দ্রের মৃত্যু হয়। সঞ্জীবচন্দ্রের বাংলা গ্রন্থের মধ্যে "পালামৌ" ভ্রমণ-কাহিনী বিখ্যাত। এছাড়া 'মাধবীলতা, কণ্ঠমালা, জালপ্রতাপচাঁদ' প্রভৃতি গ্রন্থ তিনি রচনা করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র সঞ্জীবচন্দ্রের চরিত্রের অস্থিরতার কথা উল্লেখ করেছেন। কোন কাজই তিনি দীর্ঘদিন করতে পারতেন না। রবীন্দ্রনাথ এইজন্যই বোধ হয় সঞ্জীবচন্দ্রের সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে বলে থাকবেন যে, তাঁর প্রতিভা ছিল কিন্তু গৃহিণীপনা ছিল না। সঞ্জীবচন্দ্র কিরূপ রসিক ছিলেন এবং কখনো কখনো তাঁর রসিকতা কিরূপ ভয়াবহ পরিণামের সৃষ্টি করত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী "বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ায়" শীর্ষক প্রবন্ধে তার সম্বন্ধে একটি সুন্দর ঘটনার উল্লেখ করেছেন—

"সঞ্জীববাবু তখন প্রোবেশনারী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। কয়েকটি পরীক্ষায় পাশ হইলেই তিনি পাকা হইতে পারেন। ১৮৮৪ সালে 'ডিষ্ট্রীক্ট টাউনস অ্যাক্ট' পাশ হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট চেয়ারম্যান এবং জজ সাহেব ও অন্যান্য ইংরাজ ও বাঙ্গালী হাকিমেরা

কমিশনার হইলেন ; সঞ্জীববাবুও একজন কমিশনার হইলেন। একদিন কমিটিতে কথা উঠিল—রাস্তার নাম দিতে হইবে ; সঙ্কল্প হইল ৩০০ টাকা মঞ্জুর করিতে হইবে। জজ সাহেব বলিলেন, 'আর ৭৫ টাকা চাই, কারণ বাঙ্গলা নামগুলা কে বুঝিবে ? ওগুলা ইংরাজীতে তর্জ্জমা করিয়া দিতে হইবে। বৌমার গলি বলিলে কেহই চিনিবে না, Daughter-in-laws lane বলিতে হইবে।' জজ সাহেবের কথায় কেহই আস্থা করিতেছে না, অথচ তিনি বারবার সেই কথাই বলিতেছেন। তখন সঞ্জীববাবু বলিয়া উঠিলেন, '৭৫ টাকায় হইবে না। আমি প্রস্তাব করি আরও ৩০০ টাকা দেওয়া দরকার।' জজ সাহেব উৎফুল্ল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন কেন ?' সঞ্জীববাবু বলিলেন, 'আদালতের সম্পর্কে যত লোক আছে, সকলের নামই ইংরাজীতে তর্জ্জমা করিতে হইবে। মনে করুন কালীপদ মিত্র বলিয়া একজন হাকিম আছেন। কালীপদ মিত্র বলিলে কে বুঝিবে ? উহাকে Black footed friend বলিয়া তর্জ্জমা করিতে হইবে।' সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তিনি টুপি লইয়া কমিটি হইতে উঠিয়া গেলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন, 'সঞ্জীব ভাল কাজ করিলে না। বাড়ি গিয়া উঁহাকে ঠাণ্ডা করিয়া আইস।' সঞ্জীববাবু তিন দিন গেলেন, জজ সাহেবের কাছে কার্ড পাঠাইলেন, সাহেব দেখা করিলেন না। সপ্তাহখানেক পরে খবর আসিল, জজ সাহেব সেক্রেটারী হইয়া গেলেন। সঞ্জীববাবু তিন চারিবার পরীক্ষা দিলেন, কিছুতেই পাশ করিতে পারিলেন না। তাঁহার নাম ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের তালিকা হইতে কাটিয়া দেওয়া হইল। জজ সাহেবের সেক্রেটারী হওয়ার সঙ্গে সঞ্জীববাবুর পাশ করিতে না পারিবার কার্য্যকারণ ভাব সম্বন্ধ আছে কিনা, জানি না, কিন্তু সঞ্জীববাবু মনে করিতেন, আছে।"

স্যার অ্যাশলি ইডেন (Sir Ashley Eden)। বাংলার শাসনকর্তা। ইনি বঙ্কিমচন্দ্রকে বিশেষ স্নেহ করতেন এবং তাঁর নির্ভীকতার প্রশংসা করতেন।

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে এদেশে আসেন। ১৮৬২—৭১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা সরকারের সচিব ছিলেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৮২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জুলাই তিনি মারা যান।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে এঁর পরিচয় ছিল। পৈতৃক নিবাস নদীয়া জেলার আঁশমালী গ্রামে। জন্ম ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে। এঁর মাতা হেমলতা দেবী বিদ্যাসাগরের জ্যেষ্ঠা কন্যা। কুড়ি বৎসর বয়সে "সাহিত্য কল্পদ্রুম" নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। এই পত্রিকাই পরে "সাহিত্য" নামধারণ করে বাংলা

সাহিত্যে বিখ্যাত হয়। ব্যঙ্গ রচনা এবং স্পষ্ট বক্তা হিসাবে সুরেশচন্দ্রের কুখ্যাতি ও সুখ্যাতি ছিল। এঁর রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ 'সাজি', 'ছিন্নহস্ত', 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ', 'রণভেরী', 'ইউরোপের মহাসমর' প্রভৃতি। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে সুরেশচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

হাবড়া। কর্মোপলক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র তিনবার হাবড়ায় নিযুক্ত হন। প্রথমবার তিনি আসেন ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারি, দ্বিতীয়বার আসেন ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারি এবং তৃতীয়বার আসেন ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জুলাই।

হাবড়া ২৪-পরগনা জেলার বারাসত মহকুমার থানা। কোলকাতা থেকে রেলপথে ২৮ মাইল।

হুগলী কলেজ। বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজ বা মহম্মদ মহসিনের কলেজে পড়াশোনা করতেন। এই কলেজে বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে অক্টোবর প্রবেশ করেন। তখন তাঁর বয়স সাড়ে এগার বৎসর। এই কলেজ থেকেই তিনি জুনিয়র স্কলারশিপ এবং সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা দিয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জুন বঙ্কিমচন্দ্র ট্রান্‌স্‌ফারের দরখাস্ত করেন এবং ১২ই জুলাই কলেজ ত্যাগ করেন। এই কলেজে থাকাকালীন বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের "সংবাদ-প্রভাকর" পত্রিকায় কবিতা রচনা করেন এবং পুরস্কার পান।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয় ছিল এবং বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কবিত্ব-শক্তির প্রশংসা করতেন।

হেমচন্দ্র হুগলী জেলার গুলিটা গ্রামে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি. এ. পাস করে কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। তারপর ওকালতি পাস করে কিছুকাল মুন্সেফ হিসাবে কাজ করেন, এবং হাইকোর্টে ওকালতি করেন। শেষজীবনে অন্ধ হয়ে যান। হেমচন্দ্রের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'চিন্তাতরঙ্গিণী'। অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'বীরবাহু কাব্য', 'বৃত্রসংহার', 'ছায়াময়ী', 'আশাকানন', 'কবিতাবলী', 'দশমহাবিদ্যা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে মে হেমচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

বঙ্কিম উপন্যাসের নাম ও পরিচ্ছেদের নাম সম্বন্ধীয় আলোচনা

অঙ্কুর (বিষঃ ১২ পরিঃ)। অঙ্কুর অর্থে এখানে নগেন্দ্রের হৃদয়ে যেমন কুন্দের প্রতি আসক্তির অঙ্কুর প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি নগেন্দ্রের অমনোযোগী মনোভাব এবং সূর্যমুখীর সঙ্গে রুষ্টভাবে কথাবার্তা বলায় বিষবৃক্ষের অঙ্কুর-এর সন্ধান পাওয়া যায়।

অঙ্গুরীয় প্রদর্শন (দুর্গেঃ ২/১৩)। বিমলা তিলোত্তমাকে ওসমানের অঙ্গুরীয় দিয়ে দুর্গের বাইরে যাবার উপায় করে দিলেন। কিন্তু তিলোত্তমা প্রহরীকে সেই অঙ্গুরীয় প্রদর্শন করে জগৎসিংহের কারাগারে প্রবেশ করলেন। অথচ জগৎসিংহের নিতান্ত হৃদয়হীন ব্যবহারে সেখানেই মূর্ছিতা হয়ে পড়লেন।

অগাধ জলে সাঁতার (চন্দ্রঃ ৩/৬)। ইংরেজের নৌকা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রতাপ-শৈবলিনী গঙ্গাবক্ষে সাঁতার কাটতে লাগলেন। তাঁদের বাল্যপ্রণয়ের স্মৃতি মনে জাগরিত হল। প্রতাপ বুঝলেন, শৈবলিনী এখনো তাঁকে কামনা করে। তাই তিনি বললেন—এসো আজ দু'জনে ডুবে মরি। কিন্তু শৈবলিনী চাইলেন না যে, তাঁর জন্য প্রতাপের মৃত্যু হোক। তাই তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, আজ থেকে তিনি প্রতাপকে ভুলবেন। তখন দু'জনে তীরে উঠলেন। এই পরিচ্ছেদে বঙ্কিমের সাহিত্য-শক্তির চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটেছে।

অগ্নিকাণ্ডে তৃষিতা চাতকী (রাজঃ ৮/১১)। ঔরঙ্গজেব বিদায় হলে নির্মল চঞ্চলকে বলল—পিতাকে পত্র লেখার জন্য। এবার তাদের বিয়ের তো কোন বাধা নেই! চঞ্চলের পিতা জানালেন—তিনি দু'হাজার অশ্বারোহী নিয়ে আসছেন। তৃষিতা চাতকী বলতে এখানে চঞ্চলকুমারীকেই বোঝান হয়েছে।

অগ্নিচক্র বড় ভীষণ হইল (রাজঃ ৭/৪)। যে মবারককে মাণিকলাল প্রাণদান করেছিল, তার চেষ্টায় ঔরঙ্গজেব এক রন্ধ্রমধ্যে কিছুসংখ্যক সেনা নিয়ে প্রবেশ করে অবরুদ্ধ হয়ে পড়লেন।

অগ্নিচয়ন (রাজঃ ৬/৩)। নির্মলকুমারী বাদশাহের অন্তঃপুরে যোধপুরী বেগমের কাছে গিয়ে উপস্থিত হল।

অগ্নি জ্বলিল (রাজঃ ৭ম খণ্ড)। সপ্তম খণ্ডের মোট চারটি পরিচ্ছেদে রাজসিংহের সঙ্গে যুদ্ধে ঔরঙ্গজেবের বন্দীত্বের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

অগ্নি জ্বালিবার আয়োজন (রাজঃ ৫/৩)। চঞ্চলকুমারীর পিতা পত্রে জানালেন, রাজসিংহের সঙ্গে কন্যার বিবাহে তিনি সম্মত নন। তাঁরা যদি বিবাহ করেন, তাহলে তাঁর অভিশাপ লাগবে। তবে যদি কোনদিন তিনি রাণাকে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করেন, তাহলে নিজেই বিবাহ দেবেন। অগত্যা বর্তমানে চঞ্চলকুমারী ও রাজসিংহের বিবাহ হল না।

অগ্নি জ্বালিবার আরও প্রয়োজন (রাজঃ ৫/৪)। চঞ্চলকুমারী একাকিনী বাস করার জন্য নির্মলকুমারীকেও মাণিকলালের বাহুবন্ধন ত্যাগ করে রাজকুমারীর প্রাসাদে এসে থাকতে হল।

অগ্নিতে ইন্ধনক্ষেপ—জ্বালা বাড়িল (রাজঃ ৮/৫)। মবারককে দেখে জেব-উন্নিসার হৃদয়ের জ্বালা আরো বাড়ল। চঞ্চলকুমারী তাঁকে আশ্বাস দিলেন, আজ রাত্রে সত্যই মবারককে দেখাবেন।

অগ্নিতে জলসেক (রাজঃ ৮/৯)। জেব-উন্নিসা ও মবারকের বিবাহে যাতে ঔরঙ্গজেব রাগান্বিত না হন, সে ব্যবস্থা করার জন্যও রাজসিংহ লিখলেন।

অগ্নিনির্বাণকালে উদিপুরী ভস্ম (রাজঃ ৮/১০)। রাজসিংহ ঔরঙ্গজেবকে মুক্তি দিলেন, কিন্তু উদিপুরীকে রাজকুমারীর তামাকু সাজতেই হল।

অগ্নিনির্বাণের পরামর্শ (রাজঃ ৮/৮)। রাজসিংহ মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে সন্ধি করতে রাজী হলেন।

অগ্নি পুনর্জ্বালিত (রাজঃ ৮/১২)। ঔরঙ্গজেব সন্ধির শর্ত অমান্য করে পুনরায় যুদ্ধোদ্যম করতে লাগলেন। সেই সঙ্গে মবারক নিধনেরও একটা ব্যবস্থা করলেন।

অগ্নির আয়োজন (রাজঃ ৫ম খণ্ড)। পঞ্চম খণ্ডে মোট ছটি পরিচ্ছেদ। মোগল-রাজপুতের যে বিরাট সংঘর্ষ আসন্ন, তারই প্রস্তুতি চলতে লাগল।

অগ্নির উৎপাদন (রাজঃ ৬ষ্ঠ খণ্ড)। এই খণ্ডের মোট ন'টি পরিচ্ছেদে—কিভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আগুন জ্বালার প্রস্তুতি চলছে, তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

অগ্নির নূতন স্ফুলিঙ্গ (রাজঃ ৮/১৪)। বিক্রমসোলাঙ্কি, চঞ্চলের পিতা, সেনাসমেত রাজসিংহের সাহায্যার্থে এগিয়ে এলেন।

অতিথি-সৎকার (মৃণাঃ ২/১২)। হেমচন্দ্র তিনজন যবন অশ্বারোহী সৈন্যের সঙ্গে একাকী যুদ্ধ করে দু'জনকে হত্যা করলেন। একজন পলায়ন করল। এমনিভাবে হেমচন্দ্র যবন অতিথিদের সৎকার করলেন।

অদৃষ্টগণনা (রাজঃ ২/১)। মবারক নামে এক উচ্চপদস্থ মোগল রাজপুরুষকে

দরিয়াবিবি জোর করে এক বিখ্যাত জ্যোতিষীর কাছে তাঁর হাত দেখাতে বাধ্য করলেন।

অনন্ত মিশ্র (রাজঃ ৩/২)। চঞ্চলকুমারী তাঁর পিতৃকুলপুরোহিত অনন্ত মিশ্রকে ডেকে, একখানি পত্র লিখে রাণা রাজসিংহের কাছে তাঁকে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন।

অনাথিনী (বিষঃ ১৮ পরিঃ)। অনাথিনী কুন্দ এক ঝড়-জলের রাত্রে নগেন্দ্রের গৃহ থেকে পলায়ন করল। অবশেষে ঘটনাচক্রে সে হীরা দাসীর গৃহেই এসে আশ্রয় নিল।

অনেক প্রকারের কথা (বিষঃ ৫ম পরিঃ)। কুন্দকে সঙ্গে নিয়ে নগেন্দ্র কোলকাতায় গেলেন। সেখানে কুন্দের কোন আত্মীয়ের সন্ধান না পেয়ে শেষ পর্যন্ত ভগিনী কমলমণির বাড়ীতে এনে তুললেন। কমলমণি কুন্দকে নিয়ে স্বভাবসুলভ চাপল্য প্রকাশ করলেন। এদিকে সূর্যমুখীও নগেন্দ্রকে পত্র মারফৎ জানালেন—কুন্দের সঙ্গে তিনি তাঁর এক ভ্রাতা তারাচরণের বিবাহ দেবেন। এমনিভাবে এ পরিচ্ছেদে অনেক প্রকারের কথা বিবৃত হয়েছে।

অন্বেষণ (বিষঃ ৩০ পরিঃ)। সূর্যমুখীর গৃহত্যাগের সংবাদ প্রকাশ হওয়ার পরই তাঁর অন্বেষণের জন্য মহা কোলাহল পড়ে গেল, কিন্তু কেউ তাঁকে খুঁজে পেল না।

অন্তিমকাল (দুর্গেঃ ২/১৭)। কত্‌লু খাঁ অন্তিমকালে নিজ অপরাধ স্বীকার করে গেলেন এবং বললেন, বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা নির্দোষ।

অন্তিমকালে (মৃণাঃ ৪/১৫)। পশুপতির সৎকারের সময় মনোরমাও চিতারোহণ করল।

অন্ধকার পুরী—অন্ধকার জীবন (বিষঃ ৪২ পরিঃ)। সূর্যমুখী এবং নগেন্দ্রের অভাবে দত্তবাড়ী অন্ধকার হয়ে গেছে। কুন্দ একাকিনী সে গৃহে দারুন মনঃকষ্টে কালাতিপাত করেছে। সে স্থির করে ফেলেছে, সূর্যমুখী গৃহে প্রত্যাগমন করলেই সে প্রাণত্যাগ করবে।

অন্বেষণে (কপাঃ ১/৭)। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের এই সংক্ষিপ্ত পরিচ্ছেদে পলাতক কপালকুণ্ডলা-নবকুমারের অনুসন্ধানকালে কাপালিকের বালিয়াড়ি থেকে পতন বর্ণিত হয়েছে।

এখানে মেকলের 'Lays of Ancient Rome' নামক কাব্যগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে,—

"And the great Lord of Luna
Fell at that deadly stroke ;
As falls on mount Alvernus
A thunder-smitten oak."

অর্থাৎ—লুনার মহান অধিপতি (রোমদেশীয় শত্রুর আক্রমণে) ভয়ানক আঘাতে ভূপতিত হলেন, মনে হল যেন এলভার্ণাস্ পর্বতের একটি বজ্রাহত ওক্‌গাছ পতিত হল।

Luna ছিল প্রাচীন কালের সুসভ্য Etruria-র প্রখ্যাত নগর। খ্রীষ্ট পূর্ব ১৭৭ অব্দে লুনা রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এখানে লুনার শাসকের সঙ্গে রোমান সাম্রাজ্যের যুদ্ধ বর্ণনা করা হয়েছে।

এখানে উপমাটি চয়ন করা হয়েছে বিশালদেহী কাপালিকের পতনকে লক্ষ্য ক'রে।

অবগুণ্ঠনবতী (দুর্গেঃ ২/৪)। বীরেন্দ্রসিংহের শিরশ্ছেদের সময়ে অবগুণ্ঠনবতী বিমলা উপস্থিত ছিলেন।

অবতরণ (বিষঃ ২৪ পরিঃ)। হীরা দেবেন্দ্রকে ভালবাসে। তাই দেবেন্দ্র যখন কুন্দের খোঁজে তার ঘরে এলেন, তখন হীরা পাপের পথে আর একধাপ অবতরণ করল। দেবেন্দ্রকে হীরা নিজের মনোভাব ব্যক্ত করল। তারপরেই কিন্তু তার মধ্যে জেগে উঠল এক প্রবল বিতৃষ্ণা, কারণ সে জানে দেবেন্দ্র তাকে কোনদিনই বিবাহ করবে না। আর তা নাহলে যৌবন গেলেই তার আর আদর থাকবে না।

অবরোধে (কপাঃ ২/৬)। স্বামীগৃহে কপালকুণ্ডলা পূর্বের মতই নিরাসক্ত জীবন যাপন করতে লাগল। এ অংশে ননদিনী শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে কথোপকথনে কপালকুণ্ডলার যোগিনী মনোবৃত্তিই প্রকাশিত হয়েছে। তাই বঙ্কিমচন্দ্র কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' কাব্যের ৫ম সর্গ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন।—

"কিমিত্যপাস্যাভরণানি যৌবনে
ধৃতং ত্বয়া বার্দ্ধক্যশোভি বল্কলম্।
বদ প্রদোষে স্ফুটচন্দ্রতারকা।
বিভাবরী যদ্যরুণায় কল্পতে।"

ছদ্মবেশধারী মহাদেব তপস্যানিরতা উমাকে বলছেন—কি কারণে যৌবনে তুমি সমস্ত আভরণ ত্যাগ করে বৃদ্ধের মত বল্কল পরিধান করেছ? বল দেখি, প্রদোষে চন্দ্র ও তারকাসমন্বিত রাত্রি কি অরুণের কাছে যেতে পারে?

সংসার কপালকুণ্ডলার কাছে বন্দীজীবন বলে বোধ হচ্ছে, তাই এই পরিচ্ছেদের এরূপ নামকরণ করা হয়েছে।

অভিরামস্বামীর মন্ত্রণা (দুর্গেঃ ১/৬)। মোগল অথবা পাঠান কোন্ পক্ষে গড়মান্দারণাধিপতি বীরেন্দ্রসিংহের যোগদান করা উচিত, সে সম্বন্ধে তাঁর গুরু অভিরাম স্বামী মন্ত্রণা দান করেছেন।

অমরনাথের কথা (রজনী)। 'রজনী' উপন্যাসের যে অংশে অমরনাথ কাহিনী বর্ণনা করেছে, তা "অমরনাথের কথা" নামে অভিহিত। দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ এবং পঞ্চম খণ্ডের চারটি পরিচ্ছেদ 'অমরনাথের কথা।'

অমিয়টের পরিণাম (চন্দ্রঃ ৫/১)। বিপুলসংখ্যক মুসলমান সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে অমিয়ট বীরের ন্যায় মৃত্যুবরণ করলেন।

অমৃতে গরল—গরলামৃত (মৃণাঃ ৩/৯)। মৃণালিনীর পত্র ছিঁড়ে ফেলে হেমচন্দ্রের দুঃখ হল, তিনি নিজের মনে বিচার করে ভাবলেন যে, বোধ হয় মৃণালিনীর কোন দোষই নেই। এমন সময় মৃণালিনী স্বয়ং হেমচন্দ্রের কাছে এসে উপস্থিত হল। দুঃখের অশ্রুতে উভয়ের মিলন ঘটল।

অরণিকাষ্ঠ—উর্বশী (রাজঃ ৬/১)। রাজসিংহ মাণিকলালকে দিয়ে এক পত্র পাঠালেন ঔরঙ্গজেবকে। নির্মলকুমারীও চললো দিল্লী—যদি সখীব পরিচর্যাব জন্য নবাবপত্নীকে পাওয়া যায়।

অরণিকাষ্ঠ—পুরুরবা (রাজঃ ৬/২)। মাণিকলাল-নির্মল পাথর-বিক্রেতার অনেক সাজসরঞ্জাম নিয়ে, নানাবিধ কৌশল স্থির করে দিল্লী যাবার জন্য প্রস্তুত হল।

অলৌকিক আভরণ (দুর্গেঃ ২/১২)। কত্‌লু খাঁব জন্মদিনের উৎসবে যোগদানের জন্য বিমলা অলৌকিক আভরণে ভূষিতা হয়ে তিলোত্তমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। তিলোত্তমা তাঁর এই সাজ দেখে তিরস্কার করলে, তিনি বস্ত্রমধ্য হতে তীক্ষ্ণ ছুরিকা বের করে কত্‌লু খাঁকে হত্যার আকাঙ্ক্ষার কথা জানালেন। তিলোত্তমার দুর্গ থেকে বহিষ্কারের ব্যবস্থাও করলেন।

অসাবধানতা (দুর্গেঃ ১/৭)। অসাবধানতা বলতে এখানে তিলোত্তমার অন্যমনস্কতাকে বোঝান হয়েছে। জগৎসিংহকে আত্মসমর্পণ করে তিলোত্তমা কিছুতেই আর মন স্থির করতে পারছেন না। হিজিবিজি অনেক কিছু লিখতে লিখতে অবশেষে অসাবধানতায় "কুমার জগৎসিংহ"র নামটা লিখে মনের আসল চিন্তাটিকেই প্রকাশ করে ফেললেন।

আগুন জ্বালিবার প্রস্তাব (রাজঃ ৫/৬)। ঔরঙ্গজেব এবং রাজসিংহ উভয়েই যুদ্ধোদ্যোগ করতে লাগলেন।

আগুনে কে কে পুড়িল? (রাজঃ ৮ম খণ্ড)। অষ্টম খণ্ডের মোট ষোলটি পরিচ্ছেদে উপন্যাসের বহ্নিতে কার ভাগ্যে কি ঘটল তার বর্ণনা আছে।

আচার্য (মৃণাঃ ১/১)। গুরু মাধবাচার্য হেমচন্দ্রের প্রণয়িনী মৃণালিনীকে লুকিয়ে রাখার জন্য হেমচন্দ্র প্রথমে উষ্মা প্রকাশ করলেও শেষ পর্যন্ত গুরুর আদেশ শিরোধার্য করলেন।

আত্মমন্দিরে (কপাঃ ৩/৫)। এখানে লুৎফ-উন্নিসা ও দাসী পেষমনের কথোপকথনের দ্বারা লুৎফার হৃদয়ে নবকুমারের প্রতি ভালবাসা কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে, তার পরিচয় পাই। তাই বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাপতির একটি বিখ্যাত পদ উদ্ধৃত করেছেন।—

"জনম অবধি হম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলু শ্রুতিপথ পরশ না গেল॥
কত মধুযামিনী রভসে গোঁয়ায়নু না বুঝনু কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়া জুড়ন না গেল॥
যত যত রসিক জন রসে অনুগমন অনুভব কাহু না পেখ।
বিদ্যাপতি কহে প্রাণ জুড়াইতে লাখে না মিলল এক॥"

অর্থাৎ—রাধা সারাজনম ধ'রে কৃষ্ণের রূপ দেখেও তৃপ্তি পেলেন না। তাঁর মধুর বচন শুনেও শোনার ইচ্ছা শেষ হল না। বহু মধুযামিনী একত্রে যাপন করেও আশা মিটল না এবং লাখ লাখ যুগ হৃদয়ে ধ'রে রেখেও হৃদয় শীতল করা গেল না। বিদ্যাপতি বলছেন—এমন প্রাণজুড়ান রসিক লাখের মধ্যে একটিও পাওয়া যায় না।

উদ্ধৃত অংশটি লুৎফ-উন্নিসার মনোভাব প্রকাশে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

***আনন্দমঠ।** প্রথম প্রকাশঃ ১২৮৭ সালের চৈত্রসংখ্যা 'বঙ্গদর্শন' থেকে আরম্ভ করে ১২৮৮ সালের আশ্বিনসংখ্যা পর্যন্ত 'আনন্দমঠ' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে ছ'মাসের জন্য বন্ধ থাকে, কারণ বঙ্গদর্শনও সেই সময় বন্ধ হয়ে যায়। ১২৮৯ সালের বৈশাখ মাস থেকে পুনরায় 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হলে 'আনন্দমঠ'ও প্রকাশিত হয়, এবং জ্যৈষ্ঠসংখ্যাতে শেষ হয়ে যায়। অর্থাৎ, মোট ন'টি সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' 'আনন্দমঠ' প্রথম প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থাকারে প্রকাশঃ 'আনন্দমঠ' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর। তখন পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ১৯১। গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি এরূপ ছিল।—

"আনন্দমঠ। / শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় / প্রণীত। / কলিকাতা। / জন্‌সন্ প্রেসে

শ্রীরাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক / মুদ্রিত। / ১২৮৯। / মূল্য ১৵০ এক টাকা দুই আনা মাত্র। /

গ্রন্থ-রচনার প্রেরণা ঃ বঙ্কিমের কনিষ্ঠ সহোদর পূর্ণচন্দ্রের 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গে'র বর্ণনা থেকে জানা যায়, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পটভূমিকায় গ্রন্থ-রচনার উপাদান তিনি বাল্যকালেই লাভ করেন। তাঁদের খুল্লপিতামহের নিকট বাল্যকালে তাঁরা মন্বন্তরের গল্প শোনেন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের সময় বঙ্কিমের মনে পুনরায় সেই বাল্যকালে শোনা গল্পের স্মৃতি উদিত হয়, তারপর পরিণত বয়সে 'আনন্দমঠে' রূপলাভ করে।

গ্রন্থ-পরিচয় ঃ 'আনন্দমঠ' গ্রন্থখানি বঙ্কিম পরলোকগত প্রিয় বন্ধু দীনবন্ধু মিত্রকে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গপত্রটি এরূপ ছিল।—

"উৎসর্গপত্র / ক্ব নু মাং ত্বদধীনজীবিতং / বিনিকীর্য্য ক্ষণভিন্নসৌহৃদঃ। / নলিনীং ক্ষতসেতুবন্ধনো / জলসংঘাত ইবাসি বিদ্রুতঃ॥ / স্বর্গে মর্ত্ত্যে সম্বন্ধ আছে। সেই সম্বন্ধ রাখিবার নিমিত্ত এই গ্রন্থের এইরূপ উৎসর্গ হইল।/"

গ্রন্থের মূলভাব বোঝাবার জন্য এই শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হয়।—

"যেতু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে।
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিত চেতসাং।
ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ।
অথ চিত্তং সমধাতুং ন শক্নোষি ময়িস্থিরং
অভ্যাসযোগেন ততো মামিস্থাপ্তুং ধনঞ্জয়।

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা। ১২। অধ্যায়।"

বঙ্কিমের জীবিতকালে 'আনন্দমঠে'র পাঁচটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন সংস্করণের তারিখগুলি এরূপ—২য় সং—১২৯০ বঙ্গাব্দ (১৮৮৩), ৩য় সং—১২৯২ বঙ্গাব্দ (১৮৮৬, এপ্রিল), ৪র্থ সং—ডিসেম্বর ১৮৮৬ খ্রীঃ, ৫ম সং—১৮৯২ খ্রীঃ।

'প্রথমবারের বিজ্ঞাপনে' বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন—"বাঙ্গালীর স্ত্রী অনেক অবস্থাতেই বাঙ্গালীর প্রধান সহায়। অনেক সময়ে নয়। / সমাজ বিপ্লব, অনেক সময়েই আত্মপীড়ন মাত্র। বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী।/ ইংরেজেরা বাঙ্গালা দেশ অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। / এই সকল কথা এই গ্রন্থে বুঝান গেল। /"

বঙ্কিমচন্দ্র 'দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপনে' লেখেন—"প্রথমবারের বিজ্ঞাপনে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহাব টীকাস্বরূপ কোন বিজ্ঞ সমালোচকের কথা অপব পৃষ্ঠে উদ্ধৃত করিলাম।"

এই সমালোচনাটি 'The Liberal' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল সংখ্যায প্রকাশিত হয। সমালোচনাটি এই—"The leading idea of the plot is this—should the national mind feel justified in harbouring violent thoughts against the British Government? Or to present the question in another form, is the establishment of English supremacy providential in any sense? Or to put it in a still more final and conclusive form, with what purpose and with what immediate end in view did providence send the British to this country? The immediate object is thus briefly described in the preface—To put an end to Moslem tyranny and anarchy in Bengal; and the mission is thus strikingly pictured in the last chapter :— This passage embodies the most recent and the most enlightened views of the educated Hindus, and happening as it does in a novel powerfully conceived and wisely executed, it will influence the whole race for good The author's dictum we heartily accept as it is one which already forms the creed of English education We may state in this form : India is bound to accept the scientific method of the West and apply it to the elucidation of all truth. This idea beautifully expressed, forms a silver thread as it were, and runs through the tissue of the whole work"

'তৃতীযবারের বিজ্ঞাপন'-এ বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন—"এবাব পবিশিষ্টে বাঙ্গালাব সন্ন্যাসী বিদ্রোহের যথার্থ ইতিহাস ইংবেজী গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত কবিযা দেওযা গেল। পাঠক দেখিবেন, ব্যাপাব বড গুরুতব হইযাছিল।

"আরও দেখিবেন যে, দুইটি ঘটনা সম্বন্ধে উপন্যাসে ও ইতিহাসে বিশেষ অনৈক্য আছে। যে যুদ্ধগুলি উপন্যাসে বর্ণিত হইযাছে, তাহা বীবভূম প্রদেশে ঘটে নাই, উত্তর বাঙ্গালায হইযাছিল। আব Captain Edwardes নামের পবিবর্তে Major Wood নাম উপন্যাসে„ব্যবহৃত হইযাছিল। এ অনৈক্য আমি মারাত্মক বিবেচনা করি না—কেন না, উপন্যাস উপন্যাস, ইতিহাস নহে।"

'পঞ্চমবারের বিজ্ঞাপন'-এ বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন—"তৃতীযবাবের বিজ্ঞাপনে যে অনৈক্যের কথা লেখা গিযাছে, তাহা রাখিবার প্রযোজন নাই, ইহাই বিবেচনা করিযা,

এই সংস্করণে আবশ্যকীয় পরিবর্ত্তন করা গেল। অন্যান্য বিষয়েও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করা গিয়াছে। শান্তিকে অপেক্ষাকৃত শান্ত করা গিয়াছে। এবং তৎসম্বন্ধে যে কথাটা অনুভবে বুঝিবার ভার পাঠকের উপর ছিল, তাহা এবার একটা নূতন পরিচ্ছেদে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দেওয়া গেল। মুদ্রাঙ্কণ কার্য্যও পূর্ব্বাপেক্ষা সুসম্পাদিত করা গেল।"

এই পঞ্চম সংস্করণই বর্তমানে প্রচলিত 'আনন্দমঠ' গ্রন্থ। 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত উপন্যাসের সঙ্গে পঞ্চম সংস্করণের গুরুতর পার্থক্য এগুলি।—

(ক) 'বঙ্গদর্শনে'র পাঠের উপক্রমণিকায় ছিল—"প্রিয়জনের প্রাণসর্ব্বস্ব" দানের কথা, কিন্তু পরবর্তী সংস্করণে "ভক্তি" দানের কথা বলা হয়েছে।

(খ) শান্তির পূর্বজীবনের কাহিনী পরবর্তী সংস্করণের সংযোজনা।

(গ) শান্তি-চরিত্রের অতিরিক্ত পুরুষালিভাবও পরবর্তী সংস্করণে অনেক সংশোধিত করা হয়েছে।

(ঘ) ইতিহাসের ভুলভ্রান্তি যথাসম্ভব সংশোধন করা হয়েছে।

(ঙ) বর্তমানে যেখানে গ্রন্থ শেষ হয়েছে, 'বঙ্গদর্শনে' তার পরেও ছিল—

"বিষ্ণুমণ্ডপ শূন্য হইল। তখন সহসা সেই বিষ্ণুমণ্ডপের দীপ উজ্জ্বলতর হইয়া জ্বলিয়া উঠিল ; নিবিল না। সত্যানন্দ যে আগুন জ্বালিয়া গিয়াছিলেন তাহা সহজে নিবিল না। পারি ত সে কথা পরে বলিব।"

এর থেকে বোঝা যায়, 'আনন্দমঠে'র জের টেনে বঙ্কিমের আর একটি উপন্যাস লেখার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সে উপন্যাস বঙ্কিম লিখেছিলেন কিনা তা সঠিক জানবার কোন উপায় আজ আর নেই।

কাহিনী: 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের কাহিনী এরূপ।—১১৭৬ সালে বাংলা দেশে দারুন দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। তখন পদচিহ্ন গ্রামের এক সম্পন্ন ব্যক্তি মহেন্দ্র তাঁর স্ত্রী কল্যাণী ও শিশুকন্যা সুকুমারীকে নিয়ে গ্রাম ত্যাগ করে নগরাভিমুখে রওনা হলেন। পথিমধ্যে মহেন্দ্র যখন দুগ্ধের সন্ধানে অন্যত্র যান, তখন তাঁর স্ত্রী ও কন্যা ডাকাতের হাতে পড়ে। অরণ্যে অবস্থিত 'আনন্দমঠ' নামে এক প্রতিষ্ঠানের সন্ন্যাসীসম্প্রদায় তাদের রক্ষা করে। সেই সন্ন্যাসীদের চেষ্টাতেই মহেন্দ্রের সঙ্গে কল্যাণীর পুনর্মিলন হয়। এই সন্ন্যাসীসম্প্রদায়ের প্রধান সত্যানন্দ ঠাকুর। এঁদের প্রধান কাজ মুসলমান অত্যাচারের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করা। সত্যানন্দের মহান আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে মহেন্দ্র দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করতে মনস্থ করলেন। কিন্তু তাঁর পক্ষে একমাত্র বাধা স্ত্রী ও কন্যার বন্ধন। এ কথা কল্যাণী জানতে পেরে বিষপানে আত্মত্যাগ করবার সংকল্প গ্রহণ করে। কিন্তু তার পূর্বেই শিশুকন্যাটি

বিষবড়ি মুখে পুরে দেয়। তার মুখ থেকে বড়িটি বের করে নিয়ে কল্যাণীও বিষসেবনে প্রাণত্যাগ করে।

এদিকে সিপাহীদের দ্বারা ধৃত হয়ে মহেন্দ্র কারাগারে যায়। সঙ্গে সত্যানন্দ। সত্যানন্দের ইঙ্গিতে একজন শিষ্য জীবানন্দ মহেন্দ্রের কন্যাকে নিজ ভগিনী নিমাইয়ের কাছে রেখে আসে। সেখানে জীবানন্দ, স্ত্রী শান্তির দুঃখ দেখে, পুনরায় গৃহধর্ম গ্রহণ করতে চাইলে শান্তিই তাকে বারণ করে। তখন জীবানন্দ আবার 'আনন্দমঠে' ফিরে আসে। জীবানন্দের প্রত্যাগমনের পর শান্তিও সন্ন্যাসী পুরুষের বেশ ধারণ করে আনন্দমঠের দিকে রওনা হয়।

ওদিকে ভবানন্দ নামে সত্যানন্দের একজন প্রিয় শিষ্য মৃত কল্যাণীকে জীবনদান করে এবং গোপনে অন্যত্র রেখে দেয়।

সত্যানন্দ ও মহেন্দ্র সন্তানসেনার সাহায্যে কারাগার থেকে মুক্ত হন। তাবপব সত্যানন্দ, মহেন্দ্র ও নবীনানন্দ নামক এক সন্ন্যাসীকে দীক্ষা দেন। মহেন্দ্রের উপব ভার পড়ে পদচিহ্ন গ্রামে ফিরে গিয়ে দুর্গ নির্মাণ কবার। নবীনানন্দকে সত্যানন্দ চিনতে পারলেন যে, সে জীবানন্দের স্ত্রী শান্তি। শান্তি সত্যানন্দকে প্রতিশ্রুতি দিল, সে জীবানন্দকে পথভ্রষ্ট করবে না, বরং ধর্মপথে চালিত করবে। তারপর থেকেই জীবানন্দের সঙ্গে সঙ্গে শান্তি ফিরতে লাগল।

সন্তানসেনা-দমনে ইংরেজ সেনাপতি ও সিপাহীসেনা নিযুক্ত হল। সন্তানগণও প্রাণপণ করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হল।

এদিকে ভবানন্দ কল্যাণীকে বিবাহ করতে চায়, কিন্তু কল্যাণী রাজী হয না। ভবানন্দের মনে পাপ ঢুকলেও সে কিন্তু বিশ্বাসঘাতক নয়। তাই সত্যানন্দ-প্রেবিত ধীরানন্দ নামক এক সন্ন্যাসীব বিদ্রোহের উস্‌কানিতে ভবানন্দ বিরক্ত হয়। শেষ পর্যন্ত ভবানন্দ অসীম বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রাণত্যাগ করে। মৃত্যুকালে সে সত্যানন্দের আশীর্বাদ লাভ করে।

সন্তানসেনার সঙ্গে যুদ্ধে ইংরেজসেনা পরাজিত হয়। জীবানন্দ যুদ্ধে হত হন। কিন্তু একজন মহাপুরুষের দ্বারা পুনর্জীবন প্রাপ্ত হন। শান্তি ও জীবানন্দ হিমালয়ে গিয়ে দেবার্চনায় জীবন কাটাবার সংকল্প গ্রহণ করে। মহেন্দ্র ও কল্যাণী, কন্যা সুকুমারীকে ফেরৎ পেয়ে সুখে সংসারজীবন যাপন করতে থাকে। মন্বন্তরশেষে দেশে কিছুটা শান্তি বিরাজমান। সত্যানন্দকে মহাপুরুষ এসে বললেন—তোমার কাজ শেষ হয়েছে। এখন দেশে ইংরাজ স্বাজত্ব চলবে। দু'জনে দু'জনের হাত ধরে কোথায় চলে গেলেন।

'আনন্দমঠ'-এর এই কাহিনীর মধ্যে দৃঢ় বন্ধন নেই। বিভিন্ন চরিত্রের ব্যক্তিগত কাহিনী ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। কিন্তু আনন্দমঠ প্রতিষ্ঠানটিকে কেন্দ্র করে কাহিনীর প্রসার বলে—আদর্শগত ঐক্য ঠিকই বজায় থাকে। এদিক থেকে কাহিনীকার ভুল করেননি। নামকরণের মধ্যেও লেখকের মূল দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় মেলে।

'আনন্দমঠ'-এর সন্ন্যাসী বিদ্রোহের একটি ঐতিহাসিক পটভূমিকা আছে। এ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র 'দেবী চৌধুরাণী'র 'বিজ্ঞাপনে' লেখেন—" 'আনন্দমঠ' প্রকাশিত হইলে পর, অনেকে জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন ঐ গ্রন্থের কোন ঐতিহাহিক ভিত্তি আছে কিনা। সন্ন্যাসি-বিদ্রোহ ঐতিহাসিক বটে, কিন্তু পাঠককে সে কথা জানাইবার বিশেষ প্রয়োজনের অভাব। এই বিবেচনায় আমি সে পরিচয় কিছুই দিই নাই। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা আমার উদ্দেশ্য ছিল না, সুতরাং ঐতিহাসিকতার ভাণ করি নাই। এক্ষণে দেখিয়া শুনিয়া ইচ্ছা হইয়াছে আনন্দমঠের ভবিষ্যৎ সংস্করণে সন্ন্যাসি-বিদ্রোহের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব।"

ফলে, বঙ্কিম 'আনন্দমঠে'র তৃতীয় সংস্করণের পরিশিষ্টে 'GLeig's Memoris of the Life of Warren Hasting এবং W W. Hunter's Annals of Rural Bengal' থেকে উদ্ধৃতি দেন।

'আনন্দমঠে'র দু'একটি সামান্য ঐতিহাসিক ভ্রান্তির মধ্যে অন্যতম হ'ল—ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় বাংলার নবাব মীবজাফর ছিলেন না। মন্বন্তরের সময় মসনদে আসীন ছিলেন যথাক্রমে মীরজাফরের পুত্র সৈয়েফুদ্দৌলা ও মুবারেকুদ্দৌলা।

গানঃ—'আনন্দমঠে' সন্নিবেশিত তিনটি গান বা কবিতা এই গ্রন্থ রচনার পূর্বে রচিত বা শ্রুত। পূর্ণচন্দ্র লিখেছেন—'ধীরে সমীরে তটিনীতীরে' ও 'হরে মুরারে মধুকৈটভারে'—কবিতা দু'টি বঙ্কিমের বাল্যকালে শ্রুত। 'বন্দে মাতরম্‌' সঙ্গীত বঙ্কিমের ক্লাসিক সৃষ্টি। এটি জাতীয় আন্দোলনে জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা লাভ করে।

'আনন্দমঠ'-এর গুরুত্ব উপন্যাস হিসাবে যত না, তদপেক্ষা এটি উনবিংশ শতাব্দীর জাতীয় আন্দোলনে বাংলা তথা ভারতীয় জনমানসে জাগরণের প্রেরণা জুগিয়েছিল বলে চিরকাল জাতীয় সম্পদরূপে গণ্য হবার যোগ্য।

বিভিন্ন ভাষায় 'আনন্দমঠ' গ্রন্থখানি অনূদিত হয়। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, কোলকাতা (২৮শে ডিসেম্বর) ১৯০৬-এ 'The Abbey of Bliss' নামে ইংরেজী অনুবাদ করেন। তাছাড়া, হিন্দী, মারাঠী, তামিল, তেলেগু, কানাড়ী ভাষাতেও গ্রন্থখানি অনূদিত হয়েছে।

আবার বেদগ্রাম (চন্দ্রঃ ৬/৫)। চন্দ্রশেখর উন্মাদিনী শৈবলিনীকে নিয়ে নিজ বাসভূমি বেদগ্রামে ফিরলেন।

আবার সেই (চন্দ্রঃ ৫/২)। ইংরেজের নৌকা দলনীকে এক নির্জন নদীতীরে নামিয়ে দিয়ে গেল। এমন সময়ে সেই পূর্বদৃষ্ট শৈবলিনীর উদ্ধারকারী ব্রহ্মচারীর দেখা পাওয়া গেল।

আমাকে একজামিন দিতে হইল (ইন্দিরা, ১৩ পরিঃ)। ইন্দিরা স্বামীর সঙ্গে রাত্রে দেখা করার জন্য প্রস্তুত হল। কিন্তু আজ পর্যন্ত সে পুরুষের সঙ্গে কথাবার্তায় অভ্যস্ত নয়। তাই সুভাষিণী ও ইন্দিরা, একজন পুরুষ ও অন্যজন স্ত্রী সেজে প্রেমাভিনয় করল। এমনিভাবে ইন্দিরাকে সুভাষিণীর কাছে প্রেমের পরীক্ষা দিতে হল।

আমার প্রাণত্যাগের প্রতিজ্ঞা (ইন্দিরা, ১৪ পরিঃ)। রাত্রে স্বামীর সঙ্গে ইন্দিরার সাক্ষাৎ হল। স্বামী তাকে অপরিচিতা নারী মনে করে তার রূপমুগ্ধ। ইন্দিরা চায় তার স্ত্রীর গৌরব উদ্ধার করতে। কিন্তু কথাপ্রসঙ্গে স্বামীর মুখ থেকে যখন সে শুনল যে, অপহৃতা স্ত্রীকে ফিরে পেলেও তিনি আর গ্রহণ করবেন না, তখন ইন্দিরার মাথায় বজ্রাঘাত হল। তবে ইন্দিরা প্রতিজ্ঞা করল—"ইনি আমায় স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিবেন, নচেৎ আমি প্রাণত্যাগ করিব।"

আমি ত উন্মাদিনী (মৃণাঃ ৩/৬)। হেমচন্দ্র ও মনোরমা নিজেদের প্রেমকথা ব্যক্ত করছে। মনোরমা কখনো সরলা বালিকা, কখনো বয়স্কা মহিলার ন্যায় কথাবার্তা বলেছে। পশুপতির প্রতি ভালবাসা মনোরমাকে উন্মাদিনী করেছে।

আমি শ্বশুরবাড়ী যাইব (ইন্দিরা, ১ম পরিঃ)। বহুদিন পর ইন্দিরা শ্বশুরবাড়ী যাবে, তার আয়োজনের বর্ণনা দিয়ে 'ইন্দিরা' উপন্যাসের সুরু হয়েছে।

আর একটি সংবাদ (মৃণাঃ ৩/৫)। মাধবাচার্যও হেমচন্দ্রের নিকট মৃণালিনী সম্পর্কে আর একটি সংবাদ পরিবেশন করলেন। সেটি হল মৃণালিনী হৃষীকেশের গৃহ ত্যাগ করেছেন। মৃণালিনীর চরিত্রদোষ সম্পর্কে এবার হেমচন্দ্রের ধারণা দৃঢ় হল।

আরোগ্য (দুর্গেঃ ২ ৮)। কত্‌লু খাঁর প্রাসাদে জগৎসিংহ ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করলেন।

আলাপ (দুর্গেঃ ১/২)। শৈলেশ্বরের দেবমন্দিরে জগৎসিংহ, বিমলা ও তিলোত্তমার প্রথম সাক্ষাতের পর প্রাথমিক আলাপ জমে উঠেছে।

আশমানির দৌত্য (দুর্গেঃ ১/১১)। আশমানি নামে বিমলার পরিচারিকা

গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ নামে এক বোকা ব্রাহ্মণকে বিমলার সঙ্গে শৈলেশ্বরের মন্দিরে যেতে রাজী করার কাজে দূতগিরি করেছে।

আশমানির অভিসার (দুর্গেঃ ১/১২)॥ আশমানির বিদ্যাদিগ্‌গজের কাছে গমনকে রসিকতা করে 'অভিসার' আখ্যা দেওয়া হয়েছে, কারণ গজপতি আশমানিকে তার শ্রীরাধিকা বলে মনে করে। পরিচ্ছেদটি হাস্যরসসিক্ত।

আশমানির প্রেম (দুর্গেঃ ১/১৩)। হাস্যরসসিক্ত পরিচ্ছেদ। আশমানি গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজের সঙ্গে প্রেমাভিনয় করেছে।

আশাপথে (বিষঃ ৩৫ পরিঃ)। সূর্যমুখী ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠলেন। এদিকে ব্রহ্মচারী-প্রদত্ত পত্র নগেন্দ্র অনেক পরে পেলেন। তবুও তাঁর মনে আশা জাগলো যদি সূর্যমুখীকে খুঁজে পাওয়া যায়।

আশার প্রদীপ (ইন্দিরা, ১০ম পরিঃ)। সুভাষিণী ইন্দিরার বাড়ীর খবর আনার জন্য চেষ্টা করল, কিন্তু সক্ষম হল না। ইন্দিরার আশার প্রদীপ বুঝি নিভে গেল।

আশীর্বাদ-পত্র (বিষঃ ২৮ পরিঃ)। সূর্যমুখী গৃহত্যাগকালে কমলমণিকে আশীর্বাদ-পূত যে পত্রখানি দিয়ে যান, তাতে নিজের মনের সমস্ত কথা ব্যক্ত করেছেন।

আশ্রয়ে (কপাঃ ১/৮)। কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার কাপালিকের হাত থেকে পালিয়ে অধিকারীর আশ্রয়ে এসে উঠেছে। এ অংশে অধিকারী কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার-এর বিবাহের ঘটকালী করেছে। এই সাদৃশ্যবশে বঙ্কিমচন্দ্র এখানে উদ্ধৃতি দিয়েছেন শেক্‌স্‌পীয়রের 'Romeo and Juliet' নাটকের চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্য থেকে Friar Lawrence-এর উক্তি—

"And that very night—
Shall Romeo bear thee to Mantua."

রোমিও ও জুলিয়েট পরস্পরকে ভালবাসে। কিন্তু জুলিয়েট-এর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার সঙ্গে Paris-এর বিবাহ ঠিক হয়। তখন তারা Friar Lawrence-এর কাছ থেকে এ বিপদে উদ্ধার পাবার জন্য উপায় জানতে চায়। Friar বললেন—তিনি একটি পানীয় দেবেন। সেটি জুলিয়েট পান করলে ২৪০ ঘণ্টা তার দেহে মৃত্যুলক্ষণ প্রকাশ পাবে। তখন তাকে কবরস্থ করা হবে। রোমিও সেই কবর থেকে জুলিয়েটকে নিয়ে Mantua-তে চলে যাবে।

আয়েষা (দুর্গেঃ ২/১)। বন্দী ও অসুস্থ জগৎসিংহের সেবার জন্য কত্‌লু খাঁর কন্যা আয়েষার প্রথম উপস্থিতি ঘটেছে এই পরিচ্ছেদে।

আয়েষার পত্র (দুর্গেঃ ২/১৯)। আয়েষা জগৎসিংহকে একটি পত্রের দ্বারা

জানালেন—জগৎসিংহ সুখী হলেই তিনি সুখী হবেন। জগৎসিংহও পত্রোত্তরে আয়েষাকে 'রমণীরত্ন' আখ্যা দিয়ে তাঁর মর্যাদা দিলেন।

***ইন্দিরা।** "ইন্দিরা ছোট ছিল—বড় হইয়াছে।"

১২৭৯ সালের 'বঙ্গদর্শন' চৈত্রসংখ্যায় 'ইন্দিরা' ছোটগল্প আকারে প্রকাশিত হয়। ১৮৭৩ সালে 'ইন্দিরা' প্রথম যখন পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়, তখনো বঙ্গদর্শনের পাঠটুকুই বর্তমান ছিল। তখন পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৪৫। প্রথম সংস্করণের আখ্যা পত্রটি এরূপ—

"ইন্দিরা / উপন্যাস। / বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত / কাঁটালপাড়া। / বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয়ে শ্রীহারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, / কর্ত্তৃক মুদ্রিত। / ১২৮০ / মূল্য চারি আনা মাত্র। /"

বঙ্কিমচন্দ্র, মৃত্যুর এক বছর পূর্বে, ১৮৯৩ সালে, 'ইন্দিরা'কে সংস্কার করে ১৭৭ পৃষ্ঠার পঞ্চম সংস্করণ বের করেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ বঙ্কিম গ্রন্থাবলীর সম্পাদকদ্বয় বিভিন্ন সংস্করণ সম্বন্ধে লিখেছেন—

" 'ইন্দিরা'র দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণের স্বতন্ত্র পুস্তক আমরা দেখি নাই। অনুমান হয়, ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'উপকথা' পুস্তকে মুদ্রিত 'ইন্দিরা'কে দ্বিতীয় সংস্করণ এবং ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত 'উপকথা'র দ্বিতীয় সংস্করণে প্রকাশিত 'ইন্দিরা'কে তৃতীয় সংস্করণ হিসাবে গণ্য করা হইয়াছে। এই অনুমানের পক্ষে বলা যাইতে পারে যে, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস' পুস্তকে 'ইন্দিরা'র চতুর্থ সংস্করণও (পৃ. ৪৫) যোজিত হইয়াছে। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত পঞ্চম সংস্করণের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ১৭৭।"

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, 'ইন্দিরা'র প্রথম সংস্করণের পাঠ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাবলীতে সন্নিবেশিত আছে।

'ইন্দিরা'র কলেবর-বৃদ্ধির কারণ হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র পঞ্চম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে লেখেন।—

"ইন্দিরা ছোট ছিল—বড় হইয়াছে। ইহা যদি কেহ অপরাধ বলিয়া গণ্য করেন, তবে ইন্দিরা বিনীতভাবে নিবেদন করিতে পারে যে, এমন অনেক ছোটই বড় হইয়া থাকে। ভগবানের ইচ্ছায় নিতান্তই ছোট বড় হইতেছে। রাজার কাজ ত এই দেখি, ছোটকে বড় করিয়া, বড়কে ছোট করেন। সমাজও দেখিতে পাই বড়কে ছোট, ছোটকে বড় করেম। আমিও যাহার অধীন, সে না হয়, আমাকে ছোট দেখিয়া বড় করিল। তার আর কৈফিয়ৎ কি দিব?

"তবে দোষের কথাটা এই যে, বড় হইলে দর বাড়ে। রাজার কৃপায় বা সমাজের

কৃপায় যাঁহারা বড় হয়েন, তাঁহারা বড় হইলেও আপনার আপনার দর বাড়াইয়া বসেন। এমন কি, পুলিসের জমাদার যিনি এক টাকা ঘুষেই সন্তুষ্ট, দারোগা হইলেই তিনি দুই টাকা চাহিয়া বসেন, কেন না, বড় হইয়া তাঁহার দর বাড়িয়াছে। গরীব ইন্দিরা বলিতে পারে, আমি হঠাৎ বড় হইলাম, আমার কেন দর বাড়িবে না ?

"তবে, ইন্দিরা বড় হইয়া ভাল করিয়াছে, কি মন্দ করিয়াছে, সেটা খুব সংশয়ের স্থল। সেটার বিচার আবশ্যক বটে। ছোট, ছোট থাকিলেই ভাল। ছোট লোক বড় হইয়া কবে ভাল হইয়াছে ? কিন্তু অনেক ছোট লোকই তাহা স্বীকার করিবে না। ইন্দিরা কেন তাহা স্বীকার করিবে ?

"পাঠক বোধ হয়, ইন্দিরার কলেবরবৃদ্ধির কারণ জানিতে ইচ্ছা করিতে পারেন। তাহা বুঝাইতে গেলে আপনার পুস্তকের আপনি সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। সে অবিধেয় কার্য্যে আমার প্রবৃত্তি নাই। যিনি বোদ্ধা, তিনি ছোট ইন্দিরাখানি মনঃ-সংযোগ দিয়া পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন যে, তাহাতে কি কি দোষ ছিল এবং এক্ষণে তাহা কি প্রকারে সংশোধিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে, পুরাতন নামে এ একখানা নূতন গ্রন্থ। নূতন গ্রন্থ প্রণয়নে সকলেরই অধিকার আছে। গ্রন্থকারের ইহাই যথেষ্ট সাফাই।"

এ থেকে বোঝা যায়, বঙ্কিম কোন কৈফিয়ৎই দেননি। তবে কিছু কিছু কারণ অনুমান করা যেতে পারে।

'ইন্দিরা'কে প্রথমে বঙ্কিম 'উপকথা' আখ্যা দিয়েছিলেন। কিন্তু তা তাঁর মনঃপূত ছিল না। তাই উপকথাকে উপন্যাসে পরিবর্তিত করতে গিয়ে তাঁকে প্রায় নূতন গ্রন্থ লিখতে হয়েছে। এছাড়া, অন্যান্য কিছু কিছু ছোটখাটো দোষক্রটিরও সংশোধন করা হয়েছে।

তবে, এই কলেবর-বৃদ্ধির ফলে উপন্যাসের যে কিছু ক্ষতি হয়নি এমন নয়। কিছু কিছু অপ্রয়োজনীয় ঘটনার বিস্তারিত সমাবেশ করতে হয়েছে। ব্রহ্মঠাকুরানী ও বাড়ীর গিন্নিকে নিয়ে ইন্দিরার বিস্তৃত রহস্যঘটনা মূলকাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগবিহীন। 'একবিংশতিতম পরিচ্ছেদ, সেকালে যেমন ছিল'—নিতান্তই যে অপ্রয়োজনীয়, তা বঙ্কিম নিজেই বুঝেছিলেন। তাই তিনি শেষে কৈফিয়ৎ দিয়েছেন—"এ পরিচ্ছেদটা না লিখিলেও লিখিতে পারিতাম। তবে এ দেশের গ্রাম্য স্ত্রীদিগের জীবনের এই ভাগটুকু এখন লোপ পাইয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। লোপ পাইয়াছে ভালই হইয়াছে ; কেন না, ইহার সঙ্গে অশ্লীলতা, নির্লজ্জতা, কদাচিৎ বা দুর্নীতি, আসিয়া মিশিত। কিন্তু যাহা লোপ পাইয়াছে, তাহার একটা চিত্র দিবার বাসনায় এই

পরিচ্ছেদটা লিখিলাম।" বলা বাহুল্য, বঙ্কিমের এর জন্য স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লেখাই উচিত ছিল, উপন্যাসের গঠন শিথিল করার দরকার ছিল না।

এছাড়া, আরও অনেক দোষত্রুটি আছে উপন্যাসে। প্রথমতঃ. ইন্দিরার ডাকঘর সম্বন্ধে অজ্ঞতার ঘটনাটি অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়।

দ্বিতীয়তঃ, ইন্দিরার পিতৃগ্রামের কাছ থেকে আরো দূরে কোলকাতায় আসার ঘটনাটির পিছনে যে যুক্তি আছে, তা যথেষ্ট নয়।

তৃতীয়তঃ, ইন্দিরার বিদ্যাধরী হবার কি প্রয়োজন ছিল ?

বিভিন্ন সংস্করণের পার্থক্য ঃ 'ইন্দিরা'র প্রথম সংস্করণের সঙ্গে পঞ্চম সংস্করণের পার্থক্যগুলি এরূপ।—" 'ইন্দিরা'র প্রথম সংস্করণে—

(১) পরিচ্ছেদের নামকরণ হয়নি। পঞ্চম সংস্কবণে (যে সংস্করণ আজ প্রচলিত তাতে) পরিচ্ছেদের নামগুলি কৌতুক রসে উচ্ছল।

(২) প্রথম সংস্করণ আট পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। বর্তমান প্রচলিত সংস্করণ (৫ম সংস্করণ) দ্বাদশ পরিচ্ছেদে প্রসারিত।

(৩) প্রথম সংস্করণে (ক) ছড়াগুলি নাই, (খ) 'কালির বোতল' অনুপস্থিত, (গ) শাপভ্রষ্টা অশরীরী বৃত্তান্ত নাই, (ঘ) পরিশেষে পুনর্বিবাহে বাসরঘরের দৃশ্য ও তৎপ্রসঙ্গে বঙ্কিমের নীতি-উপদেশাবলী নাই। বর্তমান গ্রন্থের যে বিশেষ মাধুর্য তা বঙ্কিমের যত্নকৃত সুসংস্কারের ফলশ্রুতি।" (ডঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায়—কথাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র)

কাহিনী ঃ 'ইন্দিরা'র কাহিনীতে অসম্ভব ঘটনার সমাবেশ হয়েছে। শ্বশুরবাড়ী যাবার পথে ধনীর কন্যা ও বধূ ইন্দিরা ডাকাতদের দ্বারা অপহৃতা হয়েছে। তারপর ঘটনাচক্রে সে অন্যের বাড়ীতে রাঁধুনীগিরি করে। সেখানে তার স্বামীর সঙ্গে দেখা হয়। অনেক কৌশলে সে স্বামীকে বশীভূত করে, অবশেষে নিজের পরিচয় প্রদান করে। শ্বশুরবাড়ীতে আবার ইন্দিরা ফিরে আসে।

কাহিনীর এইসব অসম্ভব ঘটনাকে বঙ্কিম বিশ্বাসের উ' কণ্ঠে এনে উপস্থিত করেছেন।

রচনা-রীতি ঃ 'ইন্দিরা' উপন্যাসের রচনা-রীতিতে বঙ্কিম নূতনত্ব এনেছেন। ইংরেজী সাহিত্যে তখন এ ধরনের উপন্যাস ছিল। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমই প্রথম গল্পের পাত্রপাত্রীর মুখ দিয়ে ঘটনা বর্ণনা করালেন। এই উপন্যাসের নায়িকা ইন্দিরাই গল্পকথক। এই ধরনের উপন্যাসে কিছু অসুবিধা আছে। একটি চরিত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্ত ঘটনার বিশ্লেষণ করা হয় বলে, অন্য চরিত্রগুলি তত পরিস্ফুট

হতে পারে না। 'ইন্দিরা' উপন্যাসে অবশ্য ইন্দিরা যথাসম্ভব নিরপেক্ষ দৃষ্টি ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে। তবুও বলা যায় যে, ইন্দিরার বর্ণনার জন্যই তার স্বামীর কোন কৈফিয়ৎ বা চিন্তাধারা পাঠকের সামনে উপস্থিত হয়নি।

গার্হস্থ্য চিত্র ঃ 'ইন্দিরা' উপন্যাসের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল গার্হস্থ্য চিত্রের সুনিবিড় পরিচয়। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে ঘরের কথা থাকলেও, এমন নিবিড়ভাবে নেই। ইন্দিরার বর্ণনার জন্যও নারীঘটিত বিষয়গুলির সুনিপুণ উল্লেখ আছে। নারী-জগতের সম্বন্ধে বঙ্কিমের এরূপ বিস্তৃত জ্ঞান আমাদের বিস্মিত করে।

'ইন্দিরা'র আরো একটি বৈশিষ্ট্য হাস্যরসের প্রাচুর্য। ইন্দিরা জীবনের দুঃখকে জয় ক'রেছে হাসির দ্বারা। তাই বঙ্কিম গ্রন্থাবন্তে ইংরেজ কবি শেলীর একটি কবিতা তুলে দিয়েছেন, যার মধ্য দিয়ে ইন্দিরার জীবনদর্শনটি ব্যক্ত হয়েছে।—

"Rarely, rarely comest thou,
Spirit of Delight !
Wherefore hast thou left me now
Many a day and night ?
Many a weary night and day !
'Tis since thou art fled away.
How shall ever one like me
Win thee back again ?
With the joyous and the free
Thou wilt scoff at pain.
Spirit false ! Thou hast forgot
All but those who need thee not.

* * *

Let me set my mournful ditty
To a merry measure ,—
Thou wilt never come for pity.
Thou wilt come for pleasure.

* * *

Thou art love and life ! O come !
Make once more my heart thy home !

—Shelley

অনুবাদ : ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে মহীশূর থেকে বি বেঙ্কটাচার্য 'ইন্দিরা'র কানাড়ী অনুবাদ করেন। ইংরাজী অনুবাদ (Indira and Other Stories) ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে জে. ডি. এণ্ডারসন কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

উদিপুরী বেগম (রাজঃ ২/৫)। ঔরঙ্গজেবের খ্রীষ্টিয়ানী বেগম, সুরাসক্তা উদিপুরী বেগমের পরিচয় আছে। জেব-উন্নিসা তাঁর কাছে রূপনগরের কাহিনীটি বোলে নবাবের কানে পৌঁছবার ব্যবস্থা করলেন।

উদিপুরীর দাহনারম্ভ (রাজঃ ৮/৩)। নির্মল উদিপুরীকে চঞ্চলকুমারীর সেবাকার্যে নিযুক্ত করার জন্য জোর করলে, গর্বিতা উদিপুরীর অপমানের একশেষ হল।

উপকূলে (কপাঃ ১/২)। এখানে নদীর উপকূলে নবকুমারকে পরিত্যাগ করে নৌকাযাত্রীরা স্থানত্যাগ করেছে। উপকারী নবকুমারের এরূপ প্রতিদানলাভের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র শেক্‌স্‌পীয়রের 'King Lear' নাটকের প্রথম অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্য থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

"Ingratitude ! Thou marble-hearted fiend !—"

Britain-এর বৃদ্ধ রাজা Lear-এর উক্তি তাঁর জ্যেষ্ঠ জামাতা Duke of Albany-র প্রতি। অর্থ—অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি, পাষাণহৃদয় নারকীয় কীটের ন্যায়।

নবকুমারের মতো রাজা লিয়র-ও নিজ কন্যাকে প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালবাসতেন, কিন্তু তার বিনিময়ে তিনি পেলেন আঘাত। তবে নবকুমারের আঘাতের চেয়ে লিয়র-এর আঘাত আরও গভীর।

উপনগরপ্রান্তে (কপাঃ ৩/৭)। মতিবিবি নবকুমারের কাছে প্রেম নিবেদন করে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ভয়ানক রূপ ধারণ করল। সে পুরুষবেশে নবকুমারের সর্বনাশ-চিন্তায় বের হল। শেক্‌স্‌পীয়রের 'Macbeth' নাটকের প্রথম অঙ্ক সপ্তম দৃশ্যে রাজা ডান্‌কানকে হত্যা করার সংকল্প করে ম্যাকবেথ উক্তি করেছিলেন—

"—I am settled, and bend up
Each corporal agent to this terrible feat "

অর্থাৎ, তাঁর আর কোন সংশয় নেই—তিনি নিজেকে শক্ত করেছেন এবং তাঁর শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে এই সাংঘাতিক কাজের জন্য প্রস্তুত করেছেন।

মতিবিবির মনোভাবেও সেরূপ দৃঢ়তা।

উপক্রমণিকা (চন্দ্রশেখর)। চন্দ্রশেখর উপন্যাসের উপক্রমণিকা অংশে প্রতাপ-শৈবলিনীর বাল্যপ্রণয় এবং শেষ পর্যন্ত চন্দ্রশেখরের সঙ্গে শৈবলিনীর বিবাহ বর্ণিত হয়েছে।

উপসংহার (ইন্দিরা ২২ পরিঃ)। ইন্দিরা শ্বশুরবাড়ী গেল। কিন্তু সুভাষিণী-হারাণী-রমণবাবুদেরও ভুললো না।

উনি তোমার কে ? (মৃণাঃ ৩/১)। হেমচন্দ্র যবনসেনার সঙ্গে যুদ্ধে আহত ও ক্লান্ত অবস্থায় মৃণালিনীর গৃহের দ্বারে ঘুমিয়ে পড়েন। মৃণালিনী যে পাটনীর গৃহে ছিলেন, তার যুবতী কন্যা হেমচন্দ্র সম্বন্ধে মৃণালিনীকে ঐ প্রশ্ন করেন।

উর্ণনাভ (মৃণাঃ ৪/১)। পশুপতি এবং শান্তশীলের কথোপকথনের দ্বারা তাদের বিশ্বাসঘাতকতায় গৌড়দেশে যবন-অধিকারের আলোচনা হয়েছে এখানে। মাকড়সার জালের ন্যায় তারা বিশ্বাসঘাতকতার জাল বিস্তার করেছে।

এই সেই (বিষঃ ৪র্থ পরিঃ)। কুন্দ তার মাতৃ-নির্দেশিত স্বপ্নে যে দুজন অনিষ্টকারীর মূর্তি দর্শন করেছিল, নগেন্দ্র দত্তকে দেখে—তাদের একজন বলে চিনতে পেরেছে।

একটা চোরা চাহনি (ইন্দিরা ১১ পরিঃ)। সুভাষিণীর স্বামী রমণবাবু উকিল। তাঁর এক বড মক্কেলের বাড়ীতে একদিন খাবাব নিমন্ত্রণ ছিল। ইন্দিরা খাবার দেওয়ার সময় চিনতে পারল যে, ইনিই তার স্বামী। কিন্তু সে ভদ্রলোক চিনতে পারলেন না। বরং ইন্দিরার একটা চোবা চাহনিতে কাতর হয়ে পড়লেন।

এখন যাই কোথায় ? (ইন্দিরা ৪র্থ পরিঃ)। বনপথের বাইরে এসে ইন্দিরা প্রথমে এক ব্রাহ্মণের গৃহে আশ্রয়লাভ করেছে, তাবপর কৃষ্ণদাস বসু নামক একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে কোলকাতায় খুল্লতাতের সন্ধানে যাত্রা করেছে।

এতদিনে মুখ ফুটিল (বিষঃ ৪৯ পরিঃ)। স্বভাবনীরব কুন্দ মৃত্যুকালে অনেক কথা বলল। সূর্যমুখী এবং নগেন্দ্র মৃত্যুকালে তার যথার্থ মর্যাদা বুঝতে পারলেন।

এতদিনে সব ফুরাইল (বিষঃ ৩৮ পরিঃ)। সূর্যমুখীর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে নগেন্দ্রের মনে তীব্র অনুশোচনা দেখা দিল। তিনি নিজেরও মৃত্যুকামনা করলেন।

এতদিনের পর ! (মৃণাঃ ৩/১০)। এতদিনের পর হেমচন্দ্র-মৃণালিনীর মিলন হল বটে, কিন্তু হেমচন্দ্র মৃণালিনীর একটি কথায় ভুল বুঝে পুনরায় তাকে ত্যাগ করলেন। দুঃখিনী মৃণালিনীকে গিরিজায়া রক্ষা করল।

ঐশ্বর্য-নরক (রাজঃ ২/৩)। মবারক জেব-উন্নিসার প্রণয়পাত্র। কিন্তু তিনি বিবাহ করতে চাইলে বাদ্‌শাহজাদী রাজী হলেন না। কারণ বিবাহ করা তাঁদের স্বভাববিরুদ্ধ। বাইরে বেরিয়ে মবারক দরিয়াবিবিকে দেখতে পেলেন।

***কপালকুণ্ডলা**। 'কপালকুণ্ডলা' বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় উপন্যাস। গ্রন্থটির প্রকাশ-

কাল সংবৎ ১৯২৩ অর্থাৎ ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগ। কোলকাতার নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। বঙ্কিমচন্দ্র এই গ্রন্থটি তাঁর মেজদা সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করেন।

গ্রন্থ-রচনার উৎস : 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের পটভূমি মেদিনীপুর। অনেকেই অনুমান করেন, বঙ্কিমচন্দ্র যখন মেদিনীপুরের নেগুঁয়াতে কাজ করতেন তখনই এই গ্রন্থ-পরিকল্পনার কারণ ঘটে। সে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের কথা। পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যাযের মতে, বঙ্কিমচন্দ্র যখন নেগুঁয়াতে ছিলেন তখন মাঝে মাঝে এক কাপালিক সন্ন্যাসী তাঁর সঙ্গে দেখা করতেন। সেই সন্ন্যাসী সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা হয়েছিল যে, তিনি সমুদ্র-তীরবর্তী কোন বনে বাস করেন।

মেদিনীপুরে বাসকালে সন্ন্যাসী ও প্রেতের বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনা নিয়ে বহু কাহিনী প্রচলিত হয়েছিল। তন্মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের দৌহিত্র দিব্যেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা নব-পর্যায় 'বঙ্গদর্শনে'র ১৩১৮ সালের কার্তিক সংখ্যায় "বঙ্কিমচরিত (নিশীথে প্রেতিনী দর্শন)" শীর্ষক প্রবন্ধ ও পরে তার বিস্তৃত রূপ ১৩৩১ সালের ২৫শে মাঘ 'সচিত্র শিশিরে' 'নিশীথ রাক্ষসী' নামে প্রকাশিত এবং ১৩৩১ সালের ১০ই শ্রাবণ 'সচিত্র শিশিরে' 'কপালকুণ্ডলার ইতিবৃত্ত' প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য।

এ সম্বন্ধে প্রচলিত গালগল্পের সারবত্তা বিষয়ে স্বভাবতঃই সন্দেহ জাগে। তবে বঙ্কিমের জীবনে যে সন্ন্যাসীর প্রভাব প্রচুর ছিল, তাঁর উপন্যাসগুলি তার সাক্ষ্য। কোন সন্ন্যাসীর সান্নিধ্যে এসে তাঁদের সাধন-পদ্ধতি সম্বন্ধে জানবার কৌতূহল অস্বাভাবিক নয়। বিশেষভাবে গৃহস্থ বঙ্কিম সন্ন্যাস-জীবনকে গার্হস্থ্য পটভূমিতে স্থাপন করে পরীক্ষা করতে আগ্রহী হয়েছিলেন। পূর্ণচন্দ্রের বর্ণনায় জানা যায়, তাঁর মনের এই প্রশ্ন তিনি দীনবন্ধু এবং সঞ্জীবচন্দ্রকে করেছিলেন।

প্রশ্নটি এই—"যদি শিশুকাল হইতে ষোল বৎসর পর্য্যন্ত কোনও স্ত্রীলোক সমুদ্রতীরে বনমধ্যে কাপালিক কর্তৃক প্রতিপালিত হয়, কখনও কাপালিক ভিন্ন অন্য কাহারও মুখ না দেখিতে পায় এবং সমাজের কিছুই জানিতে না পায়, কেবল বনে বনে সমুদ্রতীরে বেড়ায়, পরে সেই স্ত্রীলোকটিকে কেহ বিবাহ করিয়া সমাজে লইয়া আইসে, তবে সমাজসংসর্গে কাহার কতদূর পরিবর্ত্তন হইতে পারে, এবং তাহার উপরে কাপালিকের প্রভাব কি একেবারে অন্তর্হিত হইবে ?"

দীনবন্ধু কোন উত্তর দেননি। সঞ্জীবচন্দ্র প্রথমে রসিকতা করে বলেছিলেন, মেয়েটি গরীবের ঘরে পড়লে চোর হবে। পরে বলেছিলেন—কিছুদিন সন্ন্যাসীর প্রভাব থাকবে বটে, তবে ক্রমে স্বামী-পুত্রের প্রতি প্রেম ও স্নেহে সংসারী হয়ে পড়বে।

তারপর বোধ হয় দীর্ঘকাল ধরে মনের মধ্যে তিনি এই প্রশ্নের উপযুক্ত সমাধান খুঁজেছিলেন। বারুইপুরে থাকাকালে তাঁর এই গ্রন্থরচনার সুযোগ ঘটে।

গ্রন্থের প্রথমে দুরন্ত কুজ্ঝটিকার বর্ণনায় তিনি বাল্যকালের এক ভয়ানক কুয়াশার স্মৃতিচারণ করেছিলেন, এ সংবাদ দিয়েছেন পূর্ণচন্দ্র। তিনি আরও অনুমান করেন, কোনও কুলত্যাগিনী গৃহস্থবধূর কাহিনী অবলম্বনে 'মতিবিবি' চরিত্রটি রচিত।

এমনিভাবে টুকরো টুকরো বিক্ষিপ্ত বাস্তব ঘটনাবলীর সাহায্যে বঙ্কিমমানসে অখণ্ড সৌন্দর্যানুভূতিতে 'কপালকুণ্ডলা'র জন্ম হল।

গ্রন্থ-পরিচয় ও বিভিন্ন সংস্করণ ঃ 'কপালকুণ্ডলা'য় প্রথমে ৩২টি পরিচ্ছেদ ছিল। পরে বঙ্কিমচন্দ্র একটি পরিচ্ছেদ বাদ দেন। প্রথম খণ্ডে—৯টি, দ্বিতীয় খণ্ডে—৬টি, তৃতীয় খণ্ডে—৭টি এবং চতুর্থ খণ্ডে—৯টি, মোট ৩১টি পরিচ্ছেদ আছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে 'কপালকুণ্ডলা'র ৮টি সংস্করণ মুদ্রিত হয়। বিভিন্ন সংস্করণের তারিখগুলি এরূপ ঃ ১ম সং—সংবৎ ১৯২৩ (১৮৬৬), ২য় সং—সংবৎ ১৯২৬ (১৮৬৯), ৩য় সং—১৮৭৪, ৪র্থ সং—১৮৭৮, ৫ম সং—১৮৮১, ৬ষ্ঠ সং—১২৯১ বঙ্গাব্দ (১৮৮৪), ৭ম সং—১৮৮৮, ৮ম সং—১৮৯২।

প্রথম সংস্কবণের সঙ্গে দ্বিতীয় সংস্করণেব কয়েকটি গুরুতর পার্থক্য আছে। প্রথমতঃ, ৪র্থ খণ্ডের প্রথমে একটি পরিচ্ছেদ বাদ দেওয়া হয়। এই পবিচ্ছেদটিতে বঙ্কিমচন্দ্র অদৃষ্টবাদের বিস্তারিত আলোচনা কবেছিলেন। এতে উপন্যাসেব গতি অনেকটা ব্যাহত হয়েছিল। তাই পরিচ্ছেদটি বাদ দিয়ে ভালই হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, উপন্যাসের শেষাংশে একটি গুরুতর পরিবর্তন সাধিত হয়। প্রথম সংস্করণের শেষাংশে ছিল—

"কাপালিক আসনে বসিয়া দেখিলেন, ইহাদের প্রত্যাগমনের কাল অতীত হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা বাটী প্রত্যাগমন করিলেন, কি, এই আশঙ্কায় কাপালিক আসন ত্যাগ করিয়া শ্মশানভূমির উপর দিয়া কূলে গমন করিলেন। কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। ক্ষণেক পরে জলমধ্যে কোন পদার্থ ভাসিয়া ডুবিল দেখিলেন, বোধ হইল যেন মনুষ্যমস্তক মনুষ্যহস্ত। লম্ফ দিয়া অনায়াসে দৃষ্ট পদার্থ কূলে তুলিলেন, দেখিলেন, এ নবকুমারের অচৈতন্যপ্রায় দেহ। অনুভবে বুঝিলেন, কপালকুণ্ডলাও জলমগ্না আছেন। পুনরপি অবতরণ করিয়া তাঁহার অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে পাইলেন না। তীরে পুনরারোহণ করিয়া কাপালিক নবকুমারের চৈতন্য বিধানের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। নবকুমারের সংজ্ঞালাভ হইবামাত্র, নিশ্বাস সহকারে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল। সে বাক্য কেবল, "মৃন্ময়ি, মৃন্ময়ি !" কাপালিক জিজ্ঞাসা করিলেন মৃন্ময়ি কোথায় ? নবকুমার উত্তর করিলেন, "মৃন্ময়ি, মৃন্ময়ি, মৃন্ময়ি !"

এর পরিবর্তে দ্বিতীয় সংস্করণে বর্ণিত হয়েছে—"সেই অনন্তগঙ্গাপ্রবাহমধ্যে, বসন্ত-বায়ু বিক্ষিপ্ত বীচিমালায় আন্দোলিত হইতে হইতে কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার কোথায় গেল ?"

বলা বাহুল্য, প্রথম সংস্করণের দীর্ঘ বর্ণনার পরিবর্তে দ্বিতীয় সংস্করণের সংহত বর্ণনায় কাব্যগুণ অধিকতর বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া, প্রথম সংস্করণের বর্ণনায় আরও কতকগুলি ত্রুটি থেকে গিয়েছিল—

"এই অংশে প্রথম দোষ, বঙ্কিমচন্দ্র ভুলে গিয়েছিলেন যে, কাপালিকের আর পূর্বশক্তি ছিল না জলমগ্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার দূরে থাকুক, কোনরকমে মাত্র নিত্যকর্ম সম্পাদনে সক্ষম ছিলেন। দ্বিতীয় দোষ আসল এবং গুরুতর। ঐ সামান্য কয়েকটি ছত্রের ফলে সমগ্র উপন্যাসখানির চূড়ান্ত ফলশ্রুতি Tragic না হয়ে Pathetic হয়ে পড়েছে, উপন্যাসের বেদনাকে প্রকাশ না করে লেখকের মমতাকে প্রকাশ করেছে।"

(বঙ্কিম সরণী—প্রমথনাথ বিশী)।

আলোচনা : 'কপালকুণ্ডলা' বাংলা উপন্যাসে এক নূতন নিরীক্ষা। বর্তমান বাংলা উপন্যাসে যে নূতনতর চিন্তার প্রকাশ দেখা যায়, এই উপন্যাসটি তার সার্থক অগ্রদূত। এর পটভূমির নূতনত্ব গ্রন্থটির আকর্ষণই শুধু বাড়ায়নি, নায়িকা-চরিত্রটিকেও সুপরিস্ফুট করেছে।

কাহিনী : 'কপালকুণ্ডলা'র কাহিনীটি এই।—

দীর্ঘ দু'শ বছর পূর্বে মাঘ মাসের এক রাত্রিশেষে গঙ্গাসাগর থেকে প্রত্যাগত এক যাত্রীবাহী নৌকা ঘন কুয়াশার মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছিল। সেই নৌকার একজন যুবকযাত্রীর নির্দেশে শেষ পর্যন্ত নৌকা এক নদীর তীরবর্তী অরণ্যভূমিতে এসে উপস্থিত হল। জোয়ার আসার আগে আহারের জন্য নৌকাবোহীরা প্রস্তুত হল। কিন্তু কাঠ নাই। অন্য কেউ কাঠ সংগ্রহের জন্য বনে যেতে রাজী না হওয়ায়, শেষ পর্যন্ত, নবকুমার একাকীই বনে গমন করল। নবকুমাব ধনীর দুলাল। কাষ্ঠাহবণের পরিশ্রম তার কাছে কষ্টকর মনে হল। তাই তাব ফিবতে দেবী হতে লাগল। এদিকে নদীতে জোয়ার এসে যাওয়ায়, নৌকাযাত্রীরা তাডাতাড়ি নৌকায উঠে নৌকা ছেড়ে দিল। পরে যখন নৌকার বেগ কমল, তখন আর কেউ ফিরতে চাইল না। এমনিভাবে নির্জন সমুদ্রতীরে নবকুমার বনবাসে বিসর্জিত হল।

নদীতীরে ফিরে নবকুমার সারাদিন নৌকার জন্য অপেক্ষা করল। তারপর আশ্রয়ের সন্ধানে বনের মধ্যেই প্রবেশ করল। কিছুদূরে একটি আলো দেখতে পেয়ে নবকুমার সেদিকেই চলল। গিয়ে দেখে, এক ভীষণদর্শন কাপালিক অগ্নি জ্বালিয়ে

শবাসনে বসে সাধনা করছে। নবকুমারকে দেখে কাপালিক তাকে একটি কুটীরে নিয়ে গেল এবং খেতে দিল। তারপর আর কাপালিককে দেখতে পাওয়া গেল না। পরদিন সন্ধ্যায় নবকুমার যখন একাকী সমুদ্রতীরে বেড়াচ্ছিল, সে-সময় এক অপূর্ব রমণীমূর্তি দেখতে পেল।

এদিকে কাপালিক নবকুমারকে বলি দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। একদিন রাত্রে শক্ত লতায় নবকুমারের হাত বেঁধে কাপালিক পূজাস্থানে নিয়ে এল। কিন্তু দেখে সেখানে খড়্গ নেই। কাপালিক যেই খড়্গের সন্ধানে গেল, অমনি সেই পূর্বদৃষ্ট নারী, কপালকুণ্ডলা, এসে নবকুমারের বন্ধন মোচন করে পালাতে সাহায্য করল।

কাপালিক এসে নবকুমার ও কপালকুণ্ডলাকে না দেখতে পেয়ে ক্রোধান্বিত হয়ে তাদের অনুসরণ করতে লাগল। কিন্তু এক উঁচু বালির ঢিবি থেকে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল। কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার নিরাপদে বনের প্রান্তে এক কালীমন্দিরের অধিকারীর আশ্রয়ে এসে উঠল। এই অধিকারী কপালকুণ্ডলাকে কন্যার মতো স্নেহ করত। কপালকুণ্ডলা ব্রাহ্মণকন্যা। বাল্যকালে পর্তুগীজ জলদস্যুদের দ্বারা অপহৃতা হয়। তারপর কাপালিক তাকে সমুদ্রতীর থেকে কুড়িয়ে এনে প্রতিপালন করে। কপালকুণ্ডলা প্রায়ই অধিকারীর কাছে আসত।

অধিকারীর চেষ্টায় নবকুমারের সঙ্গে কপালকুণ্ডলার বিবাহ হয়ে গেল। তারপর নবকুমার স্ত্রীকে নিয়ে নিজ বাটী সপ্তগ্রামের দিকে রওনা হল। পথিমধ্যে এক চটীতে মতিবিবি নামে এক স্ত্রীলোকের সঙ্গে নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার সাক্ষাৎ হল। এই মতিবিবি আর কেউ নয়, নবকুমারের পূর্ববিবাহিতা স্ত্রী পদ্মাবতী। পদ্মাবতীর পিতা বাধ্য হয়ে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করায়, নবকুমারের সঙ্গে পদ্মাবতীর বিচ্ছেদ ঘটে। পদ্মাবতী লুৎফউন্নিসা নাম গ্রহণ করে মুঘল দরবারে প্রতিপত্তি লাভ করে। মতিবিবি নবকুমারকে স্বামী বলে চিনতে পারলেও, নবকুমার তাকে চিনতে পারল না।

কপালকুণ্ডলা সপ্তগ্রামে শ্বশুরবাড়াতে এসে উঠেছিল। কিন্তু সমুদ্রতীরের নির্জন বনে বিচরণের স্বাধীনতা হ্রাস পাওয়ায়, কপালকুণ্ডলার মন মাঝে মাঝে উদাস হয়ে যায়। ওদিকে মতিবিবির মনে নবকুমারের প্রতি গভীরতর ভালবাসার সঞ্চার হয়। সে দিল্লী ত্যাগ করে পুনরায় সপ্তগ্রামে এসে উপস্থিত হয়। তারপর একদিন নবকুমারকে সমস্ত পরিচয় দান করে তাকে পুনর্বার গ্রহণ করতে বলে। কিন্তু নবকুমার রাজী হয় না। তখন মতিবিবি প্রতিশোধ-বাসনায় পুরুষবেশ ধারণ করে পূর্বকথিত কাপালিকের সঙ্গে মিলে কপালকুণ্ডলার সর্বনাশের ষড়যন্ত্র করে। বালিয়াড়ি থেকে পড়ে গিয়ে কাপালিকের হাত ভেঙে গিয়েছিল এবং সে কপালকুণ্ডলার মৃত্যুর সুযোগ খুঁজছিল।

কপালকুণ্ডলার ননদিনী শ্যামাসুন্দরী স্বামীর ঘর করে না। তাই তাকে বশীভূত করার জন্য কপালকুণ্ডলা রাত্রিতে বনের মধ্যে ঔষধ সংগ্রহে গেল। নবকুমারের নিষেধ মানল না। বনের মধ্যে পুরুষবেশী মতিবিবির সঙ্গে কপালকুণ্ডলার সাক্ষাৎ হল। কিন্তু বিশেষ কথা হল না। মতিবিবি কপালকুণ্ডলাকে পরদিন বনে আসতে বলল। পরদিন কপালকুণ্ডলা যখন পুরুষবেশী মতিবিবির সঙ্গে কথা বলছিল, তখন কাপালিক নবকুমারকে এনে দূর থেকে তা দেখিয়ে কপালকুণ্ডলার চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ জাগায়। অথচ সে-সময় কপালকুণ্ডলা মতিবিবির সব কথা শুনে স্বামীর উপর নিজের অধিকার ত্যাগ করতে স্বীকৃত হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত কাপালিক, কপালকুণ্ডলা ও নবকুমারকে সপ্তগ্রামের বনভূমিতে এনে পুজার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে নদীতে স্নান করাতে নিয়ে গেল। কারণ কাপালিক তাকে বলি দেবে। নদীতীরে এসে কপালকুণ্ডলার প্রতি নবকুমারের আকুল আর্তি প্রকাশ পেল। নবকুমার জানতে চায় কপালকুণ্ডলা তাকে ভালবাসে কিনা। কিন্তু কপালকুণ্ডলা নীরব। এমন সময় নদীতীর ভগ্ন হওয়ায় কপালকুণ্ডলা জলমগ্ন হল। নবকুমারও জলে ঝাঁপ দিল। কেউ আর উঠল না।

গঠন-কৌশল ঃ গ্রন্থটির গঠন-কৌশলে নূতনত্ব আছে। প্রতিটি পরিচ্ছেদে পূর্ব-বর্তী লেখকদের রচনা উদ্ধৃত ক'রে কাহিনীর পূর্বাভাষ দান করা হয়েছে। কাহিনী বয়নে জটিলতার সৃষ্টি করলেও, সহজভাবেই লেখক কাহিনীকে টেনে নিয়ে গেছেন। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের কালগত ঐক্য দৃঢ়বদ্ধ। মাত্র এক বছরের কিছু বেশী সময়ের ঘটনা এখানে বর্ণিত হয়েছে। পটভূমি-নির্বাচনেও বঙ্কিমচন্দ্র সমুদ্র-তীরবর্তী অঞ্চল, সপ্তগ্রাম ও দিল্লীকেই গ্রহণ করেছেন। কপালকুণ্ডলার চরিত্র ও কাহিনীর সঙ্গে সমুদ্র-তীরবর্তী বনভূমি ও সপ্তগ্রামের বনভূমি অত্যন্ত সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদে নাটকীয় চমকদানও উল্লেখযোগ্য। সর্বাপেক্ষা দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই গ্রন্থের ভাষাভঙ্গী। বঙ্কিমের কবি হৃদয়ের বাণীমূর্ছনা ঝরে পড়েছে 'কপাল-কুণ্ডলা'র প্রতিটি ছত্রে। তার ফলে কাব্যের পরিবেশের মতো সমস্ত কাহিনীটিই পাঠকের মনকে সুদূর স্বপ্নলোকে টেনে নিয়ে যায়।

চরিত্র ঃ চরিত্রগুলিতে বর্ণনার আধিক্য থাকলেও বিশ্লেষণও কম নেই। নবকুমারের হৃদয়ের সুসংক্ষুব্ধ আলোড়নের চিত্রটি উপন্যাসে শেষদিকে প্রকাশিত। মতিবিবির মতি পরিবর্তনের মধ্যে আকস্মিকতা থাকলেও আলোড়িত হৃদয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে।

তত্ত্ব ঃ 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে একটি বহু-প্রচলিত তত্ত্ব নব রূপ লাভ করেছে।

শেক্‌স্‌পীয়রের 'Tempest' নাটকে, কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলা'য় প্রকৃতি ও মানবের যে সম্পর্ক দেখান হয়েছে এবং পরবর্তী কালের রবীন্দ্রনাথের হাতে যা 'বসুন্ধরা' প্রভৃতি কবিতায় কাব্যরূপ লাভ করেছে, প্রকৃতিদুহিতা কপালকুণ্ডলার সঙ্গে মানব-সমাজের সংঘাতে সেই তত্ত্বেরই পোষকতা করা হয়েছে।

শ্রেণীবিভাগ : 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে ইতিহাসের ছোঁয়া থাকলেও, তার গুরুত্ব এমন কিছু নয়। রোম্যান্টিক উপন্যাস হিসাবেই একে গ্রহণ করা যেতে পারে। কপালকুণ্ডলার শেষাংশের দুর্ঘটনা এই উপন্যাসটিকে Tragedy-তে পরিণত করেনি। বরং নবকুমার ও কপালকুণ্ডলা উভয়ের সলিলসমাধি, তাদের মহামিলনের দিকে অদৃশ্য ইঙ্গিত দান করেছে। তবুও কাব্যোপন্যাসটির অন্তরঙ্গে Tragedy-র সুর ধ্বনিত হয়েছে। তার কারণ কপালকুণ্ডলার বিষণ্ণ চারিত্রিকতা।

নামকরণ : এই গ্রন্থের পরিকল্পনাতে ভবভূতি-কৃত 'মালতীমাধব' নাটকেরও কিছু প্রভাব আছে বলে মনে হয়। নাটকের এক স্থানে আছে—"তত্র খলু শ্রীপর্বতাদ্ আগতস্য রাত্রিবিহারিণো নাতিদূরারণ্য সাধকস্য মুণ্ডধারিণো ঘোরঘণ্টনামধেয়স্য অন্তেবাসিনী মহাপ্রভাবাসিনঃ কপালকুণ্ডলা নামানুসংধ্যং সমাগচ্ছতি ততইয়ং প্রবৃত্তিঃ।" এখান থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর গ্রন্থ ও নায়িকার নামকরণ করেন 'কপালকুণ্ডলা'।

বিভিন্ন সমালোচকের মন্তব্য : বইটি প্রকাশের পর বঙ্কিমচন্দ্র ক্ষেত্রনাথকে একখানি উপহার পাঠান। বইটি পড়ে ক্ষেত্রনাথ লেখেন—"কি বলিয়া তোমার এই দ্বিতীয় উপন্যাসখানি সম্পর্কে অভিমত জানাইব তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। ইহা সত্যই অপূর্ব্ব—splendid, ইহার অধিক আর কিছু বলিতে পারি না এবং ইহা দ্বারাই ঔপন্যাসিক হিসাবে বাঙলাসাহিত্যে তোমার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইল জানিবে।"

অক্ষয়চন্দ্র সরকার এই গ্রন্থটি সম্বন্ধে বলেছেন—"এই উপন্যাসখানি বাহির হওয়ামাত্র বঙ্কিমবাবুর যশোরাশি চতুর্দ্দিক্ বিকীর্ণ হইয়া পড়িল এবং ইতিপূর্ব্বে যাঁহারা বাঙ্গালা গ্রন্থকার বলিয়া খ্যাতিপন্ন ছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই যশোজ্যোতিঃ হীনপ্রভ হইয়া পড়িল।"

বিদেশী সমালোচকদের মধ্যে আর ডব্‌লু. ফ্রেজার 'লিটারারি হিস্ট্রি অফ্ ইণ্ডিয়া' (লণ্ডন, ১৮৯৮) গ্রন্থে 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের প্রভূত প্রশংসা করেন। এক স্থানে তিনি লেখেন—"Outside in 'Mariage de Loti' there is nothing comparable to the 'Kopalakundala' in the history of Western fiction"

'কপালকুণ্ডলা'র জনপ্রিয়তা আজও হ্রাস হয়নি। সহজ, সরল, কাব্যময়, রোম্যান্টিক ঘটনাই এই উপন্যাসের প্রধান আকর্ষণ।

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের বিভিন্ন পরিবর্তন সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাবলী থেকে উদ্ধারযোগ্য—

"১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে দামোদব মুখোপাধ্যায় 'মৃন্ময়ী' নাম দিয়া 'কপালকুণ্ডলা'র পরিশিষ্ট স্বরূপ একখানি উপন্যাস প্রকাশ করেন।

'কপালকুণ্ডলা' বিভিন্ন ভাষাতেও অনূদিত হইয়াছে। ১৮৭৬-৭৭ খ্রীষ্টাব্দে 'ন্যাশনাল ম্যাগাজিনে' 'কপালকুণ্ডলা'র ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ১৮৮৫ খ্রীঃ এইচ. এ. ডি. ফিলিপ্‌স্‌ লণ্ডন হইতে 'কপালকুণ্ডলা'র একটি অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহা (প্রফেসব ক্লেম কর্তৃক) জার্মান ভাষায় অনূদিত হয়। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ডি এন ঘোষ কর্তৃক কলিকাতা হইতে 'কপালকুণ্ডলা'র ইংবেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিত হরিচরণ বিদ্যারত্ন ইহার সংস্কৃত অনুবাদ প্রকাশ করেন। এতদ্ব্যতীত ইহা বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক হিন্দী, গুজরাটী, তামিল ও তেলেগু ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

'কপালকুণ্ডলা' সাধারণ রঙ্গালয়ে বহুবার সাফল্যের সহিত অভিনীত হইয়াছে। গিরিশচন্দ্র ঘোষ সর্বপ্রথম ইহা নাটকাকারে রূপান্তরিত কবেন। কিন্তু এই নাট্যরূপ প্রকাশিত হয় নাই; কেবল ইহাব নয়টি গান 'গিরিশ গীতাবলী'তে স্থান পাইযাছে। পরবর্তী কালে অতুলকৃষ্ণ মিত্র কর্তৃক 'কপালকুণ্ডলা' নাট্যাকারে গ্রথিত হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পরে, ১৯৩৯ সনের অক্টোবর মাসে, এই নাট্যরূপ (পৃঃ ১১২) বসুমতী কার্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।"

কাঁদে (চন্দ্রঃ ৩/৪)। নদীতীরে একজন স্ত্রীলোকের ক্রন্দন শুনে ইংরেজ নৌকার প্রধান অমিয়ট সেখানে গেলেন এবং স্ত্রীলোকটিকে নৌকায় তুললেন। এই স্ত্রীলোক শৈবলিনী।

কাননতলে (কপাঃ ৪/২)। কপালকুণ্ডলা বনমধ্যে গিয়ে কাপালিক ও পুরুষবেশী মতিবিবির কথোপকথন শুনতে পেল। এখানে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে Keats-এর "Ode to a Nightingale" কবিতা থেকে—

"—Tender is the night,
And haply the queen moon is on her throne,
Clustered around by all her starry fays;
But here there is no Light."

অর্থাৎ, সুন্দরী রাত্রি। আনন্দোৎফুল্ল চন্দ্ররানী তাঁর সিংহাসনে বসে আছেন। তাঁকে ঘিরে রয়েছে অসংখ্য তারার পরী। কিন্তু এখানে এতটুকু আলো নেই।

কপালকুণ্ডলার ক্ষেত্রেও চন্দ্রালোকিত রাত্রি থাকলেও, কাননে ছিল ঘনান্ধকার।

কাপালিকসঙ্গে (কপাঃ ১/৬)। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের এই পরিচ্ছেদে নবকুমার কাপালিকের বলির উপকরণ হয়েছে। কাপালিক নবকুমারকে লতা দিয়ে দৃঢ়ভাবে বন্ধন করল। কিন্তু পূজাসমাপনান্তে যখন খাঁড়ার সন্ধানে গেল, তখন কপালকুণ্ডলা এসে নবকুমারকে মুক্ত করল।

এখানে শ্রীহর্ষ-রচিত 'রত্নাবলী' নাটকের চতুর্থ অঙ্ক থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে।—

"কথং নিগড়সংযতাসি। দ্রুতম্
নয়ামি ভবতীমিতঃ—"

নাটকে শৃঙ্খলিতা সাগরিকাকে রাজা বলেছিলেন—'একি, তুমি শৃঙ্খলাবদ্ধ? আমি এখনি তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যাব।' তবে পার্থক্য এই যে, নাটকে নারীর বন্ধনমোচন করেছিলেন পুরুষ, কিন্তু উপন্যাসে বন্ধনমোচনকারিণী নারী—কপালকুণ্ডলা।

কালির বোতল (ইন্দিরা ৭ম পরিঃ)। কালির বোতল বলতে সুভাষিণীর শাশুড়ীকে নির্দেশ করা হয়েছে, কারণ তাঁর গায়ের রঙ কালির মতই কালো। প্রথমে তিনি ইন্দিরাকে ঝি রাখতে সম্মত হলেন না, তারপর ইন্দিরার রান্না দেখে মতামত জানাবেন বলে সুভাষিণীকে বললেন।

কাহার আপত্তি (বিষঃ ২৬ পরিঃ)। নগেন্দ্র নিজের মনকে প্রবোধ দেবার জন্য কুন্দকে বিবাহ করার ব্যাপারে চিন্তা করেছেন—"সূর্য্যমুখী উদ্যোগী হইয়া বিবাহ দিয়াছে —তবে আমার এ সুখে আর কাহার আপত্তি ?"

কুন্দের কার্যতৎপরতা (বিষঃ ৪৮ পরিঃ)। কুন্দের কার্যতৎপরতা আর কিছুই নয়—সে বিষপান করেছে।

কুলতিলক (দুর্গেঃ ১/৯)। জগৎসিংহ যেভাবে অল্পসংখ্যক সেনা নিয়ে কৌশলে পাঠান সৈন্যদের বিপর্যস্ত করতে লাগলেন, তাতে সন্তুষ্ট হয়ে "মানসিংহ পুত্রকে এই পত্র লিখিলেন, 'কুলতিলক! তোমা হইতে রাজ্যাধিকার পাঠানশূন্য হইবে জানিলাম; অতএব তোমার সাহায্যার্থে আর দশ সহস্র সেনা পাঠাইলাম।"

কুলসম (চন্দ্রঃ ২/১)। দলনীবেগম তার সঙ্গী কুলসমকে দিয়ে গোপনে একটি পত্র মীরকাশেমের সেনাপতি গুরগণ খাঁর কাছে পাঠিয়েছে।

কুলের বাহির (ইন্দিরা ১৫ পরিঃ)। ইন্দিরা তার স্বামীর সঙ্গে অন্য বাসায় গেল। কিন্তু কুলের বাহিরে গেলেও সে যে কুলটা নয়, তা প্রমাণ করবার জন্য নিজে

ঘরে দরজা বন্ধ করে রইল। স্বামীকে গৃহে প্রবেশ করতে দিল না। বলল—তাকে পুনরায় স্বভাষিণীদের বাড়ীতে রেখে আসতে, নয় অষ্টাহ তার সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করতে। এইভাবে ইন্দিরা স্বামীর ধৈর্যের পরীক্ষা করল।

কুসুমনির্মিতা (মৃণাঃ ২/২)। নবদ্বীপে এসে হেমচন্দ্র যে গৃহে বাস করছিলেন, সেখানে এক ব্রাহ্মণপরিবার বাস করছিল। সেই পরিবারের এক কন্যা মনোরমাকে দেখে হেমচন্দ্রের মনে হল, এ যেন কুসুমনির্মিতা, অর্থাৎ কোমলতামণ্ডিতা নারী।

কুসুমের মধ্যে পাষাণ (দুর্গেঃ ২/২)। আয়েষা স্বভাবতঃই কোমলপ্রাণা। কিন্তু ওসমানের প্রেমকে তিনি যেভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন, তাতে ওসমানের দিক থেকে আয়েষাকে পাষাণহৃদয় বলেই মনে হয়েছে।

কৃতসংকেত (কপাঃ ৪/৪)। কপালকুণ্ডলা শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মণবেশী স্ত্রীলোক-কৃত সংকেতস্থানে যেতে মনস্থ করলেন।

***কৃষ্ণকান্তের উইল ॥**

প্রথম প্রকাশ ঃ 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ১২৮২ সালের পৌষ সংখ্যা 'বঙ্গদর্শন' থেকে ধারাবাহিক প্রকাশিত হতে থাকে। পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন—এই তিন সংখ্যায় কিয়দংশ প্রকাশিত হয়। চৈত্র সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' 'কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রকাশিত হয়নি। পরবর্তী সংখ্যা থেকে 'বঙ্গদর্শন' আর কিছুদিন প্রকাশিত হয়নি ; ফলে, 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর প্রকাশও বন্ধ ছিল। ১২৮৪ সালের বৈশাখ মাস থেকে মধ্যম অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় পুনরায় 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হলে, 'কৃষ্ণকান্তের উইল'ও প্রকাশিত হতে লাগল। ঐ বৎসর মাঘ মাসের পত্রিকায় উপন্যাসখানির শেষ কিস্তি ছাপা হয়। সুতরাং 'বঙ্গদর্শনে'র মোট তেরটি সংখ্যায় 'কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রকাশিত হয়।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে আগস্ট 'কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রটি এরূপ।—

"কৃষ্ণকান্তের উইল / শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় / প্রণীত। / কাঁটালপাড়া। / বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয়ে শ্রীরাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক / মুদ্রিত ও প্রকাশিত। / ১৮৭৮ / All Rights Reserved / মূল্য ১৵০ এক টাকা দুই আনা মাত্র।"

রচনা-কাল ঃ ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে বঙ্কিমচন্দ্র স্বাস্থ্যভঙ্গের জন্য মালদহের রোডসেসের কাজ থেকে ছ'মাসের ছুটি নিয়ে কাঁটালপাড়ায় এসে থাকেন। অনুমান সেই সময়েই তিনি 'কৃষ্ণকান্তের উইল' রচনা করেন। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, এই উপন্যাসখানি রচনার পশ্চাতে বঙ্কিমচন্দ্রের পারিবারিক ঘটনার প্রভাব আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা যাদবচন্দ্র যে উইল করে যান, তা নিয়ে ভ্রাতাদের মধ্যে বিরোধ

উপস্থিত হয়। মনে হয়, এইজন্যই তিনি 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ বন্ধ করেন এবং চুঁচুড়ায় বাস করতে থাকেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ'-এ লিখেছেন—"আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি ত চুঁচুড়ায় বাস করিয়াছেন, ইহার ভিতরে কি কিছু কৃষ্ণকান্তী আছে ?' তিনি বলিলেন, 'তুমি ঠিক বুঝিয়াছ'।"

'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে উইল সম্বন্ধীয় ঘটনার প্রাধান্য থাকলেও, এক সুখী দম্পতির জীবনে বিচ্ছেদের বেদনাই মূল আবেদন জুগিয়েছে।

কাহিনী ঃ হরিদ্রাগ্রামের জমিদার কৃষ্ণকান্ত রায় তাঁর ভ্রাতার মৃত্যুর পর ন্যায্য উইল করে ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দলালকে সম্পত্তির অর্ধেক অংশ দিলেন। তাতে কৃষ্ণকান্তের জ্যেষ্ঠপুত্র হরলাল ক্ষুণ্ণ হয়ে পিতার সঙ্গে ঝগড়া করে পিতৃগৃহ ত্যাগ করেন। কিন্তু তিনি সম্পত্তির লোভ ছাড়লেন না। জাল উইল চালাবার চেষ্টা করলেন। কৃষ্ণকান্তের অনুগৃহীত, উইলেব লিপিকর, ব্রহ্মানন্দ ঘোষের দ্বারা কাজ সমাধা করতে না পেরে, তার ভাইঝি রোহিণীব সাহায্যে হরলাল কৃষ্ণকান্তের সিন্দুকে জাল উইল পাচার করলেন। হবলাল বিধবা রোহিণীকে বিবাহ করবার প্রলোভন দেখিয়েছিলেন। রোহিণী তাই আসল উইলটি নিজেব কাছে রেখে হরলালকে প্রতিশ্রুতি রক্ষাব কথা জানাল। কিন্তু হরলাল তাতে রাজী হলেন না। তাই রোহিণীও তাঁকে আসল উইল দিল না।

বারুণী নামক পুষ্করিণী-তীরের উদ্যানে গোবিন্দলাল নিয়মিত ভ্রমণ করত। রোহিণী সেখানে জল আনতে যেত। গোবিন্দলালেব রূপদর্শনে রোহিণীব মনে অনুরাগ জন্মাল। তখন তার মনে অনুশোচনাও জাগল হরলালের হয়ে জাল উইল পাচার করে এই গোবিন্দলালেরই সর্বনাশ করার জন্য। তাই রোহিণী স্থিব করল, আবার সে কৃষ্ণকান্তেব সিন্দুকে আসল উইল রেখে, জাল উইল নষ্ট কবে দেবে। কিন্তু একদিন রাত্রে এই কাজ করতে গিয়ে রোহিণী কৃষ্ণকান্তের হাতে ধরা পড়ল। অবশ্য নিজের বুদ্ধিবলে সে জাল উইল নষ্ট করে দিল। রোহিণী শেষ পর্যন্ত গোবিন্দলালের চেষ্টাতেই কৃষ্ণকান্তের হাত থেকে মুক্তি পেল। সেই সময় রোহিণী গোবিন্দলালের কাছে প্রকাশ করে দিল যে, সে তাকে ভালবাসে। গোবিন্দলাল কিন্তু তার সদাহাস্যময়ী বালিকা স্ত্রী ভ্রমর ছাড়া আর কাউকে জানে না। ভ্রমরকেও গোবিন্দলাল জানাল রোহিণী তার প্রতি আসক্ত। ভ্রমরের রাগ হল রোহিণীর ওপর। সে দাসীকে দিয়ে রোহিণীকে বারুণী পুষ্করিণীতে ডুবে মরতে বলল।

রোহিণীও বারুণী পুষ্করিণীতে ডুব দিল ব্যর্থতার জ্বালা নিবারণ করার জন্য। সেই সময় গোবিন্দলাল উদ্যানে ভ্রমণ করছিল। অচৈতন্য রোহিণীকে জল থেকে তুলে, তার মুখে ফুঁ দিয়ে ও অনেক কৌশলে গোবিন্দলাল তার চেতনা জাগিয়ে তুলল। কিন্তু

রোহিণীর অনিন্দ্য রূপরাশিতে আকৃষ্ট হল গোবিন্দলালের মন। বাড়ী এসে গোবিন্দলাল সেদিন ভ্রমরকে বলতে পারল না আসল ঘটনাটা। এদিকে নিজের মন থেকে রোহিণীর চিন্তা দূর করার জন্য গোবিন্দলাল জমিদারি দেখার নাম করে একাকী দূরদেশে পাড়ি দিল। ভ্রমরের যখন মন খারাপ, তখন গ্রামে রটে গেল রোহিণী গোবিন্দলালের অনুগৃহীত। ভ্রমর স্বামীকে চিঠিতে জানাল, স্বামীর প্রতি তার আর ভক্তি নেই, তাই তিনি এলেই ভ্রমর বাপের বাড়ী চলে যাবে। গোবিন্দলাল ভ্রমরের অভিমান দূর করবার জন্য হরিদ্রাগ্রামে ফিরল, কিন্তু ভ্রমর বাপের বাড়ী গিয়ে বসে রইল।

ইতিমধ্যে একটা বড় অঘটন ঘটল। কৃষ্ণকান্ত মৃত্যুকালে ভ্রমরের অবস্থার কথা চিন্তা করে, উইল বদল করে গোবিন্দলালের জায়গায় ভ্রমরকে সম্পত্তির অধিকারী করে গেলেন। কৃষ্ণকান্তের মৃত্যু হল। জাঁকজমক করে শ্রাদ্ধশান্তি হল। কিন্তু গোবিন্দলালের মনের ক্ষত বড় হয়ে উঠল। সে নিজে জীবিকার্জনের সংকল্প নিল। ভ্রমর হাতে পায়ে ধরেও গোবিন্দলালের মন ফেরাতে পারল না। গোবিন্দলালের মাও কাশীবাস করলেন। গোবিন্দলাল ভ্রমরকে ত্যাগ করে মাকে কাশী পৌঁছে দিয়ে উধাও হয়ে গেল। তার মনে তখন রোহিণীর চিন্তা প্রবল।

এদিকে ভ্রমরের দুঃখ দেখে ভ্রমরের পিতা মাধবীনাথ গোবিন্দলালকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে লাগলেন। রোহিণী-গোবিন্দলালের সন্ধান মিলল প্রসাদপুর নামক একটি গ্রামে। সেখানে তখন তারা ভোগোন্মত্ত জীবন যাপন করছে। মাধবীনাথ-প্রেরিত নিশাকর নামক এক যুবকের ছলনায় রোহিণী যখন বাড়ীর বাইরে এসে তার সঙ্গে কথা বলছিল, সেই সময়. গোবিন্দলাল তা দেখল। তারপর বিশ্বাসঘাতিনীর শাস্তি হল বুলেটের আঘাতে মৃত্যু।

রোহিণীকে খুন করে গোবিন্দলাল কিছুদিন উধাও হল। অবশেষে ধরা পড়তে হল। ভ্রমরের সম্মতিতে এবং তার পিতার চেষ্টায় গোবিন্দলাল ছাড়া পেল। ভ্রমর গোবিন্দলালকে অর্থসাহায্য করতে লাগল, কিন্তু ঘৃণার বশে দেখা করতে দিল না।

তিলে তিলে ভ্রমর মৃত্যুপথের যাত্রী হল। মৃত্যুশয্যায় দেখা গেল গোবিন্দলালকে। ভ্রমর মরল, কিন্তু পাপের শাস্তিভোগ সুরু হল গোবিন্দলালের। প্রথমে গোবিন্দলাল কিছুদিন অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় কাটাল, তারপর সুস্থ হয়ে একদিন গৃহত্যাগ করল। দীর্ঘকাল পরে হরিদ্রাগ্রামে একবার দেখা গেল সন্ন্যাসী গোবিন্দলালকে। সে তখন সাংসারিক সমস্ত মোহ জয় করে ভগবৎচিন্তায় মগ্ন। তারপর আর কেউ গোবিন্দলালকে হরিদ্রাগ্রামে দেখতে পায়নি।

কাহিনী-বিচার ঃ 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর এই ঘটনাটি দুটি খণ্ডে বিভক্ত, মোট

৫৬টি পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে। প্রথম খণ্ডে আছে ৩১টি পরিচ্ছেদ এবং দ্বিতীয় খণ্ডে আছে ২৫টি পরিচ্ছেদ। ভ্রমরের চূড়ান্ত সর্বনাশ, অর্থাৎ গোবিন্দলালের গৃহত্যাগ এবং রোহিণীর রূপরাশির ধ্যান প্রথম খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে। এখানেই ঘটনার Doing, অর্থাৎ কাজ শেষ হয়েছে। তারপর দ্বিতীয় খণ্ডে সুরু হয়েছে Suffering, অর্থাৎ ফলভোগ। প্রায় কুড়ি বছরের দীর্ঘ কাহিনী উপন্যাসে বর্ণিত হওয়ায়, ঘটনায় কিঞ্চিৎ শিথিলতা এসে গেছে, কিন্তু কাহিনীর পূর্ণাঙ্গ বর্ণনায় তার প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না।

কাহিনী-বর্ণনায় কিঞ্চিৎ ত্রুটিও আছে। উপন্যাসের প্রথমে কৃষ্ণকান্তের স্ত্রী, পুত্রদ্বয় —হরলাল ও বিনোদলাল, বিনোদলালের স্ত্রী ও শিশুপুত্র এবং কন্যা শৈলবতীর উল্লেখ আছে। কিন্তু উপন্যাসের মধ্যে বা শেষে তাদের আর কোন উল্লেখ নেই। উপন্যাসের আয়তনে তাদের সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ স্বরূপ কিছু বলার প্রয়োজন ছিল।

'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ কাহিনী-বর্ণনার প্রধান গুণ হল এর সরলতা। বঙ্কিম কোন আড়ম্বর না করে সোজাসুজি সরল ভাষায় বক্তব্যকে উপস্থাপিত করেছেন। তাই এর ট্র্যাজিক আবেদন সোজাসুজি এত তীক্ষ্ণভাবে পাঠকের হৃদয়ে এসে বেঁধে।

বঙ্কিমের চিরাচরিত রীতি—পাঠক-সম্বোধন ও সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের দ্বারা পরবর্তী ঘটনার পূর্বাভাষ সূচিত করা এ উপন্যাসেও বর্তমান। একটি ইঙ্গিতের তাৎপর্য এখানে আলোচনা করা যেতে পারে। বারুণীর উদ্যানে যখন গোবিন্দলাল রোহিণীর অধরে অধর স্থাপন করে ফুঁ দিয়ে তাকে সচেতন করার চেষ্টা করছিল, তখন বঙ্কিম লিখছেন— "সেই সময়ে ভ্রমর, একটা লাঠি লইয়া, একটা বিড়াল মারিতে যাইতেছিল। বিড়াল মারিতে, লাঠি বিড়ালকে না লাগিয়া, ভ্রমরেরই কপালে লাগিল।" এর চেয়ে ভালভাবে বোধ হয় ভ্রমরের কপাল-ভাঙার ব্যঞ্জনা দেওয়া যেত না।

নামকরণ ঃ 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর নামকরণের তাৎপর্যটুকু বিচার করা দরকার। একটি ঘটনার নামে উপন্যাসের নাম কেন? কারণ বারবার এই উইল-পরিবর্তনের ঘটনাই বারবার কাহিনীর গতি পরিবর্তিত করেছে। প্রথমবারের উইলে হরলাল অসন্তুষ্ট হয়ে গৃহত্যাগ না করলে এবং উইল জাল না করলে কাহিনী জমত না। সুতরাং সমস্ত ঘটনার বীজ এখানে। উপন্যাসের প্রথম খণ্ডে উইলের দীর্ঘ এবং বিচিত্র ভূমিকা। সবশেষে কৃষ্ণকান্ত যখন উইল বদল করে ভ্রমরকে সম্পত্তি দান করলেন, তখন চূড়ান্ত-ভাবে গোবিন্দলাল ও ভ্রমরের বিচ্ছেদ সূচিত হল। কৃষ্ণকান্তের উইলটি উপন্যাসে যেন একটি জীবন্ত চরিত্ররূপে ঘটনার গতি পরিবর্তিত করেছে। তাই নামকরণে অসঙ্গতি খুঁজে পাবার উপায় নেই।

বারুণী ঃ উইল-এর মতো বারুণী পুষ্করিণীরও উপন্যাসে একটি জীবন্ত ভূমিকা

আছে। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য—পুষ্পোদ্যান, কোকিলের কুহুতান, রোহিণীর মনে যেমন গোবিন্দলালের প্রতি আসক্তি জাগিয়েছিল, তেমনি এর একটি ঘরেই গোবিন্দলালের মন রোহিণীর প্রতি দুর্বল হয়েছিল। বারুণী-পুষ্করিণী যেন রোহিণী-গোবিন্দলালের প্রণয়ের সঞ্চারী বিভাব।

নীতিবাদ ঃ 'কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রসঙ্গে নীতিবাদের বহু বাদানুবাদ আজ পর্যন্ত হয়ে আসছে। এই আলোচনার সূত্রপাত ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের হাতে। তিনি "স্বদেশ ও সাহিত্যে" এ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। কিন্তু তর্কের মধ্যে না গিয়ে বলা চলে, বঙ্কিমের নীতিবাগীশ মনোভাবের জন্য রোহিণীকে মৃত্যুবরণ করতে হয়নি। রোহিণীর সর্বনাশের বীজ তার চরিত্রের মধ্যেই নিহিত। তাছাড়া বঙ্কিম তো দূরের কথা, শরৎচন্দ্রও বিধবা রাজলক্ষ্মীকে দিয়ে শ্রীকান্তের ঘর কতটা দৃঢ়ভাবে বেঁধেছেন তা তো পাঠকমাত্রেই জানেন। বঙ্কিমের দ্বারা তাহলে কেমন করে রোহিণী-গোবিন্দলালের মিলনসাধন সম্ভব হবে!

বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল ঃ বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এই দুই সামাজিক উপন্যাসের একটি তুলনামূলক আলোচনা করবার প্রবণতা সহজেই জাগতে পারে। কারণ, এই দুই উপন্যাসের কাহিনীর মধ্যে একটা আপাত-ঐক্য বিদ্যমান। 'বিষবৃক্ষ' এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এই উভয় উপন্যাসের নায়ককেই একজন পতিপরায়ণা স্ত্রীকে ত্যাগ করে বিধবার প্রেমে পড়তে দেখা যায়। কিন্তু কেবলমাত্র এই সাদৃশ্যটুকু ছাড়া পার্থক্যের ভাগই বেশী।

প্রথমতঃ, ভ্রমর এবং সূর্যমুখী চরিত্রের পার্থক্য লক্ষ্য করা যেতে পারে। উভয়েই পতিপরায়ণা। কিন্তু সূর্যমুখীর পতিভক্তি অন্ধ বিশ্বাসে নিমজ্জিত, অপরপক্ষে ভ্রমরের পতিভক্তি শুচিতা দ্বারা ঐশ্বর্যমণ্ডিত। তাই সূর্যমুখীর পক্ষে নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে পুনরায় ঘর বাঁধা সম্ভব হয়েছে, ভ্রমর স্বামীর প্রতি ভক্তি অক্ষুণ্ন রেখেও গোবিন্দলালের সঙ্গে আর মিলতে পারেনি। সূর্যমুখী প্রথম থেকেই ব্যক্তিত্বমণ্ডিত, কিন্তু ভ্রমর দুঃখের অভিঘাতে ক্রমান্বয়ে ব্যক্তিত্ব অর্জন করেছে।

দ্বিতীয়তঃ, রোহিণী আর কুন্দে তফাৎও অনেক। উভয়ে বিধবা হলে কি হবে, কুন্দের বালিকামনে প্রেমের জন্ম যতটা শোভন ও সুন্দর হয়েছে, রোহিণীর ক্ষেত্রে তা গর্হিত মনে হয়েছে। কুন্দ ও রোহিণীর আচরণের পার্থক্যও এর কারণ।

তৃতীয়তঃ, নগেন্দ্রনাথের হৃদয়ে কুন্দের প্রতি যে প্রেমের জন্ম, তা তার হৃদয়ের অন্তস্থল থেকেই অনেকটা উৎসারিত। পরবর্তী ঘটনায় অবশ্য হীরার চেষ্টার প্রভাব অনেক আছে। কিন্তু 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ গোবিন্দলাল কোনদিনই রোহিণীকে মনপ্রাণ দিয়ে

ভালবাসতে পারেনি, সাময়িকভাবে তার রূপমোহে আকৃষ্ট হয়েছিল মাত্র। ঘটনার প্রতিকূল স্রোতের চাপে ভ্রমর ও গোবিন্দলালের মধ্যে যে বিচ্ছেদ দেখা দিয়েছে, অনুকূল স্রোত বইলে তা সম্ভব না-ও হতে পারত।

সবশেষে এই দুই উপন্যাসের পরিণতির ভিন্নতার কথাও স্মরণ করা যেতে পারে।

কৃষ্ণকান্তের উইল ও কমলাকান্তের দপ্তর : 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর তিন বছর পূর্বে (১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ) 'কমলাকান্তের দপ্তর' প্রকাশিত হয়। তাই এই উপন্যাসে কমলাকান্তী-ভাব কিছুটা স্বভাবতঃই এসে পড়েছে। আফিমখোর কৃষ্ণকান্ত নেশার ঝোঁকে কমলাকান্তের মতই নূতন দৃষ্টি লাভ করেন। তখন দেখতে পান কার্তিক মহাদেবকে জ্যেঠামহাশয় বলে ডাকছে (১/২৩)। হাস্যরসেও যেমন, বর্ণনা-ভঙ্গীতেও তেমনি কমলাকান্তী-ভাব আছে।—বসন্তের কোকিলের বর্ণনা (১/৬), ফলাহারের মহিমা বর্ণনা (১/২) তার সাক্ষ্য দেয়।

কয়েকটি দোষ : একই পাত্র-পাত্রীর ক্ষেত্রে কখনো 'আপনি', আবার কখনো 'তুমি' প্রয়োগে অন্যমনস্কতা এ উপন্যাসেও আছে। তাছাড়া, ভাষাতেও কিঞ্চিৎ অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। যেমন—'ভ্রমর রুগ্নশয্যায় শয়ন করিলেন (২/১)—এখানে রোগশয্যা অর্থে 'রুগ্নশয্যা' কথাটি প্রয়োগ করা হয়েছে। পা থেকে হাত সরিয়ে নেওয়া অর্থে বঙ্কিম লিখলেন—'ভ্রমর পদত্যাগ করিল।' (১/২৮)।

বিভিন্ন সংস্করণ ও পরিবর্তন : বঙ্কিমের জীবিতকালে 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর চারটি সংস্করণ হয়। ১ম সং—১৮৭৮ খ্রীঃ (১২৮৫, ভাদ্র), ২য় সং—১৮৮২ খ্রীঃ (পৃঃ ১৭১), তৃতীয় সংস্করণ সম্বন্ধে সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণের সম্পাদক লিখেছেন—"আমরা আখ্যাপত্রহীন তৃতীয় সংস্করণ দেখিয়াছি ; ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ১৭২।" চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয় ৩০শে নভেম্বর ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে।

বিভিন্ন সংস্করণে পরিবর্তনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রোহিণী চরিত্রকে অনেকটা মার্জিতকরণ। প্রথমদিকে যেমন দেখানো হয়েছিল, রোহিণী হরলালের কাছ থেকে টাকা নিয়ে উইল বদল করেছিল, এখানে তা বর্জন করা হয়েছে। গোবিন্দলালের পরিণামও অনুরূপ হয়েছে। 'বঙ্গদর্শনে' ছিল—

"গোবিন্দলাল উঠিলেন। উদ্যান হইতে অবতরণ করিয়া বারুণীর ঘাটে আসিলেন। বারুণীর ঘাটে আসিয়া সোপান অবতরণ করিলেন। সোপান অবতরণ করিয়া জলে নামিলেন। জলে নামিয়া স্বর্গীয় সিংহাসনারূঢ়া জ্যোতির্ময়ী ভ্রমরের মূর্ত্তি মনে মনে কল্পনা করিতে করিতে ডুব দিলেন।

"পরদিন প্রভাতে, যেখানে সাত বৎসর পূর্ব্বে তিনি রোহিণীর মৃতবৎ দেহ পাইয়াছিলেন, সেইখানে তাঁহার মৃতদেহ পাওয়া গেল।"

'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর শেষে পাদটীকায় বঙ্কিম গ্রন্থসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ মন্তব্য করেন—"...অনেক পাঠক আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—'রোহিণীকে মারিলেন কেন?...কাব্যগ্রন্থ মনুষ্যজীবনের কঠিন সমস্যাসকলের ব্যাখ্যামাত্র একথা যিনি না বুঝিয়া, এ কথা বিস্মৃত হইয়া কেবল গল্পের অনুরোধে উপন্যাস পাঠে নিযুক্ত হয়েন, তিনি এ সকল উপন্যাস পাঠ না করিলেই বাধ্য হই।"

অনুবাদ ঃ 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র দুইটি ইংরেজী অনুবাদ হয়। সুপ্রসিদ্ধা মিরিয়ম এস. নাইট (Miriam S. Knight)-এর অনুবাদ জে. এফ. ব্লুম্‌হার্ট (J. F. Blumhardt)-কৃত ভূমিকা, গ্লসারি ও টীকা সমেত লণ্ডন হইতে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বাহির হয়। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা 'মডার্ন রিভিউ' অফিস হইতে দক্ষিণাচরণ রায়-কৃত অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র হিন্দী, তেলেগু ও কানাড়ী অনুবাদ যথাক্রমে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে পাটনা হইতে এ. উপাধ্যায়, ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে মছলিপট্টম হইতে সি. এস. রাও এবং ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে মহীশূর হইতে বি. বেঙ্কটাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত হয়।"

খড়েগ খড়েগ (দুর্গেঃ ১/২১)। জগৎসিংহের সঙ্গে পাঠান সৈনিকগণের যুদ্ধ এই পরিচ্ছেদের বিষয়-বস্তু।

খুন করিয়া ফাঁসি গেলাম (ইন্দিরা ১৬ পরিঃ)। ইন্দিরার আদিষ্ট অষ্টাহ পরীক্ষায় তার স্বামী কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হলেন। স্বামীর এই ধৈর্যগুণ দেখে ইন্দিরা তাঁর দ্বিগুণতর অনুরাগিণী হল। খুন ক'রে লোকে যেমন ফাঁসি বরণ করে, ইন্দিরা তেমনি স্বেচ্ছায় কুলটা কলঙ্ক মাথায় নিয়ে স্বামীসহবাসে মেতে রইল।

খোদা শাহজাদী গড়েন কেন? (রাজঃ ২/৭)। মবারক জেব-উন্নিসার সঙ্গে কথাবার্তায় পুনরায় তাঁর ভালবাসা প্রকাশ করেন এবং বিবাহ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু জেব-উন্নিসা বললেন—'ভালবাসা গরীব-দুঃখীর দুঃখ। সে দুঃখ শাহজাদীরা স্বীকার করে না।'

খোস্ খবর (বিষঃ ২৫ পরিঃ)। খোস্ খবর বলতে এখানে কমলমণি-শ্রীশচন্দ্রের কাছে নগেন্দ্রের কুন্দকে বিবাহ করার খবরকে লক্ষ্য করা হয়েছে। সূর্যমুখী কমলমণিকে পত্রে একথা জানালে তারা প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেনি, কিন্তু নগেন্দ্রের পত্রে তার উল্লেখ দেখে বিশ্বাস করতে বাধ্য হল। 'খোস্ খবর' শব্দটি এখানে ব্যঙ্গার্থে ব্যবহৃত।

গঙ্গাতীরে (চন্দ্রঃ ২/৫)। প্রতাপ তাঁর ভৃত্য রামচরণকে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গাতীরে ফস্টরের নৌকা আক্রমণ ক'রে নৌকা অধিকার করলেন।

গল্‌স্টন ও জন্‌সন্‌ (চন্দ্রঃ ২/৭)। গল্‌স্টন ও জন্‌সন্‌ নামে দু'জন ইংরেজ প্রতাপের বাড়ীতে চড়াও হয়ে শৈবলিনী ভ্রমে সেই গৃহে আশ্রিত দলনী ও কুল্‌সমকে নিয়ে চলে গেল।

গড়মান্দারণ (দুর্গেঃ ১/৫)। গড়-মান্দারণের ইতিহাস এবং বীরেন্দ্রসিংহ, বিমলা ও তিলোত্তমার কিছু পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে।

গিরিজায়ার সংবাদ (মৃণাঃ ৩/৭)। গিরিজায়া মৃণালিনীর কাছে এসে হেমচন্দ্রের কাছে যা-যা শুনেছিল, সমস্ত কথা ব্যক্ত কবল।

গুরগণ খাঁ (চন্দ্রঃ ২/২)। মীরকাসেমের সেনাপতি গুরগণ খাঁর কিছু ঐতিহাসিক পরিচয় দেওয়া হয়েছে। দলনীবেগম গুরগণের ভগিনী। দলনী গোপনে সেনাপতি গুরগণের সঙ্গে দেখা করলেন। কথাবার্তায় গুরগণ প্রকাশ করলেন যে, তিনি মীরকাসেমকে হটিয়ে নিজে নবাব হতে চান। কিন্তু দলনী তাব তীব্র বিরোধিতা করলেন। তখন গুরগণ দলনীকে জব্দ করার জন্য তাঁর নগরে প্রবেশের সম্ভাবনা নির্মূল করলেন।

গৃহদ্বারে (কপাঃ ৪/৫)। কপালকুণ্ডলা ছদ্মবেশী পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বের হলে, নবকুমারও বের হলেন তার সন্ধানে। গৃহদ্বারে দেখা হল কাপালিকের সঙ্গে। কাপালিক নবকুমারকে পরামর্শ দেবার জন্য নবকুমারের ঘরে এসে উঠল।

এখানে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে সেক্সপীয়রের 'ওথেলো' নাটক থেকে।—

"Stand you awhile apart,
Confine yourself but in a patient ..t."

ক্রূর ইয়াগো ওথেলোর মনে তাঁর স্ত্রী ডেস্‌ডিমনার চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ জাগাবার জন্য কৌশল ক'রে ডেস্‌ডিমনা ও কর্মচারী ক্যাসিও-র কথোপকথনকালে দূর থেকে দেখাচ্ছেন এবং ওথেলোকে ধৈর্য ধরার জন্য বলছেন।

এখানে দুষ্ট কাপালিকের কাজও অনেকটা এরকম।

গৃহাভিমুখে (কপাঃ ৪/৮)। কপালকুণ্ডলা যখন লুৎফউন্নিসাকে কথা দিয়ে গৃহাভিমুখে ফিরছিল, তখন কাপালিকের সঙ্গে নবকুমারের সাক্ষাৎ হল। কাপালিক উভয়কে নিয়ে চলল শ্মশানের দিকে। কপালকুণ্ডলার আকাশে ভৈরবীমূর্তি দর্শন উপলক্ষে এখানে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-এর একটি কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে।—

"No spectre greets me—no vain shadow this."

গৃহান্তর (দুর্গেঃ ২/১১)। এই পরিচ্ছেদে জগৎসিংহের গৃহান্তরের ঘটনাটি তুচ্ছ। তার পূর্বে ওসমানের সঙ্গে মুঘল-পাঠানের সন্ধি সম্বন্ধে কথাবার্তা হয়েছে জগৎসিংহের।

গৌড়েশ্বর (মৃণাঃ ২/১)। গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণসেনের সভা ও সেখানে আসন্ন যবন আক্রমণের ঘটনা আলোচিত হয়েছে।

গ্রন্থকারের নিবেদন (রাজঃ/উপসংহার)। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস শেষে এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য ও রাজসিংহের বীরত্ব সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করেছেন।

চঞ্চলকুমারীর পত্র (রাজঃ ৩/৫)। মাণিকলালের কাছ থেকে অনন্ত মিশ্রের নিকটস্থ পত্র রাজসিংহ পড়লেন।

চঞ্চলের বিদায় (রাজঃ ৪/১)। মুঘল সৈন্যের সঙ্গে চঞ্চলকুমারী দিল্লীর দিকে যাত্রা করলেন।

চতুরে চতুরে (দুর্গেঃ ১/১৮)। বিমলা এবং ওসমান দু'জনেই বুদ্ধিতে কম নয়। ওসমানকে চাতুরীতে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টায় বিমলা ব্যর্থ হয়েছেন এবং ওসমানের হাতে বন্দিনী হয়েছেন।

চন্দ্রশেখর ॥ রচনাকাল, প্রকাশকাল ও অন্যান্য তথ্য ঃ কালানুক্রমের দিক থেকে 'চন্দ্রশেখর' বঙ্কিমচন্দ্রের একাদশতম গ্রন্থ এবং উপন্যাসের ক্ষেত্রে সপ্তম উপন্যাস। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাস রচনায় হাত দেন। উপন্যাসটি প্রথমে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৮০ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় এবং শেষ হয় ১২৮১ সালের ভাদ্র সংখ্যায়। তারপর ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রটি এরূপ।—"চন্দ্রশেখর।/উপন্যাস।/শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়/প্রণীত।/কাঁটালপাড়া।/বঙ্গদর্শন যন্ত্রে শ্রী হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক/মুদ্রিত ও প্রকাশিত।/১২৮২।/প্রথম সংস্করণের পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল—১৯৫।

গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার কালেই সাময়িক পত্রে প্রকাশিত রচনাটি পরিমার্জিত করা হয়। পুস্তকাকারে প্রকাশিত গ্রন্থের "বিজ্ঞাপন" অংশে বঙ্কিমচন্দ্র এ সম্বন্ধে লিখেছেন—" 'চন্দ্রশেখর' প্রথমে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে ইহার অনেকাংশ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, অনেকাংশ পরিত্যাগ করা গিয়াছে, এবং কোন কোন স্থান পুনর্বার লিখিত হইয়াছে।

ইহাতে যেসকল ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ আছে, তাহার কোন কোন কথা সচরাচর প্রচলিত ভারতবর্ষীয় বা বাঙ্গালার ইতিহাসে পাওয়া যায় না। সয়ের মতাক্ষরীন্ নামক পারস্য গ্রন্থের একখানি ইংরেজি অনুবাদ আছে ; ঐতিহাসিক বিষয়ে, কোথাও

কোথাও ঐ গ্রন্থের অনুবর্ত্তী হইয়াছি। ঐ গ্রন্থ অত্যন্ত দুর্লভ, ঐ গ্রন্থ পুনর্মুদ্রাঙ্কনের যোগ্য।"

বঙ্কিমচন্দ্র এই গ্রন্থটি তাঁর অনুজ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গপত্রে তিনি লেখেন—"অনুজ/শ্রীমান্ বাবু পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে/এই/গ্রন্থ/স্নেহ-চিহ্নস্বরূপ/উপহার/প্রদত্ত হইল।/"

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালেই 'চন্দ্রশেখর' গ্রন্থের তিনটি সংস্করণ হয়েছিল। ১ম সং—১৮৭৫ খ্রীঃ (১৯৫ পৃঃ), ২য় সং—১৮৮৩ খ্রীঃ (পৃঃ ১৯৭), ৩য় সং—১৮৮৯ খ্রীঃ (পৃঃ ২৩১)। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর বছর ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থটির চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

বঙ্কিমের জীবিতকালে 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের কোন অনুবাদ হয়নি। পরবর্তী কালের বিভিন্ন অনুবাদের মধ্যে—১৯০৪ খ্রীঃ সন্তোষের মন্মথনাথ রায়চৌধুরীর এবং ১৯০৫ খ্রীঃ দেবেন্দ্রচন্দ্র মল্লিকের ইংরাজী অনুবাদ, এস. টি. পিলে (মাদ্রাজ, ১৯০৮) ও এস কে. শর্মার (মাদ্রাজ) তামিল অনুবাদ, টি. এস. রাও (টান্কু, ১৯১০)-এর তেলেগু অনুবাদ উল্লেখযোগ্য।

কাহিনী ঃ 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের কাহিনী ইতিহাসের পটভূমিকায় স্থাপিত। সে ইতিহাস এমনকিছু দূরবর্তী কালের ইতিহাস নয়, বঙ্কিমের এই গ্রন্থ-রচনার একশত বছরের কিছু বেশিকাল আগের কাহিনী। সেটা ১৭৬২-৬৩ খ্রীষ্টাব্দ। মীরকাসেম তখন বাংলার নবাব।

একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বঙ্কিম তাঁর উপন্যাসের ক্রম-বিকাশে যেমন রোমান্সের নভলোক থেকে বাস্তব পৃথিবীতে পদক্ষেপ করেছেন, তেমনি দূরবর্তী কালের ইতিহাস থেকে ক্রমে ক্রমে এগিয়ে আসছেন সমসাময়িক কালের দিক। 'দুর্গেশনন্দিনী'র কাহিনী আকবরের সময়ের, 'মৃণালিনী'র কাহিনী বঙ্গে মুসলমান অধিকারের ও 'চন্দ্রশেখরে'র কাহিনী বঙ্গে ইংরেজ আধিপত্য বিস্তারের।

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে বাংলার নবাব মীরকাসেমের সঙ্গে ইংরাজের বিরোধের ফলে নবাবের ভাগ্য-বিপর্যয়ের কাহিনীর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে শৈবলিনী-প্রতাপ-চন্দ্রশেখরের অনৈতিহাসিক প্রণয়-কাহিনীটি ব্যক্ত করা হয়েছে। অনৈতিহাসিক কাহিনীটিই মূল কাহিনী।

শৈবলিনী প্রতাপকে বাল্যকাল থেকেই ভালবাসে। কিন্তু তাদের বিবাহ হল না। তারা তখন জীবন বিসর্জন দেবার বাসনায় গঙ্গায় ডুবতে গেল। প্রতাপ ডুবল, কিন্তু শৈবলিনী তা পারল না। সেই সময় চন্দ্রশেখর নামে এক ব্রাহ্মণ প্রতাপকে উদ্ধার করে। সেই চন্দ্রশেখরের সঙ্গে বিবাহ হয় শৈবলিনীর।

শৈবলিনী বেশ কিছুদিন স্বামীগৃহে বসবাস করে, চন্দ্রশেখরও তাঁর পড়াশোনার মধ্যে দিন কাটান। এমন সময় ফস্টর নামে এক দুষ্ট ইংরেজের চক্রান্তে, চন্দ্রশেখরের অনুপস্থিতিতে, শৈবলিনী অপহৃতা হয়। চন্দ্রশেখর গৃহে ফিরে শৈবলিনীকে না পেয়ে বিদ্যায় জলাঞ্জলি দিয়ে রামানন্দ স্বামীর নিকট ব্রহ্মচর্যে দীক্ষা নেন।

ওদিকে শৈবলিনীর সখী সুন্দরী প্রতাপকে গিয়ে শৈবলিনী-হরণের কাহিনী বর্ণনা করে। প্রতাপ সুন্দরীর ভগ্নীপতি। প্রতাপ অবিলম্বে ফস্টরের নৌকা থেকে শৈবলিনীকে উদ্ধার করে। তখন প্রতাপ জানতে পারে যে, তার সঙ্গে পুনর্মিলিত হবার আশাতেই শৈবলিনী আর গৃহে ফিরতে রাজী নয়। প্রতাপ তাতে অসন্তুষ্ট হয়। সেই সময় ইংরেজরা প্রতাপকে ধরে নিয়ে যায়। তখন শৈবলিনী নবাবের কাছে গিয়ে সাহায্য নিয়ে প্রতাপকে উদ্ধার করে। প্রতাপ কিন্তু শৈবলিনীকে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, দু'জনের মিলন সম্ভব নয়। প্রতাপ তাকে ছাড়ার জন্য শৈবলিনীকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেয়।

শৈবলিনী প্রতাপকে ত্যাগ ক'রে জীবনের প্রতি বীতরাগ হয়ে একাকী যখন পর্বতারোহণ করছিল, তখন প্রবল ঝঞ্ঝায় বিপর্যস্ত হয়। সেই সময় রামানন্দ স্বামীর আদেশে চন্দ্রশেখর কর্তৃক শৈবলিনীকে রক্ষা করা হয়। শৈবলিনী পাগল হয়ে যায়। সে নিজের পাপের জন্য নরকদর্শন করতে থাকে। অবশেষে রামানন্দ স্বামীর যোগবলে সুস্থ হয়। কিন্তু তবুও প্রতাপকে মন থেকে মুছে ফেলতে পারে না। অবশেষে প্রতাপ যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ ক'রে চন্দ্রশেখর-শৈবলিনীর মিলনকে সম্ভব ক'রে তুলল।

এই মূল কাহিনীর সঙ্গে মীরকাসেম ও তাঁর বেগম দলনীর একটি উপকাহিনীও বঙ্কিমচন্দ্র যোগ করেছেন। দলনী স্বামীকে যুদ্ধে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করে। কিন্তু ভ্রাতার চক্রান্তে তাকে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হয়। নবাবও তাকে ভুল বোঝেন। অবশেষে দলনী বিষপানে আত্মত্যাগ করে। যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজয়ের মুহূর্তে নবাবও দলনীর সতীত্ব ও পতিপ্রেমের পরিচয় পেয়ে মর্মাহত হন।

গঠন-কৌশল ঃ এই উপন্যাস-রচনায় বঙ্কিম তাঁর শিল্পকর্মের জটিল কলাকৌশলের প্রয়োগ করেন। ইতিহাসের ঘটনার সঙ্গে সাধারণ মানুষের ঘটনাকে তিনি সার্থকভাবে সংযুক্ত করেন। অনেক স্থানে তিনি পরবর্তী ঘটনাকে পূর্বে বর্ণনা ক'রে পাঠকের কৌতূহল জাগ্রত করেছেন এবং কাহিনীতে রহস্যময়তার সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেক পরিচ্ছেদের নামকরণ বঙ্কিমের বৈশিষ্ট্য। চন্দ্রশেখরের পরিচ্ছেদ-নামকরণে যেখানে শৈবলিনীর ঘটনা আছে, সেখানে বঙ্কিমের নীতি-শাসিত ভঙ্গীর প্রকাশ ঘটেছে ; যেমন—পাপীয়সী, পাপের বিচিত্র গতি প্রভৃতি। কাহিনীর সূচনা এবং মূল ঘটনার মধ্যে আট

বছরের ব্যবধান। এই কালগত শিথিলতাকে তিনি অনেক পরিমাণে ঢেকেছেন প্রথম অংশটিকে মূল কাহিনীর বহির্ভূত 'উপক্রমণিকা' অংশে রেখে।

ট্র্যাজেডি : 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাস মিলনান্তক নয়, এতে আছে বিয়োগান্তক বেদনা। দলনী চরিত্রের যে শোচনীয় পরিণতি দেখানো হয়েছে, তা গ্রীক ট্র্যাজেডির কথা মনে করিয়ে দেয়। দলনীর ভাগ্য-বিপর্যয়ের জন্য সে নিজে যতটা দায়ী নয়, তার চেয়ে বেশি দায়ী বহির্ঘটনার নিষ্ঠুর নিপীড়ন। প্রতাপের আত্মত্যাগ প্রতাপের জীবনের ট্র্যাজেডিকে প্রকাশিত করেনি, শৈবলিনী-চন্দ্রশেখরের ট্র্যাজেডিকে ঘনীভূত ক'রে তুলেছে। শৈবলিনী ও চন্দ্রশেখর শেষ পর্যন্ত মিলনের আশ্বাস পেয়েছে সত্য, কিন্তু তাদের মিলনের মাঝখানে ব্যবধান সৃষ্টি করেছে প্রতাপের মৃত্যু। এই সূক্ষ্ম ট্র্যাজেডি সেক্সপীরীয় ট্র্যাজেডিরই অনুকরণ। মীরকাসেমের ট্র্যাজেডি একদিকে অন্তরের, অন্যদিকে ইতিহাসের বিপর্যয়ের। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে সামাজিক ও ঐতিহাসিক—দু'দিকের ট্র্যাজেডি-ই দেখানো হয়েছে।

ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গী : শৈবলিনী-ফস্টরের কথোপকথন, নবাব-প্রতাপ-শৈবলিনীর কথোপকথন, প্রতাপের আকস্মিক মৃত্যুবরণ প্রভৃতি ঘটনা ও বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের মধ্যে অনেকাংশে নাটকের রীতিকে গ্রহণ করেছেন। এতে কাহিনীর চমৎকারিত্ব বৃদ্ধি হয়েছে। অবশ্য, বঙ্কিমের কথোপকথনের ভাষা সবসময়ে নাটকের সংলাপের ভাষা হয়ে ওঠেনি। অনেক স্থানে কথোপকথনের ভাষার মধ্যেও আলঙ্কারিক চমৎকৃতি প্রকাশিত হয়েছে। তবে বর্ণনার ভাষায় বঙ্কিম যথেষ্ট কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। বিষয়ানুসারে ভাষারও কিঞ্চিৎ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। প্রতাপ-শৈবলিনীর গঙ্গাবক্ষে সন্তরণের ভাষা এক, শৈবলিনীর নরকদর্শনের বর্ণনা আর এক রমের, রামচরণের কীর্তিকলাপের ভাষাও অন্য। কখনো তৎসম-বহুল, সমাস-বদ্ধ, যুক্তাক্ষরের প্রয়োগ; আবার কখনও অনলঙ্কৃত তদ্ভব ও দেশী-বিদেশী শব্দের প্রয়োগ।

ত্রুটি : তবে উপন্যাসের দু'একটি স্থানে পরিকল্পনাগত ত্রুটি ও কিঞ্চিৎ অসঙ্গতি আছে। যেমন এক স্থানে প্রতাপ সম্বন্ধে বঙ্কিম লিখেছেন—"চন্দ্রশেখর নবাবের সরকারে প্রতাপের চাকরী করিয়া দিলেন। প্রতাপ স্বীয় গুণে দিন দিন উন্নতি করিতে লাগিলেন। এক্ষণে প্রতাপ জমিদার। তাঁহার বৃহৎ অট্টালিকা এবং দেশবিখ্যাত নাম।" আবার সেই প্রতাপ শৈবলিনী-উদ্ধারকালে বলেছেন—"শুন আমার নাম প্রতাপ রায়। নবাবও আমাকে ভয় করেন।" আবার মীরকাসেম শৈবলিনীকে জিজ্ঞেস করেছেন—"প্রতাপ কে? তাহার বাড়ী কোথায়?

শৈবলিনী প্রতাপের সত্য পরিচয় দিল।

ন। এখানে কি করিতে আসিয়াছিল ?

শৈ। সরকারের চাকরি করিবেন বলিয়া।”

এই উদ্ধৃতিগুলি পরস্পর-বিরোধী সিদ্ধান্তের প্রকাশ করে। (ত্রুটি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার জন্য ডঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায়ের ‘কথাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র’ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।)

ঐতিহাসিকতা ঃ ‘চন্দ্রশেখর’ উপন্যাসের ঐতিহাসিক কাহিনী ও চরিত্রগুলিকে বঙ্কিমচন্দ্র যথাযথ রাখবার চেষ্টা করেছেন। এই ঐতিহাসিকতা বিষয়ে তিনি ‘সয়ের মতাক্ষরীন্’ (Seir Mutaqherin) নামক পারস্য গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদের অনুসরণ করেন।

নীতি ঃ ‘চন্দ্রশেখর’ উপন্যাসে বঙ্কিমের নীতিবাদের একটু বাড়াবাড়ি আছে; এইজন্য সমালোচকরা তাঁকে ধিক্কার দিয়ে থাকেন। শিল্পসৃষ্টির খাতিরে যদিও তিনি পাপিষ্ঠা শৈবলিনীর প্রণয়ের পাপগতির চিত্র অঙ্কন করেছেন, তবুও সমাজের দিকে তাকিয়ে এই পাপের ফলাফলও বর্ণনা করেছেন। তাই দীর্ঘসময় ধরে শৈবলিনীকে নরক দর্শন করাতে হয়, তাই শৈবলিনীকে পাগল সাজাতে হয় এবং শৈবলিনীর সতীত্ব পরীক্ষার জন্য সীতার অগ্নিপরীক্ষার চেয়ে অধিক প্রমাণের প্রয়োজন হয়। শৈবলিনীর নরকদর্শন মনস্তত্ত্বসম্মত হতে পারে, ‘ম্যাক্‌বেথ’ নাটকে লেডী ম্যাক্‌বেথকে আমরা পাগল হয়ে যেতে দেখি—কিন্তু বঙ্কিম ঘটনাগুলিকে যেভাবে প্রাধান্য দান করেছেন তাতে তাঁর পাপবৃত্তির প্রতি সমস্ত ঘৃণা বর্ষিত হয়েছে। একথা স্বীকার করতেই হবে, ‘চন্দ্রশেখরে’ বঙ্কিমচন্দ্রের নীতিবাদের গোঁড়ামি শিল্পোৎকর্ষ কিছুটা ব্যাহত করেছে। কিন্তু সে যুগে বঙ্কিমের এ ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না বলেই মনে হয়। শৈবলিনীর পাপের কাহিনী লিখতে বসেই তিনি সেকালের সমালোচকদের দ্বারা নিন্দিত হয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে বঙ্কিম-অনুবর্তী লেখক চন্দ্রনাথ বসু লেখেন—“যেমন অন্য অন্য স্থলে তুমি হৃদয়কে সমাজের বশবর্তী করিতে চেষ্টা কর, প্রণয়ের বেলাও তোমাকে তাহাই করিতে হইবে। হৃদয় তোমাকে আইনের বশবর্তী হইয়া চলিতে নিষেধ করে, হৃদয় তোমাকে অন্যের উপার্জিত অর্থ বলপূর্বক লইতে বলে। তুমি এ সকল স্থলে হৃদয়ের আজ্ঞা উপেক্ষা করিয়া সমাজের উপদেশ মত চলিয়া থাক। প্রণয়ের বেলাও তোমাকে তাহাই করিতে হইবে। পিতা; মাতা যাঁহাকে স্বামী কি স্ত্রী বলিয়া আমার সম্মুখে উপনীত করিলেন, আমি তাঁহাকে যাবজ্জীবন ভালবাসিব, হৃদয়ের হৃদয়ে তাঁহাকে যত্নের সহিত রক্ষা করিব। যদি হৃদয় ইহাতে কোনরূপ অসন্তোষ বা বিরক্তি প্রকাশ করে, আমি সেই পাপিষ্ঠ হৃদয়কে পদতলে মথিত করিব, প্রয়োজন হইলে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিব, কিন্তু আমার হৃদয়মন্দিরের দেব বা দেবীকে সিংহাসনচ্যুত করিব না।

রোগে, শোকে, বিপদে, সম্পদে, দুঃখ-সুখে ছায়ার ন্যায় উহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিব। সম্মুখে কী আছে দেখিব না, পার্শ্বে কী আছে দেখিব না। যদি স্বামী হই, স্ত্রীকে বক্ষে করিয়া যাবজ্জীবন কাটাইব। যদি স্ত্রী হই, স্বামীপদে মস্তক রাখিয়া জীবন কাটাইব। বঙ্কিমচন্দ্র সমাজনীতির এই আদর্শ না মানিয়া শৈবলিনী কুন্দ, নগেন্দ্র প্রমুখর চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, তাই তিনি নিন্দার্হ।”

নামকরণ ঃ 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র হল শৈবলিনী। কিন্তু তার নাম অনুসারে গ্রন্থের নামকরণ হয়নি। নামকরণ হয়েছে শৈবলিনীর স্বামী চন্দ্রশেখরের নামে। চরিত্রানুসারে যদি গ্রন্থের নামকরণ করতেই হয়, তাহলে কেন্দ্রীয় চরিত্রের নামেই করা উচিত ছিল। পাপিষ্ঠা শৈবলিনীর প্রতি ঘৃণাবশতঃ না হয় বঙ্কিমচন্দ্র তার নামে গ্রন্থ কলুষিত করলেন না। কিন্তু প্রতাপ? শৈবলিনীর পরই তো প্রতাপ এই উপন্যাসের আকর্ষণীয় চরিত্র। বীরত্বে, প্রেমে, আত্মত্যাগে এই চরিত্রটি রামানন্দ স্বামী, লেখক ও পাঠক সকলেরই প্রশংসা অর্জন করে। তবে 'চন্দ্রশেখর' নামকরণ হল কেন? এর কয়েকটি কারণ অনুমান করা যেতে পারে। প্রথমতঃ, চন্দ্রশেখরের নীরব বেদনা ও শুচিশুভ্র ব্রাহ্মণত্ব বঙ্কিমের সহানুভূতি অর্জন করেছিল। দ্বিতীয়তঃ, বঙ্কিমের কাছে চন্দ্রশেখর চরিত্র হিসাবে নয়, আদর্শ পুরুষ হিসাবেই প্রাধান্য লাভ করেছিল। তাই বঙ্কিম এই নীলকণ্ঠ চন্দ্রশেখরের নামে গ্রন্থের নামকরণ করেছেন।

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাস বঙ্কিমের দ্বৈত মনোবৃত্তির দ্বন্দ্বমুখর পটভূমিতে রচিত। একদিকে সৌন্দর্যসন্ধানী রোমান্স রসের কবি বঙ্কিমচন্দ্র, অপরদিকে আদর্শবাদী সমাজ-সংস্কারক বঙ্কিমচন্দ্র। পূর্ববর্তী রোমান্স-বহুল কাহিনী ও পরবর্তী আদর্শবহুল কাহিনীর মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে চন্দ্রশেখর তাই জল ও স্থলের সুস্পষ্ট মিলনরেখা নির্দেশ করে।

চন্দ্রশেখরের প্রত্যাগমন (চন্দ্রঃ ১/৫)। চন্দ্রশেখর রাজকার্য সেরে বাড়ী ফিরে এসে দেখলেন শৈবলিনী নেই। সমস্ত গৃহ তাঁর কাছে ফাঁকা বলে মনে হল। তিনি তাঁর সমস্ত পুঁথি-পত্রে আগুন দিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

চরণতলে (কপাঃ ৩/৬)। লুৎফউন্নিসা বা মতিবিবি নবকুমারের চরণতলে আত্মনিবেদন ক'রে ব্যর্থ হলেন। লুৎফার মনের কথা ব্যক্ত হয়েছে মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা কাব্য' থেকে উদ্ধৃতিতে। লক্ষ্মণের প্রতি সূর্পণখার এই পত্রেও আত্ম-নিবেদনের আকুতি প্রকাশিত হয়েছে।—

'কায় মনঃ প্রাণ আমি সঁপিব তোমারে।
ভুঞ্জ আসি রাজভোগ দাসীর আলয়ে ॥'

চিত্রদলন (রাজঃ ১/২)। রূপনগরের রাজকন্যা চঞ্চলকুমারী ছবি-বিক্রেত্রী বুড়ির কাছ থেকে ঔরঙ্গজেবের তসবির কিনে সেটিকে পা দিয়ে লাথি মেরে ভেঙে ফেললেন। রাণা রাজসিংহের বীরমূর্তি রাজকন্যার পছন্দ হল।

চিত্রবিচারণ (রাজঃ ১/৩)। রাজকুমারী চঞ্চল ক্রীত বিভিন্ন চিত্রের মধ্যে বারবার রাণা রাজসিংহের চিত্রটি দেখতে লাগলেন। তাঁর এই দুর্বলতাটি সখী নির্মলের কাছে ধরা পড়ে গেল।

চিত্রে চরণ (রাজঃ ১ম খণ্ড)। প্রথম খণ্ডে মোট পাঁচটি পরিচ্ছেদ। রাজকন্যা চঞ্চলকুমারী কর্তৃক ঔরঙ্গজেবের চিত্রে পদাঘাতের কি প্রতিক্রিয়া সুরু হল তাই এখানকার বিষয়-বস্তু।

চোরের উপর বাটপাড়ি (বিষঃ ২২ পরিঃ)। হীরা কুন্দকে নিজগৃহে লুকিয়ে রেখেছিল। কিন্তু মালতী গোয়ালিনী গোপনে হীরার উপর টেক্কা দিয়ে একদিন কুন্দের সন্ধান নিয়ে দেবেন্দ্রকে দিল।

চৌরোদ্ধরণিক (মৃণাঃ ২/৭)। শান্তশীল পশুপতির চৌরোদ্ধরণিক। শান্তশীল একজন অনুগামী রাজপুত যুবককে কৌশলে বন্দী ক'রে পশুপতিকে খবর দিল। এই রাজপুতই হেমচন্দ্র।

ছায়া (বিষঃ ৪৫ পরিঃ)। রাত্রিকালে নগেন্দ্র-দৃষ্ট সূর্যমুখীর ছায়ামূর্তি যখন প্রকৃত বলে বোধ হল, তখন দীর্ঘকাল পরে উভয়ে মিলিত হয়ে আনন্দসাগরে ভাসমান হলেন।

ছায়া পূর্বগামিনী (বিষঃ ৩য় পরিঃ)॥ এই পরিচ্ছেদে বালিকা কুন্দনন্দিনী তার মাতার মূর্তি দর্শন করেছে এবং তার জীবনের ভবিষ্যৎ ছবি দর্শন করেছে। ছায়া পূর্বগামিনী—অর্থাৎ কুন্দের ভবিষ্যৎ জীবনের ছায়া পূর্বেই দেখানো হয়েছে।

জন স্ট্যালকার্ট (চন্দ্রঃ ৬/৪)। লরেন্স ফস্টর—জন স্ট্যালকার্ট ছদ্মনামে তাঁর প্রভুদের সর্বনাশের চেষ্টা করলেন। কিন্তু ধরা প'ড়ে নবাবসেনার দ্বারা বন্দী হলেন।

জয়শীলা চঞ্চলকুমারী (রাজঃ ৪/৪)। মবারকের বুদ্ধিবলে যখন স্বল্পসংখ্যক রাজপুত সৈন্য বিপুল মুঘল সৈন্যের দ্বারা অবরুদ্ধ হল, তখন রাজসিংহ যুদ্ধে প্রাণ দেওয়া স্থির করলেন। কিন্তু চঞ্চলকুমারী দৃঢ়তার সঙ্গে মবারকের সামনে এসে উপস্থিত হলেন। মবারক চঞ্চলকুমারীর মহানুভবতায় মুগ্ধ হয়ে পথ ছাড়লেন।

জাল ছিঁড়িল (মৃণাঃ ৪/৫)। পশুপতি বিশ্বাসঘাতকতার জাল বিস্তার ক'রে যবনের নগর অধিকারে সাহায্য করল। কিন্তু তার আশা পূর্ণ হল না। বখ্‌তিয়ার বললেন—পশুপতি ইসলামধর্ম গ্রহণ না করলে কিছুই উপহার পাবেন না। এখন তিনি বন্দী। এমনিভাবে পশুপতির জাল ছিঁড়ল।

জেব-উন্নিসা (রাজঃ ২/২)। ঔরঙ্গজেবের কন্যা জেব-উন্নিসার কিছু ঐতিহাসিক পরিচয় দেওয়া হয়েছে এখানে। দরিয়াবিবি জেব-উন্নিসার কাছে আসতে গিয়ে দেখল, মবারক সেখানে প্রবেশ করলেন। তা ই সে লুকিয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগল।

জেব-উন্নিসার দাহনারম্ভ (রাজঃ ৮/৪)। রাজসিংহের হাতে বন্দিনী জেব-উন্নিসার হৃদয়ে যখন মবারক-বিরহের তীব্র জ্বালা, তখন তিনি মবারককে সম্মুখে দেখতে পেলেন না।

ডুবিল বা কে, উঠিল বা কে (চন্দ্রঃ উপঃ /২)। বড় হয়ে যখন প্রতাপ-শৈবলিনী বুঝল যে, তাদের সামাজিক মিলন সম্ভব নয়, তখন তারা দুজনে নদীতে ডুবতে গেল। কিন্তু প্রতাপ ডুবলেও, শৈবলিনী ডুবতে পারল না। এই ঘটনাটি দ্বারা প্রতাপের আত্মত্যাগের উদারতা ও শৈবলিনীর জীবনাসক্তির তীব্রতা প্রকাশিত হয়েছে।

তসবিরওয়ালী (রাজঃ ১/১)। এক বৃদ্ধা ছবিওয়ালী রূপনগরের রাজপুরে বিভিন্ন রাজা-রাজড়াদের ছবি দেখাতে এসেছে। এই ঘটনা দিয়ে 'রাজসিংহ' উপন্যাসের সুরু।

তারাচরণ (বিষঃ ৬ষ্ঠ পরিঃ)। সূর্যমুখীর ভাই তারাচরণের কিছু পরিচয় দেওয়া হয়েছে এই পরিচ্ছেদে। এই তারাচরণের সঙ্গে কুন্দের বিবাহ হবে।

তুমি না তিলোত্তমা ? (দুর্গেঃ ২/৩)। জগৎসিংহ জ্ঞান ফিরে পেয়ে আয়েষাকে তিলোত্তমা বলে ভুল করেছে।

দগ্ধ বাদশাহের জলভিক্ষা (রাজঃ ৮/৭)। নির্মলকুমারীর শিক্ষিত পারাবত ঔরঙ্গজেবের পত্র বয়ে নিয়ে এল, তাতে ক্ষুধার্ত ঔরঙ্গজেব ইম্‌লিবেগমের কাছে সাহায্য ভিক্ষা চেয়েছেন।

দরবারে (চন্দ্রঃ ৬/৭)। নবাব দরবারে ফস্টরের বিচার হল। ফস্টর স্বীকার করলেন যে, শৈবলিনীর তিনি ধর্মনাশ করেননি। এমন সময় যুদ্ধের কামান গর্জে উঠল।

দরিয়াবিবি (রাজঃ ১/৫)। চিত্র-বিক্রেত্রী বুড়ির পুত্রবধূ রূপনগরের রাজকন্যার চিত্র-দলনের কাহিনীটি দরিয়াবিবি নামক এক স্ত্রীলোককে বলল। দরিয়াবিবি খবরটি নবাব-হারেমে বিক্রি করার জন্য রওনা হল।

দলনী কি করিল (চন্দ্রঃ ৫/৩)। দলনী ব্রহ্মচারীর সঙ্গে মুঙ্গেরের দিকে রওনা হল।

দলনী বেগম (চন্দ্রঃ ১/১)। মীরকাসেম ও তাঁর বেগম দলনীর কথোপকথন বর্ণিত হয়েছে। মীরকাসেমের যুদ্ধযাত্রায় দলনী শঙ্কিত। তাই নবাবের সঙ্গে যুদ্ধ-ক্ষেত্রেও তিনি থাকতে চান। কিন্তু মীরকাসেম দলনীর হস্তরেখা দেখে চিন্তিত হলেন,

তাই **দলনীর** হস্তলিপি-বিষয়ে স্থিরনিশ্চিত **হবার জন্য** তিনি এ বিষয়ে তাঁর গুরু চন্দ্রশেখরকে ডেকে পাঠালেন।

দলনীর কি হইল (চন্দ্রঃ ২/৩)। গুরগণের জন্য দলনী ও কুলসম নগরে প্রবেশ করতে পারলেন না। রাত্রির অন্ধকারে দু'জন স্ত্রীলোককে দেখে, চন্দ্রশেখর তাঁদের সাহায্যের জন্য নিজের গৃহে এনে তুললেন। চন্দ্রশেখরকে দলনী সব কথা বললে, চন্দ্রশেখর তাঁদের সাহায্য করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

দাসীচরণে (দুর্গেঃ ২/১৬)। নৃত্যরতা অবস্থায় বিমলা কত্‌লু খাঁর বুকে ছুরি বসিয়ে দিলেন। কত্‌লু খাঁ দাসীরূপী বিমলার চরণে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। বিমলার প্রতিশোধ বাঞ্ছা তৃপ্ত হল।

দাহনে বাদশাহের বড় জ্বালা (রাজঃ ৮/২)। বন্দী ঔরঙ্গজেব জ্বালা আর সহ্য করতে না পেরে একমাত্র উপায়স্বরূপ নির্মলকুমারীর শিক্ষিত পায়রাটিকে উড়িয়ে দিলেন।

দিগ্‌গজ সংবাদ (দুর্গেঃ ২/৯)। গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ নিজেকে সেখ দিগ্‌গজ নামে জগৎসিংহের কাছে পরিচয় দিল। বিমলা এবং তিলোত্তমা নবাবের উপপত্নীতে পরিণত হয়েছে, এই সংবাদ জগৎসিংহকে জানাল।

দিগ্‌গজহরণ (দুর্গেঃ ১/১৪)। গজপতিকে আশমানি-বিমলা বাড়ী থেকে বের করেছে। এই ঘটনাটিকে হরণ আখ্যা দান করা হয়েছে।

দিগ্‌গজের সাহস (দুর্গেঃ ১/১৫)। দিগ্‌গজ বিমলার সঙ্গে শৈলেশ্বরের মন্দিরে যাবার পথে ভূতের ভয়ে পলায়ন ক'রে অভূতপূর্ব সাহসের পরিচয় দিয়েছে।

দিবা-গৃহিণী (সীতাঃ ১ম খণ্ড)। প্রথম খণ্ডে মোট চোদ্দটি পরিচ্ছেদ আছে। এখানে শ্রীর গৃহিণীমূর্তিই প্রতিষ্ঠিত। একমাত্র স্বামীই তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। এটি শ্রীর জীবনের দিবালোক।

দ্বিতীয় Xerxes—দ্বিতীয় Platoes (রাজঃ ৭/১)। ঔরঙ্গজেব এবং রাজসিংহের যুদ্ধোদ্যোগের বর্ণনা করা হয়েছে।

দীপনির্বাণ (বিষঃ ২য় পরিঃ)। নগেন্দ্র দত্ত নৌকাযাত্রায় ঝড়ের জন্য পথিমধ্যে যে জীর্ণ গৃহে আশ্রয় নেন, সেই গৃহস্বামীর জীবন-দীপ নির্বাপিত হয়।

দীপ নির্বাণোন্মুখ (দুর্গেঃ ২/২০)। জগৎসিংহের বিরহে তিলোত্তমার জীবন-দীপ নির্বাণোন্মুখ। তাই দেখে অভিরাম স্বামী জগৎসিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে সব কথা খুলে বললেন।

* **দুর্গেশনন্দিনী** ॥ 'দুর্গেশনন্দিনী' বঙ্কিমচন্দ্রের তথা বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস।

রচনাকাল ঃ গ্রন্থটির রচনাকাল ১৮৬২ খ্রীঃ থেকে ১৮৬৪ খ্রীঃ বলে অনুমিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স তখন ২৪ থেকে ২৬ বৎসর। তিনি তখন খুলনা জেলার হাকিম। সেখানে তিনি নববিবাহিতা কিশোরী পত্নীকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। খুলনা তখন যশোহরের অধীনস্থ একটি মহকুমা। সেখানকার পরিবেশ তখন অশান্ত। একদিকে নীলকর অত্যাচার, অন্যদিকে চোর-ডাকাতের উপদ্রব। বঙ্কিমচন্দ্র দৃঢ়হস্তে শাসন-ক্ষমতা গ্রহণ করলেন। দুর্ধর্ষ নীলকর মরেল সাহেবকে দমন করলেন। কিন্তু সেখানে 'দুর্গেশনন্দিনী' রচনা বেশিদূর অগ্রসর হয়নি। মাত্র কয়েকটি পরিচ্ছেদ রচিত হয়। তারপর তিনি ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মার্চ ২৪-পরগনার বারুইপুরে বদলী হয়ে এলেন। এইখানে তিনি 'দুর্গেশনন্দিনী' শেষ করলেন। সেই সময়ের বঙ্কিম-মানসের বর্ণনা দিয়েছেন কালীনাথ দত্ত ঃ—

"বারুইপুরে বদলী হইয়া আসিবার পর তিনি আবার ঐ অসমাপ্ত রচনায় (দুর্গেশনন্দিনী) হাত দিলেন। এজলাসে আসেন, বসেন, মামলার বিবরণ শোনেন, কিন্তু এই সময়ে তাহাকে সর্বদা অন্যমনস্ক দেখা যাইত। এমন কি, সাক্ষীর এজাহার লিখিতে লিখিতে তিনি কলম বন্ধ করিয়া ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনা হইয়া পড়িতেন, এবং হঠাৎ এজলাস পরিত্যাগ করিয়া গৃহাভ্যন্তরে, study room-এ প্রস্থান করিতেন, চিন্তিত বিষয়টি লিপিবদ্ধ না করিয়া এজলাসে ফিরিতেন না।"

দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় এরূপ ব্যস্ততা ছিল বলেই বোধ হয় তিনি 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে Relief গ্রহণ করবার জন্য একটু বেশি 'রোমান্টিক' হয়ে পড়েছেন।

গ্রন্থটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে। 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রটি এরূপ ঃ—

"দুর্গেশনন্দিনী ।/ ইতিবৃত্ত-মূলক উপন্যাস।/ শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায / প্রণীত / কলিকাতা।/মৃজাপুর, অপর সরকিউলর রোড, নং ৫৮।৫ /বিদ্যারত্ন যন্ত্র।/ইং ১৮৬৫/ মূল্য—১৲এক টাকা।/"

বর্তমান বিজ্ঞান কলেজের পাশে এই প্রেস অবস্থিত ছিল। এর মালিক ছিলেন বিদ্যাসাগরের বন্ধু গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

'দুর্গেশনন্দিনী'র উৎসর্গপত্রটি এরূপ ছিল—"জ্যেষ্ঠাগ্রজ/শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের/শ্রীচরণে এই গ্রন্থ উপহারস্বরূপ অর্পণ করিলাম।/"

বিভিন্ন সংস্করণ ঃ বঙ্কিমের জীবিতকালে এ পুস্তকের ১৩টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১ম সং—১৮৬৫ (পৃ. ৩০৭), ৩য় সং—১৮৬৯ (পৃ. ২৯৮), ৪র্থ সং—১৮৭১ (পৃ. ২৯৮), ৫ম সং—১৮৭৪ (পৃ ২২০), ৬ষ্ঠ সং—১৮৭৫ (পৃ. ২২০), ৭ম সং—

১৮৭৯ (পৃ. ২২০), ৯ম সং—১৮৮৩ (পৃ. ২১৭), ১০ম সং—১২৯২ সাল (১৮৮৪ ?) (পৃ. ২৩৮+২), ১১শ সং—১৮৮৮ (পৃ. ২৩৮), ১৩শ সং—১৮৯৩ (পৃ ৩১৪)।

২য়, ৮ম ও ১২শ সংস্করণ সম্বন্ধে জানা যায়নি।

প্রকাশ-পূর্ব ইতিহাস ঃ 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশের পূর্বের একটু ইতিহাস আছে। পুস্তকখানি প্রকাশ করবেন কিনা তা নিয়ে বঙ্কিমের মনে দ্বিধার অন্ত ছিল না। তাই তিনি প্রথমে কাঁটালপাড়ার বাড়ীতে কয়েকজনের সম্মুখে পাণ্ডুলিপি পাঠ ক'রে শোনান। এঁদের মধ্যে ছিলেন তাঁর দুই অগ্রজ ও ভাটপাড়ার কয়েকজন পণ্ডিত। পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সেই পাঠের বর্ণনা করেছেন—

"এক সময়ে, বড়দিনের কি মহরমের ছুটীতে আমার মনে নাই, অনেক ভদ্রলোক আসিয়াছিলেন। তন্মধ্যে শিক্ষিত, অশিক্ষিত উভয় সম্প্রদায়ের লোকই ছিল। ভাট-পাড়ার পণ্ডিতগণও ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার হস্তলিখিত 'দুর্গেশনন্দিনী' তাঁহাদের নিকট পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। সকলে নিঃশব্দে বসিয়া শুনিতে লাগিলেন ; কেহ ঐ ঘরে প্রবেশ করিলে শ্রোতৃগণ বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিলেন।······শ্রোতাদিগের মধ্যে কেহ কেহ অহিফেনভোগী ছিলেন ; মুহুর্মুহুঃ তাহাদের তামাক আবশ্যক হইত ; তাঁহারা তামাক ডাকিতে ভুলিয়া গেলেন।······একজন প্রাচীন ভদ্রলোক মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া বলিতেছেন, 'আ মরি, আ মরি ! কি বক্তৃতাই করিতেছেন।' এইরূপে দুইদিনে গল্পপাঠ শেষ হইল।" (বঙ্কিম-প্রসঙ্গ : ৭০-৭১ পৃঃ)

এই পাণ্ডুলিপি তিনি সুখ্যাত সমালোচক ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের জামাতা তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কেও পড়তে দিয়েছিলেন। ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন—"তোমার লিখবার শক্তি আছে কিন্তু এ বই এখনই ছাপিও না। তবে তুমি লিখে যাও।" বঙ্কিমচন্দ্রের দুই অগ্রজও গ্রন্থখানিকে প্রকাশের অযোগ্য বলে মন্তব্য করেছিলেন।

এমনিভাবে নিন্দা ও প্রশংসার মধ্যে বঙ্কিমের 'দুর্গেশনন্দিনী' বের হল। এই গ্রন্থ প্রকাশের পরও কম সমালোচনা হল না। মোটকথা, বাংলা সাহিত্যে একটা আলোড়ন পড়ে গেল।

সমসাময়িক সমালোচনা ঃ 'দুর্গেশনন্দিনী'র আবির্ভাবে বাংলা দেশে যে কি আলোড়ন পড়ে গিয়েছিল, তার বর্ণনা দিয়েছেন শিবনাথ শাস্ত্রী।—

"আমরা সেদিনের কথা ভুলিব না। দুর্গেশনন্দিনী বঙ্গসমাজে পদার্পণ করিবামাত্র সকলের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিল। এ জাতীয় উপন্যাস বাঙ্গালাতে কেহ অগ্রে দেখে নাই।······এরূপ অদ্ভুত চিত্রণশক্তি অগ্রে কেহ দেখে নাই। দেখিয়া সকলে চমকিয়া

উঠিল। কি বর্ণনার রীতি, কি ভাষার নবীনতা, সকল বিষয়ে বোধ হইল, যেন বঙ্কিমবাবু দেশের লোকের রুচি ও প্রবৃত্তির স্রোত পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া লেখনী ধারণ করিয়াছেন।" (রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ)

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের The Calcutta Review-এ বঙ্কিমচন্দ্র বিনা নামে 'Bengali Literature' নামে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। সেখানে তিনি নিজ গ্রন্থ সম্বন্ধে লেখেন—"Among the romance writers, Babu Protap chandra Ghose, author of 'Bangadhip Parajay', has recently been noticed at length in this review The only other writer of this class whose works it seems necessary to notice, is Babu Bankim chandra Chatarji, whose Durgesnandini, Kapalkundala and Mrinalini are among the most popular of Bengali books."

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত রমেশচন্দ্র দত্তের "The Literature of Bengal"-গ্রন্থে 'দুর্গেশনন্দিনী' সম্বন্ধে লিখিত হয়ঃ—"......the Bengali reading community was taken by surprise by the Durges Nandini, the first work of the author and a masterwork of creative imagination ......Durges Nandini is the best of Bankim Babu's historical novels......"।

রমেশচন্দ্র অন্যত্র লেখেন—"যখন দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হইল, তখন যেন বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে সহসা একটি নূতন আলোকের বিকাশ হইল। দেশের লোক সে আলোকচ্ছটায় চমকিত হইল, সে বালার্ককিরণে প্রফুল্ল হইল, সে দীপ্তিতে স্নাত হইয়া স্তুতিগান করিল। কলিকাতা ও ঢাকা এবং পশ্চিম ও পূর্বদেশ হইতে আনন্দরব উত্থিত হইল, বঙ্গবাসিগণ বুঝিল সাহিত্যে একটি নূতন যুগের আরম্ভ হইয়াছে। একটি নূতন ভাবের সৃষ্টি হইয়াছে। নূতন চিন্তা ও নূতন কল্পনা বঙ্কিমচন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া আবির্ভূত হইয়াছে।"

১২৭২ সালের ১৩ই বৈশাখের 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় 'দুর্গেশনন্দিনী'র এরূপ সমালোচনা করা হয়—

"মনোহর উপন্যাস চিত্তকে যেরূপ আকর্ষণ করে, দুর্গেশনন্দিনী আমাদের চিত্তকে সেইরূপ আকর্ষণ করিয়াছিল।... ..কয়েকটি স্থানে অতিবর্ণন দোষে বিরস হইয়া গিয়াছে। ভাষাটিও ললিত ও সবজন হৃদয়গ্রাহিণী হয় নাই।"

কাহিনী ঃ 'দুর্গেশনন্দিনী'র কাহিনী মোটামুটি এরূপ :—

গড়মান্দারণ দুর্গাধিপতি বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা তিলোত্তমা রূপে-গুণে অতুলনীয়া। তাঁর সঙ্গে মুঘল সেনাপতি মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহের প্রথম দর্শনেই প্রণয় হয়।

জগৎসিংহ এসেছিলেন উড়িষ্যাধিপতি পাঠান কত্‌লু খাঁর সাম্রাজ্য-সম্প্রসারণ দমন করতে। তিলোত্তমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য একদিন রাত্রে যখন জগৎসিংহ তিলোত্তমার সহচরী বিমলার সঙ্গে গড়মান্দারণ দুর্গে প্রবেশ করলেন, তখন পাঠান সেনাপতি ওসমান কর্তৃক দুর্গ অবরুদ্ধ হল এবং জগৎসিংহ বন্দী হলেন। বীরেন্দ্রসিংহ কত্‌লু খাঁর সহায়তা করতে স্বীকৃত না হওয়ার জন্যই পাঠান সেনাপতি দুর্গ আক্রমণ করেছিলেন। এদিকে জগৎসিংহ আহত হয়ে কত্‌লু খাঁর কন্যা আয়েষার সেবায় সুস্থ হলেন। আয়েষা প্রেমে পড়লেন জগৎসিংহের। ওদিকে পাঠান সেনাপতি ওসমান আয়েষার পাণিপ্রার্থী। কিন্তু আয়েষা কর্তৃক ওসমান প্রত্যাখ্যাত হয়ে জগৎসিংহকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করলেন। জগৎসিংহ ওসমানকে পরাজিত ক'রেও কৃতজ্ঞতাবশতঃ প্রাণে মারলেন না। এদিকে অত্যাচারী মদ্যপ কত্‌লু খাঁ বন্দিনী বিমলা ও তিলোত্তমার উপর পাশবিক অত্যাচার করার আয়োজন করেছিল। বীরেন্দ্রসিংহ পূর্বেই মারা গেছেন। বিমলা আসলে দাসী নন—বীরেন্দ্রসিংহেরই পত্নী, কিন্তু ভিন্নজাতীয়া বলে তা গোপন রেখেছিলেন। বিমলা স্বামীহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য এবং তিলোত্তমাকে রক্ষার জন্য কত্‌লু খাঁর জন্মদিনে তাকে হত্যা করলেন। জগৎসিংহ ও তিলোত্তমা গড়মান্দারণে ফিরে এলেন। তাদের বিয়ে হল। ব্যর্থপ্রেমিকা আয়েষার অশ্রুজলে কাহিনী সমাপ্ত হল।

'দুর্গেশনন্দিনী'র কাহিনীটি নাকি গল্পাকারে বহুদিন থেকে প্রচলিত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ছেলেবেলায় এই গল্পটি তাঁর মেজঠাকুরদা জয়নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের মুখে শুনেছিলেন। এ সম্বন্ধে পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বর্ণনা এরূপ :—

"আমাদের খুল্লপিতামহ এক শত আট বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন।⋯ ⋯ তাঁহার নিকট বঙ্কিমচন্দ্র ও আমরা সকলে গল্প শুনিতাম। যাহা শুনিতাম তাহা বাঙ্গালার ইতিহাসের অন্তর্গত ; উহা প্রায়ই বঙ্গের মুসলমান রাজত্বের অবসানের কথা।⋯⋯ তাঁহার নিকট বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম গড়মান্দারণের ঘটনা শুনিয়াছিলেন ; যদিও ঐ ঘটনা আকবর শাহা বাদশাহের সময় ঘটিয়াছিল, তথাচ তিনি উহা জানিতেন। সেকালের প্রাচীনেরা মুসলমান বাদশাহদিগের সময়ের অনেক ঘটনা জানিতেন। আমাদের মেজঠাকুরদাদার মধ্যে মধ্যে বিষ্ণুপুর অঞ্চলে যাতায়াত ছিল। মান্দারণ গ্রাম জাহানাবাদ ও বিষ্ণুপুরের মধ্যস্থিত। ঐ অঞ্চলে মান্দারণের ঘটনাটি উপন্যাসের ন্যায় লোকমুখে কিম্বদন্তীরূপে চলিয়া আসিতেছিল। মেজঠাকুরদা উহা ঐ স্থানে শুনিয়াছিলেন, এবং মান্দারণের জমিদারের গড় ও বৃহৎ পুরী ভগ্নাবস্থায় দেখিয়াছিলেন। তাঁহারই মুখে প্রথম শুনি যে, উড়িষ্যা হইতে পাঠানেরা মান্দারণ গ্রামের জমিদারের পুরী লুটপাট করিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার স্ত্রী ও কন্যাকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়, রাজপুত-

কুলতিলক কুমার জগৎসিংহ তাঁহাদের সাহায্যার্থ প্রেরিত হইয়া বন্দী হইয়াছিলেন। এই গল্পটি বঙ্কিমচন্দ্র আঠার উনিশ বর্ষ বয়ঃক্রমে শুনিয়াছিলেন।" (বঙ্কিম-প্রসঙ্গ)

ঐতিহাসিকতা : তাছাড়া, ঐ অঞ্চলে গিয়েও তিনি লোকমুখে প্রচলিত গল্পটি শুনেছিলেন। ইতিহাসের আগ্রহী পাঠক বঙ্কিমচন্দ্র বিভিন্ন ঐতিহাসিকের কাছ থেকেও উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। এ বিষয়ে স্টুয়ার্টের History of Bengal এবং ও'মেলি-র Gazetteer of Santal Pargana তাঁকে সাহায্য করেছিল বলে মনে হয়। তাছাড়া, যদুনাথ সরকারের মতে 'ঐতিহাসিক নামজাদা একজন ঘোর কল্পনিক' কাপ্তান এলেকজাণ্ডার ডাও (Alexander Dow)-এর প্রভাবও আছে বঙ্কিমচন্দ্রের উপর। ('দুর্গেশনন্দিনী'র ঐতিহাসিক তথ্যের জন্য শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাশগুপ্তের 'উপন্যাস-সাহিত্যে বঙ্কিম' গ্রন্থের পরিশিষ্ট ও যদুনাথ সরকারের লিখিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ বঙ্কিম গ্রন্থাবলীর ভূমিকা দ্রষ্টব্য।)

'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'আইভ্যান হো' : 'দুর্গেশনন্দিনী'র ঐতিহাসিকতা গৌণ, প্রধান স্থান অধিকার করেছে এর রোমান্টিক প্রণয়কাহিনী। সেই প্রণয়কাহিনী আবার আমাদের চিরাচরিত বাঙালীয়ানা-মণ্ডিত নয়। মনে হয়, যেন পাশ্চাত্য জগতের প্রেমোপাখ্যান। এইজন্যই অনেকে স্কটের উপন্যাস 'আইভ্যান হো'র সঙ্গে 'দুর্গেশনন্দিনী'র সাদৃশ্য কল্পনা ক'রে বঙ্কিমকে আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু চন্দ্রনাথ বসুর কথার ওপর ভিত্তি ক'রে একথা স্বীকার করা চলে যে, বঙ্কিম বলেছিলেন—" 'দুর্গেশনন্দিনী' লিখিবার আগে 'আইভ্যান্ হো' পড়ি নাই।"

অবশ্য, 'আইভ্যান হো'র সঙ্গে কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে সত্য। " 'আইভ্যান হো' এবং 'দুর্গেশনন্দিনী'র আখ্যায়িকার সাদৃশ্য সংক্ষেপতঃ এইরূপ : আহত যুবক-যোদ্ধার শুশ্রূষা করিতে যাইয়া শুশ্রূষাকারিণী যুবতীর মনে প্রণয় সঞ্চার হইল। কিন্তু ধর্ম্মের বৈষম্য উভয়ের মধ্যে যে ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়াছে তাহাতে বুদ্ধিমতী যুবতী বুঝিল, তাহার প্রণয়তৃষ্ণা মিটিবার নহে। সুতরাং আত্মমর্য্যাদাশালিনী উদারচেতা যুবতী যুবকের অন্তরজয়ের ব্যর্থ চেষ্টা না করিয়া, যুবকের প্রণয়িনীর সহিত তাঁহার মিলনের ক্ষণে ভগিনীস্থানীয়া পতিসোহাগিনীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া নীরবে বিদায় লইল।" ('উপন্যাস-সাহিত্যে বঙ্কিম'—প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত)

প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত মহাশয় অনুমান করেন, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'-এ রোসিনারা চরিত্রে স্কটের প্রভাব পড়ে, তা থেকে বঙ্কিমের আয়েষা চরিত্রে কিঞ্চিৎ বিদেশী গন্ধ এসে পড়ে।

ভাষা ঃ 'দুর্গেশনন্দিনী'র ভাষা নিয়ে অনেক সমালোচনা হয়েছিল। পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ তাঁর 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় এর ভাষাকে 'শব পোড়া মড়া দাহ' আখ্যা দিলেন, অর্থাৎ গুরু-চণ্ডালী দোষে অভিহিত করলেন। আসলে সেই সংস্কৃত পণ্ডিতদের প্রাধান্যের যুগে বাংলাভাষার নূতন রূপ অনেকেরই মনঃপূত হয়নি। এ বিষয়ে বঙ্কিমের নিজের দ্বিধাও কম ছিল না। পূর্ণচন্দ্র লিখছেন—"বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম হইতে ধারণা ছিল যে, 'দুর্গেশনন্দিনী'র ভাষা ব্যাকরণ-দোষে দূষিত। সেজন্য তিনি গল্প পাঠ শেষ হইলে উপস্থিত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাষার ব্যাকরণ-দোষ আছে—উহা কি লক্ষ্য করিয়াছেন? ৺মধুসূদন স্মৃতিরত্ন···বলিলেন, 'গল্প ও ভাষার মোহিনী শক্তিতে আমরা এতই আকৃষ্ট হইয়াছিলাম যে, আমাদের সাধ্য কি যে অন্যদিকে মন নিবিষ্ট করি।' বিখ্যাত পণ্ডিত ৺চন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন বলিলেন যে, 'আমি স্থানে স্থানে ব্যাকরণ দোষ লক্ষ্য করিয়াছি বটে, কিন্তু সেই স্থানে ভাষা আরও মধুর হইয়াছে।" (বঙ্কিম-প্রসঙ্গ)

যাই হোক, এসব সত্ত্বেও বাংলা সাহিত্যে 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের গুরুত্ব অসীম। এর পূর্বে বাংলা উপন্যাস-রচনার চেষ্টা চললেও এটিকেই যথার্থ প্রথম উপন্যাস আখ্যা দেওয়া চলে। চরিত্রচিত্রণে কিছুটা আড়ষ্টতা থাকলেও, কাহিনী-বয়নে এটি নিখুঁত উপন্যাস।

শচীশচন্দ্রের মত অনুসারে বঙ্কিমচন্দ্র নিজে 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসকে তৃতীয় শ্রেণীর উপন্যাস বলে গণ্য করলেও এবং তৎকালে বহু-নিন্দিত হলেও এটিই বঙ্কিমের সর্বাপেক্ষা অধিক বিক্রীত উপন্যাস।

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর 'বেঙ্গল থিয়েটারে' 'দুর্গেশনন্দিনী'র নাট্যরূপ অভিনীত হয়।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে জে. এফ. ব্রাউন ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক কলিকাতা, থ্যাকার স্পিঙ্ক অ্যাণ্ড কোম্পানি দ্বারা সম্পূর্ণ রোমান অক্ষরে গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা থেকে চারুচন্দ্র মুখার্জি কর্তৃক ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়—Durgesa Nandini ; or, The chieftain's Daughter.

১৮৭৬ খ্রীঃ লক্ষ্ণৌ থেকে K. Krishna কর্তৃক হিন্দুস্থানী, ১৮৮২ খ্রীঃ বেনারস থেকে G. Sinha কর্তৃক হিন্দী ও ১৮৮৫ খ্রীঃ বাঙ্গালোর থেকে B. Venkatachar কর্তৃক কানাড়ী অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

দূতী (মৃণাঃ ১/৪)। দূতী গিরিজায়া মৃণালিনীর সংবাদ নিয়ে হেমচন্দ্রকে দিল। তার আগে খবরের জন্য হেমচন্দ্রকে সে নাস্তানাবুদ করতে ছাড়ল না।

দেবনিকেতনে (কপাঃ ১/৯)। এ অংশে অধিকারীর কাছ থেকে কপালকুণ্ডলা ও নবকুমারের বিদায়কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। বিদায়কালে অধিকারীর চক্ষু অশ্রুতে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। শকুন্তলাকে বিদায় দেবার কালে পালকপিতা কণ্বের এরূপ দুর্দশা হয়েছিল। তাই এখানে কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকের চতুর্থ অঙ্ক থেকে কণ্বের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন—"কণ্ব। অলং রুদিতেন ; স্থিরা ভব, ইতঃ পন্থানমালোকয়।"—আর কেঁদ না, স্থির হও, এইদিকে পথ দেখে চল।

দেবমন্দির (দুর্গেঃ ১/১)। এই পরিচ্ছেদে শৈলেশ্বরের দেবমন্দিরে বিমলা ও তিলোত্তমার সঙ্গে জগৎসিংহের সর্বপ্রথম সাক্ষাৎ হয়েছে।

দেবী চৌধুরাণী ॥ গ্রন্থ-পরিচয়ঃ ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই আগস্ট বঙ্কিমচন্দ্র জাজপুর (কটক)-এ অস্থায়ী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টররূপে যোগদান করেন। এই সময়েই 'দেবী চৌধুরাণী'র রচনা সুরু বলে মনে হয়।

১২৮৯ সালের পৌষ মাসের 'বঙ্গদর্শন' থেকে 'দেবী চৌধুরাণী' প্রকাশিত হতে থাকে, কিন্তু চৈত্র সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত হয়ে বন্ধ হয়ে যায়। কারণ, ১২৯০ সালের বৈশাখ থেকে আশ্বিন পর্যন্ত 'বঙ্গদর্শন' বন্ধ থাকে। তারপর কার্তিক থেকে মাঘ পর্যন্ত চারটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়ে 'বঙ্গদর্শন' আবার বন্ধ হয়। ঐ চার সংখ্যাতে 'দেবী চৌধুরাণী'-ও ছিল। কিন্তু মাত্র দ্বিতীয় খণ্ড পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। তারপর বঙ্কিম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থরূপে 'দেবী চৌধুরাণী' প্রকাশ করেন।

'দেবী চৌধুরাণী' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মে। পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ২০৬। প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রটি ছিল এরূপ—"দেবী চৌধুরাণী। শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়/প্রণীত।, কলিকাতা,/শ্রী উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত /৩/৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট—বাণীযন্ত্রে/শ্রী শরচ্চন্দ্র দেব কর্তৃক মুদ্রিত। /১২৯১/মূল্য ২ টাকা/"

গ্রন্থখানি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গপত্রটি এরূপ—"যাঁহার কাছে/প্রথম নিষ্কাম ধর্ম্ম শুনিয়াছিলাম, / যিনি স্বয়ং/নিষ্কাম ধর্ম্মই ব্রত করিয়াছিলেন, / যিনি এখন / পুণ্যফলে স্বর্গারূঢ়, / তাঁহার / পবিত্র পাদপদ্মে / এই গ্রন্থ/ভক্তিভাবে উৎসর্গ করিলাম।/'

উপন্যাসের দ্বিতীয় পত্রে দুটি উদ্ধৃতি ছিল। উদ্ধৃতিগুলি এই—

"The substance of Religion is Culture The Fruit of it the Higher Life".—Natural Religion, by the author of Ecce Homo, P. 145.

"The General Law of Man's progress, whatever the point of

view chosen, consists in this that man becomes more and more Religious."—Auguste Comte—Catechism of Positive Religion—English Translation by Congreve, 1st Edition, P. 374.

'দেবী চৌধুরাণী'র বিজ্ঞাপন অংশে বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন—

"দেবী চৌধুরাণীর কিয়দংশমাত্র বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হইল।

"আনন্দমঠ" প্রকাশিত হইলে পর, অনেকে জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, ঐ গ্রন্থের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কি না। সন্ন্যাসি-বিদ্রোহ ঐতিহাসিক বটে, কিন্তু পাঠককে সেকথা জানাইবার বিশেষ প্রয়োজনের অভাব। এই বিবেচনায় আমি সে পরিচয় কিছুই দিই নাই। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা আমার উদ্দেশ্য ছিল না, সুতরাং ঐতিহাসিকতার ভাণ করি নাই। এক্ষণে দেখিয়া শুনিয়া ইচ্ছা হইয়াছে, আনন্দমঠের ভবিষ্যৎ সংস্করণে সন্ন্যাসি-বিদ্রোহের কিঞ্চিৎ ঐতিহাসিক পরিচয় দিব।

দেবী চৌধুরাণীরও ঐরূপ একটি ঐতিহাসিক মূল আছে। যিনি বৃত্তান্ত অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি হণ্টর সাহেব কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রচারিত বাঙ্গালার "Statistical Account" মধ্যে রঙ্গপুর জিলার ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত পাঠ করিলে জনিতে পারিবেন। সে কথাটা বড় বেশী নয়, এবং "দেবী চৌধুরাণী" গ্রন্থের সঙ্গে ঐতিহাসিক দেবী চৌধুরাণীর সম্বন্ধ বড় অল্প। দেবী চৌধুরাণী, ভবানীপাঠক, গুড্‌ল্যাড সাহেব, লেফ্‌টেনাণ্ট ব্রেনান্‌, এই নামগুলি ঐতিহাসিক। আর দেবীর নৌকায় রাস, বরকন্দাজ সেনা প্রভৃতি কয়টা কথা ইতিহাসে আছে বটে। এই পর্য্যন্ত। পাঠক মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক আনন্দমঠকে বা দেবী চৌধুরাণীকে "ঐতিহাসিক উপন্যাস" বিবেচনা না করিলে বড় বাধিত হইব।

কাহিনী: বরেন্দ্রভূমে হরবল্লভ নামে এক সম্পন্ন জমিদার ছিলেন। তাঁর একমাত্র পুত্র ব্রজেশ্বরের প্রথমা পত্নী প্রফুল্লকে তিনি গ্রাম্য লোকেদের মিথ্যা অপবাদে শ্বশুরবাড়ী-ছাড়া করেন। প্রফুল্লর বিধবা দুঃখী মা, কন্যাকে বেশিদিন রাখতে পারলেন না। তাই একদিন কন্যাকে নিয়ে প্রফুল্লর শ্বশুরবাড়ীতে এলেন। প্রফুল্লর শাশুড়ী পুত্রবধূর সুন্দর মুখ দেখে মোহিত হয়ে হরবল্লভের নিকট দরবার করলেন। কিন্তু নির্দয় হরবল্লভ আদেশ দিলেন—প্রফুল্লকে ঝাঁটা মেরে বিদায় ক'রে দেবার। তিনি পুত্র ব্রজেশ্বরকে ডেকেও সেই আদেশ করলেন।

প্রফুল্ল ছাড়া ব্রজেশ্বরের অন্য দুই বিবাহ ছিল। দ্বিতীয়া পত্নী নয়ানবৌ কুরূপা ও মুখরা। কিন্তু তৃতীয়া পত্নী সাগর বড়লোকের কন্যা, বালিকা ও স্বভাবমধুরা।

সাগর বেশির ভাগ বাপের বাড়ীতেই কাটায়। কিন্তু প্রফুল্লর আগমনের সময় সে শ্বশুরবাড়ীতেই ছিল। সাগর প্রফুল্লকে ডেকে নিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে ভাব জমায়। তারপর রাত্রে ব্রজেশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ ক'রে দেয়।

এক রাত্রি স্বামীবাসের সুখস্মৃতি নিয়ে প্রফুল্ল পুনরায় মার কাছে ফিরে যায়। ব্রজেশ্বরও প্রফুল্লর প্রতি অনুরক্ত হয়ে তার একটা ব্যবস্থা করার সংকল্প গ্রহণ করে।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই প্রফুল্লর মার মৃত্যু হয়। প্রফুল্ল একাকী থাকতে পারে না, তাই পাড়ার ফুলমণি নাপিতানী নামে একজন স্ত্রীলোককে রাত্রে শুতে বলে। ফুলমণির চরিত্র ভাল নয়। গ্রামের জমিদারের নায়েব হরবল্লভের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে জমিদারের ভোগের জন্য তারা প্রফুল্লকে এক রাত্রে হরণ করে। পথিমধ্যে ডাকাতের ভয়ে জঙ্গলে তারা প্রফুল্লকে ফেলে পালায়। প্রফুল্ল বিপন্মুক্ত হয়ে একাকী জঙ্গলে প্রবেশ করতে থাকে।

এদিকে ফুলমণি গ্রামে এসে রটায় এক অলৌকিক কাহিনী। সবাই জানল—প্রফুল্ল মারা গেচে। ব্রজেশ্বর সে সংবাদ শুনে ক্রমে ক্রমে মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে। তারপর কোনক্রমে বেঁচে ওঠে। পিতার প্রতি তার মাঝে মাঝে ক্ষোভ জাগলেও, সে পিতৃভক্তির আদর্শ চিন্তা ক'রে তা দমন করে।

বনমধ্যে প্রবেশ ক'রে প্রফুল্ল এক ভগ্ন কুটীরে এক মুমূর্ষু বৃদ্ধকে দেখতে পায়। বৃদ্ধ মৃত্যুকালে তাকে প্রচুর গুপ্তধন দান করে। প্রফুল্ল বৃদ্ধের মৃত্যুর পর তার দেহ সৎকার করে। তারপর একটি মোহর নিয়ে হাটের পথে দস্যুসর্দার ভবানী পাঠকের হাতে পড়ে। ভবানী পাঠক প্রফুল্লর গুণাবলী লক্ষ্য ক'রে তাকে নিজের অধীনে রেখে দীর্ঘ পাঁচ বছর ধ'রে নানাপ্রকার শিক্ষাদান করেন। তারপর প্রফুল্ল ডাকাতি-কার্যে আত্মনিয়োগ করে। তখন তার নাম হয় দেবী চৌধুরাণী। এই ডাকাতির অর্থ কিন্তু তারা কেউ গ্রহণ করত না, গরীব-দুঃখীদের বিলিয়ে দিত। দেশে সে-সময় শাসন-ব্যবস্থা উৎকৃষ্ট ছিল না। তাই প্রবলের অত্যাচার থেকে দুর্বলকে রক্ষা করাই ছিল এই দলের উদ্দেশ্য।

দশ বছর কেটে গেল। হরবল্লভের অবস্থা খুবই খারাপ। তাঁর কয়েক হাজার টাকার দরকার। তাই ব্রজেশ্বর টাকার সন্ধানে সাগরের বাবার কাছে গেল। কিন্তু সাগরের বাবা টাকা দিতে রাজী হলেন না। ফলে, ব্রজেশ্বর রাগ ক'রে শ্বশুরবাড়ী থেকে চলে আসতে চাইল। সাগর ব্রজেশ্বরের পা ধরে অনুরোধ করল একদিন থেকে যাবার। ব্রজেশ্বর রাগে এমনভাবে পা টেনে নিল যে, সাগরের মনে হল স্বামী তাকে লাথি মারল। সে-ও ক্রুদ্ধা ফণিনীর মত প্রতিজ্ঞা করল, তারও পা সে যদি স্বামীকে

দিয়ে না টেপায়, সে তবে ব্রাহ্মণের মেয়েই নয়। ব্রজেশ্বর পথিমধ্যে দেবী চৌধুরাণীর ডাকাতদলের হাতে পড়ল। দেবীর চেষ্টায় সাগরের প্রতিজ্ঞা পূরণ হল। দেবী ব্রজেশ্বরকে প্রয়োজনীয় অর্থও দান করল। ব্রজেশ্বর দেবীকে চিনতে না পারলেও দুর্বলতা-বশতঃ তাকে চুম্বন করল। পরে সাগরের কাছে জানতে পারল এই দেবীই প্রফুল্ল।

নির্দিষ্ট সময়মত হরবল্লভ দেবীর টাকা ফেরৎ না দিয়ে ইংরেজ সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে দেবীকে ধরবার ব্যবস্থা করলেন। ব্রজেশ্বর তার আগেই দেবীর বজরায় এসে উপস্থিত। দেবীর কিন্তু আজ ধরা দেবার ইচ্ছা। কিন্তু ভাগ্যচক্রে ও -দেবীর কৌশলে হরবল্লভ ও সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে দেবীর নৌকা নদীপথে অনেকদূর এসে পড়ল। সাহেবকে দেবী মুক্তি দিল। হরবল্লভ স্বীকৃত হলেন দেবীর সঙ্গে ব্রজেশ্বরের বিবাহ দিতে।

প্রফুল্ল পুনরায় সংসারে প্রবেশ করল। পরে সবাই জানতে পারল, এ ব্রজেশ্বরের নূতন বিবাহ নয়, এ বৌ তার প্রথমা স্ত্রী প্রফুল্ল। প্রফুল্ল সংসারে সকলকে সুখী করতে পারল।

ঐতিহাসিকতা ঃ 'দেবী চৌধুরাণী'র কাহিনীতে কিছু ঐতিহাসিকতা আছে। কিন্তু সে ঐতিহাসিকতা কাহিনীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করেনি, পরিবেশ বা পটভূমিকা রচনায় সাহায্য করেছে। বঙ্কিম গ্রন্থমধ্যে বর্ণনা করেছেন—"তখন দেশ অরাজক। মুসলমানের রাজ্য গিয়াছে ; ইংরেজের রাজ্য ভাল করিয়া পত্তন হয় নাই—হইতেছে মাত্র। তাতে আবার বছর কত হইল, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর দেশ ছারখার করিয়া গিয়াছে। তারপর আবার দেবী সিংহের ইজারা।......সেই ভয়ানক অত্যাচার বরেন্দ্র-ভূমি ডুবাইয়া দিয়াছিল। অনেকেই কেবল খাইতে পায় না নয়, গৃহে পর্য্যন্ত বাস করিতে পায় না। যাহাদের খাইবার নাই, তাহারা পরের কাড়িয়া খায়। কাজেই এখন গ্রামে গ্রামে দলে দলে চোর ডাকাত। কাহার সাধ্য শাসন করে ?" (১/৮)

অন্যত্র—"...কাছারির কর্ম্মচারীরা বাকিদারের ঘরবাড়ী লুঠ করে, লুকান ধনের তল্লাসে ঘর ভাঙ্গিয়া, মেঝ্যা খুঁড়িয়া দেখে, পাইলে এক গুণের জায়গায় সহস্র গুণ লইয়া যায়, না পাইলে মারে, বাঁধে, কয়েদ করে, পোড়ায়, কুড়ুল মারে, ঘর জ্বালাইয়া দেয়, প্রাণবধ করে। সিংহাসন হইতে শালগ্রাম ফেলিয়া দেয়, শিশুর পা ধরিয়া আছাড় মারে, যুবকের বুকে বাঁশ দিয়া দলে, বৃদ্ধের চোখের ভিতর পিঁপড়ে, নাভিতে পতঙ্গ পুরিয়া বাঁধিয়া রাখে। যুবতীকে কাছারিতে লইয়া গিয়া সর্ব্বসমক্ষে উলঙ্গ করে, মারে, স্তন কাটিয়া ফেলে, স্ত্রীজাতির যে শেষ অপমান চরম বিপদ্, সর্ব্বসমক্ষে তাহা প্রাপ্ত করায়।" (১/১৬)

বঙ্কিম পাঠককে ইতিহাস অংশের জন্য যে গ্রন্থ দেখার কথা বলেছেন এবং নিজেও দেখেছেন, সেই 'Statistical Account of Bengal'-এর বর্ণনা এরূপ—"Rangpur, as a frontier province bordering on Nepal, Bhutan, Kuch Behar, and Assam, was peculiarly liable to be infested by banditti, who ravaged the country in armed bands numbering several hundreds....The tract of country lying south of the stations of Dinajpur and Rangpur and west of the present district of Bogra, towards the Ganges, was a favourite haunt of these banditti, being far removed from any central authority. In 1787, Lieutenant Brenan was employed in this quarter against a notorious leader of dakāits (gang robbers), named Bhawāni Pathak. He despatched a native officer, with twenty-four sepoys, in search of the robbers, who surprised Pathak, with sixty of his followers, in their boats. A fight took place, in which Pathak himself and three of his lieutenants were killed, and eight wounded, besides forty-two taken prisoners. Pathak was a native of Bajpur.···We catch a glimpse from the Lieutenant's report of a female dakāit, by name Debi Chaudhrāni, also in league with Pathak She lived in boats, had a large force of barkandāzs in her pay, and committed dakāitis on her own account, besides receiving a share of the booty obtained by Pathak. Her title Debi Chaudhrāni would imply that she was a zāmindār—probably a petty one, else she need not have lived in boats for fear of capture."

Hunter : *A Statistical Account of Bengal*, Vol. VII, Pp 158-59

অনুশীলনতত্ত্ব ও দেবী চৌধুরাণী : 'দেবী চৌধুরাণী' রচনার পিছনে বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শবাদ যে কার্যকরী হয়েছে, একথা সর্ববাদীসম্মত। গীতার অনুশীলনতত্ত্বের প্রকাশ তিনি দেখিয়েছেন প্রফুল্ল চরিত্রের মধ্যে। নিষ্কাম কর্মসাধনাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। প্রফুল্লর দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে অনুশীলনের ফল যখন গার্হস্থ্য জীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে এসে সার্থকতা খুঁজে পায়, তখন আমাদের এই আদর্শবাদের কথা চিন্তা

ক'রে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। গার্হস্থ্য ধর্মই মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনপীঠ। প্রফুল্ল তাই নিশির মত সব-কিছু শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করতে পারেনি। শ্রীকৃষ্ণে সর্বস্ব সমর্পণ ক'রে নিশি নিষ্কর্মা। প্রফুল্লর কিন্তু কর্ম আছে সংসারের ক্ষেত্রে।

বাঙালী গার্হস্থ্য জীবনে সুখশান্তি-কামনায় বঙ্কিমচন্দ্র প্রফুল্লর মত সর্বগুণসম্পন্না নারীর আবির্ভাব কামনা করেছেন।

সমাজচিত্র ঃ কিন্তু আদর্শবাদে যাই থাক না কেন, এর মধ্যে গার্হস্থ্য জীবনের ও তৎকালীন সমাজের চিত্রটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। হরবল্লভের বিরাট পরিবার, প্রফুল্লর নামে পাড়ার লোকের কুৎসা রটনা, ব্রজেশ্বরের সাগরের বাপের বাড়ী যাত্রার ঘটনা প্রভৃতি দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

ঘটনার সম্ভাব্যতা ঃ 'দেবী চৌধুরাণী'তে অনেক ঘটনা সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম করেছে। প্রফুল্লর দেবী-চৌধুরাণীতে পরিণতি তার অন্যতম দৃষ্টান্ত। বজরা নিয়ে ইংরেজ সিপাহীদের ফাঁকি দিয়ে পলায়নের মধ্যেও অসম্ভাব্যতা রয়েছে। কিন্তু 'দেবী চৌধুরাণী'তে যে উদ্দেশ্যমূলকতার অবতারণা করা হয়েছে, তাতে ঘটনার এরূপ বিপর্যয় একেবারে অপ্রয়োজনীয় নয়।

হাস্যরস ঃ নয়ানবৌয়ের বোকামি, দেবীর বজরায় হরবল্লভের দুর্দশা, ফুলমণি-দুর্লভচন্দ্রের পলায়ন, গোবরার মার আংশিক বধিরতা দ্বারা 'দেবী চৌধুরাণী'র অনেক স্থানে হাস্যরসের অবতারণা করা হয়েছে।

মূল্যবিচার ঃ 'দেবী চৌধুরাণী'র আকর্ষণ আজও পাঠকের কাছে কম নয়। এর কারণ বঙ্কিম-প্রদত্ত আদর্শবাদের প্রতি আকর্ষণ নয়। এই উপন্যাসের মধ্যে একদিকে যেমন সমাজের চিত্রটি সুন্দররূপে ফুটে উঠেছে, অন্যদিকে তেমনি প্রফুল্লর চরিত্রমাধুর্যে ব্রজেশ্বরের প্রতি আকর্ষণ আমাদের মুগ্ধ করেছে। পাঠকের আকর্ষণও এখানে।

বিভিন্ন সংস্করণ ঃ বঙ্কিমের জীবিতকালে 'দেবী চৌধুরাণী'র ছটি সংস্করণ হয়। ১ম সং—১২৯১, বৈশাখ (১৮৮৪), ২য় সং— , ৩য় সং—১৮৮৭ খ্রীঃ, ২৫শে জানুয়ারি (পৃঃ ২২৩), ৪র্থ সং—"চতুর্থ সংস্করণ সম্ভবতঃ ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দেই বাহির হইয়াছিল, আমরা এই সংস্করণ একখানিও সংগ্রহ করিতে পারি নাই।" (সাঃ পরিঃ গ্রন্থাঃ), ৫ম সং—১৮৮৮ খ্রীঃ (২৩১ পৃঃ), ৬ষ্ঠ সং—১৮৯১ খ্রীঃ (২৩১ পৃঃ)।

'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত আখ্যান ও বঙ্কিমের জীবিতকালের শেষ সংস্করণের মধ্যে পার্থক্য খুব গুরুতর নয়। কেবলমাত্র—(ক) পরবর্তী সংস্করণে প্রফুল্লর প্রতি নয়নতারার ঝাঁটামারা প্রভৃতি উগ্র ব্যবহার সংযত করা হয়েছে। (খ) প্রথমদিকে প্রফুল্লর 'তিরোধান বৃত্তান্ত'-এ বাত-শ্লেষ্ম-বিকারে মরার কথা ছিল, কিন্তু পরবর্তী সংস্করণে মৃত্যু-

কাহিনী আরও সরস হয়েছে। (গ) প্রফুল্লর অর্থ-প্রাপ্তি এবং ভবানী পাঠক সংক্রান্ত কয়েকটি ঘটনার কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। (দ্রঃ প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত—'উপন্যাস-সাহিত্যে বঙ্কিম', ৫১৭—৫৩৫ পৃঃ)

অনুবাদ ঃ বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই 'দেবী চৌধুরাণী'র যে ইংরেজি অনুবাদ করেন, তার কিছু অংশ পাওয়া গেছে। ১৮৩৯ খ্রীঃ অমৃতসর থেকে তুলসীরাম এবং ১৯০৬ খ্রীঃ লক্ষ্মৌ থেকে জে. প্রসাদ এই গ্রন্থের হিন্দুস্থানী অনুবাদ প্রকাশ করেন। 'দেবী চৌধুরাণী'র তামিল অনুবাদের নাম 'দেবীচন্দ্রপ্রভা'। এটি ভি. অম্মলের লেখা। ১৯০৯ খ্রীঃ সি. ভাস্কর রাও এর তেলেগু অনুবাদ এবং ১৮৯৯ খ্রীঃ মহীশূর থেকে বি. ভেঙ্কটাচার্যের কানাড়ী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। অতুলকৃষ্ণ মিত্র 'দেবী চৌধুরাণী'র নাট্যরূপ দেন। ১৯০০ খ্রীঃ কেদারনাথ বিশ্বাস 'ভবানী পাঠক' নামে 'দেবী চৌধুরাণী'র পরিশিষ্ট লেখেন।

ধরা পড়িল (বিষঃ ১৪ পরিঃ)। কমলমণি গোবিন্দপুরের বাড়ীতে এসে, নিমেষেই বিষণ্ণপুরীতে হাসি ফুটিয়ে তুললেন। কুন্দের সঙ্গেও তিনি হাস্যপরিহাসে মত্ত হলেন। কিন্তু কুন্দ যে নগেন্দ্রকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবেসেছে, তা কমলমণির কাছে ধরা পড়ে গেল।

ধাতুমূর্তির বিসর্জন (মৃণাঃ ৪/১৪)। পশুপতির গৃহে আগুন লেগেছে। পশুপতি ভাবলেন বন্দী মনোরমাও বুঝি পুড়ে মরেছে। তখন তিনি তাঁর ইষ্টদেবীকে গঙ্গায় বিসর্জন দেবেন বলে আনতে গেলেন। কিন্তু নিজেই অগ্নিদগ্ধ গৃহে সমাধিস্থ হলেন।

নগেন্দ্রের নৌকাযাত্রা (বিষঃ ১ম পরিঃ)। গোবিন্দপুরের জমিদার নগেন্দ্র দত্ত নৌকাযোগে কলকাতায় যাত্রা করেছেন। পথিমধ্যে ঝড়ের জন্য তিনি নৌকা থামাতে বাধ্য হন। তারপর তিনি এক জীর্ণ গৃহে আশ্রয় গ্রহণের জন্য উপস্থিত হন। এই পরিচ্ছেদে ঝোড়ো হাওয়ায় নগেন্দ্রের নৌকাযাত্রার বিপর্যয় উপন্যাস মধ্যে নগেন্দ্রের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার বিপর্যয়ের যথার্থ প্রতীক-সূচনা বলে গ্রহণ করতে পারি।

নন্দনে নরক (রাজঃ ২য় খণ্ড)। দ্বিতীয় খণ্ডে মোট ৭টি পরিচ্ছেদ আছে। এই অংশে নবাব-হারেমের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। মোগল-হারেম ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরে নন্দনকাননতুল্য। কিন্তু তার অন্তঃপুরে নরকের পাপাচার বিরাজমান।

নবীন সেনাপতি (দুর্গেঃ ১/৪)। নবীন সেনাপতি বলতে এখানে জগৎসিংহকে বোঝান হয়েছে। মোগল-পাঠান যুদ্ধে মানসিংহ পুত্র জগৎসিংহকে নূতন সেনাপতি নির্বাচিত করলেন।

নয়নবহ্নিও বুঝি জ্বলিয়াছিল (রাজঃ ৭/২)। ঔরঙ্গজেব নির্মলকুমারীকে আদর ক'রে 'ইমলি বেগম' বলে ডাকতেন। নির্মলের বুদ্ধিমত্তা ও বাক্‌চাতুর্যে বাদশাহ এতই মুগ্ধ যে, তিনি তাকে বেগম পর্যন্ত করতে চাইলেন। নির্মল তা প্রত্যাখ্যান করল।

"না" (বিষঃ ১৬ পরিঃ)। কুন্দনন্দিনী নগেন্দ্রের উদ্যান-মধবর্তী পুষ্করিণী-তীরে একাকী বসে আত্মহত্যার সংকল্প করছিল, এমন সময় চোরের মত নগেন্দ্র এসে তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব করলেন। কিন্তু কুন্দ "না" বলে প্রত্যাখ্যান করল।

নাপিতানী (চন্দ্রঃ ১/৪)। ফস্টর এক নৌকায় শৈবলিনীকে কলকাতায় পাঠালেন। পথে এক নাপিতানী শৈবলিনীর নৌকায় উঠল। এই নাপিতানী আর কেউ নয়, শৈবলিনীর সখী সুন্দরী। সে শৈবলিনীকে গৃহে ফেরবার অনুরোধ জানাল। কিন্তু শৈবলিনী ফিরতে রাজী হল না।

নির্মলকুমারীর অগাধ জলে ঝাঁপ (রাজঃ ৪/২)। চঞ্চলকুমারীর দিল্লী গমনের পর নির্মলকুমারী আর স্থির থাকতে না পেরে পদব্রজে রওনা দিল।

নিরাশা (রাজঃ ৩/৭)। রাজসিংহের দিক থেকে তার চিঠির কোন উত্তর না পেয়ে, চঞ্চলকুমারীর মনে নিরাশা সঞ্চারিত হল।

নূতন পরিচয় (চন্দ্রঃ ৩/২)। শৈবলিনী নবাবের দরবারে এসে দলনীর সংবাদ দিলেন। কিন্তু নিজের পরিচয় গোপন ক'রে বললেন, তাঁর নাম রূপসী, প্রতাপ তাঁর স্বামী।

নূতন সখ (চন্দ্রঃ ৩/৩)। মীরকাসেম নৌকাপথে পলায়নপর ইংরেজ নৌকাকে, যার মধ্যে দলনী বেগম আছেন, ধরবার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু শৈবলিনীর সখ হল তিনিও দ্রুতগামী নৌকা নিয়ে যেতে চান। নবাব শৈবলিনীর ইচ্ছা পূরণ করলেন।

নৃত্যগীত (চন্দ্রঃ ৫/৩)। মুঙ্গেরে জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রাসাদে নৃত্যগীতের অন্তরালে গুরগণ খাঁ ও তাঁদের মধ্যে মীরকাসেমের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলেছে।

নৌকা ডুবিল (চন্দ্রঃ ৪/৪)। চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীর কিছু কথোপকথন হল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে শৈবলিনীর উন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পেতে লাগল। শৈবলিনীর চেতনা-নৌকা ডুবল।

নৌকাযানে (মৃণাঃ ২/৩)। হৃষিকেশের গৃহ থেকে বেরিয়ে গিরিজায়া ও মৃণালিনী নৌকাপথে যে কথোপকথন করছিলেন, তাই এখানকার বিষয়-বস্তু। শেষ পর্যন্ত তাঁরা নদীয়াতেই এলেন।

পথান্তরে (কপাঃ ৩/২)। একটি ষড়যন্ত্রে মতিবিবি ব্যর্থ হয়ে অন্য পথ অবলম্বন করেছে—তাই এই নামকরণ। মতিবিবির মনের ভাবসাদৃশ্যে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে

দীনবন্ধু মিত্রের 'নবীন তপস্বিনী' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের অন্তর্গত মন্ত্রী জলধরের উক্তি থেকে।—

"যে মাটিতে পড়ে লোকে উঠে তাই ধরে।
বারেক নিরাশ হয়ে কে কোথায় মরে॥
তুফানে পতিত কিন্তু ছাড়িব না হাল।
আজিকে বিফল হলো, হতে পারে কাল।"

মতিবিবি নবকুমারের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে পুনরায় যেভাবে আশা পোষণ করেছে, তাতে উদ্ধৃতিটি সার্থক হয়েছে।

পথিপার্শ্বে (বিষঃ ৩৪ পরিঃ)। পথক্লান্ত সূর্যমুখী মুমূর্ষু অবস্থায় পথিপার্শ্বে পড়েছিলেন। একজন ব্রহ্মচারী তাঁকে উদ্ধার ক'রে এক গৃহে নিয়ে যান।

পদ্মপলাশলোচনেঃ তুমি কে? (বিষঃ ৭ম পরিঃ)। নগেন্দ্রের আপন গৃহে কুন্দ প্রথম এসে উপস্থিত হল। সেখানে মাতৃদৃষ্ট দ্বিতীয় অপকারী 'পদ্মপলাশলোচনা শ্যামাঙ্গী' এক নারীকে দেখে কুন্দ তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করল। সে এ বাড়ীর দাসী—হীরা।

পর্বতোপরি (চন্দ্রঃ ৩/৮)। প্রতাপের কাছ থেকে দূরে পলায়ন-কামনায় শৈবলিনী দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য অবস্থায় এক পর্বতোপরি আরোহণ করতে লাগলেন। এমন সময় ভয়ানক ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হল। শৈবলিনী বুঝলেন, কে যেন তাঁকে দু'হাতে তুলে নিয়ে যাচ্ছেন।

পরামর্শ (মৃণাঃ ৪/১২)। হেমচন্দ্র ও মাধবাচার্য পরামর্শ ক'রে যবন-বিজয়ের পর কি করা উচিত স্থির করলেন। মৃণালিনী-হেমচন্দ্রের মিলনের কথা শুনে মাধবাচার্যও আনন্দপ্রকাশ করলেন।

পরিশিষ্ট (মৃণাঃ)। কাহিনীর অসমাপ্ত অংশের সমাপ্তি বর্ণনা করা হয়েছে।

পশুপতি (মৃণাঃ ২/৬)। গৌড়দেশের ধর্মাধিকার পশুপতির পরিচয় প্রদান করা হয়েছে এবং পশুপতির সঙ্গে যবন মহম্মদ আলির কথোপকথন বর্ণিত হয়েছে। পশুপতি নিজে গৌড়েশ্বর হবার আশায় যবনকে নগরাধিকারে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

পাকাচুলের সুখ দুঃখ (ইন্দিরা ৯ম পরিঃ)। বাড়ীর গৃহিণীর পাকাচুলে কলপ মাখিয়ে ইন্দিরা তাঁকে খুশী করল। তাই দেখে বৃদ্ধা পাচিকাঠাকুরাণীও গোপনে কলপ মেখে মুখ পর্যন্ত কালি ক'রে বাড়ীসুদ্ধ লোকের হাস্যরসের খোরাক যোগাল।

পাঠক মহাশয়ের বড় রাগের কারণ (বিষঃ ৮ম পরিঃ)। বঙ্কিমচন্দ্র মাঝে মাঝে উপন্যাসের অন্তরাল থেকে পাঠকের সামনে বেরিয়ে আসেন। এখানে তিনি তারাচরণের সঙ্গে কুন্দের বিবাহ, দেবেন্দ্র নামক একজন অসচ্চরিত্র জমিদারের কুন্দের প্রতি আসক্তি এবং তারাচরণের মৃত্যু খুব সংক্ষেপে বিবৃত করেছেন। কুন্দের এভাবে বিবাহ ও বৈধব্য ঘটাতে অনেক পাঠক অসন্তুষ্ট হতে পারেন ভেবেই বঙ্কিম উপরোক্ত নামকরণ করেছেন।

পান্থনিবাসে (কপাঃ ২/২)। পরিচ্ছেদের প্রথমেই রূপগোস্বামীর 'উদ্ধবদূত' থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে—"কৈষা যোষিৎ প্রকৃতিচপলা"। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বৃন্দাবনে রাধিকার খবর আনতে পাঠালে তিনি রাধিকাকে দেখে ভাবলেন—কে এই প্রকৃতিচপলা নারী ? এখানেও নবকুমারের সঙ্গে মতিবিবির কথোপকথনের দ্বারা মতিবিবির চপল চরিত্রের প্রকাশ দেখা যায়।

পাপ (চন্দ্রঃ ২য় খণ্ড)। দ্বিতীয় খণ্ডে মোট আটটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। শৈবলিনীর পাপের আকাঙ্ক্ষা যে ক্রমে ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে, তা-ই এই খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য, এর জন্য বিভিন্ন ঘটনার আকস্মিকতাও কম দায়ী নয়।

পাপীয়সী (চন্দ্রঃ ১ম খণ্ড)। এই খণ্ডের নাম 'পাপীয়সী' দেওয়া হয়েছে শৈবলিনীর আচরণের দিকে তাকিয়ে। যদিও শৈবলিনী ফস্টর কর্তৃক অপহৃতা হয়েছেন, তবু তার মনে প্রতাপের সঙ্গে মিলনের সুপ্ত ইচ্ছা রয়েছে। এইজন্য তাকে লেখক পাপীয়সী আখ্যা দিয়েছেন। এই খণ্ডে মোট পাঁচটি পরিচ্ছেদ আছে। শৈবলিনীর অপহরণ ও চন্দ্রশেখরের গৃহত্যাগ এই খণ্ডের প্রধান বিষয়।

পাপের বিচিত্র গতি (চন্দ্রঃ ২/৮)। শৈবলিনীর আত্মানুসন্ধান এ পরিচ্ছেদের বিষয়-বস্তু। শৈবলিনী আত্মহত্যা ক'রে নিজের জ্বালা জুড়াবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু পাপের এমনি বিচিত্র গতি যে, তিনি তা পারলেন না, ভাবলেন, চন্দ্রশেখরের কাছে অপরাধ স্বীকার ক'রে মরবেন। এমন সময় দেখলেন—সামনেই চন্দ্রশেখর।

পিঞ্জর ভাঙ্গিল (মৃণা ঃ ৪/৬)। পশুপতি মনোরমাকে ঘরে বন্দী ক'রে রেখেছিলেন। মনোরমা সেখান থেকে পলায়ন করল।

পিঞ্জরের পাখী (বিষঃ ২৩ পরিঃ)। হীরার গৃহে আবদ্ধ কুন্দ পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর ন্যায় ছটফট করতে লাগল। তার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা শেষ পর্যন্ত তাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে এল নগেন্দ্রের উদ্যানে। সেখানে সূর্যমুখীর সঙ্গে দেখা। সূর্যমুখী কুন্দের হাত ধরে অন্তঃপুরে নিয়ে গেলেন।

পিঞ্জরের বিহঙ্গী (মৃণাঃ ১/২)। মাধবাচার্যের কৌশলে মৃণালিনী হৃষিকেশ

নামক এক গৃহস্থের বাড়ীতে আছেন। সেখানে গৃহস্বামীর কন্যা মণিমালিনীর সঙ্গে তাঁর এ স্থানে আগমন-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে আলোচনা করছেন।

পুনরালাপে (কপাঃ ৪/৬)। এখানে কাপালিক নবকুমারকে উত্তেজিত করেছেন—বিশ্বাসঘাতিনী কপালকুণ্ডলাকে বধ করবার জন্য। এই বধকার্যে যে দেবতার স্বপ্নাদেশও আছে, একথা তিনি জানাতে ভোলেননি।

কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' কাব্যের তৃতীয় সর্গে আছে—"তদ্‌গচ্ছ সিদ্ধ্যৈ কুরু দেবকার্যম্।" মহাদেবের তপোভঙ্গে অকালবসন্তে মদনের সাহায্যের জন্য ইন্দ্র মদনকে বলছেন—তুমি সিদ্ধিলাভের জন্য অগ্রসর হও এবং দেবকার্য সাধন কর।

কাপালিকের মনোভাবও তাই।

পুনশ্চ সমিধসংগ্রহের জন্য (রাজঃ ৬/৬)। পাথর-বিক্রেতা ছদ্মবেশী মাণিক-লালকে নির্মল তৈজসপত্রের মাধ্যমে একটি পত্র প্রদান করল।

পুণ্যের স্পর্শ (চন্দ্রঃ ৩য় খণ্ড)। তৃতীয় খণ্ডে মোট আটটি পরিচ্ছেদ। পাপিষ্ঠা শৈবলিনীর হৃদয়ে পুণ্যের স্পর্শলাভ হয়েছে। তাই তিনি প্রতাপের থেকে দূরে সরে যেতে চাইলেন। শুধু তাই নয়, এক পুণ্যাত্মা তাঁকে উদ্ধার করলেন। সে বর্ণনা পরবর্তী খণ্ডে।

পূর্ণাহুতি—ইষ্টলাভ (রাজঃ ৮/১৬)। যুদ্ধান্তে চঞ্চল ও রাজসিংহের বিবাহ হল।

পূর্বকথা (চন্দ্রঃ ৬/১)। শৈবলিনীর উদ্ধারকারী যে ব্রহ্মচারী চন্দ্রশেখর, একথা বঙ্কিমচন্দ্র এখানে ব্যক্ত করেছেন এবং শৈবলিনীর উদ্ধার-কাহিনী যা পূর্বে অনুক্ত ছিল তা-ও বলেছেন।

পূর্বপরিচয় (মৃণাঃ ৪/১১)। মৃণালিনী গিরিজায়াকে তার পূর্ব পরিচয় এবং হেমচন্দ্রের প্রতি অনুরাগের কথা বলেছেন।

পূর্ববৃত্তান্ত (বিষঃ ৪৬ পরিঃ)। নগেন্দ্রের সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাতের পর সূর্যমুখী তাঁর গৃহত্যাগের পরবর্তী সমস্ত ঘটনা সংক্ষেপে বিবৃত করলেন।

প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে (দুর্গেঃ ১/২০)। দুর্গের প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে যে বিভিন্ন ঘটনা চলছিল, তার কথা বলা হয়েছে।

প্রচ্ছাদন (চন্দ্রঃ ৫ম খণ্ড)। এই খণ্ডে চারটি পরিচ্ছেদের মধ্যে দলনী সম্পর্কিত বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। প্রচ্ছাদন অর্থাৎ আচ্ছাদন বা অন্তরাল। অর্থাৎ, বহির্ঘটনার অন্তরালে একটা সর্বনাশের সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। সে সর্বনাশ মীরকাসেমের এবং দলনীর।

প্রতাপ কি করিলেন (চন্দ্রঃ ৪/১)। প্রতাপ ইংরেজদের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ নবাবের আদেশ নিয়ে দেশীয় লাঠিয়ালদের একত্র ক'রে ইংরেজ তাড়ানোর চেষ্টা করতে লাগলেন।

প্রত্যাগমন (বিষঃ ৪৩ পরিঃ)। কমলমণি-শ্রীশচন্দ্র আগেভাগে গোবিন্দপুরে এসে ঘরবাড়ী পরিষ্কার করলেন। তারপর এলেন নগেন্দ্রনাথ।

প্রতিজ্ঞা—পর্বতো বহ্নিমান্ (মৃণাঃ ৩/২)। হেমচন্দ্র আহত অবস্থায় বাড়ী ফিরলে মনোরমা সেবা করতে লাগলেন। তাই দেখে গিরিজায়া মৃণালিনীকে জানাল, হেমচন্দ্র মনোরমার হয়েছে। কিন্তু মৃণালিনীর প্রতিজ্ঞা—হেমচন্দ্র তাঁরই, আর কারো নয়।

প্রতাপ (চন্দ্রঃ ২/৪)। প্রতাপ রূপসীকে বিয়ে করেছেন। শৈবলিনীর সখী সুন্দরী রূপসীর বোন। রূপসীর মুখে শৈবলিনীর অপহরণ-বৃত্তান্ত শ্রবণ ক'রে প্রতাপও মুঙ্গেরে এলেন।

প্রতিমা বিসর্জন (দুর্গেঃ ২/১০)। গজপতির কাছ থেকে তিলোত্তমার উপপত্নী হওয়ার খবর পেয়ে, নিজের হৃদয়ে অঙ্কিত তিলোত্তমার স্মৃতিকে মুছে ফেলবার চেষ্টা করবেন।

প্রতিযোগিতা (দুর্গেঃ ২/১৮)। আয়েষাকে কেন্দ্র ক'রে ওসমান জগৎসিংহকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানালেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও জগৎসিংহকে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতে হল। ওসমান পরাজিত হলেন। কিন্তু জগৎসিংহ তাঁকে হত্যা না ক'রে মুক্তি দিলেন।

প্রতিযোগিনী গৃহে (কপাঃ ৩/৩)। "শ্যামাদন্যো নহি নহি প্রাণনাথো মমাস্তি।"—রূপগোস্বামীর উদ্ধবদূত থেকে রাধার এই উক্তি—শ্যাম ছাড়া আমার আর অন্য প্রাণনাথ নাই।

মতিবিবিও এতদিনে বুঝতে পেরেছে যে, নবকুমারই তার একমাত্র প্রণয়াস্পদ। তাই প্রতিযোগিনী মেহেরউন্নিসার কাছে গিয়ে, তার সেলিমের প্রতি ভালবাসার পরিচয় পেয়েও মতিবিবি দুঃখিত হয় না।

প্রভুভক্তি (রাজঃ ৩/৯)। মাণিকলাল তার কন্যার একটা ব্যবস্থা ক'রে, মহারাণার সন্ধানে যাত্রা করল এবং নিজ বুদ্ধিবলে গুপ্তস্থানে মহারাণার সন্ধান পেল। রাজসিংহ মাণিকলালকে ছদ্মবেশে মোগল সেনার মধ্যে থাকতে বললেন। সে যেন চঞ্চলকুমারীর সঙ্গে ফেরে। প্রভুভক্ত মাণিকলাল মহারাণার জন্য এই দুঃসাহসিক কর্মে প্রবৃত্ত হল।

প্রায়শ্চিত্ত (চন্দ্রঃ ৪র্থ খণ্ড)। এতে মোট চারটি পরিচ্ছেদ আছে। শৈবলিনীর পাপের প্রায়শ্চিত্তের উপায় এই অংশে বর্ণিত হয়েছে।

প্রেতভূমে (কপাঃ ৪/৯)। কাপালিক নবকুমারকে দিয়ে কপালকুণ্ডলাকে বলি দেবার জন্য পূজার আয়োজন করছেন। তারপর নবকুমারকে আদেশ করলেন, কপালকুণ্ডলাকে স্নান করিয়ে আনবার জন্য। নদীতীরে দাঁড়িয়ে নবকুমার কপাল-কুণ্ডলাকে আকুল আবেদন জানাল গৃহে ফিরে যাবার। তারপর নদীর তীরভূমিতে ধ্বস্ নামায় উভয়ে হারিয়ে গেল আলোড়িত বারি-প্রবাহের অন্তরালে।

"বপুষা করলোজ্‌ঝিতেন সা নিপতন্তী পতিমপ্যপাতয়ৎ।

নমু তৈলনিষেকবিন্দুনা সহ দীপ্তার্চ্চিরুপৈতি মেদিনীম্ ॥"

উদ্ধৃতিটি কালিদাসের 'রঘুবংশম্' মহাকাব্যের অষ্টম সর্গের। ইন্দুমতীর মৃত্যুতে রাজা অজ মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। তার বর্ণনা কালিদাস দিয়েছেন এভাবে—প্রদীপ থেকে মাটিতে তৈলবিন্দু পতনের সঙ্গে সঙ্গে যেমন দীপশিখাও পতিত হয়, তেমনি (ইন্দুমতী) পতনের কালে পতিকেও পতিত করলেন।

কপালকুণ্ডলাও তেমনি নবকুমারকে নিয়ে নদীজলে পড়লেন।

প্রেম—নানাপ্রকার (মৃণাঃ ৪/১০)। হেমচন্দ্র-মৃণালিনীর মধুর মিলন হল। সেই সঙ্গে গিরিজায়া-দিগ্বিজয়ের কষায়-মধুর প্রেমও বর্ণিত হয়েছে।

প্রেমিকে প্রেমিকে (দুর্গেঃ ১/১৯)। ওসমান রহিম সেখ নামক একজন প্রহরীকে বিমলার তত্ত্বাবধানে রেখে দুর্গের অন্যত্র গেল। বিমলা রহিম সেখের সঙ্গে প্রেমাভিনয় করতে লাগলেন এবং সেখজীকে কাবু ক'রে বন্দিত্ব মোচন করতে সমর্থ হলেন।

ফলভোগী রাণা (রাজঃ ৪/৬)। মাণিকলালের কৌশলে মোগল সৈন্য পলায়ন করল। রাজসিংহ চঞ্চলকুমারীকে নিয়ে উদয়পুর ফিরলেন।

ফাঁদ (মৃণাঃ ২/১০)। হেমচন্দ্র মনোরমার সাহায্যে এক যবনের অনুসরণ ক'রে পশুপতির গৃহের নিকট এসে লুকিয়ে রইলেন। এমন সময় শান্তশীল তা লক্ষ্য ক'রে কৌশলে হেমচন্দ্রকে গৃহে নিয়ে এসে বন্দী করলেন। এমনিভাবে হেমচন্দ্র শান্তশীলের ফাঁদে পড়লেন।

ফাঁসির পর মোকদ্দমার তদারক (ইন্দিরা ১৭ পরিঃ)। রমণবাবু, ছদ্মবেশী ইন্দিরা, যার নাম এখন কুমুদিনী, তার সম্বন্ধে ইন্দিরার স্বামীকে অনেক কথাই বললেন। অর্থাৎ, ইন্দিরার সঙ্গে তার স্বামীর মিলনের চেষ্টা রমণবাবু ও সুভাষিণী করছেন। সেটাকেই ইন্দিরা 'ফাঁসির পর মোকদ্দমার তদারক' বলে উল্লেখ করেছে। কারণ, ইন্দিরার যা সর্বনাশ হবার তা তো হয়েছেই।

বক ও হংসীর কথা (রাজঃ ৩/১)। যোধপুরী বেগম-প্রেরিত দূত এসে সমস্ত কথা চঞ্চলকুমারীকে বলেছে। এখানে সম্ভবতঃ হংসী—চঞ্চলকুমারী ও বক—দূতী দেবী। অবশ্য, এঁরা যথাক্রমে চঞ্চল ও নির্মলও হতে পারেন। দ্রুতগামী সংবাদ সরবরাহের ঘটনাটিকে লক্ষ্য ক'রেই বোধ হয় বক ও হংসীর কথারূপে পরিচ্ছেদটিকে অভিহিত করা হয়েছে।

বজ্রাঘাত (চন্দ্রঃ ২/৬)। নৌকা থেকে শৈবলিনীকে উদ্ধার ক'রে প্রতাপ নিজের বাড়ীতে এনে তুললেন। দীর্ঘদিন পরে প্রতাপের দেখা পেয়ে শৈবলিনী নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করলেন। কিন্তু প্রতাপ তাঁর তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করলেন।

বর মিলিল (চন্দ্রঃ উপঃ/৩)। প্রতাপকে জল থেকে তুললেন চন্দ্রশেখর নামে একজন নৌকাযাত্রী। প্রতাপ বেঁচে উঠল। শৈবলিনী আর প্রতাপকে মুখ দেখাল না। এদিকে চন্দ্রশেখরের শৈবলিনীকে দেখে পছন্দ হল। তিনি শৈবলিনীকে বিবাহ করলেন।

বহ্নিব্যাপ্যো ধূমবান্ (মৃণাঃ ৩/৪)। হেমচন্দ্রের নিকট কথা আদায় করবার জন্য গিরিজায়া মিথ্যা ক'রে মৃণালিনীর বিবাহ সংবাদ দিল। তাতে হেমচন্দ্রের কি মুখভাব হল, গিরিজায়া বুঝতে পারল না। সে ভাবল—হেমচন্দ্র-মৃণালিনীর সম্পর্কের মধ্যে ভাঙন ধরেছে। এমনিভাবে আগুন জ্বলে উঠল।

বাজিয়ে যাব মল (ইন্দিরা ৫ম পরিঃ)। ইন্দিরা গঙ্গাপথে কলকাতায় যাবার সময় দুই তীরের বিচিত্র দৃশ্যাবলী দর্শন করেছে। তার মধ্যে স্মরণীয় হল অমলা ও নির্মলা নামে দুটি ছোট মেয়ের গাওয়া একটি প্রাচীন গীত। সেই গীতের একটি কলি হল—'বাজিয়ে যাব মল'। এই পংক্তিটি ইন্দিরার জীবনেও প্রযোজ্য—শত দুঃখের মধ্যেও তার আনন্দময় মূর্তিটি ম্লান হয়নি।

বাতাস উঠিল (চন্দ্রঃ ৪/৩)। ব্রহ্মচারীর কথামত শৈবলিনী গুহামধ্যে সাতদিন উপবাসক্লিষ্ট অবস্থায় নানাপ্রকার কুস্বপ্ন দর্শন করতে লাগলেন। অবশেষে তাঁর সামনে ব্রহ্মচারীবেশী চন্দ্রশেখর এসে দাঁড়ালেন। 'বাতাস উঠিল' অর্থাৎ—শৈবলিনীর জাগ্রত চিত্তে আলোড়ন জাগল।

বাতায়নে (মৃণাঃ ২/৪)। হেমচন্দ্র তাঁর গৃহের বাতায়নে এক 'বিশালশ্মশ্রুসংযুক্ত' মুখমণ্ডল দর্শন ক'রে বুঝলেন যে, নগরে যবনের আগমন ঘটেছে।

বাদশাহ বহ্নিচক্রে (রাজঃ ৭/৩)। রাজসিংহের পার্বত্য পথে সেনা-সংস্থাপনের কৌশলে ঔরঙ্গজেবের বিপুল সেনাবাহিনী সহজেই বিপদে পড়ল। রাজসিংহ বেগমদের বন্দিনী করলেন।

বাদশাহের দাহনারম্ভ (রাজ ৮/১)। ঔরঙ্গজেব সংকীর্ণ পার্বত্য পথে বন্দী অবস্থায়, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় যখন শুনলেন তাঁর বেগমরা বন্দী হয়েছেন, তখন রাগে অস্থির হয়ে উঠলেন।

বাপীকূলে (মৃণাঃ ২/৫)। হেমচন্দ্র নির্জন বাপীকূলে মনোরমাকে দেখে তার সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হলেন।

বাবু (বিষঃ ১০ম পরিঃ)। দেবীপুরের জমিদার দেবেন্দ্রবাবুর পরিচয় দান করা হয়েছে। তৎকালীন বাবু-সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতি ইঙ্গিতও এই নামকরণের তাৎপর্য হতে পারে।

বালকবালিকা (চন্দ্রঃ উপঃ/১)। বালক প্রতাপের গলায় বালিকা শৈবলিনী কখনো বা মালা পরাত, কখন বা নানারকম ছেলেমানুষী করত। কিন্তু সমস্ত ছেলে-মানুষীর মধ্যেও দুটি হৃদয়ের গভীর অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়।

বিজনে (কপাঃ ১/৩)। নির্জন অরণ্যে পরিত্যক্ত নবকুমারের সামনে নেমে এসেছে রাত্রির ভয়াবহ অন্ধকার। বায়রনের 'ডন জুয়ান' কাব্যের নায়ক ডন জুয়ান-এর বন্দিত্বের অসহায় অবস্থার একটি বর্ণনা এখানে দেওয়া হয়েছে।—

"—Like a veil,
Which if withdrawn, would but disclose the frown
Of one who hates us, so the night was shown
And grimly darkled o'er their faces pale
and hopeless eyes."

বিদ্যাধরী (ইন্দিরা ১৯ পরিঃ)। স্বামীর জেরার উত্তরে ইন্দিরা নিজেকে শাপগ্রস্তা বিদ্যাধরী বলে পরিচয় দিয়েছে। এই পরিচ্ছেদে রসিকতা সম্ভাব্যতার সীমা ছাড়িয়ে অলৌকিকতার পর্যায়ে উপনীত হয়েছে।

বিদ্যাধরীর অন্তর্ধান (ইন্দিরা ২০শ পরিঃ)। ইন্দিরা ও তার স্বামী ইন্দিরার পিতৃগৃহে এসেছে। সেখানে স্বামী জানতে পারলেন যে কুমুদিনী বিদ্যাধরী নয়, সে-ই ইন্দিরা।

বিধবা (দুর্গেঃ ২/৫)। বিধবা বিমলা স্বামীহত্যার প্রতিশোধ কামনায় কত্‌লু খাঁর অন্দরে প্রবেশ করার জন্য ওসমানকে একখানি পত্র দিয়েছে।

বিনা সূতার হার (মৃণাঃ ৪/২)। মনোরমা যখন বিনা সূতার হার গাঁথছিল, তখন পশুপতি তাকে গোপনে বিয়ে করবার প্রস্তাব দিল। কিন্তু মনোরমা কিছুই উত্তর দিল না।

বিবাহে বিকল্প (রাজঃ ৩য় খণ্ড)। তৃতীয় খণ্ডে মোট দশটি পরিচ্ছেদ। চঞ্চলকুমারীকে ঔরঙ্গজেব বিবাহ করার জন্য সেনা পাঠিয়েছেন। অন্যদিকে চঞ্চলকুমারী বিবাহের বিকল্প ব্যবস্থা করেছেন রাজসিংহের সঙ্গে।

বিবি পাণ্ডব (ইন্দিরা ৮ম পরিঃ)। ইন্দিরা রন্ধনে সকলকে সন্তুষ্ট করল। দ্রৌপদীর রান্নার সুখ্যাতি ছিল। তাই সুভাষিণী পরিহাসের সঙ্গে ইন্দিরাকে 'বিবি পাণ্ডব' আখ্যা দান করেছে।

বিমলার পত্র (দুর্গেঃ ২/৬)। ওসমানকে প্রদত্ত বিমলার পত্র দ্বারা জানা গেল, বাল্যকালে ওসমানকে দস্যুর অপহরণের হাত থেকে বিমলাই বাঁচিয়েছিল। বিমলার পূর্ব পরিচয়ও এখানে রয়েছে।

বিমলার পত্র সমাপ্ত (দুর্গেঃ ২/৭) বিমলার পত্রপাঠ সমাপ্ত ক'বে ওসমান তাঁর সম্বন্ধে কৃতজ্ঞতাবশতঃ কত্‌লু খাঁর জন্মদিনের উৎসবে তাঁর প্রবেশের ব্যবস্থা ক'রে দিল।

বিমলার মন্ত্রণা (দুর্গেঃ ১/৮)। তিলোত্তমার সঙ্গে জগৎসিংহের বিবাহ দেবার জন্য বিমলা অভিরাম স্বামীকে পরামর্শ দিয়েছে।

***বিষবৃক্ষ** ॥ বঙ্কিম 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাস রচনা করলেন, কিন্তু বাংলা উপন্যাসের জগতে এক অমৃতময় বৃক্ষের জন্ম হল। বঙ্কিম তাঁর 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে বাংলা সামাজিক উপন্যাসের যে দিগন্ত উন্মোচিত করলেন, বর্তমানে তা বিচিত্র রঙে সুশোভিত।

প্রথম প্রকাশ ও বিভিন্ন সংস্করণঃ বঙ্কিমচন্দ্রে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রকাশের সঙ্গে 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসও ধারাবাহিকভাবে এই প্রত্রিকায় প্রকাশিত হতে লাগল। ১২৭৯ সালের বৈশাখ থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত মোট এগারো সংখ্যায় এই উপন্যাস প্রকাশিত হয়। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন গ্রন্থটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রটি এরূপ—"বিষবৃক্ষ/উপন্যাস।/শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়/প্রণীত।/কাঁটালপাড়া।/বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয়ে শ্রীহারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।/১২৮০।/"

বঙ্কিমের জীবিতকালে গ্রন্থটির আটটি সংস্করণ হয়। ১ম সং—১২৮০ বঙ্গাব্দ (১৮৭৩ খ্রীঃ ১লা জুন) পৃ. ২১৩, ২য় সং—১২৮২ বঙ্গাব্দ (২১৪ পৃ.), ৩য় সং—১৮৮০ খ্রীঃ (২১২ পৃ.), ৪র্থ সং—১২৮৮ বঙ্গাব্দ (২১২ পৃ.), ৫ম সং—তারিখ জানা যায়নি, ৬ষ্ঠ সং—১৮৮৭ খ্রীঃ (২৪৯ পৃ.), ৭ম সং—১৮৯০ খ্রীঃ (২৪৯ পৃ.) ও ৮ম সং—১৮৯২ খ্রীঃ (২৪৮ পৃ.)।

প্রথম সংস্করণে পত্রিকায় প্রকাশিত আখ্যানেরই পুনর্মুদ্রণ হয়। তারপর প্রতি সংস্করণে কিছু কিছু পাঠ বদল হয়েছে। কিন্তু তা নিতান্তই সামান্য। দেবেন্দ্র-হীরা

সম্পর্কিত কাহিনীতেই বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায়। হীরার দুঃসাহসিকা বৃত্তি কিছুটা সংযত করা হয়েছে এবং কয়েকটি ছড়া ও গান বাদ দেওয়া হয়েছে। (দ্রঃ উপন্যাস-সাহিত্যে বঙ্কিম—প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত, পৃ. ৪৪১—৪৪৭)।

'বিষবৃক্ষ' প্রকাশকালে বঙ্কিম মুর্শিদাবাদে কর্মরত। সম্ভবতঃ এখানেই উপন্যাসটি লিখিত হয়। বঙ্কিমের বয়স তখন আনুমানিক ৩৫ বৎসর।

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে বঙ্কিম রোমান্স ও ইতিহাসের স্বপ্নলোক থেকে মাটির পৃথিবীতে নেমে এসেছেন। এরকমটি কেন হল, তার কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। তবে অনুমান করা চলে যে, বিদ্যাসাগর ও অন্যান্য সংস্কারকদের দ্বারা বাংলা সমাজ-জীবনে যে পরিবর্তন দেখা দিচ্ছিল, তাই বঙ্কিমচন্দ্রকে সামাজিক উপন্যাস রচনা করতে প্রেরণা দিয়েছিল। বিধবা বিবাহ-সমস্যা যে বঙ্কিমকে ভাবিয়ে তুলেছিল, তার প্রমাণ বিষবৃক্ষে আছে। কুন্দ বিধবা, হীরা বিধবা—এই দুজনের সমস্যাই প্রধান। তারাচরণের মা শ্রীমতীও বিধবা ছিল এবং তার চরিত্র দুষ্ট হয়েছিল। এসব থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, বঙ্কিম বিধবা বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন না।

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের কাহিনীর সঙ্গে সত্য ঘটনার সম্পর্ক: 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের বিষয়-বস্তুতে বঙ্কিম যেমন মাটির কাছাকাছি এসেছেন, তেমনি কোন কোন চরিত্র তাঁর ব্যক্তিগত জীবন থেকে সংগ্রহ করেছেন। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার 'বঙ্কিম প্রসঙ্গে' লিখেছেন—তিনি বঙ্কিমকে জিজ্ঞাসা করেন সত্যই কি বিষবৃক্ষে কিছু বাস্তব ছবি আছে? তার উত্তরে বঙ্কিম বলেন—'কতক সত্য বই কি, তবে আসলের উপর অনেক রং ফলাইতে হইয়াছে।'

নবীনচন্দ্র সেন 'আমার জীবন' (২য় ভাগ)-এ লেখেন, সূর্যমুখীর চরিত্র বঙ্কিমের স্ত্রীর প্রতিচ্ছবি। ১৮৭৭ খ্রীঃ তিনি যখন কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান, তখন নবীনচন্দ্র তাঁর রচনা থেকে পাঠ করতে অনুরোধ জানান। 'তিনি কি পড়িবেন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ...আমি বলিলাম—'বিষবৃক্ষ'। তিনি—'কোন্ স্থান পড়িব? আমি—'যে স্থান আপনার অভিরুচি।' তিনি 'বিষবৃক্ষ' খুলিয়া যেখানে কমলমণির কাছে সূর্যমুখী তাঁহার পতিপ্রাণতা দেখাইয়া পত্র লিখিয়াছেন সে স্থান পড়িতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পড়িয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন—'বিষবৃক্ষ আমি পড়িতে পারি না। তুমি অন্য কিছু শুনিতে চাও ত পড়ি।' আমাকে অক্ষয়বাবু সত্যই বলিয়াছিলেন যে বঙ্কিমবাবুর স্ত্রীর চরিত্রই তাঁহাকে 'নভেলিষ্ট, করিয়াছে। তিনিই সূর্যমুখী।' (আমার জীবন, ২য় ভাগ ; পৃঃ ৩৬৬)।

বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসখানি তাঁর প্রিয় বন্ধু জগদীশনাথ রায়ের নামে উৎসর্গ

করেন। উৎসর্গপত্রে লেখা ছিল—"কাব্যপ্রিয়/পণ্ডিতাগ্রগণ্য/শ্রীযুক্তবাবু জগদীশনাথ রায়/সুহৃদ্বরকে/এই গ্রন্থ/বন্ধুত্ব ও স্নেহের চিহ্নস্বরূপ/অর্পিত হইল। এই জগদীশনাথ রায় সম্বন্ধে 'বঙ্কিম-জীবনী'তে শচীশচন্দ্র লেখেন—'বিষবৃক্ষে' হরদেব ঘোষালের নামে যে পত্রগুলি আছে, সেগুলি জগদীশনাথ রায়ের লেখা।

কাহিনী: নগেন্দ্রনাথ দত্ত গোবিন্দপুরের সম্পন্ন জমিদার। তাঁর প্রিয়তমা পত্নী সূর্যমুখী। নগেন্দ্র একবার নৌকাযোগে কলকাতায় আসছিলেন। পথিমধ্যে ঝড়-জলের জন্য এক গ্রামের জীর্ণ এক প্রাসাদে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়। বৃদ্ধের একমাত্র বালিকা কন্যা কুন্দকে তার মেসোর কাছে পৌঁছে দেবার জন্য তিনি কলকাতায় আনলেন। কিন্তু কুন্দর মেসোর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। অগত্যা কুন্দ নগেন্দ্রের উপর এসে পড়ল। নগেন্দ্র দিনকতক কলকাতায় ভগ্নী ও ভগ্নীপতি—কমলমণি ও শ্রীশচন্দ্রের বাড়ীতে কাটিয়ে কুন্দকে নিয়ে স্বগৃহে ফিরলেন। সূর্যমুখীর চেষ্টায় তার এক সম্পর্কিত ভ্রাতা তারাচরণের সঙ্গে কুন্দের বিবাহ হল। কিন্তু বিবাহের তিন বছর পরেই কুন্দ হল বিধবা। সে নগেন্দ্রের পরিবারেই আশ্রয় নিল।

কিন্তু ক্রমে ক্রমে নগেন্দ্র ও কুন্দ পরস্পর আসক্ত হল। সূর্যমুখীও সেটা অনুভব ক'রে মরমে মরে গেলেন। কুন্দ সূর্যমুখীর প্রতি কৃতজ্ঞতায় নিজেকে দমন করার চেষ্টায় একদিন নগেন্দ্রের গৃহত্যাগ করল। সে আশ্রয় নিল নগেন্দ্রের বাড়ীর এক কুটিলা দাসী হীরার গৃহে। হীরা চায় সূর্যমুখীর গৃহে অশান্তি আনতে। সে আবার পার্শ্ববর্তী গ্রামের মদ্যপ জমিদার দেবেন্দ্রকে ভালবেসে ফেলেছে। দেবেন্দ্র কুন্দনন্দিনীর জন্য পাগল। তাই কুন্দনন্দিনীর সর্বনাশসাধনও হীরার একটি উদ্দেশ্য।

হীরার চেষ্টায় নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর সম্পর্ক ক্রমে ক্রমে বিষময় হয়ে উঠল। তারপর কুন্দ একদিন যখন নগেন্দ্রকে গোপনে দেখতে গেল, তখন ধরা পড়ল। সূর্যমুখী দেখলেন, কুন্দ এখন নগেন্দ্রের প্রাণ। স্বামীর আনন্দবিধানের জন্য নগেন্দ্রের সঙ্গে কুন্দের বিবাহ দিয়ে সূর্যমুখী একদিন গৃহত্যাগ করলেন। পথক্লিষ্টা মৃতপ্রায় সূর্যমুখীকে উদ্ধার ক'রে, এক ব্রহ্মচারী তাঁকে সুস্থ ক'রে তুললেন। এদিকে নগেন্দ্রও সূর্যমুখীর গৃহত্যাগ বুঝতে পারলেন—সূর্যমুখীই তাঁর সর্বসুখের মূল ছিল। তিনিও সূর্যমুখীর খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। হতভাগিনী কুন্দ একাকী পড়ে রইল দত্তবাড়ীতে। দীর্ঘকাল পরে আবার দত্তবাড়ীতে নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর মিলন হল। কিন্তু তখনই হীরার দেওয়া বিষ খেয়ে কুন্দ আত্মহত্যা করল। অপরদিকে হীরাও পাগল হয়ে গেল এবং দেবেন্দ্র বিষময় মৃত্যুবরণ করল।

কাহিনী বিশ্লেষণ: বিষবৃক্ষের এই কাহিনীর মধ্যে দুটি কাহিনী রয়েছে—একটি নগেন্দ্র-সূর্যমুখী-কুন্দের, অন্যটি হীরা-দেবেন্দ্রের। কিন্তু কাহিনী দুটি পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বঙ্কিম উপন্যাসে মূল কাহিনী এবং উপকাহিনীর এমন নিবিড় সংমিশ্রণ এই প্রথম। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে বঙ্কিম যেভাবে গঠন-কৌশলের সুষ্ঠু পরিকল্পনার পরিচয় দিয়েছেন, তা শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের কৃতিত্ব বহন করে।

উপন্যাসের পঞ্চাশটি পরিচ্ছেদের মধ্যে কেন্দ্রীয় ঘটনা—নগেন্দ্র ও কুন্দের বিবাহ পঞ্চবিংশ ও ষড়বিংশ—এই মধ্যবর্তী পরিচ্ছেদে সন্নিবেশিত। উপন্যাসের প্রথমেই কুন্দের মাতার স্বপ্নদর্শন ঘটনা দ্বারা উপন্যাসের গঠন-কৌশলে নূতনত্বের আমদানি করা হয়েছে। তাছাড়া, এই উপন্যাসের পত্র-ব্যবহারের বাহুল্য লক্ষণীয়। পত্রগুলির গুরুত্বও অসীম। এগুলির দ্বারা পত্রপ্রেরকের মনোভাব সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। উপন্যাসের ঘটনাগুলি দৃঢ়বদ্ধ। তবে তারাচরণের সঙ্গে কুন্দের বিবাহকালে তিন বছরের জন্য কাহিনীর গতি স্তব্ধ হয়েছে। তারাচরণের সঙ্গে কুন্দের বিবাহ ও কুন্দের বিধবা হওয়ার ঘটনাটির খুব বেশি প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয় না। কুন্দনন্দিনীর বিষপানের ঘটনাটিকে অনেকে নিন্দা করেছেন। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও নাকি শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে বলেছিলেন—"কুন্দনন্দিনীর বিষ খাওয়াটা যে নীতিবিরুদ্ধ তাহা আমি স্বীকার করি।" কুন্দের স্বপ্নদর্শনের ঘটনাগুলি কিছুটা অলৌকিক হলেও উপন্যাসের প্রয়োজন সিদ্ধ করেছে। দেবেন্দ্রের বৈষ্ণবীবেশে নগেন্দ্রের অন্তঃপুরে যাতায়াত কিছুটা অস্বাভাবিক বলে মনে হয়।

কাহিনীকাল: 'বিষবৃক্ষে'র কাহিনীকাল ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। কারণ এতে বিদ্যাসাগর-প্রবর্তিত বিধবা-বিবাহ, ব্রাহ্ম সমাজ প্রভৃতি যেমন উল্লেখ আছে, তেমনি সূর্যমুখীর স্বামীগৃহ নির্মাণের ফলকে খোদিত আছে—এই গৃহস্থাপনা হয় ১৯১০ সম্বৎসরে, অর্থাৎ ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে। বিষবৃক্ষের ঘটনার পরিসীমা অনধিক ৫ বৎসর।

বর্ণনারীতি: 'বিষবৃক্ষে'র ঘটনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এর বর্ণনা-রীতিতেও বঙ্কিম সহজ-সরল সুরের বিন্যাস করেছেন। অনাড়ম্বর শব্দ-যোজনা ও বর্ণনার স্বাভাবিকতা দ্বারা তিনি যে চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন, তা প্রশংসার যোগ্য। যেমন—এই বর্ষার চিত্রটি কত অনাড়ম্বর, অথচ কত গভীর—"বর্ষাকাল। বড় দুর্দ্দিন। সমস্ত দিন বৃষ্টি হইয়াছে। একবারও সূর্য্যোদয় হয় নাই। আকাশ মেঘে ঢাকা।"

হাস্যরস: 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে হাস্যরস সৃষ্টিতে বঙ্কিম যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। হীরার আইর "ইষ্টিরসে" 'কেষ্টরসের' বিধানলাভ সত্যই কৌতুকপ্রদ।

নামকরণের তাৎপর্য: 'বিষবৃক্ষে'র নামকরণের তাৎপর্য বঙ্কিম নিজেই গ্রন্থের "ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ: বিষবৃক্ষ কি?"-এর মধ্যে ব্যক্ত করেছেন। রিপুর প্রাবল্য হল

বিষবৃক্ষের বীজ। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই এই বীজ নিহিত আছে। কিন্তু যাদের চিত্তসংযম নাই তাদের ক্ষেত্রে এই বীজ উপ্ত হয় ও বৃদ্ধি পায়। নগেন্দ্রের অশেষ গুণ থাকা সত্ত্বেও চিত্তসংযমের অভাবে কুন্দনন্দিনীর প্রতি আসক্ত হয়ে বিষময় ফল ভোগ করতে হয়েছে। কুন্দের পক্ষেও নগেন্দ্রের প্রতি অনুরাগ চিত্তদৌর্বল্যের প্রকাশ। সূর্যমুখীর দোষ কি?—কুন্দকে প্রশ্রয় দান! হীরা-দেবেন্দ্রের দোষ অবর্ণনীয়। তাই সকলকেই কম-বেশি শাস্তি পেতে হয়েছে। কুন্দের শাস্তি মৃত্যুতে যত না হয়েছে, তার চেয়ে বেশি হয়েছে তার প্রতি নগেন্দ্রের উপেক্ষায়। সূর্যমুখীর শাস্তি গৃহত্যাগের পর। নগেন্দ্রের শাস্তি আজীবন কুন্দের স্মৃতিভার বহনে। হীরা-দেবেন্দ্রের শাস্তি অনেকটা Tragic অপেক্ষা Pathetic হয়ে পড়েছে।

বিষবৃক্ষের রূপান্তর : বঙ্কিমের অন্যান্য উপন্যাসের মত 'বিষবৃক্ষ'-ও বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে 'The Poison Tree' নামে ইংরাজীতে অনুবাদ করেন মিরিয়াম এস্. নাইট। এর ভূমিকা লেখেন—স্যার এড্উইন আর্নল্ড। তিনি উপন্যাসখানির বিশেষ প্রশংসা করেন। এছাড়া 'বঙ্কিম-জীবনী' থেকে জানা যায়—'The bone of Life' নামে বিষবৃক্ষের অংশবিশেষ বঙ্কিমচন্দ্র অনুবাদ করেন ছোটলাট ইলিয়ট সাহেবের পত্নীকে উপহার দেওয়ার জন্য। অনুবাদটির কিয়দংশ পাওয়া গেছে। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে শিয়ালকোট থেকে G Quader-এর হিন্দুস্থানী অনুবাদ 'Fasih' বের হয়। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে স্টক্হল্ম থেকে গ্রন্থটির সুইডিশ অনুবাদ প্রকাশিত হয় 'Det giftiga.Tradet' নামে। 'বিষবৃক্ষে'র নাট্যরূপ দেন রসরাজ অমৃতলাল বসু।

'বিষবৃক্ষ' নিঃসন্দেহে বঙ্কিমের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এই উপন্যাসের দ্বারা বাংলা সাহিত্যে অমৃত ফলেছে।

বিষবৃক্ষ কি ? (বিষঃ ২৯ পরিঃ)। এই পরিচ্ছেদে বঙ্কিম বিষবৃক্ষের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। এর দ্বারা একদিকে যেমন গ্রন্থের নামকরণের তাৎপর্য বর্ণিত হয়েছে অন্যদিকে তেমনি তাঁর নীতিবাদী মনোভাবও প্রকাশিত হয়ে পড়েছে।

বিষবৃক্ষের ফল (বিষঃ ৩২ পরিঃ)। সূর্যমুখীকে হারিয়ে নগেন্দ্রের মনে কুন্দের প্রতি যে তীব্র বিতৃষ্ণা দেখা দিয়েছে, তা নগেন্দ্রের বন্ধু হরদেব ঘোষালের সঙ্গে কয়েকটি পত্র-বিনিময়ের দ্বারা প্রকাশ পেয়েছে।

বিহঙ্গী পিঞ্জরে (মৃণাঃ ৪/৩)। মনোরমা পশুপতিকে জানাল যে, সে-ই তার পূর্ব-বিবাহিতা স্ত্রী। পশুপতিও আজ মনোরমাকে ছেড়ে দিতে রাজী হল না। সমস্ত দরজা বন্ধ ক'রে বন্দিনী করল।

বীর পঞ্চমী (দুর্গেঃ ১/১৭)। এই পরিচ্ছেদে জগৎসিংহকে নিয়ে বিমলা গড়-মান্দারণ দুর্গে প্রবেশ করার চেষ্টা করেছেন। জগৎসিংহ একজন অনুসরণকারীকে হত্যা করার জন্য বিমলার কাছ থেকে অস্ত্র চাইলে, বিমলা প্রহরীর কাছ থেকে এই বলে অস্ত্র চাইলেন—"আজ আমার বীর পঞ্চমীর ব্রত, ব্রত করিলে বীর পুত্র হয়; তাহাতে রাত্রে অস্ত্র পূজা করিতে হয়; আমি পুত্র কামনা করি··· ।"

বুড়ি বড় সতর্ক (রাজ: ১/৪)। ছবি-বিক্রেত্রী বুড়ী যাতে রাজকুমারীর চিত্রদলনের কাহিনী দিল্লীতে কাউকে না বলে, তার জন্য রাজকুমারীর সখী তাকে কিছু বখ্‌শিশ করেছিল। কিন্তু বুড়ী তার পুত্রের কাছে কথাটি বলার জন্য ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলল।

ভারি জুয়াচুরির বন্দোবস্ত (ইন্দিরা ১৮ পরিঃ)। ইন্দিরা স্বামীর সঙ্গে কথোপকথনে, ইন্দিরা-সম্বন্ধীয় বিবিধ ঘটনার এমন অন্তরঙ্গ পরিচয় দিয়েছে যে, তার স্বামীর মনে হয়েছে—'হয় তুমি স্বয়ং ইন্দিরা, নয় কোন মায়াবিনী।'

ভালবাসার চিহ্নস্বরূপ (বিষঃ ৩৩ পরিঃ)। নগেন্দ্রের বাড়ী ছাড়ার পর হীরাই প্রকৃতপক্ষে দত্তবাড়ীর কর্ত্রী। একদিন সে যখন লতামণ্ডপে শুয়েছিল, তখন দেবেন্দ্র কুন্দের আশায় সেখানে আসে। এটা হীরার মোটেই ভাল লাগে না। তাই সে দারোয়ানদের দিয়ে দেবেন্দ্রকে প্রহার দিয়ে তার পিঠে ভালবাসার চিহ্ন রেখে দেয়।

ভিখারিণী (মৃণাঃ ১/৩) গিরিজায়া নামে একজন ভিখারিণীর গানে আকৃষ্ট হয়ে মৃণালিনী তাকে ডেকে আনলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, এ নারী হেমচন্দ্রের প্রেরিত। তাই তিনিও কৌশলে গিরিজায়ার মারফত হেমচন্দ্রকে সংবাদ পাঠালেন।

ভীমা পুষ্করিণী (চন্দ্রঃ ১/২)। ভীমা নামক এক পুষ্করিণী'তে শৈবলিনী যখন তাঁর সখী সুন্দরীর সঙ্গে স্নান করছিলেন, তখন লরেন্স ফস্টর নামে এক ইংরেজ তাঁর রূপে মুগ্ধ হলেন।

ভুতপূর্বে (কপাঃ ৩/১)। এখানে কিঞ্চিৎ ঐতিহাসিক ঘটনা পরিবেশিত হয়েছে। মতিবিবি বা লুৎফউন্নিসা বাল্যসখী মেহেরউন্নিসার সম্রাজ্ঞী হওয়ায় বাধা দান করছে। মতিবিবি মেহের-এর দাসীরূপে বাঁচতে চায় না। তাই শ্রীহর্ষ-রচিত 'রত্নাবলী' নাটকের প্রথম অঙ্ক থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে—"কষ্টোহয়ং খলু ভৃত্যভাবঃ," অর্থাৎ—ভৃত্যভাব বড়ই কষ্টদায়ক। নাটকের উক্তিটি রাজমন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের। তিনি রাজার উপকারের জন্যই রাজার অনভিপ্রেত অনেক কাজ করেছেন, অথচ সর্বদাই রাজার কাছ থেকে শাস্তির ভয়, তাই এরূপ মন্তব্য।

মতিবিবির দাসীত্ব স্বীকার না করার কারণ অবশ্য অন্য।

মন্ত্রণার পর উদ্যোগ (দুর্গেঃ ১/১০)। বিমলা পূর্বকথামত জগৎসিংহের সঙ্গে শৈলেশ্বরের মন্দিরে পুনরায় সাক্ষাৎ করতে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছেন। এর পূর্বে জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার বিবাহের জন্য তিনি অভিরাম স্বামীর সঙ্গে মন্ত্রণা করেছিলেন বলে, এ পরিচ্ছেদের এরূপ নামকরণ করা হয়েছে।

মবারক ও দরিয়া ভস্মীভূত (রাজঃ ৮/১৫)। মবারকের সাহায্যে পুনরায় মুসলমান সেনা পরাজিত হল। দরিয়ার গুলিতে মবারক মারা গেলেন। শাহজাদী সাধারণ স্ত্রীলোকের মতই কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

মবারকের দাহনারম্ভ (রাজঃ ৮/১৩)। মবারক জেব-উন্নিসাকে গ্রহণ করলেও দরিয়াকে ভুলতে পারেননি। এমন সময় পাগলী দরিয়াকে দেখে বুঝলেন যে তাঁকে মরতেই হবে।

মহম্মদ আলির প্রায়শ্চিত্ত (মৃণাঃ ৪/১৩)। যে যবন মহম্মদ আলি পশুপতিকে লোভ দেখিয়ে বিশ্বাসঘাতকতায় উৎসাহিত করেছিল, সে নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য বন্দী পশুপতিকে মুক্ত ক'রে দিল।

মহাসমর (বিষঃ ১৩ পরিঃ)। সূর্যমুখীর আমন্ত্রণে কমলমণি গোবিন্দপুরে আসার জন্য শ্রীশচন্দ্রের সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হয়েছে। তাদের মধুর কলহ মহাসমর ছাড়া আর কিছু নয়। তাদের মহাসমরে একমাত্র শিশুপুত্র সতীশচন্দ্রের ভূমিকাও নিতান্ত কম নয়।

মাণিকলাল (রাজঃ ৩/৪)। ডাকাতদলকে রাণা রাজসিংহ একাকী পরাস্ত করলেন। সেই দলের একজন মাণিকলাল রক্ষা পেল। মাণিকলাল মহারাণাকে কথা দিল, মহারাণার জন্য সে সাধ্যমত কাজ করবে।

মাতাজীকি জয় (রাজঃ ৩/৬)। রাজসিংহ রাজধানীতে না ফিরে উদয়পুরের দিকে চললেন। এমন সময় রাজসিংহের সৈন্যসামন্ত 'মাতাজীকি জয়' বলে রাণার সঙ্গে এসে মিলিত হল।

মিশ্র ঠাকুরের নারায়ণ স্মরণ (রাজঃ ৩/৩)। অনন্ত মিশ্র রাজসিংহের কাছে যাবার পথে ডাকাতের হাতে পড়ে ভয়ে নারায়ণ স্মরণ করতে লাগলেন।

মুক্ত (মৃণাঃ ২/১১)। পশুপতির গৃহে বন্দী হেমচন্দ্রকে মনোরমা মুক্ত করে জানাল যে, সে যেন সাবধানে থাকে, কারণ আজ রাত্রে তাকে হত্যা করার চেষ্টা করা হবে।

মুক্তকণ্ঠ (দুর্গেঃ ২/১৫)। জগৎসিংহ এবং আয়েষা যখন অন্তরঙ্গভাবে কথাবার্তা বলছিলেন, তখন ওসমান এসে তা দেখে ঈর্ষ্যা প্রকাশ করলেন। তাতে আয়েষাও

ক্রোধে ওসমানকে শুনিয়ে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করলেন যে—তাঁর একমাত্র হৃদয়েশ্বর জগৎসিংহ।

***মৃণালিনী ॥ গ্রন্থ-পরিচয়ঃ** 'মৃণালিনী' বঙ্কিমচন্দ্রের তৃতীয় উপন্যাস। গ্রন্থটি ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ প্রকাশ সম্বন্ধে শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বঙ্কিম-জীবনী'তে বলেন—"আলিপুরে বঙ্কিমচন্দ্র দশমাস মাত্র ছিলেন। সেই দশমাসের [১৮৬৭ আগষ্ট হইতে ১৮৬৮ জুন] ভিতর তিনি মৃণালিনী লিখিয়া শেষ করিলেন। পরে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাস হইতে তিনি ছয়মাসের ছুটী লইলেন। ছুটীর কিয়দংশ গৃহে থাকিয়া আইন-পুস্তক-পাঠে ও মৃণালিনীর পাণ্ডুলিপি সংশোধনে অতিবাহিত করিলেন; এবং অবশেষে মৃণালিনী ছাপিতে দিয়া কাশীধামে চলিয়া গেলেন। ..... মৃণালিনী মুদ্রিত হইতে এক বৎসরের উপর সময় লাগিয়াছিল। অবকাশান্তে বঙ্কিমচন্দ্র আলিপুরে ফিরিয়া আসিলেন; তখনও মৃণালিনী ছাপা শেষ হয় নাই। অবশেষে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে মৃণালিনী প্রকাশ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে চলিয়া গেলেন।"

'মৃণালিনী'র প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রটি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

আখ্যায়িকাপত্রে একটি শ্লোক উদ্ধৃত ছিল।—"বিভর্ষি চকারমণির্ ́তানাং/মৃণালিনী হৈমমিবোপরাগম্"। উৎসর্গপত্রে বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন—"বঙ্গকবিকুলতিলক/শ্রীযুক্ত বাবু দীনবন্ধু মিত্র/সুহৃৎপ্রধানকে/এই গ্রন্থ/প্রণয়োপহারস্বরূপ/উৎসর্গ করিলাম।

মৃণালিনীর ঐতিহাসিক পটভূমিকাঃ 'মৃণালিনী উপন্যাসে একটি ঐতিহাসিক পটভূমিকা আছে। সে ইতিহাস হল যবনহস্তে বাংলাদেশে সেন রাজত্বের অবসানের ইতিহাস। মাত্র সপ্তদশ অশ্বারোহীর দ্বারা বঙ্গাবিজয় সম্পন্ন হয়েছিল—এই ঘটনাকে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার ইতিহাসের এক কলঙ্কজনক অধ্যায় বলে মনে করতেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই কলঙ্ক অপনোদনের জন্য এই ঘটনার একটি বিশ্বাসযোগ্য রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন 'মৃণালিনী' উপন্যাসে। ঘটনার কিছু বিকৃতিসাধন করলেও মোটামুটি তিনি ইতিহাসের কাঠামোটি ঠিক রেখেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই ইতিহাস সংগ্রহ করেন আবু ওমার মিন্‌হাজউদ্দিন-এর 'তাবাকৎ-ই-নসিবি' নামক গ্রন্থ ও স্টুয়ার্ট সাহেবের অনুবাদ থেকে। এতে আছে—

"In the year 600, Mohammed Bukhtyar Khulijy, having acquired sufficient information of the unguarded state of Bengal, secretly assembled his troops; and marching from Behar, proceeded with such expedition toward Nuddeah, that his approach was not even suspected.

On his arrival in the vicinity of the city, he concealed his troops in a wood, and, *accompanied by only seventeen horsemen, entered the city.* On passing the guards, he informed them that he was an envoy, going to pay his respects to their master.

He was permitted to approach the palace ; and having passed through the gates, he and his party drew *their swords, and* commenced a slaughter of the royal attendants.

The Raja Luchmunyah, who was then seated at dinner, alarmed by the cries of his people, made his escape from the palace by a private door, and, getting on board a small boat, rowed with the utmost expedition down the river."

অবশ্য, নদীয়া কিছুদিন বখ্‌তিয়ারের অধীন থাকার পর আবার সেনরাজাদের হস্তগত হয়। পরবর্তী কালের ঐতিহাসিকদের মতে বঙ্গজয়ের প্রধান গৌরব বখ্‌তিয়ারের পুত্র ইখ্‌তিয়ারউদ্দিন মহম্মদেরই প্রাপ্য।

যাই হোক, বঙ্কিমচন্দ্র যে ইতিহাসকে অনুসরণ ক'রে 'মৃণালিনী' উপন্যাস রচনা করতে প্রবৃত্ত হন, তাকে অধিকাংশ স্থলেই যথাযথ রেখেছেন। কিন্তু দেশপ্রেমের চেতনা ও আত্মমর্যাদাবোধ কয়েকটি পরিবর্তন সাধন করতে তাঁকে বাধ্য করেছিল। তার মধ্যে প্রধান হল—পশুপতি কর্তৃক অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ। পশুপতি কাল্পনিক হতে পারে, কিন্তু তার উপস্থিতি ইতিহাস-সমর্থিত।

বঙ্কিমচন্দ্র নিজ দূরদৃষ্টিবলে যে মিন্‌হাজউদ্দিন-এর বর্ণনাতে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন, পরবর্তী কালের ঐতিহাসিকরা তার সমর্থন করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস মধ্যেই লিখেছেন—"ষষ্টি বৎসর পরে যবন-ইতিহাসবেত্তা মিন্‌হাজউদ্দীন এইরূপ লিখিয়াছিলেন। ইহার কতদূর সত্য, কতদূর মিথ্যা, তাহা কে জানে? যখন মনুষ্যের লিখিত চিত্রে সিংহ পরাজিত, মনুষ্য সিংহের অপমানকর্তা স্বরূপ চিত্রিত হইয়াছিল, তখন সিংহের হস্তে চিত্রফলক দিলে কিরূপ চিত্র লিখিত হইত? মনুষ্য মূষিকতুল্য প্রতীয়মান হইত সন্দেহ নাই। মন্দভাগিনী বঙ্গভূমি সহজেই দুর্ব্বলা, আবার তাহাতে শত্রুহস্তে চিত্রফলক!" (৪/৪)

কাহিনী ও ঘটনাবিন্যাস: 'মৃণালিনী' উপন্যাসে দুটি কাহিনী পাশাপাশি চলেছে। একটি হল হেমচন্দ্র-মৃণালিনী কাহিনী অন্যটি পশুপতি-মনোরমা কাহিনী।

বখ্‌তিয়ার খিল্‌জি মগধরাজ্য অধিকার করলে, মগধরাজপুত্র হেমচন্দ্র, গুরু মাধবাচার্যের প্ররোচনায় দেশ থেকে যবন-বিতাড়নের কাজে আত্মনিয়োগ করেছে।

পাছে এই কাজে বিঘ্ন ঘটে এইজন্য মাধবাচার্য হেমচন্দ্রের প্রণয়িনী মৃণালিনীকে তাঁর এক শিষ্যের বাড়ী লুকিয়ে রাখেন। হেমচন্দ্র গিরিজায়া নামে একজন বৈষ্ণবীকে দিয়ে মৃণালিনীর খোঁজ করান। খোঁজ পাওয়ার পরই কিন্তু মাধবাচার্যের আদেশে হেমচন্দ্রকে নবদ্বীপে চলে আসতে হয়। ওদিকে মৃণালিনীর আশ্রয়দাতার পুত্র মৃণালিনীর প্রতি অসদ্ব্যবহার করায়, মৃণালিনীকে সে গৃহ ত্যাগ করতে হয়। মৃণালিনী গিরিজায়ার সঙ্গে নবদ্বীপে আসে। এদিকে নবদ্বীপে তখন সেনরাজা বৃদ্ধ। তিনি ধর্মাধিকার পশুপতির হাতের ক্রীড়নক মাত্র। পশুপতিই কার্যতঃ রাজ্যেশ্বর। তিনি যবনদের সঙ্গে দূতবিনিময় করছেন, তাদের সাহায্যে নিজে সিংহাসনে বসবার জন্য। পশুপতি দেশকে ভালবাসেন ঠিকই, কিন্তু তিনি রাজা হতে চান তাঁর প্রণয়িনী বিধবা মনোরমাকে বিবাহের পথ সুগম করার জন্য।

এই মনোরমা এক আশ্চর্য বালিকা। সে কখনো সরলা বালিকা, কখনো যুবতী, কখনো প্রৌঢ়া। এদের গৃহেই হেমচন্দ্র আছেন। হেমচন্দ্র এ-কে ভগিনীর মত স্নেহ করেন। মনোরমার সর্বত্র অবাধ যাতায়াত। কখনো সে নির্জন বনে বসে থাকে, আবার কখনো পশুপতির গৃহে যায়। পশুপতির কার্যের প্রতি তার বিন্দুমাত্র সমর্থন নাই, কিন্তু আবার পশুপতিকে সে ছাড়তেও পারে না। একদিন মনোরমা প্রকাশ করল যে, সে জানতে পেরেছে সে বিধবা নয়। সে-ই পশুপতির বিবাহিতা স্ত্রী। তার বাবা বিধবা হবার ভয়ে, তাকে স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রেখেছিল। এই কথা জানিয়ে মনোরমা পশুপতিকে যবন সাহায্যে রাজ্য অধিকার করবার মতলব ত্যাগ করতে বলল। কিন্তু তখন পশুপতি অনেকদূর এগিয়ে গেছেন, তাঁর আর ফেরবার পথ নেই। হেমচন্দ্র কিছু করবার আগেই পরিকল্পনামত ষোড়শ অশ্বারোহী সেনাসমেত বখ্‌তিয়ার নবদ্বীপ অধিকার ক'রে নিলেন। বৃদ্ধ রাজা পালিয়ে গেলেন। কিন্তু সন্ধি-মত যবনরা পশুপতিকে রাজ্য দিল না। তারা জানাল, আগে পশুপতিকে যবনধর্ম গ্রহণ করতে হবে, তবে রাজ্য পাবে। পশুপতি রাজী না হওয়ায় বন্দী হলেন। তারপর এক যবন সৈনিকের সাহায্যে উদ্ধার পেলেন। কিন্তু পশুপতির তখন মনে পড়ল, তিনি মনোরমাকে তাঁর গৃহে বন্দী ক'রে রেখেছিলেন। সেখানে গিয়ে দেখেন গৃহটি অগ্নিকবলিত। সেই আগুনের মধ্যে পশুপতি প্রবেশ করলে জীবন্ত দগ্ধ হলেন। এক ব্রাহ্মণ কর্তৃক পশুপতির মৃতদেহ আবিষ্কৃত হল। দাহকার্যের সময় মনোরমা স্বামীর সঙ্গে সহমরণে গেল।

হেমচন্দ্র ও মৃণালিনীর মধ্যে অনেক ভুল বোঝাবুঝির পর আবার মিলন হল। জানা গেল, মৃণালিনী ও হেমচন্দ্র পূর্ব থেকেই বিবাহিত। পশুপতির জমানো টাকা

নিয়ে, মাধবাচার্যের পরামর্শে তাঁরা নূতন জায়গায় নূতন রাজ্য স্থাপন ক'রে নূতন ক'রে যবন-বিরোধিতার প্রস্তুতি চালাতে লাগলেন।

আলোচনা : উপন্যাস মধ্যে যে দুটি কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, তারা যে পরস্পর অঙ্গাঙ্গী জড়িত এমন কথা বলা যায় না। দুটি কাহিনীর যোগসূত্র হিসাবে মনোরমাকে ব্যবহার করা হয়েছে। কাহিনী দুটির মধ্যে কোন্‌টি মুখ্য ও কোন্‌টি গৌণ, তা নির্ধারণ করা শক্ত। তবে হেমচন্দ্র মৃণালিনীর কাহিনী দিয়ে যেভাবে উপন্যাসের সূত্রপাত করা হয়েছে এবং সমাপ্তি ঘটানো হয়েছে, তাতে মনে হয় লেখক এটিকেই মুখ্য কাহিনী করতে চেয়েছিলেন। এই কাহিনীর নায়িকার নামানুসারেই উপন্যাসের নামকরণ করা হয়েছে। পশুপতির কাহিনীর মধ্য দিয়ে যেমন বাংলার পরাজয়ের কাহিনী বিবৃত হয়েছে, তেমনি হেমচন্দ্রের কাহিনীর মাধ্যমে তিনি দেশ-উদ্ধারের স্বপ্নবীজ রোপণ করেছেন।

ভুলত্রুটি : 'মৃণালিনী' উপন্যাসে গঠনগত কিছু কিছু ভুলত্রুটি আছে। প্রথমতঃ, মনোরমা পশুপতিকে তাদের পূর্বকাহিনী শোনাবার সময়ে বলেছে—একদিন জনার্দন যখন তাঁর স্ত্রীকে গোপনে এসব কথা বলছিলেন তখন সে শুনেছে। কিন্তু মানোরমার জানা এবং না-জানার মধ্যে মাত্র তিনদিনের ব্যবধান। এই সামান্য সময়ের মধ্যে—গতকাল কিংবা আজ শুনছি না বলে—'একদিন' বলার সার্থকতা কি? তাছাড়া, মনোরমা এই সব কথা যেরূপ নির্বিকারভাবে বলেছে, তাতেও মনে হয় না যে, ঘটনার আকস্মিকতা তাকে ব্যাকুল ক'রে তুলেছে।

দ্বিতীয়তঃ, সখী মণিমালিনীর কানে কানে মৃণালিনী কী বলেছে সে-কথা পাঠকের কাছে লেখক গোপন রেখেছেন, পরেও স্পষ্ট ক'রে বলে দেননি যে, সেকথা হল হেমচন্দ্রের সঙ্গে তার বিবাহের কথা। এরকম রহস্যময়তার কোন কারণ ছিল না।

কাহিনীর কালসীমা : 'মৃণালিনী' উপন্যাসে যে সময়কার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, তার কাল হল ত্রয়োদশ শতাব্দী। ঐতিহাসিকদের মতে, ১২০২ খ্রীষ্টাব্দে বখ্‌তিয়ার খিল্‌জি বাংলা জয় করে। বঙ্কিম-বর্ণিত কাহিনীর কালসীমা খুবই অল্প। প্রাবৃটের দিনশেষে কাহিনীর সুরু হয়ে কার্তিকে শেষ হয়েছে।

গান : 'মৃণালিনী' উপন্যাসে একটি নূতনত্ব হল, সঙ্গীতের বাহুল্য। গিরিজায়া-মৃণালিনীর মাধ্যমে তিনি এই উপন্যাসে বহু গীত সন্নিবেশিত করেছেন। এই গীতের কতকগুলির মধ্যে কথোপকথনের রস সঞ্চারিত। 'কণ্টকে গঠিল বিধি মৃণাল অধমে' গানটি মৃণালিনীর পরিচয়-জ্ঞাপক। গানটিকে যেভাবে মৃণালিনী-সন্ধানের কাজে লাগান হয়েছে তাতে চমৎকৃত হতে হয়। কতকগুলি গানে বৈষ্ণব পদাবলীর মাধ্যমে হেমচন্দ্র-মৃণালিনীর বিরহ-মিলনের মনোভাবটি সার্থকভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

শব্দ-ব্যবহার ঃ গিরিজায়া ও কয়েকজনের কথাবার্তায় অনুপ্রাসের বাহুল্য দেখা যায়। তাছাড়া, সংস্কৃত-ঘেঁষা শব্দেরও সাক্ষাৎ মেলে।

হাস্যরস ঃ এই উপন্যাসে হাস্যরস-সৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্র 'গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজের' স্তর অতিক্রম ক'রে অনেকটা এগিয়ে গেছেন। কথোপকথনে অনুপ্রাস-বহুল গদ্যের ব্যবহারে, জনার্দনের বধিরতায় এবং গিরিজায়ার আপনার সঙ্গে কথা বলার ভঙ্গীতে হাস্যরসের উদ্রেক করা হয়েছে।

চরিত্র ঃ 'মৃণালিনী' উপন্যাসে চরিত্র-বর্ণনায় বঙ্কিম বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। পশুপতি চরিত্রটিই একমাত্র দোষে-গুণে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। হেমচন্দ্রের চরিত্র-মাহাত্ম্য ক্রোধোন্মত্ততায় বিপর্যস্ত। মৃণালিনী স্বামীপ্রেমের পরাকাষ্ঠায় বিশেষত্ব-বর্জিতা এবং মনোরমা প্রহেলিকামাত্র।

বিধবাবিবাহ ঃ বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে বঙ্কিমের চিন্তার সূত্রপাত 'মৃণালিনী' উপন্যাসেই। পশুপতি বলেছে—"এখন বিধবাবিবাহ করিলে জনসমাজের পরিত্যক্ত হইব ; কিন্তু যখন আমি স্বয়ং রাজা হইব, তখন কে আমাকে ত্যাগ করিবে ? যেমন বল্লালসেন কৌলীন্যের নূতন পদ্ধতি প্রচলিত করিয়াছিলেন, আমি সেইরূপ বিধবা-পরিণয়ের নূতন পদ্ধতি প্রচলিত করিব।" (২/৯)

স্বদেশপ্রেম ঃ 'মৃণালিনী' উপন্যাসের আরো একটি বৈশিষ্ট্য হল, এই উপন্যাসের মধ্যে স্বদেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব লক্ষ্য করি। সতের জন অশ্বারোহীর বঙ্গাধিকারের কলঙ্কজনক ইতিহাসের বেদনাবোধ থেকেই এই উপন্যাসের জন্ম। যবনগণের পর ইংরাজগণ আবার ভারতবর্ষের অধীশ্বর হয়েছে। পরাধীন ভারতবর্ষের গ্লানি থেকে মুক্ত হবার জন্য বঙ্কিম লিখলেন—"সেই দিন রাত্রিকালে মহাবন হইতে বিংশতি সহস্র যবন আসিয়া নবদ্বীপ প্লাবিত করিল। নবদ্বীপ-জয় সম্পন্ন হইল। যে সূর্য সেই দিন অস্ত গিয়াছে, আর তাহার উদয় হইল না। আর কি উদয় হইবে না ? উদয় অস্ত উভয়ই ত স্বাভাবিক নিয়ম !" (৪/৬)

বিভিন্ন সংস্করণ ঃ বঙ্কিমের জীবিতকালে 'মৃণালিনী'র দশটি সংস্করণ হয়।—১ম সং—১৮৬৯ (২৪১ পৃঃ), ২য় সং—১৮৭১ (২৪১ পৃঃ), ৩য় সং—১৮৭৪ (১৯৫ পৃঃ), ৪র্থ সং—১৮৭৮, ৫ম সং—১৮৮০ (১৯১ পৃঃ), ৬ষ্ঠ সং—১৮৮১ (১৯১ পৃঃ), ৭ম সং—১৮৮৩ (১৭৪ পৃঃ), ৮ম সং—১৮৮৬ (১৯৪ পৃঃ), ৯ম সং—১৮৯০ (২১১ পৃঃ), ১০ম সং—১৮৯৩ (২৫৮ পৃঃ)। অন্যান্য উপন্যাসের মত এই উপন্যাসেও বঙ্কিমচন্দ্র বিভিন্ন সংস্করণে সংস্কারকার্য করেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—প্রথম কয়েকটি সংস্করণে প্রথম-দিকে 'হস্তীযুদ্ধ' 'গজহস্তা' নামে দুটি পরিচ্ছেদে বখ্‌তিয়ারের হস্তিযুদ্ধ এবং হেমচন্দ্র

দ্বারা হস্তীবধ-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছিল। এই ঘটনা বাদ দিয়ে তিনি সামান্য উল্লেখমাত্র করেন পরবর্তী সংস্করণে। এতে ক্ষতি না হয়ে, কাহিনীর গতি দ্রুত হয়েছে।

পরিবর্তন : ন্যাশন্যাল থিয়েটারের উদ্যোগে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী জোড়াসাঁকোর স্যান্যালবাড়ীতে 'মৃণালিনী'র নাট্যরূপ সর্বপ্রথম প্রদর্শিত হয়। K. Sinha কর্তৃক হিন্দুস্থানী অনুবাদ লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত হয় ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে। সুরেন্দ্র-মোহন ভট্টাচার্য 'হেমচন্দ্র' নাম দিয়ে 'মৃণালিনী' উপন্যাসের পরবর্তী অংশ কল্পনা ক'রে উপন্যাস রচনা করেন ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে।

উপন্যাসের দিক থেকে 'মৃণালিনী' যতই নিকৃষ্ট হোক না কেন, স্বদেশপ্রেমের রঙ্গমঞ্চে বঙ্কিমের প্রথম আবির্ভাব হিসাবে এই উপন্যাসটি স্মরণযোগ্য।

মৃণালিনীর লিপি (মৃণাঃ ৩/৮) : মৃণালিনী হেমচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য গিরিজায়ার হাত দিয়ে একটি লিপি পাঠাল। কিন্তু সে লিপি হেমচন্দ্র পাঠ না ক'রে ছিঁড়ে ফেললেন এবং মৃণালিনীকে 'কুলটা' বলে গালাগাল দিলেন। মৃণালিনী গিরিজায়ার কাছ থেকে এই সংবাদ পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

মৃণালীনির সুখ কি ? (মৃণাঃ ৪/৮)। গিরিজায়া ও মৃণালিনীর কথোপকথনে মৃণালিনীর দুঃখের দিনেও হেমচন্দ্রের প্রতি আকর্ষণ বর্ণিত হয়েছে।

মেহেরজান (রাজঃ ৩/৮)। মোগল সৈন্য চঞ্চলকুমারীকে নিয়ে যাবার জন্য রূপনগরে এসে তাঁবু গেড়েছে। সেই তাঁবুর মধ্যে মেহেরজান নামে এক নর্তকীর খুব খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। এই মেহেরজান-ই দরিয়াবিবি।

মোগল পাঠান (দুর্গেঃ ১/৩)। মোগল-পাঠানের বিরোধের ঐতিহাসিক কাহিনী এই পরিচ্ছেদের বিষয়-বস্তু।

মোহ (দুর্গঃ ২/১৪) মূর্ছিতা তিলোত্তমাকে অসীম যত্নে আয়েষা সেবা দিয়ে সুস্থ ক'রে তুললেন। জগৎসিংহের কক্ষ থেকে তিলোত্তমার নির্গমনের সময় উভয়ে উভয়ের দিকে এমনভাবে তাকাতে লাগলেন যে, বোঝা যায় তাঁদের মধ্যে এখনো মোহ বিদ্যমান।

মোহিতা (মৃণাঃ ২/৯)। পশুপতির বিশ্বাসঘাতকতার কথা জানতে পেরে মনোরমা প্রথমে রাগান্বিত হল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পশুপতির ক্রন্দনে তার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করেছে।

মোহিনী (মৃণাঃ ২/৮)। মনোরমার প্রতি পশুপতি অনুরক্ত। এখানে পশুপতির চোখে মনোরমার মোহিনী মূর্তি ধরা পড়েছে।

যবনদূত—যমদূত বা (মৃণাঃ ৪/৪)। যমদূতের ন্যায় যবনেরা রাজপুরীমধ্যে প্রবেশ করলে রাজা পলায়ন করলেন।

যবনবিপ্লব (মৃণাঃ ৪/৭)। নগরে যবনসেনার অত্যাচারে যখন অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা, তখন একাকী হেমচন্দ্র দুর্দশাগ্রস্তের সেবা ক'রে বেড়াতে লাগলেন। এমন সময় মুমূর্ষু ব্যোমকেশের সঙ্গে দেখা হল। ব্যোমকেশের মুখ থেকে হেমচন্দ্র জানতে পারলেন মৃণালিনী নিষ্কলঙ্কা।

***যুগলাঙ্গুরীয় ॥ গ্রন্থ-পরিচয়ঃ** ১২৮০ সালের বৈশাখ সংখ্যা **'বঙ্গদর্শনে'** 'যুগলাঙ্গুরীয়' প্রথম প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৮৭৪ সালে। ১ম সংস্করণের আখ্যাপত্র—"যুগলাঙ্গুরীয়/উপন্যাস।/শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়/প্রণীত।/কাঁটালপাড়া।/বঙ্গদর্শন যন্ত্রে শ্রী হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক/মুদ্রিত ও প্রকাশিত।/১২৮১।/"

বঙ্কিমের জীবিতকালে গ্রন্থটির ৫টি সংস্করণ হয়। ১ম সং—১২৮১ (পৃ. ৩৬), ২য় ও ৩য় সংস্করণ মনে হয় 'উপকথা' নামক পুস্তকের ১ম (১৮৭৭) ও ২য় (১৮৮১) সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত হয়। ৪র্থ সং—১৮৮৬ খ্রীঃ (পৃ. ৩৬), ৫ম সং—১৮৯৩ খ্রীঃ (পৃ. ৫০)।

বিভিন্ন সংস্করণে গ্রন্থটির কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হলেও তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। প্রথম সংস্করণের ৩৬ পৃষ্ঠা, পঞ্চম সংস্করণে ৫০ পৃষ্ঠায় পরিণত হয়।

রূপান্তরঃ 'যুগলাঙ্গুরীয়ে'র অনেকগুলি ইংরাজী অনুবাদ হয়। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় The Two Rings নামে অনুবাদ করেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে পি. এন. বসু ও মোরেনো-র অনুবাদ 'Jugalanguria' প্রকাশিত হয়। জে. ডি. অণ্ডারসনের অনুবাদ আছে Indira and other stories-এর মধ্যে। ডি. সি. রায়ের অনুবাদ—The Two Rings and Radharani, ১৯১৯ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়। কে. আর. ভাট ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে পাটনা থেকে 'যুগলাঙ্গুরীয়ে'র হিন্দী অনুবাদ বের করেন।

আলোচনাঃ 'যুগলাঙ্গুরীয়' আকারে ছোটগল্প হলেও, প্রকারে উপন্যাস। কাহিনীর মধ্যে অসম্ভব ঘটনার আধিক্য থাকলেও, দূরকালের পটভূমিতে তাকে স্থাপন করার জন্য বেশ মানিয়ে গেছে। কাহিনীতে গল্পরসেরই প্রাধান্য।

কাহিনীঃ পুরন্দর ও হিরণ্ময়ীর বাল্যপ্রণয় সার্থক হল না তাদের পিতার জন্য। পুরন্দর বাণিজ্য করতে সিংহল যাত্রা করল। কিছুদিন পরে চোখ-বাঁধা অবস্থায় হিরণ্ময়ীর বিবাহ হল। বর-কনেকে একই রকম দুটি আংটি দিয়ে বলা হল—পাঁচ বছর

পরে এটি পরতে হবে। একে অন্যের হাতে এই আংটি দেখলে পরস্পরকে স্বামী-স্ত্রী বলে চিনতে পারবে।

পাঁচ বছর পার না হতেই হিরন্ময়ীর বাবা মারা গেলেন। হিরণ্ময়ী পিতৃঋণ শোধ করতে গিয়ে দরিদ্র হয়ে পড়ল। পুরন্দরও দেশে ফিরে এসেছে, কিন্তু হিরণ্ময়ী-পুরন্দরের দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। একদিন রাজা মদনদেব হিরণ্ময়ীকে ডেকে পাঠালেন। মদনদেব হিরণ্ময়ীকে তাদের বিবাহের অন্য আংটিটি দেখিয়ে বললেন—তিনিই তাঁর স্বামী। কিন্তু হিরণ্ময়ী ভালবাসত পুরন্দরকে, তাই সে রাজার কাছ থেকে মুক্তি চাইল। রাজা তখন বললেন—তিনি মিথ্যা কথা বলেছেন। আসল স্বামীকে তিনি আনালেন। সে আর কেউ নয়—পুরন্দর। হিরণ্ময়ীর বৈধব্যদোষ খণ্ডনের জন্য তার পিতা এরূপ কৌশল ক'রে বিবাহ দিয়েছিলেন।

'যুগলাঙ্গুরীয়ে'র কাহিনীর সঙ্গে বঙ্কিমের তমলুকের রাজবাটীর এক উদ্যানের বাস্তব অভিজ্ঞতা জড়িত রয়েছে, একথা বলেছেন বঙ্কিম জীবনীকার শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

যুদ্ধক্ষেত্রে (চন্দ্রঃ ৬/৮)। নবাব ও ইংরাজের যুদ্ধে প্রতাপ বীরের মত মৃত্যু-বরণ করলেন। মৃত্যুকালে চন্দ্রশেখর, শৈবলিনী ও রামানন্দ স্বামী ছিলেন। রামানন্দ স্বামী বুঝলেন—এ প্রতাপের মৃত্যু নয়, আত্মহত্যা। তিনি দ্বিধাহীনকণ্ঠে প্রতাপের মহত্ত্ব স্বীকার করেন।

যোগবল না PSYCHIC FORCE? (চন্দ্রঃ ৬/৬)। রামানন্দ স্বামীর যোগবলে, অর্থাৎ প্রদত্ত ঔষধের ক্রিয়ার চন্দ্রশেখরের কাছে শৈবলিনী তাঁর পূর্বকৃত সমস্ত অপরাধ স্বীকার করলেন।

যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ (বিষঃ ১৭ পরিঃ)। সুরেন্দ্র এবং দেবেন্দ্রের কথোপকথন শুনে হীরা বুঝতে পারল দেবেন্দ্রই হরিদাসী বৈষ্ণবী। হীরা ইচ্ছাকৃতভাবে দেবেন্দ্রের হাতে ধরা পড়ল। তার মনে একটি গোপন ইচ্ছা জাগল। হীরা এবং দেবেন্দ্র দু'জনেই সমান পাপী। তাই বলা হয়েছে—যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ।

যোধপুরী বেগম (রাজঃ ২/৬)। বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের প্রধানা মহিষী হিন্দু যোধপুরী বেগম, রূপনগরের রাজকন্যাকে নবাবের বিবাহ করার প্রস্তাব শুনে উদ্বিগ্ন হলেন। তিনি দেবী নামক একজন দাসীকে রূপনগরে পাঠালেন চঞ্চলকুমারীকে এই সংবাদ পাঠাতে যে, তিনি যেন মোগল-হারেমে আসার পূর্বে মৃত্যুবরণ করেন।

***রজনী ॥ প্রথম প্রকাশ:** 'রজনী' রচিত হয় ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে। ঐ বৎসর ফেব্রুয়ারি মাস থেকে বঙ্কিমচন্দ্র অসুস্থতার জন্য ছুটি নেন তিন মাস। তারপর মে মাস থেকে বারাসতে পাঁচ-ছ মাস থাকেন। গ্রন্থটি সেই সময়ে রচিত। ঐ বৎসরই, অর্থাৎ

১২৮১ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'বঙ্গদর্শন' থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। ১২৮১ সালের আশ্বিন থেকে চৈত্র এবং ১২৮২ সালের বৈশাখ ও ভাদ্র থেকে অগ্রহায়ণ পর্যন্ত মোট বারোটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 'রজনী' গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ২রা জুন, ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে (১২৮৪ সালে)। 'রজনী'র প্রথম সংস্করণ সম্বন্ধে সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ গ্রন্থাবলী সম্পাদকের মন্তব্য—" 'রজনী'র প্রথম সংস্করণ ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আছে। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাগারেও একখণ্ড আছে বটে, কিন্তু তাহার ১-২ ও ৯-১০ পৃষ্ঠা নাই।"

পুস্তকাকারে প্রকাশিত গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে বঙ্কিম যে সব তথ্য পরিবেশন করেন, তা অত্যন্ত মূল্যবান। বিজ্ঞাপনটি এই—

"রজনী প্রথমে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। এক্ষণে, পুনর্মুদ্রাঙ্কনকালে, এই গ্রন্থে এত পরিবর্ত্তন করা গিয়াছে যে, ইহাকে নূতন গ্রন্থও বলা যাইতে পারে। কেবল প্রথম খণ্ড পূর্ব্ববৎ আছে; অবশিষ্টাংশের কিছু পরিত্যক্ত হইয়াছে, কিছু স্থানান্তরে সমাবিষ্ট হইয়াছে, অনেক পুনর্লিখিত হইয়াছে।

"প্রথম লর্ড লিটন প্রণীত 'Last Days of Pompeii' নামক উৎকৃষ্ট উপন্যাসে নিদিয়া নামে একটি 'কানা ফুলওয়ালী' আছে; রজনী তৎস্মরণে সূচিত হয়। যে সকল মানসিক বা নৈতিক তত্ত্ব প্রতিপাদন করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য, তাহা অন্ধ যুবতীর সাহায্যে বিশেষ স্পষ্টতা লাভ করিতে পারিবে বলিয়াই ঐরূপ ভিত্তির উপর রজনীর চরিত্র নির্ম্মাণ করা গিয়াছে।

"উপাখ্যানের অংশবিশেষ, নায়ক বা নায়িকা বিশেষের দ্বারা ব্যক্ত করা, প্রচলিত রচনা-প্রণালীর মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না, কিন্তু ইহা নূতন নহে। উইল্‌কি কলিন্স কৃত 'Woman in White' নামক গ্রন্থ প্রণয়নে ইহা প্রথম ব্যবহৃত হয়। এ প্রথার গুণ এই যে, যে কথা যাহার মুখে শুনিতে ভাল লাগে, সেই কথা তাহার মুখে ব্যক্ত করা যায়। এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছি বলিয়াই, এই উপন্যাসে যে সকল অনৈসর্গিক বা অপ্রাকৃত ব্যাপার আছে, আমাকে তাহার জন্য দায়ী হইতে হয় নাই।"

কাহিনী: রজনী নামে এক অন্ধ ফুলওয়ালী যুবতী রামসদয় মিত্রের বাড়ী ফুল যোগান দেবার জন্য যাতায়াত করত। রামসদয় মিত্রের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী লবঙ্গলতা রজনীর প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তার বিয়ের ঠিক করে। কিন্তু রজনী রামসদয়ের প্রথম পক্ষের পুত্র শচীন্দ্রনাথকে মনে মনে ভালবাসে। রজনীর সঙ্গে যখন রামসদয় মিত্রের এক কর্মচারীর পুত্র গোপালের বিবাহের ঠিক হয়ে যায়, তখন রজনী গোপালের প্রথম

পক্ষের স্ত্রীর সহায়তায় বিবাহ বন্ধ করার জন্য বাড়ী থেকে পলায়ন করে। গোপালের স্ত্রীর ভাই হীরালালের উপর ভার পড়ে রজনীকে স্থানান্তরিত করার।

হীরালাল দুষ্ট চরিত্রের লোক। সে রজনীকে কুপ্রস্তাব করে। রজনী রাজী হয় না। তখন হীরালাল রজনীকে এক নির্জন নদীর চরে পরিত্যাগ করে। রজনী হতাশ হয়ে যখন আত্মহত্যা করতে উদ্যত, তখন এক নৌকা এসে তাকে উদ্ধার করে। কিন্তু সেই নৌকার একজন লোক রজনীকে অন্ধ দেখে অত্যাচার করার সুযোগ নেয়। কিন্তু তখনি অমরনাথ নামক এক ব্যক্তির সহাযতায় রজনী রক্ষা পায়। এই অমরনাথ ভবঘুরে জীবন যাপন করে। সে রজনীর জীবনের এক অজ্ঞাত কাহিনী জানে। সে কাহিনী হল—রজনী বর্তমানে যাকে পিতা বলে জানে, সে আসলে তার মেসো। তার পিতা মেসোকে মানুষ করতে দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, রজনী উত্তরাধিকারসূত্রে বিরাট সম্পত্তির অধিকারী। সে সম্পত্তি বর্তমানে রামসদয় মিত্র ভোগ করছে।

অমরনাথ রজনীকে কলকাতায় নিয়ে আসে এবং চেষ্টাচরিত্র ক'রে রজনীর সম্পত্তি উদ্ধার করে এবং রজনীকে বিবাহ করতে চায। কিন্তু অমরনাথের একটি অতীত কলঙ্কজনক অধ্যায় আছে। অমরনাথ লবঙ্গলতাকে ভালবাসত। কিন্তু লবঙ্গের বিবাহ হয় রামসদয় মিত্রের সঙ্গে। একবার গোপনে অমরনাথ লবঙ্গলতার গৃহে প্রবেশ করলে, লবঙ্গ তার পিঠে গরম শলা দিয়ে 'চোর' কথাটি লিখে দেয়। লবঙ্গলতা যখন জানল অমরনাথ রজনীকে বিয়ে করতে চায়, তখন সে সব কথা ফাঁস ক'রে দিতে চাইল। কিন্তু অমরনাথ নিজেই সে-কথা রজনীকে বলবে জানিয়ে মহত্ত্ব দেখাল। লবঙ্গলতা কিন্তু শচীন্দ্রের সঙ্গে রজনীর বিবাহ দেবার চেষ্টা করতে লাগল। শচীন্দ্রও এক সন্ন্যাসীর প্রভাবে মনের মধ্যে রজনীর ধ্যান করতে লাগল ও তার জন্য ব্যাকুল হয়ে শয্যাশায়ী হল। অবশেষে রজনী একদিন অমরনাথকে জানাল, সে মনে মনে শচীন্দ্রকে ভালবাসে। অমরনাথ সরে গেল রজনীর জীবন থেকে। শচীন্দ্র-রজনীর বিবাহ হল। কৃতজ্ঞতার নিদর্শনরূপে তারা পুত্রের নাম রাখল অমরপ্রসাদ। রজনীরও অন্ধত্বমোচন হল।

কাহিনীর মধ্যে কিছু জটিলতা ও অলৌকিকতার সমাবেশ ঘটানো হলেও, যথেষ্ট সাবলীলতা আছে। কাহিনীর উপস্থাপনাও বিশ্বাসযোগ্য।

রচনারীতিঃ 'রজনী' উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল এর রচনারীতি। বঙ্কিম যেমন বাংলা উপন্যাসের প্রকৃত স্রষ্টা, তেমনি তিনি বাংলা উপন্যাসের জগতে নূতনতর রীতিরও প্রবর্তক। অবশ্য, এই রীতি তিনি ইংরেজী উপন্যাস থেকেই গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছেন, উইল্‌কি কলিন্স-এর "Woman in White" নামক গ্রন্থে এই রীতি প্রথম ব্যবহৃত হয়। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথের

'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে এই রীতি ব্যবহৃত হয়। এতে বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর মুখের কথায় কাহিনী বর্ণনা করা হয়ে থাকে। এই প্রথার উপযোগিতা সম্বন্ধে বঙ্কিম দুটি যুক্তি দিয়েছেন। প্রথমতঃ, এর দ্বারা যার মুখে যে কথা শুনতে ভাল লাগে, তার মুখ দিয়ে সে-কথা বলা যায়। দ্বিতীয়তঃ, 'রজনী' উপন্যাসের অনৈসর্গিক বা অপ্রাকৃত ব্যাপারের জন্য তিনি পাত্র-পাত্রীদের উপরেই দোষারোপ করতে চেয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র-প্রদত্ত প্রথম যুক্তিটি সার্থক। রজনীর বর্ণনার রীতি এক, আবার লবঙ্গ-লতার বর্ণনার রস অন্য, অমরনাথের হতাশাব্যঞ্জক জীবনের আবেদনও স্বতন্ত্র। বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর দ্বারা বর্ণনার ফলে 'রজনী'র একই আধারে বহু রসের প্লাবন দেখা গেছে। তবে এর মধ্যে 'রজনীর কথা'ই উৎকৃষ্ট ও শচীন্দ্রের বর্ণিত অংশ সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট।

দ্বিতীয় যুক্তিটি সম্বন্ধে বলা চলে যে, অলৌকিকে বিশ্বাসস্থাপনের দায় হয়তো বিশিষ্ট চরিত্রের উপর চাপানো যায়, কিন্তু সামগ্রিকভাবে এর জন্য লেখককেই দায়ী হতে হয়।

এই রীতির দোষও একটু আছে। বিভিন্ন চরিত্র, ঘটনা বর্ণনা করায় মনে হয় তারা কি যুক্তি ক'রে পর পর কাহিনী বর্ণনা করেছে? তা নইলে শৃঙ্খলা বজায় রেখে কি ক'রে বিভিন্ন চরিত্র পর পর কাহিনী বলে যাচ্ছে! এ বিষয়ে 'রজনী'তে বঙ্কিম যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। মনে হয়, ঘটনাটি ঘটে যাবার পর রজনী-লবঙ্গলতা-অমরনাথ ও শচীন্দ্র যুক্তি ক'রে কাহিনীটি রচনা করেছে। কিন্তু শেষাংশে অমরনাথ যেভাবে আবার উধাও হলেন, তাতে পাণ্ডুলিপির সন্ধানে তার পশ্চাতে কাকে দৌড়াতে হয়েছিল কে জানে? তবে এরূপ চিন্তা, লেখক কর্তৃক ঘটনা বর্ণিত হলেও, জাগা স্বাভাবিক ছিল।

'রজনী'র উপর বিদেশী প্রভাব : বঙ্কিমচন্দ্র 'রজনী' উপন্যাস-রচনায় লিটনের 'লাস্ট ডেজ্ অব্ পম্পে' উপন্যাস এবং তার নিদিয়া চরিত্রের কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন। এই দুই উপন্যাসের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যগুলি একটু আলোচনা করা দরকার। বিসুভিয়সের অগ্ন্যুৎপাতে পম্পাই নগরীর ধ্বংসের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় লিটনের উপন্যাস রচিত। 'রজনী'র কাহিনীতে কিছু ঘটনার চমক থাকলেও, সামাজিক জীবনের পটভূমিতেই রচিত। সুতরাং দুই উপন্যাসের মধ্যে পার্থক্য প্রচুর।

নিদিয়া এবং রজনী দুজনেই জন্মান্ধ। এছাড়া আর কোন মিল নেই উভয়ের মধ্যে। বিদেশিনী চরিত্রের বৈশিষ্ট্যে নিদিয়া পথে পথে ঘুরে বেড়ায় এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করে। রজনীও একবার পথে বেরিয়েছিল, কিন্তু সে-ও নিতান্ত দায়ে পড়ে এবং অন্যের সহায়তা লাভের আশায়। বাঙালী চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রজনীকে কোমলচরিত্ররূপে অঙ্কন করা হয়েছে। নিদিয়া নিজেই ফুল বিক্রি করত,

কিন্তু রজনী দু'একজন ভদ্র গৃহস্থের বাড়ী ছাড়া কোথাও যেত না। নিদিয়া রাস্তায় গান গাইত, রজনী রাস্তাঘাটে গান গায়নি। নিদিয়ার প্রেমজীবনের সমাপ্তি ব্যর্থতায়। রজনী কিন্তু প্রেমে সার্থক। রজনী চক্ষুও ফিরে পেয়েছে।

তবে লিটনের উপন্যাসের কাছে ঋণ স্বীকার ক'রে বঙ্কিম সুকৌশলে সমালোচকদের পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের সম্ভাবনাকে বন্ধ করেছেন।

তত্ত্বঃ বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—'মানসিক বা নৈতিক তত্ত্ব প্রতিপাদন করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য'। এই জাতীয় উদ্দেশ্য সফল হলে 'রজনী'কে মনস্তত্ত্বমূলক বা নীতিমূলক উপন্যাস পর্যায়ে ঠাঁই দিতে হয়।

মনস্তত্ত্বের দিক থেকে দেখতে গেলে, অন্ধ রজনীর মনে কেমনভাবে প্রেমের জাগরণ হল, তার উল্লেখ প্রথমেই করতে হয়। এই অংশ যথার্থই সুন্দর। কিন্তু শচীন্দ্রের মনে যেভাবে রজনীর স্মৃতি উদিত হয়েছে, তাকে মনস্তাত্ত্বিক না বলে অলৌকিক আখ্যা দিলেই বোধ হয় ভাল হয়। তাছাড়া, লবঙ্গলতা এবং অমরনাথের বর্ণনার দ্বারা তাঁদের মনোভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যটুকুও প্রকাশিত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসে কি নৈতিক তত্ত্ব প্রতিপাদন করতে চেয়েছেন? প্রকৃত প্রেমের ক্ষেত্রে রূপের কোন প্রয়োজন নেই, অন্ধ রজনীর প্রেম থেকে এটাই বোঝা যায়। এছাড়া সন্ন্যাসীকে দিয়ে অবশ্য বঙ্কিম অনেক নীতিকথা শুনিয়েছেন।

'রজনী' উপন্যাস-রচনায় বঙ্কিমের উদ্দেশ্য যাই থাক না কেন, কখনও নীতি ও মনস্তত্ত্বের ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেনি।

বিভিন্ন সংস্করণঃ বঙ্কিমের জীবিতকালে 'রজনী'র তিনটি সংস্করণ হয়। ১ম সং—১২৮৪ (১২২ পৃ.), ২য় সং—১২৮৭ (১৮৮১ খ্রীঃ—১২১ পৃঃ), ৩য় সং—১৮৮৭ খ্রীঃ (১৬২ পৃ.)। 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত 'রজনী' গ্রন্থাকারে প্রকাশের কালে অনেক সংস্কৃত হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে অমরনাথের চরিত্রে। গ্রন্থে অমরনাথের চরিত্রটি আরও মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে।

ত্রুটিঃ তবুও 'রজনী' উপন্যাস একেবারে ত্রুটিমুক্ত নয়। প্রথমেই রজনীর বয়স নিয়ে একটু গণ্ডগোলে পড়তে হয়। শচীন্দ্রের পিতামহ বাঞ্ছারাম মিত্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল রজনীর পিতার এক ভাই মনোহর দাসের। আবার বঙ্কিম লিখেছেন—"মনোহর বয়ঃজ্যেষ্ঠ বলিয়া (বাঞ্ছারাম) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় তাঁহাকে মান্য করিতেন।" মনোহর দাস আবার রজনীর পিতা হরেকৃষ্ণ দাসের চেয়ে ছোট ছিলেন বলেই মনে হয়। কারণ, অমরনাথ বলছে—'হরেকৃষ্ণ দাসের এক ভাই মনোহর দাস না?' তাহলে দেখা যাচ্ছে, হরেকৃষ্ণ দাসের কন্যা রামসদয় মিত্রের বয়সী হওয়াই উচিত। বৃদ্ধবয়সে হরেকৃষ্ণের

কন্যা হলেও, রজনী শচীন্দ্রের চেয়ে বড়ো হওয়াই সম্ভব। এ বিষয়ে বঙ্কিমের একটু সতর্ক হওয়া উচিত ছিল।

তাছাড়া, রজনী জন্মান্ধ হলেও অনেকস্থলে এমন বর্ণনা দিয়েছে যা চক্ষুষ্মানের পক্ষেই জানা সম্ভব। যেমন রজনী বলেছে—"হীরালাল তৎকালে ভগ্নমনোরথ হইয়া ঘরের এদিক সেদিক দেখিতে লাগিল।" এভাবে হীরালালকে লক্ষ্য করা অন্ধ রজনীর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

একই ব্যক্তিকে আবার 'আপনি' 'তুমি'—দুভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। রজনী একবার হীরালালকে বলল—"হীরালালবাবু, আপনার গায়ে জোর কেমন?" আবার তাকেই বলেছে—"তোমার হাতে কিসের লাঠি?" তাছাড়া, কিছু ব্যাকরণগত ত্রুটিও আছে।

রূপান্তর : ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই থেকে এন. হেমচন্দ্র 'রজনী'র গুজরাটী অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলকাতা থেকে ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন পি. মজুমদার।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারি বেঙ্গল থিয়েটারে 'রজনী' নাটকাকারে অভিনীত হয়। নাট্যরূপ দান করেন—বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়। প্রথম রজনীর অভিনয়ে বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন—শচীন্দ্র : মহেন্দ্র বসু, অমরনাথ : হরিদাস দাস এবং রজনী : মিসেস্ সুকুমারী দত্ত।

১২৯৭ খ্রীষ্টাব্দে স্টার রঙ্গমঞ্চে আর্ট থিয়েটার কর্তৃক 'রজনী'র অভিনয় উল্লেখযোগ্য। অপরেশ মুখোপাধ্যায় এর নাট্যরূপ দেন ও রামসদয়ের ভূমিকায় অভিনয় করেন। অন্যান্য চরিত্রলিপিতে ছিলেন—অমরনাথ : অহীন্দ্র চৌধুরী, হীরালাল : মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য বি. এস্-সি, শচীন্দ্র : সন্তোষ সিংহ, রজনী : সুশীলাবালা, লবঙ্গলতা : নীহারবালা।

রজনীর কথা (রজনী)॥ 'রজনী' উপন্যাসে যে অংশে রজনীর জবানীতে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, সেখানে 'রজনীর কথা' বলে শিরোনাম দেওয়া আছে। ১ম খণ্ডের আটটি পরিচ্ছেদ—রজনীর কথা।

রণপণ্ডিত মবারক (রাজঃ ৪/৩)। সংকীর্ণ রন্ধ্রপথে রাজপুত কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে মোগল সৈন্যমধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে মবারক হাল ধরলেন।

রন্ধ্রে রন্ধ্রে (রাজঃ ৪র্থ খণ্ড)। এই খণ্ডের ৭টি পরিচ্ছেদে—পর্বতরন্ধ্রে মুঘল-রাজপুতের যুদ্ধ, চঞ্চলকুমারীর উদ্ধার ও মাণিক-নির্মলের বিবাহ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

রসিকা পানওয়ালী (রাজঃ ৩/১০)। মাণিকলাল রূপনগরে এক রসিকা

পানওয়ালীকে আবিষ্কার করল এবং তার সাহায্যে এক মুসলমান সেনাকে বন্দী ক'রে তার পোষাক-পরিচ্ছদ নিয়ে মোগল সৈন্যমধ্যে আত্মগোপন ক'রে রইল।

রাজনিকেতনে (কপাঃ ৩/৪)। মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' শান্তনুকে জাহ্নবী লিখেছেন—"পত্নীভাবে আর তুমি ভেবো না আমারে।" এখানে মতিবিবিও বাদশাহ জাহাঙ্গীরের কাছে গিয়ে জানাল যে, তিনি যেন আর তাকে না ভালবাসেন, কারণ সে এখন নবকুমারকে বিবাহ করতে চায়।

রাজপথে (কপাঃ ২/১)। মেদিনীপুর থেকে ফিরবার পথে নবকুমার দস্যুকবলে পতিত এক রমণীকে (মতিবিবি) সাহায্য করেন চটিতে পৌঁছে দিতে। রমণীর নবকুমারের প্রতি এই নির্ভরশীলতার সাদৃশ্যে বঙ্কিম একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

"—There—now lean on me :
Place your foot here—"

এটি বায়রনের 'Manfred' নাট্যকাব্য থেকে নেওয়া হয়েছে। পাহাড়ের ওপর ম্যান্‌ফ্রেড-এর অবস্থা যখন সঙ্কটাপন্ন, তখন একজন শিকারী তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে—'আমার দেহের উপর আপনি ভর করুন, এখানে পা রাখুন—' ইত্যাদি। তুলনাটির সাদৃশ্য নিতান্তই বহিরঙ্গের।

***রাজসিংহ ॥ প্রথম প্রকাশ :** ১২৮৪ সালের (১৮৭৮ খ্রীঃ) 'বঙ্গদর্শনে'র চৈত্র সংখ্যা থেকে 'রাজসিংহ' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। ১২৮৫ সালের ভাদ্র মাস পর্যন্ত, মোট ৬টি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়ে অসমাপ্ত অবস্থায় গ্রন্থটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘ তিন বছর পরে ১২৮৮ সালে (৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ১৮৮২ খ্রীঃ) 'রাজসিংহ' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তখন লেখক গ্রন্থটিকে উপন্যাস না বলে 'ক্ষুদ্রকথা' নামে অভিহিত করেন। প্রথম সংস্করণে এর পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ৮৩। ২য় সং—১২৯২ (পৃ. ৯০)। তৃতীয় সংস্করণ পর্যন্ত সামান্য পরিবর্তনের ফলে পৃষ্ঠাসংখ্যা দাঁড়ায় ৯০-এ। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই আগস্ট 'রাজসিংহে'র চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। চতুর্থ সংস্করণটি ব্যাপক পরিমার্জন ও পরিবর্ধনের ফলে সম্পূর্ণ নূতন রূপ লাভ করে। পৃষ্ঠাসংখ্যা হয় ৪৩৪।

'বঙ্গদর্শনে' 'রাজসিংহে'র প্রকাশ হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্বন্ধে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গে' লেখেন—"আমি প্রিয় সুহৃৎ বাবু নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সঙ্গে মাঝে মাঝে তাঁর (বঙ্কিমচন্দ্রের) কাছে যাইতাম। 'উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম' প্রণেতা বাবু চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে একদিন গিয়াছিলাম।......'রাজসিংহ' তাহার কিছুদিন আগে 'বঙ্গদর্শনে' ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। চন্দ্রশেখরবাবু জিজ্ঞাসা

করিলেন, তাহা সম্পূর্ণ হইতেছে না কেন? বঙ্কিমবাবু তাঁহার কোনও বন্ধুর নাম করিয়া বলিলেন, 'এঁরা বলেন—আমার সৃষ্ট চরিত্রগুলিতে এখনকার ছেলেপুলে মাটি হইতেছে। তাই আর ডাকাত মাণিকলালকে আঁকিতে ইচ্ছা করে না'......চন্দ্রশেখরবাবুতে এবং আমাতে একযোগে বলিলাম, মাণিকলালের মত দুই একটা ডাকাতের চিত্র দেশের সম্মুখে ধরিলে উপকার ভিন্ন অপকার হইবে না। এই কথায় বঙ্কিমবাবু কি ভাবিয়াছিলেন, বলিতে পারি না, কিন্তু ইহার অল্পদিন পরে 'রাজসিংহে'র প্রথম সংস্করণ বাহির হইল।" আবার অনেকে বলেন—বঙ্কিমের এ সময়ে লঘুরচনার প্রতি আসক্তিই 'রাজসিংহে'র প্রকাশবন্ধের কারণ।

প্রথম সংস্করণের 'বিজ্ঞাপনে' বঙ্কিমচন্দ্র পূর্বোল্লিখিত আপত্তি সত্ত্বেও গ্রন্থটি প্রকাশ করার কৈফিয়ৎ দেন—

"এ অবস্থাতে গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত করাতে অনেকেই আমার উপর রাগ করিবেন। একবার মনে করিয়াছিলাম, এই বিজ্ঞাপনে তাঁহাদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিব। কিন্তু দেখিতেছি, যাহাতে তাঁহাদের রাগ না হয়, এমন একটা সহজ উপায় আছে। তাঁহারা গ্রন্থখানি না পড়িলেই হইল।"

চতুর্থ সংস্করণের 'বিজ্ঞাপন'টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—

"রাজসিংহের পূর্ব্ব তিন সংস্করণে যে ঐতিহাসিক ঘটনাটি অবলম্বন করা হইয়াছিল, তাহা একটা অতি গুরুতর ঐতিহাসিক ঘটনার একটি ক্ষুদ্র অংশমাত্র। মোগল সাম্রাজ্যের প্রধান কথা, হিন্দুদিগের সঙ্গে মোগলের বিবাদ। মোগলের প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দুদিগের মধ্যে প্রধান রাজপুত ও মহারাষ্ট্রীয়। মহারাষ্ট্রীয়দিগের কথা সকলেই জানে। রাজপুতগণের বীর্য্য অধিকতর হইলেও, এদেশে তেমন সুপরিচিত নহে। তাহা সুপরিচিত করিবার যথার্থ উপায়, ইতিহাস। কিন্তু ইতিহাস লিখিবার পক্ষে অনেক বিঘ্ন। প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা কি, তাহা স্থির করা দুঃসাধ্য। মুসলমান ইতিহাস-লেখকেরা অত্যন্ত স্বজাতিপক্ষপাতী; হিন্দুবিদ্বেষক। হিন্দুদিগের গৌরবের কথা প্রায় লুকাইয়া থাকেন—বিশেষতঃ মুসলমানদিগের চির শত্রু রাজপুতজাতিদিগের কথা। রাজপুত ইতিহাসের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় না—স্বজাতিপক্ষপাত নাই এমন নহে। মানুচী নামে একজন বিনিসীয় চিকিৎসক মোগলদিগের সময়ে ভারতবর্ষে বাস করিয়াছিলেন। তিনিও মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাস লিখিয়া রাখিয়াছিলেন; কক্র নামা একজন পাদ্রি তাহা প্রকাশিত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই তিন জাতীয় ইতিহাসে পরস্পরের সহিত অনৈক্য আছে। ইহাদের মধ্যে কাহার কথা সত্য, তাহার মীমাংসা দুঃসাধ্য। অন্ততঃ এ কার্য্য বিশেষ পরিশ্রমসাপেক্ষ।

"ইতিহাসের উদ্দেশ্য কখন কখন উপন্যাসে সুসিদ্ধ হইতে পারে। উপন্যাস-লেখক সর্ব্বত্র সত্যের শৃঙ্খলে বদ্ধ নহেন। ইচ্ছামত অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য কল্পনার আশ্রয় লইতে পারেন। তবে, সকল স্থানে উপন্যাস, ইতিহাসের আসনে বসিতে পারে না। কিন্তু এই গ্রন্থে আমার যে উদ্দেশ্য, তাহাতে এই নিষেধবাক্য খাটে না। এক্ষণে বুঝাইতেছি, এই উদ্দেশ্য কি।

" 'ভারতকলঙ্ক' নামক প্রবন্ধে আমি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি, ভারতবর্ষের অধঃপতনের কারণ কি কি। হিন্দুদিগের বাহুবলের অভাব সে সকল কারণের মধ্যে নহে। এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে 'হিন্দুদিগের' বাহুবলের কোন চিহ্ন দেখা যায় না। ব্যায়ামের অভাবে মনুষ্যের সর্ব্বাঙ্গ দুর্ব্বল হয়। জাতি সম্বন্ধেও সেকথা খাটে। ইংরেজ সাম্রাজ্যে হিন্দুর বাহুবল লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে কখনও লুপ্ত হয় নাই। হিন্দুদিগের বাহুবলই আমার প্রতিপাদ্য। উদাহরণস্বরূপ আমি রাজসিংহকে লইয়াছি। মহারাষ্ট্রীয় অপেক্ষাও রাজপুত বাহুবলে বলবান্ ছিলেন বলিয়া আমার বিশ্বাস। তবে রাজকীয় অন্যান্য গুণে তাঁহারা নিকৃষ্ট ছিলেন।

"যখন বাহুবল মাত্র আমার প্রতিপাদ্য, তখন উপন্যাসের আশ্রয় লওয়া যাইতে পারে। উপন্যাসে সে কথা পাঠকের হৃদয়ঙ্গম করাইতে গেলে, রাজসিংহের পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণে যে ক্ষুদ্র ঘটনাটি অবলম্বন করা গিয়াছিল, তদ্দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। রাজসিংহের সঙ্গে মোগল বাদশাহের যে মহাযুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা সমস্তই উপন্যাসভুক্ত করিতে হয়। তাহা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি বলিয়া গ্রন্থের কলেবর এত বাড়িয়াছে। বিশেষতঃ উপন্যাসের ঔপন্যাসিকতা রক্ষা করিবার জন্য কল্পনাপ্রসূত অনেকবিষয়ই গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত করিতে হইয়াছে।

"স্থূল ঘটনা, অর্থাৎ যুদ্ধাদির ফল, ইতিহাসে যেমন আছে, প্রায় তেমনই রাখিয়াছি। কোন যুদ্ধ বা তাহার ফল কল্পনাপ্রসূত নহে। তবে যুদ্ধের প্রকরণ, যাহা ইতিহাসে নাই, তাহা গড়িয়া দিতে হইয়াছে। ঔরঙ্গজেব, রাজসিংহ, জেব-উন্নিসা, উদিপুরী, ইহারা ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ইহাদের চরিত্রও ইতিহাসে যেরূপ আছে, সেইরূপ রাখা গিয়াছে। তবে তাঁহাদের সম্বন্ধে যেসকল ঘটনা লিখিত হইয়াছে, সকলই ঐতিহাসিক নহে। উপন্যাসে সকল কথা ঐতিহাসিক হইবার প্রয়োজন নাই।

"ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে কোন্‌টি প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাহার পক্ষে বিচার আবশ্যক। আমি সে বিচার বড় করি নাই। দুই একটি উদাহরণ দিলে বুঝা যাইবে। রূপনগরের রাজকন্যা সম্বন্ধে যে স্থূল ঘটনা বিবৃত হইয়াছে তাহা টডের গ্রন্থে আছে, কিন্তু অর্মের গ্রন্থে নাই। আমি উভয় ঘটনাই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি।

রন্ধ্র মধ্যে ঔরঙ্গজেব যে অবস্থায় পতিত হওয়ার কথা লিখিয়াছি, অর্ম এরূপ লেখেন। কিন্তু টডের গ্রন্থে শাহজাদা সম্বন্ধে ঐ ঘটনা ঘটিয়াছিল বলিয়া লিখিত হইয়াছে। আমি এখানে অর্মের অনুবর্ত্তী হইয়াছি। এইরূপ অনেক আছে।

"কথিত আছে, নৃতগীত কেহ না করিতে পারে, এমন আদেশ ঔরঙ্গজেব প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের অন্তঃপুরেই সে আদেশের অবমাননা ঘটিয়াছিল, এ উপন্যাসে এইরূপ লিখিয়াছি। আমার স্থির বিশ্বাস, ঐতিহাসিক সত্য আমার দিকে।

"ঔরঙ্গজেব নিজে মদ্য পান করিতেন না, কিন্তু ইঁহার পিতা ও পিতামহ, খুল্লতাত এবং সহোদর প্রভৃতি অতিশয় মদ্যপ ছিলেন। তাঁহার পৌরাঙ্গনাগণও যে মদ্যপায়িনী ছিল, তাহারও ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। কেহ যদি এ বিষয়ে সন্দেহ করেন, তবে সে সন্দেহ ভঞ্জন করিতে প্রস্তুত আছি।

"পরিশেষে বক্তব্য যে, আমি পূর্ব্বে কখনও ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখি নাই। দুর্গেশনন্দিনী বা চন্দ্রশেখর বা সীতারামকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যাইতে পারে না। এই প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিলাম। এই পর্য্যন্ত ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রণয়নে কোন লেখকই সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। আমি যে পারি নাই, তাহা বলা বাহুল্য।

"ভাষা সম্বন্ধেও একটা কথা বলা প্রয়োজনীয়। এখন লেখকেরা বা ভাষা-সমালোচকেরা দুইভাগে বিভক্ত। এক সম্প্রদায়ের মত যে, বাঙ্গালা ব্যাকরণ সর্ব্বত্র সংস্কৃতানুযায়ী হওয়া উচিত। দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের মত—তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সংস্কৃতে সুপণ্ডিত—যে, যাহা পূর্ব্ব হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা সংস্কৃত ব্যাকরণ বিরুদ্ধ হইলেও চলিতে পারে। আমি নিজে এই দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের ম র পক্ষপাতী, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে এবং সকল স্থানে তাঁহাদের অনুমোদনে প্রস্তুত নহি। আমি যদিও ইতিপূর্ব্বে সম্বোধনে 'ভগবন্', 'প্রভো', 'স্বামিন্', 'রাজকুমারি', 'পিতঃ' প্রভৃতি লিখিয়াছি, এক্ষণে এ সকল বাঙ্গালা ভাষায় অপ্রযোজ্য বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি। আমি 'তথা' এবং 'তথায়' উভয় রূপই ব্যবহার করিয়াছি। 'সসৈন্যে' এবং 'সসৈন্য' দুই-ই লিখিয়াছি—একটু অর্থ প্রভেদ। কিন্তু 'গোপিনী' 'সশরীরে উপস্থিত', এরূপ প্রয়োগ পরিত্যাগ করিয়াছি। কারণনির্দ্দেশের এ স্থান নহে। সময়ান্তরে তাহা করিব ইচ্ছা আছে।"

সংস্করণ-ভেদ ঃ 'রাজসিংহে'র 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত রূপ ও ১ম সংস্করণের রূপের সঙ্গে চতুর্থ সংস্করণের পার্থক্য অনেক। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য—চঞ্চলকুমারীকে মোগল সেনার হাত থেকে উদ্ধার ক'রেই কাহিনী সমাপ্ত হয়েছিল। ১ম সংস্করণের সমাপ্তি এরূপ—"বলা বাহুল্য যে, নির্ম্মলকুমারী পরিণীতা হইয়া স্বামী কর্ত্তৃক উদয়পুরে

আনীতা এবং রাজপুরীমধ্যে চঞ্চলকুমারীর নিকট প্রেরিতা হইলেন। ইহাও বলা বাহুল্য যে চঞ্চলকুমারী উদয়পুরের রাণার রাজমহিষী হইলেন। এবঞ্চ মাণিকলাল রাজদরবারে সম্মানিত লইয়া উচ্চ পদ লাভ করিলেন। তাঁহার কন্যাটি নির্ম্মলকুমারীর জিম্মায় রহিল। পিসীমার সঙ্গে আর বড় সম্বন্ধ রহিল না।

"ঔরঙ্গজেব শিশুপালের দশা প্রাপ্ত হইয়া দেবীরের ক্ষেত্রে রাজসিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন। সেখানেও শিশুপালের দশান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সে সকল কথা বলা হইল না।"

চতুর্থ সংস্করণে ঔরঙ্গজেব ও রাজসিংহের সংঘর্ষের বিবরণ দেওয়ায় কাহিনীর কলেবর বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু প্রথম প্রকাশিত কাহিনীকে বঙ্কিম অনেকস্থানেই অবিকৃত রাখেন।

দরিয়াবিবি পরবর্তী সংস্করণে নবাগতা। মবারক-জেবউন্নিসার কাহিনীও পল্লবিত রূপ লাভ করে।

মাণিকলাল-নির্মলকুমারীর কোর্টশিপ ও বিবাহকাহিনী পরবর্তী সংস্করণের নূতন সংযোজন।

প্রথম সংস্করণে যোধপুরী বেগমের ভূমিকা ছিল অল্পই।

আলোচনা: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'রাজসিংহ' প্রবন্ধে (আধুনিক সাহিত্য) উপন্যাসটির যে মূল্যায়ন করেছেন, তদপেক্ষা সার্থক সমালোচনা আজ পর্যন্ত হয়নি।

ঐতিহাসিকতা: বঙ্কিমচন্দ্র 'রাজসিংহ'কে তাঁর একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে আখ্যাত করেছেন। সুতরাং রাজসিংহের ঐতিহাসিকতা নিয়ে আজ পর্যন্ত যত আলোচনা হয়েছে, এর অন্যান্য গুণাগুণ সম্বন্ধে তত হয়নি। এ সম্বন্ধে সাহিত্যপরিষৎ সংস্করণ বঙ্কিম-রচনাবলীতে ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের বিস্তৃত তথ্যসম্বলিত ভূমিকা প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। বঙ্কিম তৎকালীন স্বল্পতম ঐতিহাসিক উপাদানকে কেন্দ্র ক'রে অগ্রসর হয়েছিলেন বলে কিছু ভুল-ত্রুটি থেকে গেছে। কিন্তু তা সামান্যই। তাই শেষ পর্যন্ত যদুনাথ মন্তব্য করেছেন—"বঙ্কিম উপন্যাসের বেগে সত্যকে অতিক্রম করেন নাই, সত্যকে জীবন্ত আলোকে উদ্ভাসিত করিয়াছেন মাত্র।"

নামকরণ: 'রাজসিংহ' উপন্যাসে হিন্দুর বাহুবল প্রতিপাদন বঙ্কিমের লক্ষ্য। সেই বাহুবল প্রকাশিত হয়েছে রাণা রাজসিংহকে কেন্দ্র ক'রে। তাই রাজসিংহ নামকরণ অসার্থক হয়নি।

গতি: 'রাজসিংহ' উপন্যাসের কাহিনীর গতি রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল। চলমান সৈন্যদলের সঙ্গে তিনি তুলনা করেছেন কাহিনীকে। তাই উপন্যাসের ছোটখাট

ফাঁক নজরে আসে না। মাণিকলালের কোর্টশিপের সংক্ষিপ্ততার জন্য বঙ্কিমের কৈফিয়ৎ না দিলেও যায়-আসে না।

কাহিনীর বহুমুখী ধারা : 'রাজসিংহ' উপন্যাসে যেমন বহু চরিত্রের ভীড়, তেমনি কাহিনীও বহুমুখী ধারায় প্রকাশিত। চঞ্চলকুমারীকে কেন্দ্র ক'রে রাজসিংহ ও ঔরঙ্গজেবের যুদ্ধ মূল ঘটনা। মবারক-দরিয়া ও জেবউন্নিসা—উপাখ্যান স্বতন্ত্র আস্বাদ দান করে, মাণিকলাল-নির্মলকে অবশ্য আলাদাভাবে কাহিনী-গঠনের সুযোগ দান করা হয়নি। কিন্তু যতই শাখা-কাহিনী থাক না কেন, 'রাজসিংহে'র কাহিনীস্রোত শাখা-প্রশাখায় শীর্ণতোয়া হয়ে যায়নি, সংহতবেগে ছুটে চলেছে ইতিহাসের আবর্তসঙ্কুল সমুদ্রে। এখানেই বঙ্কিমের কৃতিত্ব।

রাজসিংহের পরাভব (রাজঃ ৫/২)। রাজসিংহ মোগলের হাত থেকে চঞ্চল-কুমারীকে ছিনিয়ে আনলেন, কিন্তু রাজকুমারীর কাছে বাক্‌চাতুর্যে পরাভূত হলেন। চঞ্চলকুমারী রাণাকে তাঁদের বিবাহের পূর্বে পিতামাতার আশীর্বাদ আনাতে বললেন।

রাত্রি—ডাকিনী (সীতাঃ ৩য় খণ্ড)। এই খণ্ডে মোট ২৪টি পরিচ্ছেদ এবং 'পরিশিষ্ট' সন্নিবেশিত। শ্রী সকলের কাছে ডাকিনীরূপেই প্রতিপাদিত হয়েছে। ফলে, সীতারামের জীবন ও রাজ্যের রাত্রি ঘনিয়ে এসেছে।

***রাধারাণী ॥ প্রথম প্রকাশ :** ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জুন থেকে ছুটি নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র কাঁঠালপাড়ায় বাস করতে থাকেন। ঐ বছরই কার্তিক-অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' 'রাধারাণী' প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৮৭৭ ও ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থটি—'উপকথা—অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস' নামক পুস্তকে স্থানলাভ করে: ১৮৮৬ খ্রীঃ স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে 'রাধারাণী'র প্রথম আবির্ভাব। এটিতে তৃতীয় সংস্করণ লেখা ছিল এবং পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ৩৮। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত চতুর্থ সংস্করণটিতে পৃষ্ঠাসংখ্যা দাঁড়ায় ৬৫। 'চতুর্থবারের বিজ্ঞাপন'-এ বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন—"এই ক্ষুদ্র উপন্যাসের দোষ সংশোধন করিতে গিয়া, ইহার কলেবর বাড়াইতে হইয়াছে। কাজেই মূল্যও বাড়াইতে হইয়াছে।"

বিভিন্ন সংস্করণের পরিবর্তনগুলি গুরুতর নয় বলে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই।

কাহিনীর উৎস : বঙ্কিম-জীবনীকার শচীশচন্দ্র এই 'রাধারাণী' আখ্যানের সূত্র হিসাবে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন—

"গৃহ-বিগ্রহ রাধাবল্লভজিউর রথযাত্রা প্রতি বৎসর মহাসমারোহে সম্পন্ন হইত। পূজনীয় যাদবচন্দ্র তখন জীবিত। বঙ্কিমচন্দ্র ১২৮২ সালে রথযাত্রার সময় ছুটি লইয়া গৃহে আসিয়াছিলেন। রথে বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল। সেই ভিড়ে একটি ছোট

মেয়ে হারাইয়া যায়। তাহার আত্মীয়-স্বজনের অনুসন্ধানার্থ বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও কিছু চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই ঘটনার দুইমাস পরে 'রাধারাণী' লিখিত হয়। আমার মনে হয়, এই ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র 'রাধারাণী' রচনা করিয়াছিলেন।

বিচার ঃ 'রাধারাণী' উপন্যাস, কি ছোটগল্প তা নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হয়ে থাকে। গল্পটিকে সংহত ক'রে রুক্মিণীকুমার ও রাধারাণীর মিলনেই যদি কাহিনীর ইতি টানা হত, তাহলে হয়ত এটি ছোটগল্পে পরিণত হতে পারত। কিন্তু যেভাবে বিবাহের আয়োজন করা হয়েছে ও ঘটনার অতিরিক্ত বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, তাতে এটি উপন্যাসধর্মী হয়ে পড়েছে।

রাধারাণীর কাহিনী নিকটকালের পটভূমিতে স্থাপন করা হলেও, দূরলোকের রোমান্সের গন্ধ তাকে মধুর রূপ দান করেছে।

'রাধারাণী'র দুখানি ইংরেজি অনুবাদ হয়।

রামচরণের মুক্তি (চন্দ্রঃ ৩/৭)। প্রতাপের সঙ্গে তাঁর ভৃত্য রামচরণও ইংরাজের হাতে বন্দী হয়েছিল। প্রভুর পলায়নের পর, সে-ও মুক্তিলাভ করল। এই পরিচ্ছেদে সে কিঞ্চিৎ হাস্যরস বিতরণ করেছে।

রামানন্দ স্বামী (চন্দ্রঃ ৩/১)। চন্দ্রশেখরের গুরু রামানন্দ স্বামীর পরিচয় দান করা হয়েছে। রামানন্দ স্বামী ও চন্দ্রশেখরের সাক্ষাৎ হয়েছে।

লবঙ্গলতার কথা (রজনী)। লবঙ্গলতা—৪র্থ খণ্ড ১ম, ৩য়, ৪র্থ এবং ৭ম পরিচ্ছেদে কথা বলেছেন।

লরেন্স ফস্টর (চন্দ্রঃ ১/৩)। লরেন্স ফস্টরের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। তিনি একজন রেশমকুঠীর কুঠিয়াল। চন্দ্রশেখরের অনুপস্থিতির সুযোগে এক রাত্রে লরেন্স ফস্টরের লোক শৈবলিনীকে হরণ করল।

লুব্ধ (মৃণাঃ ১৫)। মৃণালিনী যে গৃহে ছিল, সেই গৃহস্বামীর পুত্র ব্যোমকেশ মৃণালিনীর রূপরাশিতে লুব্ধ হয়ে রাত্রিতে তার হাত ধরল। মৃণালিনীও তার সমুচিত জবাব দিল।

শচীন্দ্র বক্তা, শচীন্দ্রনাথের কথা, শচীন্দ্রের কথা (রজনী)। 'রজনী' উপন্যাসের ৩য় খণ্ডের ৬টি পরিচ্ছেদে 'শচীন্দ্র বক্তা'। শচীন্দ্র-কথিত ৪র্থ খণ্ড ৫ম পরিচ্ছেদ 'শচীন্দ্রনাথের কথা' এবং ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ 'শচীন্দ্রের কথা' নামে অভিহিত হয়েছে।

শয়নাগারে (কপাঃ ৪/১)। এখানে কপালকুণ্ডলা শ্যামাসুন্দরীর জন্য স্বামীবশের ঔষধ সংগ্রহ করতে রাজী হয়েছে এবং তাই নিয়ে নবকুমারের সঙ্গে তার তর্ক-বিতর্কও হয়েছে।

মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যের 'সারিকা' কবিতার উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে—"রাধিকার বেড়ী ভাঙ, এ মম মিনতি।" রাধা পিঞ্জরাবদ্ধ সারিকাকে মুক্ত করার জন্য সখীদের মিনতি করছেন। আসলে কিন্তু এ সংসারাবদ্ধ রাধিকারই মুক্তি-কামনার প্রকাশ। বনবাসিনী কপালকুণ্ডলাও যে এ সংসার থেকে বেড়ী ভেঙে পালাতে চায়।

শ্বশুরবাড়ী চলিলাম (ইন্দিরা ২য় পরিঃ)। শ্বশুরবাড়ীর পথে এক বনে ইন্দিরা এবং বাহকবৃন্দ দস্যু কর্তৃক আক্রান্ত হল। দস্যুরা লুঠতরাজ করল বটে, কিন্তু ইন্দিরার কোন ক্ষতি করল না।

শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার সুখ (ইন্দিরা ৩য় পরিঃ)। একাকী বনপথে ইন্দিরার দুঃখভোগ এখানে বর্ণিত হয়েছে। নামকরণটি এখানে বিপরীত ভাব প্রকাশ করে।

শাহজাদী অপেক্ষা দুঃখী ভাল (রাজঃ ৫/১)। যুদ্ধক্ষেত্রে মবারক একটি কূপে পতিত হলে দরিয়াবিবি তাঁকে উদ্ধার করল। কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসার পুনরুজ্জীবনে মবারক দরিয়াকে বিবাহ ক'রে বেশ সুখেই কিছুদিন অতিবাহিত করলেন। শাহজাদীর জন্য ক্ষোভ রইল না।

শাহজাদী ভস্ম হইল (রাজঃ ৮/৬)। মবারককে পেয়ে শাহজাদীর সমস্ত গর্ব ধুলিস্যাৎ হয়ে গেল। তিনি এখান থেকে মুক্তি পেলে মবারককে বিবাহ করবেন স্থির করলেন।

শিবিকারোহণে (কপাঃ ২/৪)। মতিবিবি-প্রদত্ত সমস্ত অলঙ্কার কপালকুণ্ডলা নির্বিকারচিত্তে ভিক্ষুককে দান ক'রে দিল।

এখানে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র চতুর্থ সর্গ থেকে—

"—খুলিনু সত্বরে,
কঙ্কণ, বলয়, হার, সিঁথি, কণ্ঠমালা,
কুণ্ডল, নূপুর, কাঞ্চি।"

রাবণ যখন সীতাকে হরণ ক'রে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন সীতাদেবী সমস্ত অলঙ্কার খুলে ফেলে দেন রামকে পথের চিহ্ন দেখিয়ে দেবার জন্য।

শৈলেশ্বর সাক্ষাৎ (দুর্গেঃ ১/১৬)। শৈলেশ্বরের সম্মুখে জগৎসিংহ বিমলার কাছ থেকে তিলোত্তমার পরিচয় সংগ্রহ করেছে। তিলোত্তমা-জগৎসিংহের মিলন সম্পর্কে আরো অনেক কথোপকথন হয়েছে উভয়ের মধ্যে।

শৈবলিনী কি করিল (চন্দ্রঃ ৪/২)। পর্বতোপরি এক গুহায় শৈবলিনীর মানসিক বিকার দেখা দিতে লাগল। তিনি নরকদর্শন করতে লাগলেন। তিনি উদ্ধারকর্তা ব্রহ্মচারীর কাছ থেকে এই পাপমুক্তির উপায় জিজ্ঞাসা করলেন। ব্রহ্মচারী তাঁকে

বেহগ্রামে ফিরে গিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে বললেন। শৈবলিনী স্বামীকে দেখতে চাইলে, ব্রহ্মচারী একমনে তাঁকে স্বামীর ধ্যান করতে বললেন।

সকল সুখেরই সীমা আছে (বিষঃ ৩১ পরিঃ)। সূর্যমুখীর গৃহত্যাগের পর নগেন্দ্র বুঝতে পেরেছেন সূর্যমুখী তাঁর কাছে কতখানি ছিল এবং কুন্দের মধ্যে তার অভাব কোথায়। এদিকে কুন্দও তার আকাঙ্ক্ষিত সুখ লাভ ক'রেও কোথায় যেন অস্বস্তির আভাষ পেয়েছে। সে বুঝতে পেরেছে—সকল সুখেরই সীমা আছে।

সকলের কথা (রজনী ৪র্থ খণ্ড)। 'রজনী' উপন্যাসের চতুর্থ খণ্ডে বিভিন্ন পরিচ্ছেদে লবঙ্গলতা, শচীন্দ্র, অমরনাথ সকলেরই মুখ দিয়ে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে বলে এর নাম 'সকলের কথা'।

সন্ধ্যা—জয়ন্তী (সীতাঃ ২য় খণ্ড)। এই খণ্ডে মোট ১৭টি পরিচ্ছেদ আছে। শ্রীর জীবনের সন্ধ্যা, অর্থাৎ জয়ন্তীর প্রভাব এবং ধর্মানুরাগ দেখানো হয়েছে। এটিকে সীতারামের বুদ্ধিবৃত্তিরও সন্ধ্যাপর্ব বলা চলে।

সপত্নী সম্ভাষে (কপাঃ ৪/৭)। লুৎফউন্নিসা কপালকুণ্ডলাকে নিজ পরিচয় দিয়ে নবকুমারকে তার কাছ থেকে ভিক্ষা চেয়েছে এবং কপালকুণ্ডলাও তাতে রাজী হয়েছে।

এখানে Lucretia থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে—

"Be at peace, it is your sister that addresses you. Require Lucretia's Love."

Lucretia রোমের বীর সেনাপতি Collatinus-এর স্ত্রী। Sextus নামক এক কামুক এক ভোজসভায় Lucretia-র ধর্মনাশ করতে উদ্যত হলে Lucretia একথা বলেন—সে যেন তাকে ভগ্নী মনে ক'রে লোভ সম্বরণ করে। এখানে লুৎফউন্নিসা কপালকুণ্ডলাকে ভগ্নী সম্বোধন করেছে।

সফলে নিষ্ফল স্বপ্ন (দুর্গেঃ ২/২১)। জগৎসিংহের আগমনে তিলোত্তমা ক্রমে ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠলেন। একদিন জগৎসিংহকে তিনি পূর্বে দেখা এক স্বপ্নের কথা বললেন। তাতে জগৎসিংহের সঙ্গে তাঁর মিলনের দুরাশার কথাই ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু জগৎসিংহ তিলোত্তমাকে গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে স্বপ্নঘটনাকে নিষ্ফল ক'রে দিলেন।

সব ফুরাইল, যন্ত্রণা ফুরায় না (বিষঃ ৩৯ পরিঃ)। শ্রীশচন্দ্রের সঙ্গে কথোপকথনে নগেন্দ্রের হৃদয়ে যে সূর্যমুখীর বিয়োগজনিত যন্ত্রণা তা প্রকাশিত হয়ে পড়েছে।

সব সমান (রাজ: ৬/৮)। মবারকের মৃত্যু সংবাদ শুনে জেব-উন্নিসার আনন্দ হল না, তিনি কান্নায় ভেঙে পড়লেন। তিনি বুঝলেন, ভালবাসার ক্ষেত্রে সবাই সমান। সাপে-কাটা মবারকের দেহ কবর থেকে তুলে বাঁচানো যায় কিনা, সে চেষ্টা করবার জন্য তিনি একজন বিশ্বস্ত লোক নিযোগ করলেন।

সমাপ্তি (দুর্গে: ২/২২)। 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদ। এখানে জগৎসিংহ-তিলোত্তমার বিবাহ এবং আয়েষার নীরব স্বার্থত্যাগের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

সমাপ্তি (বিষ: ৫০ পরি:)। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের সমাপ্তি অধ্যায়ে দেবেন্দ্রের মৃত্যু ও হীরার ঘোর উন্মাদিনী অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

সম্রাট ও রবাট্ (চন্দ্র: ৬/৩)। মীরকাসেম যখন কুল্‌সমের মুখে দলনীর আত্মহত্যার কথা এবং তকির বিশ্বাসঘাতকতার কথা শুনলেন, তখন ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে উঠলেন।

সমিধসংগ্রহ—উদিপুরী (রাজ: ৬/৪)। নির্মলকুমারী উদিপুরীর কাছে গিয়ে তাঁর নেশাচ্ছন্ন মুহূর্তে চঞ্চলের পত্রখানি দিয়ে এলো। কিন্তু হারেম থেকে বেরুবার পথে নবাবের সামনে পড়ে গেল।

সমিধসংগ্রহ—জেব-উন্নিসা (রাজ: ৬/৭)। জেব-উন্নিসা মবারক-দরিয়ার একত্র বসবাসের সংবাদে ক্রোধান্বিত হয়ে নবাবের কাছে মবারকের নামে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ আনলেন। ফলে, বাদশাজাদীর রোষে মবারককে সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ করতে হল।

সমিধসংগ্রহ—দরিয়া (রাজ: ৬/৯)। মাণিকলাল মবারককে বাঁচিয়ে নিজের সঙ্গে নিয়ে চলল। এদিকে উন্মাদিনী দরিয়া জেব-উন্নিসার চোখে জল দেখে অট্টহাস্য ক'রে উঠল।

সমিধসংগ্রহ—স্বয়ং যম (রাজ: ৬/৫)। ঔরঙ্গজেবের হাতে নির্মল ধরা পড়ল। ঔরঙ্গজেব নির্মলের বুদ্ধিমত্তায় বিস্মিত হলেন। কিন্তু তাকে মুক্তি দিলেন না। যোধপুরী বেগমের মহলে রেখে দিলেন।

সমুদ্রতটে (কপা: ১/৫)। এই অধ্যায়ে নবকুমারের সঙ্গে কপালকুণ্ডলার প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছে। এখানে কালিদাসের 'রঘুবংশম্' মহাকাব্যের যোড়শ সর্গের সপ্তম শ্লোকটি উদ্ধৃত হয়েছে—

"—যোগপ্রভাবো ন চ লক্ষ্যতে তে।
বিভর্ষি চাকারমনির্বৃতানাং মৃণালিনী হৈমমিবোপরাগম্ ॥" অর্থাৎ—

(আপনার মধ্যে) কোন যোগপ্রভাব লক্ষিত হচ্ছে না। আপনার আকৃতি

দুঃখিত জনের মত, হিমপ্রভাবে ক্লিষ্টা মৃণালিনীর মত বোধ হচ্ছে। রামচন্দ্রের পুত্র কুশ যখন পিতার মৃত্যুর পর শরাবতীতে রাজত্ব করেছিলেন, তখন অযোধ্যার রাজলক্ষ্মী তাঁকে দর্শন দেন। সেই রাজলক্ষ্মীর মলিন রূপ দর্শন ক'রে কুশ এই মন্তব্য করেছিলেন।

কপালকুণ্ডলার রূপও এরূপ মহার্ঘ্য, কিন্তু বনবাসী বলে তা অযত্নবিন্যস্ত।

সরলা এবং সর্পী (বিষঃ ৪৭ পরিঃ)। সর্পী হীরা অত্যন্ত চাতুরীর সঙ্গে সরলা কুন্দের মনে আত্মহত্যার বাসনা জাগিয়ে, তার সামনে বিষের কৌটা রেখে অন্যত্র গমন করে। কুন্দও সেই বিষ চুরি করল।

সংবাদ-বিক্রয় (রাজঃ ২/৪)। দরিয়াবিবি জেব-উন্নিসার গৃহে প্রবেশ করল। কথাবার্তায় সে যখন শাহজাদীকে বলল—মবারকের সঙ্গে তার বিবাহ হয়েছিল, তখন নবাবজাদী বড় রাগলেন। অবশেষে দরিয়া রূপনগরের চিত্রদলনের কাহিনীটি বলল।

স্বদেশ (কপাঃ ২/৫)। নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে নিয়ে স্বদেশে ফিরেছে। এখন নবকুমারের হৃদয়ে কপালকুণ্ডলার প্রতি জেগেছে প্রেম। তাই সে কারণে-অকারণে কপালকুণ্ডলার কাছে আসতে চায়। কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্য থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে—

"শব্দাখ্যেয়ং যদপি কিল তে যঃ সখীনাং পুরস্তাৎ।
কর্ণে লোলঃ কথয়িতুমভূদাননস্পর্শলোভাৎ॥"

বিরহী যক্ষ মেঘের মাধ্যমে প্রিয়ার কাছে বার্তা পাঠাচ্ছে—"যে কথা সখীদের সামনে বলা গেলেও কেবলমাত্র প্রিয়ার কর্ণের মধুর স্পর্শ লাভ করার জন্য কানে কানে বলতো (সে প্রিয় আজ অনেক দূরের থেকে বার্তা পাঠাচ্ছে)।

নবকুমারের মনোভাবের সঙ্গে উদ্ধৃতিটির চমৎকার সাদৃশ্য দেখা যায়।

স্বপ্ন (মৃণাঃ ৪/৯)। মৃণালিনী স্বপ্নে হেমচন্দ্রকে যেন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেছেন, এমন সময় সত্যই হেমচন্দ্র এসে উপস্থিত হলেন।

স্বপ্নে (কপাঃ ৪/৩)। কপালকুণ্ডলা স্বপ্নে নানারূপ অশুভ ঘটনা দেখতে পেল এবং জাগরিত হয়ে ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণের পত্র পেল। এখানে Byron-এর 'ডনজুয়ান' কাব্যের চতুর্থ সর্গে বর্ণিত নায়িকা হেইডীর স্বপ্নঘটনার উদ্ধৃতি আছে—"I had a dream, which was not all a dream", অর্থাৎ—আমি একটি স্বপ্ন দেখেছিলাম, যেটি শুধুমাত্র স্বপ্নই ছিল না। এই অংশে বর্ণিত কপালকুণ্ডলা'র স্বপ্নও শুধুমাত্র স্বপ্ন নয়, পরবর্তী ঘটনার পূর্বভাষমাত্র।

সাগরসঙ্গমে (কপাঃ ১/১)। নায়ক নবকুমার এবং তাঁর সহযাত্রীরা গঙ্গা-সাগর থেকে প্রত্যাগমনকালে কুয়াশার মধ্যে পড়ে কেমন বিপন্ন হয়েছিলেন, সেই

ঘটনা বিবৃত হয়েছে। পরিচ্ছেদের সুরুতে সেক্সপীয়রের "Comedy of Errors"-এর প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্য থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে—"Floating straight obedient to the stream"। এজিয়ন (Aegeon) নামে সিরাকিউস (Syracuse) দেশের এক বণিক ঐ নাটকে নৌকাপথে বিপন্ন হয়েছিলেন। Epidamnum থেকে Corinth-এর দিকে যাবার সময় ঝড়ে তাঁর জাহাজ ভেঙে যায়, তিনি এক ভাঙা মাস্তলে নিজেকে বেঁধে ভেসে যাচ্ছিলেন। সেদিনও কুয়াশা ছিল। তিনি যদি Ephesus-এর দিকে আসতেন, তাহলে প্রাণদণ্ড ভোগ করতে হত; কারণ, Ephesus-এর লোকরা Syracuse-এর লোককে সহ্য করতে পারত না। কিন্তু তিনি সূর্য উঠলে দেখলেন, বিপরীত দিকেই চলেছেন। তাই বহমান স্রোতের বিশ্বাসযোগ্যতা সম্বন্ধে এই মন্তব্য। নবকুমারদের বিপথগামী নৌকাও ঐরূপ বহমান স্রোতের সাহায্যে রক্ষা পেয়েছিল। নবকুমারও বিপন্ন নৌকাকে রক্ষা করার জন্য নাবিকদিগকে পরামর্শ দিলেন—"তোমরা এক্ষণে বাহন বন্ধ কর, স্রোতে নৌকা যথায় যায় যাক্।" এই সাদৃশ্যের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজি উদ্ধৃতিটি ব্যবহার করেছেন।

সিদ্ধি (চন্দ্রঃ ৬ষ্ঠ খণ্ড)। এই খণ্ডে মোট ৮টি পরিচ্ছেদ আছে। এটিই 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের শেষ খণ্ড। সিদ্ধি বলতে এখানে প্রতাপ যে আত্মত্যাগের সাধনা করেছেন, সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভের কথাই বলা হয়েছে।

স্তিমিত প্রদীপে (বিষঃ ৪৪ পরিঃ)। বহুকাল পরে নগেন্দ্র গৃহে ফিরে রাত্রিকালে শয়নকক্ষে সূর্যমুখীর স্মৃতিচারণ করছিলেন। এমন সময় স্তিমিত প্রদীপের অস্পষ্টালোকে দ্বারদেশে সূর্যমুখীর ছায়ামূর্তি দর্শন ক'রে তিনি জ্ঞান হারালেন।

***সীতারাম** ॥ বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ উপন্যাস 'সীতারাম'। পূর্ববর্তী উপন্যাস 'দেবী চৌধুরাণী'তে বঙ্কিমচন্দ্র গীতার নিষ্কাম ধর্মের অনুশীলনের যে সা· ·ক্তা দেখিয়েছিলেন, এই উপন্যাসে তারই বিপরীতভাবে মোহগ্রস্ত মানুষের জীবনে অনুশীলনধর্মের ব্যর্থতার কথা বর্ণনা করেছেন।

গ্রন্থ-পরিচয়—প্রেরণা : 'সীতারাম' উপন্যাস-রচনার প্রেরণা হিসাবে শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র তাঁর 'যশোহর খুলনার ইতিহাস' ২য় খণ্ডে একটি তথ্যের উল্লেখ করেছেন। এই তথ্য এবং অন্যান্য তথ্যের সমবায়ে যদুনাথ সরকার সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় লিখেছেন—"১৮৬১—১৮৬৩ এই তিন বৎসর বঙ্কিম, খুলনা জেলায় ডেপুটী কলেক্টর ছিলেন, এবং ঐ জেলার মাগুরা বিভাগের সবডিভিসনাল অফিসর নিযুক্ত থাকেন। ঐ অঞ্চলে মাগুরা শহর হইতে ১৩ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে সীতারামের রাজধানী মহম্মদপুর এখন গ্রাম মাত্র, কিন্তু তাঁহার রাজবাড়ী, মন্দির, দুর্গ-প্রাকার,

পরিখা প্রভৃতির অগণ্য ভগ্নাবশেষ জঙ্গলে ঢাকা পড়িয়া আছে। স্থানীয় প্রবাদ এইরূপ যে, 'রাইচরণ মুখোপাধ্যায় নামক একজন গল্পরসিক কর্ম্মকুশল ব্যক্তির সন্ধান পাইয়া বঙ্কিম তাঁহার নিকট হইতে অনেক গল্পগুজব শুনিয়া লন। কেহ কেহ বলেন রাইচরণ বাবু ২।৩ মাস বঙ্কিমচন্দ্রের বেতনভুক্ হইয়া মাগুরায় থাকেন ও তাঁহাকে সময়মত গল্প শুনাইতেন।' (সতীশচন্দ্র, ২য় খণ্ড, ৫১৪ পৃঃ) সীতারামের মৃত্যুর দেড়শত বৎসর পরেও তাঁহার বাসস্থানে তাঁহার নিজের এবং লোকজনের বংশধরদের মধ্যে প্রচলিত কাহিনী সীতারামের নিজজীবনের বিবরণের একমাত্র উপাদান। তাহার উপর বঙ্গদেশের ইতিহাস কয়েক পৃষ্ঠা মাত্র ষ্টুয়ার্ট (তস্য পিতা রিয়াজ-উস্-সলাতীন, তস্য পিতা সলিমুল্লার তারিখ-ই বাংগালা) হইতে লইয়া বঙ্কিম নিজ কাহিনী পূর্ণ করিয়াছেন।"

রচনাকাল ঃ বঙ্কিমচন্দ্র যখন হাওড়ায় ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে কাজ করছিলেন, সে সময় তিনি বেশির ভাগ কলকাতাতেই থাকতেন এবং এখানেই 'সীতারাম' গ্রন্থটি লিখিত হয়েছিল বলে মনে হয়।

প্রথম প্রকাশ ঃ বঙ্কিমচন্দ্র-পরিচালিত 'প্রচার' পত্রিকার ১ম সংখ্যা (১২৯১, শ্রাবণ) থেকেই ধারাবাহিকভাবে 'সীতারাম' উপন্যাস প্রকাশিত হতে থাকে। ১২৯৩ সালের মাঘ সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত হয়ে তবে শেষ হয়। মাঝে কয়েক সংখ্যা বাদ ছিল।

গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ ঃ 'সীতারাম' উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১২৯৩ সালের ১৭ই ফাল্গুন (মার্চ ১৮৮৭), পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ৪১৯। মূলতঃ এটি 'প্রচারে' প্রকাশিত উপন্যাসেরই পুনর্মুদ্রণ। গ্রন্থখানি তিনি উৎসর্গ করেন—রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে। উৎসর্গপত্রটি এরূপ—"সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত,/সর্ব্বগুণের আধার,/সকলের প্রিয়,/আমার বিশেষ স্নেহের পাত্র,/৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের/স্মরণার্থ/এই গ্রন্থ/উৎসর্গ করিলাম।"

গ্রন্থের প্রথমে গীতার শ্লোক উদ্ধৃত ক'রে তিনি এই গ্রন্থ-রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাষ দান করেন। শ্লোকগুলি পুনরুদ্ধৃত হল।

অর্জ্জুন উবাচ

জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দ্দন।
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব॥
ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্॥

শ্রীভগবানুবাচ

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাঙ্খ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্ ॥
ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥
নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযমস্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥
যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥
নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ ॥
যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচার ॥ গীতা ।৩।১—৯।
ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥
রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ গীতা ।২।৬২—৬৪।

প্রথম সংস্করণের 'বিজ্ঞাপনে' বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন—"সীতারাম ঐতিহাসিক ব্যক্তি। এই গ্রন্থে সীতারামের ঐতিহাসিকতা কিছুই রক্ষা করা যায় নাই। গ্রন্থের উদ্দেশ্য ঐতিহাসিকতা নহে। যাঁহারা সীতারামের প্রকৃত ইতিহাস জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা Westland সাহেবের কৃত যশোহরের বৃত্তান্ত, এবং Stewart সাহেবের কৃত বাঙ্গালার ইতিহাস পাঠ করিবেন।"

বিভিন্ন সংস্করণ: বঙ্কিমের জীবিতকালে গ্রন্থটির তিনটি সংস্করণ হয়। ১২৯৫ সালে দ্বিতীয় সংস্করণে পৃষ্ঠা-সংখ্যা কমে গিয়ে দাঁড়ায় ৩০০-তে। এই সংস্করণের বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন—"সীতারামের কিয়দংশ পরিত্যক্ত এবং কিয়দংশ পরিবর্ত্তিত হইল। গ্রন্থের আকার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইল, এজন্য ইহার দামও কমান গেল।"

তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩০১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে (১৮৯৪, মে), পৃষ্ঠা ৩২২।

পাঠভেদ : 'প্রচারে' প্রকাশিত এবং বিভিন্ন সংস্করণে যে পরিবর্তন সাধিত হয়, তার মূল সূত্রগুলি এখানে প্রকাশিত হল।—

(ক) প্রচারের 'ভৈরবী' উপন্যাসে 'সন্ন্যাসিনী' হয়েছে।

(খ) গঙ্গারামের উদ্ধারকার্যে সীতারাম অনেক ক্ষিপ্র হয়েছেন এবং অনেক ঘটনারও পরিবর্তন করা হয়েছে।

(গ) 'প্রচারে' সীতারামের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ফকিরের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

(ঘ) এছাড়া, ছোটখাট আরো অনেক পরিবর্তনে উপন্যাসটি সুন্দর হয়েছে।

(দ্রঃ প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত—উপন্যাস-সাহিত্যে বঙ্কিম, ৫৩৫—৫৫৩ পৃঃ।)

রূপান্তর : 'সীতারাম' উপন্যাসের বিভিন্ন রূপান্তর সাধিত হয়।

ইংরাজী অনুবাদ—শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৯০৩)—কলকাতা।

কানাড়ী অনুবাদ—বি. বেঙ্কটাচার্য (১৯০১)—মহীশূর।

তামিল অনুবাদ—এস. টি. পিলাই (১৯১০)—মাদ্রাজ।

নাট্যরূপ—গিরিশচন্দ্র ঘোষ কৃত ও বসুমতী কার্যালয় থেকে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৭শে অক্টোবর প্রকাশিত।

এছাড়াও, পরবর্তী কালে আরও বহুভাবে রূপান্তরিত হয়েছে।

কাহিনী : রাজা সীতারাম রায়ের তিন স্ত্রী—শ্রী, নন্দা ও রমা। কিন্তু বিবাহের পরই শ্রীর সঙ্গে সীতারামের সম্পর্ক ছেদ হয়। একদিন শ্রী তাঁর ভ্রাতা গঙ্গারামের বিপদ্ দেখে সীতারামের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। সীতারাম দীর্ঘদিন পরে শ্রীর সৌন্দর্য-দর্শনে মুগ্ধ হলেন এবং গঙ্গারামকে মুসলমান বিচারকদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য অগ্রসর হলেন। এর ফলে সীতারামের সঙ্গে মুসলমানদের বিরোধ বেধে উঠল। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত সীতারাম গঙ্গারামকে উদ্ধার করতে সমর্থ হলেন। কিন্তু শ্রীকে ধরে রাখতে পারলেন না। শ্রী সীতারামের অন্তরে রূপের আগুন জ্বালিয়ে কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। শ্রীর ভাগ্যে আছে তিনি তাঁর প্রিয়জনের প্রাণহানির কারণ হবেন ; তাই তাঁর সর্বদাই প্রিয় স্বামীর কাছ থেকে পলায়নের চেষ্টা।

শ্রীর সঙ্গে জয়ন্তী নামে এক সন্ন্যাসিনীর সাক্ষাৎ হল। সেই সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে তিনি বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করতে লাগলেন। এদিকে সীতারাম রাজা হিসাবে দিল্লীশ্বরের অনুমতি আনতে গঙ্গারামের উপর নগর-রক্ষার ভার দিয়ে দিল্লী যাত্রা

করেছেন। সীতারামের স্ত্রী রমা অত্যন্ত দুর্বলচিত্ত। পাছে শত্রুরা আক্রমণ করে, সেই আশঙ্কায় তিনি প্রায়ই রাত্রে গঙ্গারামকে গোপনে নিজের ঘরে ডেকে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। গঙ্গারামের মনেও ক্রমে ক্রমে রমার রূপরাশি পাপবাসনার জাল বিস্তার করতে লাগল। গঙ্গারাম রমাকে লাভ করার জন্য সীতারামের অনুপস্থিতিতে মুসলমানদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে রাজধানী আক্রমণ করানোর ব্যবস্থা করতে লাগল। মুসলমান সৈন্য সীতারামের রাজধানীর পতন ঘটানোর শেষ মুহূর্তে সন্ন্যাসিনী জয়ন্তীর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে ও সীতারামের উপস্থিতিতে রাজধানী রক্ষা হল।

এমনিভাবে বাইরের আক্রমণ রোধ হল বটে, কিন্তু সীতারামের পারিবারিক জীবনে এক বিপর্যয় দেখা দিল। রমার সঙ্গে গঙ্গারামকে মিলিয়ে কলঙ্কের বোঝা চাপানো হতে লাগল। সীতারাম নিরপেক্ষ বিচারে বসলেন। রাজরানীকে জনসাধারণের সমক্ষে বিচারার্থ এনে দাঁড়াতে হল। শেষ পর্যন্ত জয়ন্তীর চেষ্টায় গঙ্গারাম অপরাধ স্বীকার করল। গঙ্গারাম রাজধানী ছেড়ে চলে গেল। রমা কলঙ্কের হাত থেকে মুক্তি পেলেন বটে, কিন্তু তাঁর অন্তরের জ্বালা ক্রমে ক্রমে তাঁকে মৃত্যুপথে ঠেলে দিল।

সীতারাম তখন শ্রীর জন্য উন্মাদ। শ্রীকে তিনি স্বতন্ত্র স্থানে রেখে তাঁর রূপদর্শন করতে লাগলেন। কারণ, শ্রী ঈশ্বরে নিজেকে সমর্পণ করেছেন, সীতারামের কাছে আর তিনি ফিরতে পারেন না। কিন্তু কেবলমাত্র রূপদর্শনে ও বাসনার অতৃপ্তিতে সীতারামের চূড়ান্ত অবনতি ঘটতে লাগল। রাজ্য ও রাজকার্য রসাতলে যেতে বসলো। তিনি এমন নীচে নেমে গেলেন যে, তাঁর সমস্ত রাগ যখন সন্ন্যাসিনী জয়ন্তীর উপর গিয়ে পড়ল, তখন তাঁকে জনসমক্ষে বিবস্ত্রা করতেও তাঁর বিবেকে বাধল না। তখন নন্দা-ই জয়ন্তীকে তথা সীতারামকে বাঁচালেন।

শেষ পর্যন্ত পুনরায় মুসলমান আক্রমণ হল। শ্রী সীতারামকে সাহায্য করতে অগ্রসর হলেন। সামনে শ্রী ও জয়ন্তীকে রেখে তাঁরা শত্রুসেনার মধ্য থেকে বেরিয়ে যেতে চাইলেন। একটি কামান সীতারামকে তাক্ করলে, শ্রী আগে নিজে মরার জন্য বুক পেতে দিলেন। ফলে, সে ব্যক্তি কামান দাগতে পারল না। সীতারাম তার মাথাটি স্কন্ধচ্যুত করলেন। পরে শ্রী জানতে পারলেন—এই ব্যক্তি তাঁরই ভ্রাতা ছদ্মবেশী গঙ্গারাম। এমনিভাবে প্রিয় ভ্রাতার মৃত্যুর কারণ হয়ে তাঁর ভাগ্যের লিখন ফললো।

সীতারাম ও শ্রীর পরবর্তী কালের সঠিক ইতিহাস বর্ণিত হয়নি। কেবলমাত্র গ্রামবাসীদের কথোপকথনের দ্বারা তাঁদের বিপর্যয়ের আভাষ দান করা হয়েছে।

কাহিনী বিচার: 'সীতারাম' উপন্যাসের কাহিনী মোট তিনটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ড 'দিবা—গৃহিণী', দ্বিতীয় খণ্ড 'সন্ধ্যা—জয়ন্তী' ও তৃতীয় খণ্ড 'রাত্রি—ডাকিনী'

নামের দ্বারা সীতারামের জীবনেরই তিনটি স্তরকে চিহ্নিত করা হয়েছে। সীতারামের জীবনের কর্মময় দিবাভাগ শ্রীর সুগৃহিণীত্ব লাভ করতে পারলে ধন্য হত। কিন্তু জয়ন্তীর প্রভাবে শ্রীর অধ্যাত্মচেতনা সীতারামের মনে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে তুলেছে। শেষ পর্যন্ত শ্রী ডাকিনার মতই সীতারামের সামনে রূপজাল বিস্তার ক'রে অথচ অধরা থেকে তাঁর জীবনে রাত্রির অমানিশা ডেকে এনেছেন।

কাহিনী অংশে সীতারামের ঐতিহাসিক কার্যকলাপ অপেক্ষা তাঁর গৃহ-জীবনের স্বরূপ উদ্ঘাটনের দিকেই বঙ্কিমের লক্ষ্য ছিল বেশি। তবে তার আনুষঙ্গিক ঐতিহাসিক উপকরণকে বঙ্কিম অবহেলা করেননি। উপন্যাসে জয়ন্তী ও গঙ্গারামের দ্বারা স্বতন্ত্র কাহিনী বয়নের সম্ভাবনা থাকলেও, বঙ্কিম তাকে উপকাহিনীতে পরিণত হতে দেননি। তাই সীতারাম উপন্যাসের কাহিনী এক অখণ্ড বন্ধনে আবদ্ধ।

ঐতিহাসিকতা ঃ 'সীতারাম' উপন্যাসের একটি ঐতিহাসিক পটভূমিকা রয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র এই অংশের তথ্যের জন্য Westland এবং Stewart-এর বর্ণনা দেখতে বলেছেন। কৌতূহলী পাঠকের জন্য তা উদ্ধার করা হল। স্টুয়ার্ট-বর্ণিত কাহিনীর অংশবিশেষ :—

"...a person of an illustrious family, named Syed Aboo Turab, having, through the interest of one of the viziers, obtained the office of Foujedar of Bhoosnah in Bengal, adjacent to which resided a refractory zemindar, named Sittaram, who kept in his pay a band of robbers, with whom he used to infest the roads and plunder the boats on the rivers, and even carry off the cattle from the villages, setting at defiance the power of the Foujedar—to extirpate this public depradator, Aboo Turab applied for assistance to the Nawab ; but, instead of affording him the required aid, he was supposed, in an underhand manner, to countenance and encourage Sittaram.

At length the Foujedar, finding he had nothing to expect from the governor, took into his own pay an Afghan officer, named Peer Khan, with 200 of his followers, well-mounted and armed, and sent him to beat up the quarters of the depradator ; but Sittaram, having intelligence of the circumstance, moved to

another part of the country, where by chance he fell in with the Foujedar, who was amusing himself in hunting, and attended by a very small escort The robbers immediately attacked the Foujedar and his party, and, before their chief came up, killed Aboo Turab. When Sittaram found that it was the Foujedar he had slain, he much regretted the circumstance, and told his followers that the Nawab would certainly revenge the insult offered to his government, by flaying them alive, and by desolating the pergunnah of Mahmoodabad : he then respectfully delivered the body to the Foujedar's attendants, who carried it to Bhoosnah, and interred it in the vicinity of that town.

When the Nawab received intelligence of the murder of Aboo Turab, he was greatly alarmed, being apprehensive of having incurred the displeasure of the emperor by his neglect of so respectable a person ; and who he knew had many friends about the court, who would not fail to represent the state of the case He therefore appointed Bukhsh Aly Khan to succeed the deceased ; and sent with him a considerable force, with instructions to seize Sittaram and all his party. Orders were also issued to all the neighbouring Zemindars, to assi in seizing the offender ;......the Zemindars raised their posse comitatus and hemmed the robbers in one every side, until Bukhsh Aly Khan arrived, who seized Sittaram, his women, children and accomplices, and sent them in irons to Moorshudabad, where Sittaram and the robbers were impaled alive, and the women and children sold as slaves."

Stewart : *History of Bengal* (Edited by Mouat), Pp. 239-40.

বাংলা—"ভূষণার ফৌজদার ছিলেন সৈয়দ আবু তোরাব। নিকটে সীতারামের জমিদারি। সীতারামের অধীনে একদল ডাকাত থাকে। ডাকাত অনুচরদের সাহায্যে তিনি রাহাজানি করেন এবং নৌকার উপর চড়াও হন। গ্রাম হতে গরু-বাছুর নিয়ে

কখনও পলায়ন করেন। জনগণের অনিষ্টকারী এই দস্যুসর্দার সীতারামকে দমন করার জন্য নবাবের সাহায্য প্রার্থনা করেন তোরাব, কিন্তু সে সাহায্য তিনি প্রাপ্ত হন না। অবশেষে ফৌজদার নবাবের নিকট সাহায্য না পেয়ে পীর খাঁ নামক এক আফগান সেনাপতিকে দুইশত সশস্ত্র সৈনিকসমেত সীতারামকে ধরার জন্য প্রেরণ করেন। এই খবর পেয়ে সীতারাম দেশের অন্যত্র গমন করেন। সেখানে ছোট একটি দল নিয়ে ফৌজদার নিজে শিকার করতে গিয়েছিলেন। সীতারামের অনুপস্থিতিতে তাঁর দল তোরাবের উপর চড়াও হয় এবং তোরাবকে হত্যা করে। সীতারাম যখন দেখেন যে, ফৌজদার নিহত হয়েছেন, তখন তিনি অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েন। কারণ, নবাব এই সংবাদে সীতারামের উপর আক্রমণ করবেন। সীতারামের মহম্মদাবাদ পরগনা ধ্বংস ক'রে দেবেন। সীতারাম শ্রদ্ধাসহকারে তোরাবের মৃতদেহ তাঁর অনুচরদের হস্তে সমর্পণ করেন। তোরাবের অনুচররা সেই মৃতদেহ সম্মানসহকারে ভূষণায় নিয়ে গিয়ে শহরের প্রান্তে কবরস্থ করেন। নবাব যখন আবু তোরাবের মৃত্যুসংবাদ পান, তখন তিনি বক্সী আলি খাঁকে তোরাবের স্থলে নিযুক্ত ক'রে সীতারামকে সদলবলে ধরার নির্দেশ দেন। সীতারাম তাঁর স্ত্রী-পুত্র এবং দস্যুদল সমভিব্যাহারে ধৃত হন। তাঁদের শৃঙ্খলিত অবস্থায় মুর্শিদাবাদে নিয়ে যাওয়া হয়। সীতারাম ও দস্যুদের জীবন্ত প্রোথিত করা হয়। স্ত্রী-পুত্রদের দাসদাসীতে রূপান্তরিত করা হয়।"

(শ্রীসুধাকর চট্টোপাধ্যায়—"কথা-সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র")

ওয়েস্টল্যাণ্ড-বর্ণিত কাহিনীর অংশবিশেষ :—

"The Zemindari of Bhusna came whether by heredity descent or by some other means, into the hands of Raja Sittaran Roy. The Zemindari he held for fourteen years, during which time he built Muhammadpur for his capital, and adorned it with many fine buildings and tanks,......Before his time Muhammadpur was not in existence, and its site was a mere rice plain, the capital being then probably Bhusna, on the other side of what is now the Madhumati, what was then only a small Khal, the Alangkhali. At the beginning of the century, Muhammadpur was one of the chief towns in the district; it was in fact only of late years, that is, since 1836, that it has fallen from its high estate.

Of the origin of Sittaram Roy more than one story is current. The first story I shall narrate runs this :—

On the other side the present Madhumati River there is a Village, Hariharnagar. In this village Sittaram had a taluq. He held also a jumma in another village, Shyamnagar, close to the present Muhammadpur. One day he was riding across from his village, Hariharnagar, to see the jumma, when his horse's feet so stuck in the mud that it could not be got out. So he made some men dig up the ground so as to extricate the horse's feet, and in so doing they came upon a trishul or Hindu trident. Digging still further, they found it was the pinnacle of a temple which they accordingly proceeded to dig up. Inside the temple they found the idol Lakshmi Narayan......

Lakshmi Narayan is the God of good fortune; and when Sittaram was, in the manner just described, proclaimed the favourite of the gods, he was not long in finding adherents. He was himself an uttar rāre kayath (an upcountry kayath by caste), and ever so many upcountrymen flocked to him. He either received them, or he previously had in his service a certain giant, a mighty son of valour, named Menahati, from his elephantine strength; and this Menahati was, or became, the leader of a troop of fighting men.

Sittaram, strengthened by this accession, now planted himself at the place where Lakshmi Narayan had appeared......With the aid of his little army he commenced a war of aggression upon the possessors of the Bhusna Zemindari, and having obtained the Zemindari, fortified himself in it, refused to pay rents to the nawab and lived in magnificence on the produce of his lands.

......I consider the above story a mere dilution of the original

legend, which I am about to relate, and which is probably nothing more than an embellishment of the truth.

In this part of the coutry there were twelve provinces, and the rajahs of these twelve provinces were (as was much the custom in those days) rather remiss in sending to the emperor, or his nawab at Dacca the revenues assessed upon their lands. Sittaram was accordingly deputed by the emperor of Delhi to "investigate" the matter by force of army, and this duty he performed with such effect that he not only turned the twelves rajahs out of possession, but installed himself as lord of their domains. The nawab now demanded from Sittaram the revenues due upon his lands, but Sittaram refused to acknowledge his authority. He held his land from the emperor above, and to the emperor alone would he pay his rents......

Of Sittaram's history after his acquisition of the Zemindari the legend has only one form. The nawab being refused his revenues, levied war against Sittaram ; but the latter, who had fortified himself in Muhammadpur, and gathered around him many soldiers and servants, chief of whom were Menahati,...... Bakhtyar Khan, Muchra Singh, and Ghabar Dalan, was able to hold his own against the nawab's men..

Then the nawab sent against him his son-in-law, Abu Tarab, and he had a battle with Sittaram's men ; but again the redoubtable Menahati was victorious having slain Abu Tarab with his own hand.

So the nawab now sent a more formidable force under his great general Singharam Sha ; and he came to Bhusna and established his camp there. Profiting by the experience of his predecessors, he resolved to get Menahati into his power first before making any attack. Watching for his opportunity he at

last captured him as he was passing the dhol mandir in the morning......Another account says that, receiving information from a spy, he secretly crossed the river at night, and captured Menahati sleeping at the 'Lion gate' which was......the entrance to Sittaram's citadel, and close to the dhol mandir.

Menahati who was thus caught unarmed was bound by his capturers, who kept him for seven days, belabouring him with sticks and hacking him, with swords. Menahati kept continually about him a wondrous drug which was bound under the skin in front of his right shoulder, and its virtue was such that though it could not prevent him from feeling the pain of blows, it rendered his body impenetrable to stick and sword. Wearied, however, with the continual assaults......and willing rather to suffer death than a life with such pain, he at last confessed the secret of the drug. The influence of it could be got rid of by taking him to the bank of the Ram Sagar......plucking it from his arm, and throwing it into the water of the tank. So they did, and so Menahati died.

When Sittaram heard of the capture and death of his faithful general, he knew that his time too was come. He accordingly went and surrendered himself, or, more likely, was carried captive, to the nawab of Dacca, who locked him up in prison. He lingered there for a little time, but at last, when an officer of the nawab came to him and told him that there was no hope, and he was sure to be hanged, he sucked poison from a ring which Hannibal-like, he kept against such emergencies, and so he died. The nawab sent for Sittaram to his darbar, but found that he had placed himself beyond his power.

There is some confusion here between the nawab at Dacca and the nawab at Moorshidabad. It is however excusable, seeing

that these events occurred at the very latest, about 1712 or 1714 A. D. less than ten years after the transfer of the nawab's capital from Dacca to Moorshidabad."

J. Westland : *A Report of the District of Jessore*, Pp. 25—28.

বাংলা—"ভূষণার জমিদারি উত্তরাধিকারসূত্রে অথবা অন্য কোন উপায়ে রাজা সীতারাম রায় প্রাপ্ত হন। চৌদ্দ বৎসর ধরে তিনি জমিদারি রক্ষণ করেন, বহু অট্টালিকা সরোবরে সুশোভিত ক'রে মহম্মদপুরকে রাজধানী করেন। তাঁর পূর্বে মহম্মদপুরের কোন অস্তিত্ব ছিল না।.........সীতারামের উদ্ভব সম্বন্ধে একাধিক কাহিনী প্রচলিত আছে। প্রথম কাহিনীটি এইরূপ। মধুমতী নদীর অপর পারে হরিহরনগর নামে একটি গ্রাম আছে। এই গ্রামে সীতারামের তালুক ছিল। বর্তমান মহম্মদপুরের নিকটবর্তী শ্যামনগরে সীতারামের জমা ছিল। একদিন তিনি অশ্বারোহণে হরিহরনগর হতে জমার দিকে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর ঘোড়ার পা কাদায় আটকে যায়। ঘোড়ার পা কাদা হতে তুলতে না পারায় সেখানকার মাটি খোঁড়ার ব্যবস্থা করা হয়। খুঁড়তে খুঁড়তে একটি মন্দিরের মাথার ত্রিশূল এবং মন্দিরের লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ পাওয়া যায়। লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ-প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সীতারাম নিজেকে 'দেবকুলপ্রিয়' বলে উল্লেখ করেন। অবিলম্বে অনেকে তাঁর আনুগত্য গ্রহণ করেন। সীতারাম নিজে উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থ ছিলেন। এখন নানা দিক হতে উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থ তাঁর চতুর্দিকে এসে হাজির হন। অপরিসীম শক্তিশালী মেনাহাতি (হাতির মত শক্তিশালী মেনা বা মৃন্ময়) তাঁর প্রধান সেনাপতি হন। সীতারাম তাঁর ক্ষুদ্র সৈন্যদলের সাহায্যে ভূষণার জমিদারি অধিকার করেন। চারিদিক দৃঢ়ভাবে রক্ষার ব্যবস্থা করেন। নবাবকে কর দিতে অস্বীকার করেন।......

ওয়েস্টল্যাণ্ড মনে করেন, "উদ্ধৃত ঘটনা আসল ঘটনার অলঙ্কৃত রূপমাত্র। আসল ঘটনাটি হল, তখনকার দিনে বাংলাদেশের এই অংশ বারোটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। এই বারোটি প্রদেশের রাজারা করদানের বিষয়ে শৈথিল্য প্রকাশ করায় দিল্লীর বাদশাহ সীতারামকে ক্ষুদ্র সৈন্যদলের অধিকর্তা ক'রে এই বিষয়ে তদারকির ভার দেন। সীতারাম তাঁর কার্য এরূপভাবে সম্পন্ন করেন যে, এই বারো রাজা কেবল উৎখাত হন না, সীতারাম নিজেকে সকলের ভূখণ্ডের উপরে প্রতিষ্ঠিত করেন। নবাব সীতারামের নিকট কর চান। কিন্তু সীতারাম তাঁর প্রভুত্ব স্বীকার করতে অস্বীকার করেন। নবাব সীতারামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। সীতারাম মহম্মদপুরকে সুরক্ষিত ক'রে অনেক সৈন্য এবং অনুচরের দ্বারা মহম্মদপুর রক্ষার ব্যবস্থা করেন। প্রধান সেনাপতিদের

মধ্যে মেনাহাতির নাম উল্লেখযোগ্য। নবাব যুদ্ধে সফল না হ'য়ে জামাতা আবু তোরাবকে সীতারামের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। দুর্ধর্ষ মেনাহাতি যুদ্ধে জয়লাভ করেন এবং আবু তোরাবকে স্বহস্তে হত্যা করেন। নবাব এইবার অনেক সৈন্য সমভিব্যাহারে বিখ্যাত সেনাপতি সিংহরাম শাকে প্রেরণ করেন। মেনাহাতি ধৃত হন এবং তাঁর মৃত্যু ঘটে। সীতারাম মেনাহাতির মৃত্যুতে ভগ্নহৃদয়ে আত্মসমর্পণ করেন অথবা খুব সম্ভবতঃ বন্দী অবস্থায় নবাবের নিকট নীত হন। নবাব তাঁকে কারাগারে প্রেরণ করেন। বন্দী অবস্থায় বিষপূর্ণ অঙ্গুরীয়কের সাহায্যে সীতারাম আত্মহত্যা করেন।"

(সুধাকর চট্টোপাধ্যায় : কথা-সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র)

"এই কাহিনীর সহিত উপন্যাসে বর্ণিত কাহিনীর নিম্নলিখিত সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য লক্ষণীয় :

১। শ্যামনগর গ্রাম উপন্যাসে শ্যামপুর নামে অভিহিত হইয়াছে এবং এই গ্রামই সমৃদ্ধিলাভ করিয়া সীতারামের রাজধানী মহম্মদপুরে পরিণত হইয়াছে। ওয়েস্টল্যাণ্ডের কাহিনীতে মহম্মদপুর পূর্বে ধানের ক্ষেত ছিল।

২। উভয় কাহিনীতেই যুদ্ধক্ষেত্রে মেনাহাতির (উপন্যাসের 'মৃন্ময়') হস্তে আবু তুরাবের (উপন্যাসের তোরাব্ খাঁ) মৃত্যুর উল্লেখ রহিয়াছে।

৩। ওয়েস্টল্যাণ্ড সাহেবের কাহিনীতে মেনাহাতি অতর্কিতে শত্রু কর্তৃক ধৃত হন, বঙ্কিম এই কাহিনীর উপর ঈষৎ রং ফলাইয়া লিখিয়াছেন, 'প্রাতে উঠিয়াই মৃন্ময় সংবাদ শুনিলেন যে, মুসলমান সেনা মহম্মদপুর আক্রমণে আসিতেছে—আগতপ্রায়—প্রায় গড়ে পৌছিল। সংবাদ পাইবামাত্র মৃন্ময় সবিশেষ জানিবার জন্য স্বয়ং অশ্বারোহণ করিয়া যাত্রা করিলেন। কিছুদূর গিয়া মুসলমান সেনার সম্মুখে পড়িলেন। তিনি পলাইতে জানিতেন না, সুতরাং তাহাদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া [illegible]ত হইলেন।' ওয়েস্টল্যাণ্ডের গ্রন্থে মেনাহাতির রক্ষাকবচের যে আজগুবী কাহিনী [illegible] হইয়াছে বঙ্কিম তাহা সম্পূর্ণ বাদ দিয়াছেন।

৪। বঙ্কিমের সীতারাম শত্রুর নিকট আত্মসমর্পণ করেন নাই অথবা শত্রু কর্তৃক বন্দী হন নাই। তিনি শেষ মুহূর্তে তোপের সাহায্যে পথ করিয়া লইয়া 'নিজ মহিষী ও পুত্র কন্যা ও হতাবশিষ্ট সিপাহীগণ লইয়া মুসলমানকটক কাটিয়া বেবিশূন্য স্থানে উত্তীর্ণ হইলেন।' বঙ্কিমের এই কাহিনী অনৈতিহাসিক এবং সম্পূর্ণ কাল্পনিক।

৫। কাজীর আদালতে গঙ্গারামের বিচারের প্রহসন এবং ইহার সূত্র ধরিয়া ফৌজদারের সিপাহীর সহিত সীতারামের সঙ্ঘর্ষ, সীতারাম ও শ্রীর প্রণয়কাহিনী, গঙ্গারামের বিশ্বাসঘাতকতা ও তাহার বিচার সম্পূর্ণ কাল্পনিক কাহিনী।"

(প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত : উপন্যাস-সাহিত্যে বঙ্কিম)

আসল কথা, বঙ্কিম ইতিহাসকে কোথাও গুরুতরভাবে লঙ্ঘন করেননি, কিন্তু ইতিহাসের উপাদানে জীবনকাহিনী বর্ণনাই ছিল তাঁর মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়।

উদ্দেশ্য ঃ 'সীতারাম' উদ্দেশ্য-প্রণোদিত রচনা। প্রচারের প্রথম সংখ্যায় 'সীতারাম' প্রথম প্রকাশিত হয়। সেই সংখ্যাতেই বঙ্কিমের দুটি প্রবন্ধ 'বাঙ্গালার কলঙ্ক' ও 'হিন্দুধর্ম'-এর মধ্যে উপন্যাসের উদ্দেশ্যটিও প্রকাশিত। 'বাঙ্গালার কলঙ্ক' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালীর বাহুবলের অভাবের কলঙ্কের কথা আলোচনা করেছেন। সীতারামকে দিয়ে বাঙালীর বাহুবলের অভাব মোচন করা হল। 'হিন্দুধর্ম'-এ বলা হয়েছে—যাতে জীবনের "শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক সর্ববিধ উন্নতি হয় তাহাই ধর্ম"। সীতারামের মধ্যে এই মানসিক উন্নতির অভাবই তাঁকে সর্বনাশের পথে টেনে নামিয়েছে।

মুসলমান সমাজ ঃ 'সীতারামে' অঙ্কিত কয়েকজন মুসলমানের চরিত্র নিকৃষ্টরূপে অঙ্কন করা হয়েছে বলে অনেকে বঙ্কিমকে মুসলমান-বিদ্বেষী বলে অভিযুক্ত করেন। কিন্তু তারই পাশাপাশি আর একজন মুসলমান ফকিরের উদার মতবাদ যে বঙ্কিমেরই সৃষ্টি, এ-কথা অভিযোক্তারা ভুলে যান কেমন ক'রে?

সুন্দরী সন্দর্শনে (কপাঃ ২/৩)। নবকুমারের মুখে কপালকুণ্ডলার প্রশংসা শুনে মতিবিবি তাকে দেখতে চাইল। নিরাভরণা কপালকুণ্ডলাকে মতিবিবি তার সমস্ত অলঙ্কারে সাজিয়ে দিল। এই ঘটনার সাদৃশ্যে মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র দ্বিতীয় সর্গ থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে—

"—ধর দেবি মোহন মূরতি
দেহ আজ্ঞা, সাজাই ও বরবপু আনি
নানা আভরণ!"

রাবণ মহাদেবের অনুগৃহীত। তাই রাবণকে বধ করতে হলে আগে মহাদেবকে সন্তুষ্ট করা দরকার। কিন্তু মহাদেব তখন কৈলাসশিখরে ধ্যানমগ্ন। পার্বতী মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করার জন্য রতিকে আহ্বান করলেন। রতি তখন দেবীকে এই কথা বলেন—আপনি মোহিনীমূর্তি ধারণ করুন, আজ্ঞা করুন, নানা আভরণ দিয়ে আপনার দেহখানি সাজিয়ে দিই।

সুবো (ইন্দিরা ৬ষ্ঠ পরিঃ)। কলকাতায় ইন্দিরা খুল্লতাতের কোন সন্ধান পেল না। তখন কৃষ্ণদাসবাবুর গৃহিণী সুভাষিণী বা সুবো নামে তাঁর এক বোনঝির সঙ্গে ইন্দিরার পরিচয় করিয়ে দিলেন। সুভাষিণীর শ্বশুরবাড়ীতে ইন্দিরার ঝি-গিরি করা স্থির হল।

সূর্যমুখী ও কমলমণি (বিষঃ ২৭ পরিঃ)। কমলমণি সূর্যমুখীকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সূর্যমুখীর যে ব্যথা কোথায় কমলমণি তা বুঝেছে। কমলমণি সূর্যমুখীর শয্যাগৃহে একখানি পত্র পেল। তাতে জানতে পারল—সে গৃহত্যাগ করেছে।

সূর্যমুখীর পত্র (বিষঃ ১১ পরিঃ)। সূর্যমুখী কুন্দ এবং নগেন্দ্রের ক্রম-বর্ধমান অনুরাগ সম্বন্ধে সন্দেহ ক'রে কমলমণিকে পত্র প্রদান করেছে।

সূর্যমুখীর সংবাদ (বিষঃ ৩৭ পরিঃ)। নগেন্দ্র সূর্যমুখীর সংবাদ নিতে এসে জানতে পারলেন যে, সূর্যমুখী গৃহদাহে পুড়ে মরেছে। নগেন্দ্র সংবাদ শুনে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

স্তূপশিখরে (কপাঃ ১/৪)। নবকুমার এক বালুকাস্তূপের উপর আলো দেখতে পেলেন। কাছে গিয়ে দেখেন এক ভীষণদর্শন কাপালিক। এখানে বঙ্কিমচন্দ্র 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র পঞ্চম সর্গ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

"—সবিস্ময়ে দেখিলা অদূরে,
ভীষণ-দর্শন মূর্তি।"

মেঘনাদকে হত্যার পূর্বে লক্ষ্মণ স্বপ্নে আদিষ্ট হলেন তাঁকে লঙ্কার উত্তরদ্বারে অবস্থিত চণ্ডীর পূজা করতে হবে। লক্ষ্মণ সেই মন্দিরের দ্বারে দেখলেন ভীষণদর্শন মহাদেব পাহারা দিচ্ছেন। কাপালিক ও মহাদেবের আকৃতিগত সাদৃশ্যের জন্যই এই উদ্ধৃতিচয়ন।

সেকালে যেমন ছিল (ইন্দিরা ২১ পরিঃ)। সেকালে কোন সম্পন্ন গৃহস্থবাড়ীতে জামাই এলে পাড়ার মেয়েদের কিরকম রঙ্গরসিকতা করবার ধূম পড়ে যেত, বঙ্কিমচন্দ্র ইন্দিরার স্বামীর আগমন-উপলক্ষ্যে তার কিঞ্চিৎ নমুনা দান করেছেন। 'ইন্দিরা' উপন্যাসটি বড় করবার সময় এই পরিচ্ছেদটি সংযোজিত হয়। পরিচ্ছেদটি উপন্যাসে অনেকটাই অবান্তর।

সে প্রয়োজন কি? (রাজঃ ৫.৫)। নির্মলকুমারী চঞ্চলের প্রাসাদে আসবার পথে এক বিখ্যাত জ্যোতিষীর কাছে গণনা ক'রে জানতে পারল, যদি সসাগরা পৃথিবী-পতির মহিষী এসে কোনদিন চঞ্চলকুমারীর সেবা করেন, তবে তাঁর বিবাহ হবে।

স্নেহশালিনী পিসী (রাজঃ ৪/৭)। মাণিকলালের অর্থলোলুপ স্নেহশালিনী পিসীর সাহায্যে নির্মল ও মাণিকের যথাশাস্ত্র পরিণয় সম্পাদিত হল।

হরণ ও অপহরণে দক্ষ মাণিকলাল (রাজঃ ৪/৫)। মাণিকলালের সঙ্গে নির্মলকুমারীর পথিমধ্যে সাক্ষাৎ ও হঠাৎ বিবাহের রসমধুর পরিচ্ছেদ। যুদ্ধের বিভীষিকার মধ্যে একটুখানি মিলনের মাধুর্য বেশ উপভোগ্য।

হরিদাসী বৈষ্ণবী (বিষঃ ৯ম পরিঃ)। জমিদার দেবেন্দ্র বিধবা কুন্দকে পাবার

আশায় হরিদাসী বৈষ্ণবী সেজে নগেন্দ্রের অন্তঃপুরে যাতায়াত আরম্ভ করল। কুন্দের শাশুড়ীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার একটি ঘটনা বানিয়ে বলে কুন্দকে বাইরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করল।

হারাণীর হাসিবন্ধ (ইন্দিরা ১২ পরিঃ)। হারাণী সুভাষিণীর বাড়ীর দাসী। হাসি তার রোগ। ইন্দিরার সে অনুরক্ত। কিন্তু ইন্দিরা যখন রমণবাবুর মক্কেলের কাছ থেকে কিছু খবর আনবার জন্য হারাণীকে বলল, তখন হারাণীর হাসি বন্ধ হল এবং ঘৃণার ভাব প্রকাশিত হল। অবশেষে সুভাষিণীর সাহায্যে হারাণীকে দিয়ে ইন্দিরার কার্যসিদ্ধি হল।

হাসে (চন্দ্রঃ ৩/৫)। শৈবলিনী নৌকায় উঠে জানাল যে, তার খিদে পেয়েছে। কিন্তু সে ব্রাহ্মণ ছাড়া কারো হাতে খাবে না। সুতরাং তাকে যে নৌকায় বন্দী প্রতাপ ছিল, সেখানে নিয়ে যাওয়া হল। শৈবলিনী ও প্রতাপ দুজনে গঙ্গাবক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়ে ইংরাজের হাত থেকে পলায়ন করল। হাসে—অর্থাৎ, এখানে শৈবলিনীর সহাস্যময় মূর্তি।

হীরা (বিষঃ ১৫ পরিঃ)। হরিদাসী বৈষ্ণবী পুরুষ না স্ত্রীলোক সে সম্বন্ধে সন্দেহ নিরসন করবার জন্য কমলমণি ও সূর্যমুখী হীরাকে বৈষ্ণবীর পশ্চাদনুসরণেব কাজে নিয়োজিত করল। হীরার কিছু পরিচয় দেওয়া হয়েছে এই পরিচ্ছেদে।

হীরার আয়ি (বিষঃ ৪১ পরিঃ)। হীরার বৃদ্ধ আয়ি নাতিনীর মস্তিষ্কবিকৃতির জন্য ডাক্তারের কাছ থেকে ওষুধ আনতে গিয়ে এ পরিচ্ছেদে কিঞ্চিৎ হাস্যরস বিতরণ করেছে।

হীরার কলহ—বিষবৃক্ষের মুকুল (বিষঃ ২১ পরিঃ)। হীরা ইচ্ছা ক'রে একজন দাসীর সঙ্গে কলহ সুরু করল। তার ফলে সূর্যমুখী যথার্থ বিচারে হীরাকে কর্মচ্যুত করলেন। হীরা নগেন্দ্রের কাছে গিয়ে সে-কথা বলতেই নগেন্দ্রের সুপ্ত সূর্যমুখী-বিদ্বেষ প্রকাশিত হয়ে পড়ল। সূর্যমুখী বুঝলেন কুন্দসর্বস্ব নগেন্দ্রকে কুন্দ ছাড়া কেউ শান্তি দিতে পারবে না। তাই তিনি কুন্দকে খুঁজে আনবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। এমনি-ভাবে নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর সুখের সংসাবে যে বিষবৃক্ষের বীজ রোপিত হয়েছিল, তার মুকুল দেখা দিল।

হীরার দ্বেষ (বিষঃ ২০ পরিঃ)। সূর্যমুখীর ঐশ্বর্যের ও প্রতিপত্তির জন্য হীরার হৃদয়ে তাঁর প্রতি যথেষ্ট দ্বেষ সঞ্চিত ছিল। কুন্দকে হাত ক'রে এখন সূর্যমুখীর প্রতিপত্তি নাশ করার সংকল্প করল হীরা।

হীরার রাগ (বিষঃ ১৯ পরিঃ)। দেবেন্দ্র যখন হীরাকে অর্থলোভ দেখিয়ে,

কুন্দকে বশ ক'রে দেবার কথা বললেন, তখন হীরার রাগ হল। কারণ, হীরার মনের গোপনে দেবেন্দ্রের প্রতি ভালবাসা সঞ্চিত হচ্ছিল।

হীরার বিষবৃক্ষ মুকুলিত (বিষঃ ৩৬ পরিঃ)। দেবেন্দ্র হীরার কাছ থেকে আঘাত খেয়ে প্রতিশোধ নেবার সংকল্প করলেন। তাই তিনি হীরার সঙ্গে প্রেমাভিনয় করতে লাগলেন। হীরাও সহজেই ধরা পড়ল। এমনিভাবে হীরার সর্বনাশের সূচনা হল।

হীরার বিষবৃক্ষের ফল (বিষঃ ৪০ পরিঃ)। হীরাকে উপভোগ করা হয়ে গেলে দেবেন্দ্র তাকে পরিত্যাগ করলেন। হীরা প্রথমে আত্মহত্যার সংকল্প করল। তারপর স্থির করল, হয় সে দেবেন্দ্র-বাঞ্ছিত কুন্দকে মারবে, নয় দেবেন্দ্রকে মারবে। সে এক চণ্ডালের কাছ থেকে বিষও সংগ্রহ করল।

হুকুম (চন্দ্রঃ ৬/২)। মহম্মদ তকি, যাঁর উপর দলনীর উদ্ধারের ভার ছিল, তিনি মিথ্যা ক'রে দলনীকে জানালেন যে, নবাবের হুকুম দলনীকে বিষপানে দেহত্যাগ করতে হবে। দলনী প্রিয়তম স্বামীব নিষ্ঠুর আদেশ অম্লানবদনে পালন করলেন।

হৃষীকেশ (মৃণাঃ ১/৬)। মৃণালিনীর গৃহস্বামী হৃষীকেশ মৃণালিনীর চরিত্র সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে তাকে বাড়ী থেকে বের ক'রে দিলেন।

হেতু—ধূমাৎ (মৃণাঃ ৩/৩)। গিরিজায়া হেমচন্দ্রের গৃহে পাহারা দিতে দিতে হেমচন্দ্রের সঙ্গে মনোরমার সম্পর্কটি নিজের মনেই গড়ে তুলতে লাগল। মৃণালিনী ও হেমচন্দ্রের প্রেম সম্পর্কের মধ্যে ধূমের সঞ্চার হতে লাগল। অথবা গিরিজায়া ধোঁয়া দেখে অগ্নি যে আছে সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হল।

অগ্নিবর্ণ (রাজঃ ৭/২)। পুরাণ-প্রখ্যাত রাজা। রমণী-রূপে আকৃষ্ট হয়ে তিনি উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করতেন। শেষ পর্যন্ত যক্ষ্মারোগে তাঁর মৃত্যু হয়। 'রাজসিংহ' উপন্যাসে নির্মলকুমারীর প্রতি ঔরঙ্গজেবের অনুরাগ প্রসঙ্গে এর তুলনা দেওয়া হয়েছে।

অঞ্জনা-নন্দন (রজনী ১/২)। হনুমানের কথা বলা হয়েছে। বিশ্বামিত্রের শাপে কুঞ্জতনয়া নামে এক বিদ্যাধরী বানরজন্ম গ্রহণ করেন। অঞ্জনা এরই কন্যা। সুমেরুর রাজা কেশরীর সঙ্গে অঞ্জনার বিয়ে হয়। কিন্তু পবন দেবতার বরে অঞ্জনার গর্ভে হনুমানের জন্ম হয়। তাই হনুমান পবনপুত্র বলেই খ্যাত। হনুমান ছিল অসীম শক্তিশালী বীর।

'রজনী' উপন্যাসে, লবঙ্গ তার বৃদ্ধ স্বামী রামসদয়কে ফুল দিয়ে সাজিয়ে যখন রতিপতির সঙ্গে তুলনা দিত, তখন আত্ম-সচেতন রামসদয় নিজের সঙ্গে 'অঞ্জনা-নন্দনে'র উপমাটি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করত।

অধিকারী (কপাঃ ১/৮)। কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে কাপালিকের হাত থেকে

রক্ষা ক'রে যে দেবালয়ে নিয়ে আসেন, ইনি সেখানকার অধিকারী। অধিকারীর বয়স পঞ্চাশ বছর অতিক্রম করেছিল, তাঁর মস্তক ছিল বিরলকেশ। এছাড়া, অধিকারীর নাম বা কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

অধিকারী কপালকুণ্ডলাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করতেন। কপালকুণ্ডলার অলৌকিক রূপরাশি তাঁর ধর্ম-সংস্কারবদ্ধ মনে দেবী-মহিমার সূচনা করেছে। কিন্তু কপালকুণ্ডলার প্রতি তাঁর যথেষ্ট পিতৃসুলভ স্নেহও বিদ্যমান ছিল। কাপালিকের হাত থেকে নবকুমারকে রক্ষা করায়, তিনি কপালকুণ্ডলার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। অবশেষে কপালকুণ্ডলার মঙ্গলের জন্যই ঘটকগিরি ক'রে নবকুমারের সঙ্গে বিবাহের ব্যবস্থা করেছেন। নবকুমারের সঙ্গে বিবাহের কথোপকথনে তিনি যেভাবে অগ্রসর হয়েছেন, তাতে ঘটকালির ব্যবসা এককালে তাঁর ভালই চলত মনে হয়। স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রেরও ঘটকগিরিতে যে কৃতিত্ব অসীম, তার পরিচয় রয়েছে সমগ্র উপন্যাসাবলীতে। তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসই নায়ক-নায়িকা-মিলনসঙ্কুল।

কপালকুণ্ডলা ও নবকুমারের বিবাহের আচার-অনুষ্ঠানে অধিকারী যতদূর সম্ভব হিন্দু শাস্ত্রকে অনুসরণ করেছেন। কপালকুণ্ডলার বিদায়ের কালে অধিকারী, দেবতার পূজার অর্থ থেকেই পাথেয় হিসাবে সঙ্গে দিয়ে দিয়েছেন। তারপর স্নেহার্ত পিতার মতো কন্যাকে শ্বশুরালয়ে পাঠিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করেছেন। কপালকুণ্ডলার পিতার অভাব পূরণ করেছেন এই অধিকারী। দেবস্থানের সঙ্গে সংযুক্ত থাকলেও, ইনি সাংসারিক জগৎ সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞ।

অনন্ত মিশ্র (রাজঃ ৩/২)। "অনন্ত মিশ্র, চঞ্চলকুমারীর পিতৃকুলপুরোহিত। কন্যানির্বিশেষে, চঞ্চলকুমারীকে ভালবাসিতেন। তিনি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত। সকলে তাঁহাকে ভক্তি করিত।"

চঞ্চলকুমারীর দৌতকার্যেই উপন্যাসে অনন্ত মিশ্রের প্রয়োজন। অনন্ত মিশ্র রসিকও বটেন। নিজ স্ত্রীর স্বভাব তিনি ভালোই জানেন। তাই স্ত্রী যখন দূরদেশে যেতে বাধা দিলেন, তখন অর্থলোভ দেখিয়ে শান্ত ক'রে তিনি রাজসিংহের কাছে যাত্রা করলেন। কিন্তু পথিমধ্যে দস্যুদলের কাছে চাতুরিতে তিনি হার মানলেন। ডাকাত-দলের হাতে তাঁর দুর্ভোগের একশেষ হল। কিন্তু তিনি এতই ভীতু যে, রাজার সিপাইদের আসতে দেখে প্রাণপণে পালাতে লাগলেন। তাঁকে দেখে মনে হয়—'দুর্গেশনন্দিনী'র গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ কি বুড়ো হয়ে গেল?

অভিরাম স্বামী (দুর্গেঃ ১/৫)। বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাসেই একটি ক'রে সন্ন্যাসী চরিত্র আছে। 'দুর্গেশনন্দিনী'র অভিরাম স্বামী চরিত্রে তার সূত্রপাত লক্ষ্য করা

যেতে পারে। কিন্তু পরবর্তী কালের সন্ন্যাসী চরিত্রের মতো এই চরিত্রে বঙ্কিম কোন অলৌকিকতা আরোপ করেননি। অভিরাম স্বামী সাধারণের মতোই দোষ-গুণাশ্রিত মানুষ। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে একবার মাত্র অভিরাম স্বামীর জ্যোতিষ গণনার কথা আছে। তিনি গণনা দ্বারা জানতে পেরেছেন যে, মুঘল সেনাপতি দ্বারা তিলোত্তমার অমঙ্গল হবে। তাই বীরেন্দ্রসিংহকে তিনি অনুরোধ জানিয়েছেন, মুঘলের সঙ্গে সন্ধি করতে। অবশ্য, শেষ পর্যন্ত তাঁর জ্যোতিষ গণনা ব্যর্থ হয়েছে। জগৎসিংহের সঙ্গে তিলোত্তমার মিলন ঘটেছে। অভিরাম স্বামী যে অনেককে শিক্ষাদান করতেন তারও নির্দেশ আছে।

এই অভিরাম স্বামী ছিলেন গড়-মান্দারণের অধিবাসী। তাঁর পূর্বনাম ছিল শশিশেখর ভট্টাচার্য। তিনি বিদ্যাশিক্ষা করলেও দুশ্চরিত্র ছিলেন। ঐ গ্রামের এক বিধবার সঙ্গে অবৈধ সংসর্গে তাঁর এক কন্যা জন্মে। সেই কন্যাই তিলোত্তমার মাতা। অপরদিকে গ্রামত্যাগের পর এক শূদ্রাণী কন্যার গর্ভে তাঁর আর এক কন্যার জন্ম হয়, তার নাম বিমলা। শশিশেখরের দুই কন্যাকেই বিবাহ করেন বীরেন্দ্রসিংহ। এমনিভাবে বঙ্কিম অভিরাম স্বামীর পূর্ব চরিত্রকে কলঙ্কিত ক'রে অঙ্কন করেছেন। যুবক বঙ্কিমের মনে সন্ন্যাসী-ভক্তিতে সংশয় ছিল বলেই বোধ হয় চরিত্রটি এরূপ হয়েছে।

এই উপন্যাসে অভিরাম স্বামী বীরেন্দ্রসিংহকে মন্ত্রণাদান করেছেন। তাছাড়া, শেষ দৃশ্যে জগৎসিংহকে আনয়ন ক'রে তিলোত্তমার সঙ্গে মিলিত করার কার্যও সাধন করেছেন তিনি। এই চরিত্রটির মধ্যে কখনও কঠোরতা, কখনও কোমলতার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে যথার্থ মানুষরূপে গড়ে তুলেছেন বঙ্কিমচন্দ্র।

অমরনাথ ঘোষ (রজনী ২/১)। 'রজনী' উপন্যাসের অমরনাথ ত্যাগে ও মহানুভবতায় একটি আশ্চর্যজনক চরিত্র। অমরনাথের বিদ্যা-বুদ্ধি, ঐশ্বর্য সবই ছিল, কিন্তু যৌবনে একটিমাত্র ভুলের জন্য তাঁকে বহুদিন ছন্নছাড়া জীবন যাপন করতে হয়। যৌবনে লবঙ্গলতার রূপে আকৃষ্ট হয়ে গোপনে তার গৃহে প্রবেশ করাতে, চপলা লবঙ্গলতার হাতে তাঁর লাঞ্ছনার চূড়ান্ত হয়। লবঙ্গলতা তপ্ত লৌহ শলাকা দিয়ে অমরনাথের পিঠে 'চোর' লিখে দেয়। সেই অপমান এবং কলঙ্কের বেদনা নিয়ে আর লবঙ্গলতাকে না পাওয়ার তৃষ্ণা নিয়ে তিনি পথে পথে ভবঘুরে জীবন যাপন করেছেন।

অমরনাথের এই পরিচয় উপন্যাসে বিবৃত হয়েছে মাত্র। কিন্তু আখ্যানভাগে তাঁর যে পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে, তার তুলনা নেই। পরোপকার-বৃত্তিতে অমরনাথের আগ্রহ প্রচুর। কোথাকার কে রজনী, তার সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য অমরনাথের চেষ্টার অন্ত নেই। রজনীকে দুষ্টলোকের হাত থেকে উদ্ধার ক'রে—তিনি তার বিষয়-সম্পত্তিও উদ্ধার করেছেন।

অমরনাথ জীবন্ত হয়েছেন প্রেমে। দীর্ঘকাল পরে ব্যর্থপ্রেমের স্মৃতি ভুলে গিয়ে তিনি রজনীর কানা চোখের প্রেমে পড়লেন। কিন্তু সেই প্রেমের সার্থক রূপায়ণের জন্য রজনীর উপকারের সুযোগ নিলেন না। রজনীর সম্পত্তির প্রতিও তাঁর কোন লোভ ছিল না।

অবশ্য, 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত অমরনাথের চরিত্র অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট ছিল। সেখানে রজনীর বিষয়-সম্পত্তি উদ্ধারের পরই অমরনাথ তাকে স্ত্রী বলে পরিচয় দিয়েছেন। তাছাড়া, একটু বড়মানুষীর ভাণও করেছেন। কারণ, তিনি ভেবেছিলেন, রজনী দরিদ্র, তাই বড়মানুষী চাল দেখে বোধ হয় একটু মুগ্ধ হবে। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় বঙ্কিম এ ত্রুটি সংশোধন করেছেন।

অমরনাথ লবঙ্গলতাকে একবার তাঁর পূর্বকাহিনী রজনীকে বলতে বারণ করেছেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর হৃদয়ের দেবতা জেগে উঠে তাঁকে প্রস্তুত করেছে রজনীকে সব কথা খুলে বলবার জন্য। রজনীকে তিনি যথার্থ ভালবাসলেও যখন তিনি জানলেন, রজনী শচীন্দ্রের প্রতি অনুরক্তা, তখন স্বেচ্ছায় দূরে সরে গেলেন। প্রথম যৌবনের বেদনা তীব্রতর হল শেষ বসন্তের আর এক আঘাতে। অমরনাথ আবার বেরুলেন পথে পথে। দীর্ঘকাল পরে ফিরে দেখলেন—না, তিনি হারিয়ে যাননি এ পৃথিবীতে, লবঙ্গলতার ইহকালে না হোক পরকালের স্বপ্নলোকে যেমন তিনি বেঁচে আছেন, তেমনি রজনী-শচীন্দ্রের উত্তরাধিকার 'অমরপ্রসাদে'র মধ্যে তাঁর আদর্শ বেঁচে আছে। অমরনাথের স্বার্থত্যাগের এটাই সবচেয়ে বড় পুরস্কার।

'লাস্ট ডে অফ পম্পাই' উপন্যাসে নিদিয়ার প্রেমজীবনের ব্যর্থতা 'রজনী' উপন্যাসের অমরনাথকে সৃষ্টি করেছে।

অমরপ্রসাদ (রজনী ৫/৪)। শচীন্দ্র ও রজনীর সন্তান। অমরনাথের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃই তারা পুত্রের এরূপ নাম দিয়েছিল।

অমলা (যুগঃ ৫ম পরিঃ)। অমলা গোপকন্যা। সে বিধবা। তার একটি কিশোরবয়স্ক পুত্র এবং কয়েকটি কন্যা। 'তাহার যৌবনকাল অতীত হইয়াছিল। সচ্চরিত্রা বলিয়া তাহার খ্যাতি ছিল।' রাজা মদনদেবের সঙ্গে যোগসাজসে সে হিরণ্ময়ীর মত ও স্বভাবাদির পরিচয় সংগ্রহ করেছে। অমলার কথাবার্তা সরল সাধারণ নারীর মতো হলেও চতুরতায় সে কম দক্ষ নয়।

অমলা (ইন্দিরা ৯ম পরিঃ)। ইন্দিরা যখন কলকাতায় আসছিল, তখন সাত আট বছরের দুটি বালিকার গঙ্গার ঘাটে গাওয়া 'বাজিয়ে যাব মল' গানটি ইন্দিরার মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল। অমলা ও নির্মলা সেই বালিকাদ্বয়ের নাম।

অমিয়ট (চন্দ্রঃ ২/৫)। অমিয়ট ঐতিহাসিক চরিত্র। কলকাতা কাউন্সিলের মধ্যে অমিয়ট-ই ছিলেন মীরকাশেমের সর্বাপেক্ষা বিরোধী। 'সয়ের মুতাক্ষেরিন' (Seir Mutaqherin) থেকে জানা যায়, মীরকাশেম-প্রদত্ত আদেশবলেই অমিয়টকে হত্যা করা হয়। (দ্রঃ Syed Gholam Hossein Khan's *Seir Mutaqherin* —Translated by M. Raymond under the pseudonym : Nota-Manus. Reprinted by D C. Kerr. Vol. II, Sec XI, Pp. 475-76, অথবা শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাশগুপ্তের 'উপন্যাস-সাহিত্যে বঙ্কিম', ৫৬৩—৬৫ পৃঃ।)

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে অমিয়টের ব্যক্তিগত জীবন অপেক্ষা ঐতিহাসিক দিকটিই প্রধান ক'রে তোলা হয়েছে। অবশ্য, শৈবলিনীকে হরণ করতে গিয়ে দলনীহরণ প্রভৃতি ঘটনা দ্বারা উপন্যাসের কাল্পনিক কাহিনীর সঙ্গেও তিনি জড়িয়ে পড়েছেন। কিন্তু অমিয়টের প্রধান কাজ মীরকাশেমকে পরাজিত ক'রে এদেশে ইংরাজ রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা।

অমিয়ট বীর, সাহসী এবং কর্তব্যপরায়ণ ইংরাজ। মৃত্যুকেও তিনি ভয় পান না। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাই তিনি বলে ওঠেন—"মরিব। আমরা আজি এখানে মরিলে, ভারতবর্ষে যে আগুন জ্বলিবে, তাহাতে মুসলমান রাজ্য ধ্বংস হইবে। আমাদের রক্তে ভূমি ভিজিলে তৃতীয় জর্জের রাজপতাকা তাহাতে সহজে রোপিত হইবে।"

অমিয়ট ব্যক্তিচরিত্র নয়, শ্রেণী চরিত্র। এই শ্রেণীর দুঃসাহসিক ইংরাজদের জন্যই এদেশে ইংরাজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল।

অরুন্ধতী (মৃণাঃ ৪/১১)। ইনি সম্পর্কে মৃণালিনীর মাসী হন। ছেলেবেলা থেকে তিনি মৃণালিনীকে লালন-পালন করেন। গোপনে যখন মৃণালিনী ও হেমচন্দ্রের বিবাহ হয়, তখন ইনিই কন্যাসম্প্রদান করেন। চরিত্রটির প্রাসঙ্গিক উল্লেখ আছে মাত্র, কোন বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়নি।

অলকমণি (দেবীঃ ১/১০)। ফুলমণির ভগিনী অলকমণি। সে ফুলমণির কল্পিত প্রফুল্ল অন্তর্ধানের উপাখ্যান পাড়াময় রাষ্ট্র করেছে। অলকমণি কানপাতলা গ্রাম্য নারীর প্রতীক।

আকবর (দুর্গেঃ ১/৩)। ভারতবর্ষের তৃতীয় মোগল সম্রাট। তিনি হুমায়ুন ও হামীদাবানুর পুত্র। তাঁর পুরা নাম আকবর আবুল ফতে জালালউদ্দীন মহম্মদ। ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর তাঁর জন্ম হয়। হুমায়ুনের মৃত্যুর পর মাত্র ১৩-১৪ বছর বয়সে ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারি তিনি দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজ্য-জয়, সুশাসন ও বিভিন্ন সংস্কারের দ্বারা আকবর ভারতের ইতিহাসে 'মহামতি

আকবর' নামে সুপরিচিত। পুত্রদের বিদ্রোহ ও অবাধ্যতার জন্য শেষবয়সে তাঁর জীবন অশান্তিতে কাটে। অবশেষে ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে অথবা ২৬শে অক্টোবর তাঁর মৃত্যু হয়।

'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে আকবরের কথা ইতিহাস হিসাবেই স্থান পেয়েছে। বাংলা দেশে মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি মানসিংহকে নিযুক্ত করেন। বঙ্কিম এই প্রসঙ্গে আকবরের দূরদর্শিতা ও বিজ্ঞতার যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন।

আকব্বর (রাজঃ ২/১)। ঔরঙ্গজেবের চতুর্থ পুত্র আকবর বা আকব্বর। 'রাজসিংহ' উপন্যাসে তাঁর সম্বন্ধে আছে—"যে সকল ঘটনা এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার কিছু পরে ঔরঙ্গজেবের কনিষ্ঠ পুত্র আকব্বর রাজদ্রোহী হইয়াছিল। পঞ্চাশ হাজার সেনা তাঁহার সহায় ছিল; ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে অল্প সেনাই ছিল, কিন্তু জ্যোতির্বিদের গণনার উপর নির্ভর করিয়া আকব্বর সৈন্যযাত্রায় বিলম্ব করিলেন, ইতিমধ্যে ঔরঙ্গজেব কৌশল করিয়া তাঁহার চেষ্টা নিষ্ফল করিলেন।"

এ সম্বন্ধে ইতিহাস বলে—ঔরঙ্গজেব মেবার আক্রমণ করলে রাজসিংহ আরাবল্লীর পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তখন ঔরঙ্গজেব আকবরের অধীনে চিতোর দিয়ে আজমীর আক্রমণ করেন। কিন্তু ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে আকবর রাজপুতগণের আক্রমণে বিব্রত হয়ে চিতোর থেকে বিতাড়িত হলে, তাঁর অন্য ভাই আজম মেবারে মোগল সৈন্যের ভার পান। এতে অপমানিত হয়ে আকবর পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন ও রাজপুতদের সঙ্গে যোগ দেন। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের চেষ্টায় রাজপুতদের কাছে তিনি বিশ্বাসঘাতক প্রতিপন্ন হন। তখন তিনি প্রাণভয়ে পলায়ন করেন। অবশেষে রাজ্যের নেতা দুর্গাদাস তাঁকে আশ্রয় দিলেন শিবাজীর পুত্র শম্ভুজীর কাছে। ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

আনন্দস্বামী (যুগঃ ৩য় পরিঃ)। তিনি হিরণ্ময়ীর ভাগ্য গণনা ক'রে বৈধব্যযোগ দেখেছিলেন। কিন্তু কৌশলে তিনি দৈবের লিপিকে খণ্ডন করেছেন। হিরণ্ময়ীর প্রতি তাঁর স্নেহও বিদ্যমান। হিরণ্ময়ীর দারিদ্র্যদশা দেখে তিনি রাজাকে বলে সাহায্যের ব্যবস্থা করেছিলেন।

আলমগীর (রাজঃ ১/২)। দ্রঃ ঔরঙ্গজেব।

আলি ইব্রাহিম খাঁ (চন্দ্রঃ ২/১)। এটি ঐতিহাসিক চরিত্র। তিনি ছিলেন মীরকাশেমের বিশ্বস্ত বন্ধু ও একান্ত সচিব। তিনি যে ইংরাজের সঙ্গে বিবাদ বাধাতে ইচ্ছুক ছিলেন না, এটা উপন্যাস থেকে বোঝা যায়।

আয়েষা (দুর্গেঃ ২/১)। "যেমন উদ্যানমধ্যে পদ্মফুল, এ আখ্যায়িকা মধ্যে

তেমনই আয়েষা।"—বঙ্কিমের এই উক্তি যথার্থ। পদ্মফুলের যেমন আভিজাত্য ও সৌন্দর্য দুইই আছে—আয়েষারও তেমনি। দেবপূজায় পদ্মফুল লাগে, আয়েষারও জীবনপদ্ম বিকশিত হয়েছিল জগৎসিংহের পূজার জন্য।

"আয়েষার বয়ঃক্রম দ্বাবিংশতি বৎসর হইবেক।" তিলোত্তমার মতো আয়েষাও জগৎসিংহের প্রতি প্রথমদর্শনেই অনুরক্তা হয়েছিল, কিন্তু তার বহিঃপ্রকাশ ছিল না। প্রাণ দিয়ে আয়েষা জগৎসিংহের সেবা করেছেন, কিন্তু কখনো প্রেমনিবেদন করেন নি। এইজন্যই আয়েষা আমাদের কাছে সর্বাপেক্ষা শ্রদ্ধার পাত্রী। প্রেমের কাঙালীপণায় নয়, প্রেমের আত্মনিবেদনেই আয়েষা সুন্দরী হয়ে উঠেছেন। এমন কি, পাছে জগৎসিংহ মনে করেন আয়েষা তাঁর প্রতি অনুরাগবশতঃই ঘন ঘন তাঁর গৃহে আগমন করে, তাই জগৎসিংহের রোগ সেরে গেলে তিনি যাতায়াত বন্ধ করলেন।

আয়েষার প্রতি পাঠকের সহানুভূতি আরও গভীর হয় এইজন্য যে, একদিকে ওসমানের মতো সুপাত্রের প্রেমনিবেদন তিনি বারবার প্রত্যাখ্যান করেছেন, অপরদিকে জগৎসিংহের মনে প্রেমিকা হিসাবে আয়েয়ার প্রাধান্য একটুও নেই। আরোগ্যলাভের পর জগৎসিংহের মনে আয়েষার চিন্তা তৃতীয় স্থান লাভ করেছে, তা-ও সেবাময়ীরূপে।

আয়েষা কোনদিনই হয়তো জগৎসিংহকে তাঁর মনের ভাব জানতে দিতেন না। কিন্তু ওসমানের অভিযোগের উত্তরে দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি স্বীকার করেছেন—"এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর!" এরূপভাবে মনের ভাব প্রকাশ ক'রে ফেলার জন্য আয়েষার অনুশোচনাও কম হয়নি, তাই জগৎসিংহকে বলেছেন—"রাজপুত্র. তুমিও অপরাধ ক্ষমা কর। যদি ওসমান আজ আমাকে মনঃ-পীড়িত না করিতেন, তবে এ দগ্ধ হৃদয়ের তাপ কখনও তোমার নিকট প্রকাশ পাইত না, কখনও মনুষ্য কর্ণগোচর হইত না।"

একদিকে ওসমান, অন্যদিকে জগৎসিংহ—সর্বোপরি আয়েষার নিজ মনোবৃত্তির দোলায় চরিত্রটি দ্বন্দ্বসঙ্কুল হয়ে উঠেছে। ক্রমে সেই প্রেম আত্ম-নিবেদনের ভক্তিমার্গে উন্নীত হয়েছে। তাই আয়েষা অনায়াসে বলতে পেরেছেন—'আমার যাহা দিবার তাহা দিয়াছি, তোমার নিকট প্রতিদান কিছু চাহি না।' দুঃখিনী আয়েষা জগৎসিংহ-তিলোত্তমার বিবাহে হাস্যমুখে উপস্থিত থেকেছেন। সবশেষে দৃঢ়তার সঙ্গে মৃত্যুবরণের লোভ সম্বরণ ক'রে হৃদয়ে অনির্বাণ রেখেছেন বিরহের দুঃসহ জ্বালা।

আত্মত্যাগের এই সুকঠোর মন্ত্রে আয়েষা হয়ে উঠেছেন যথার্থই—"রমণীরত্ন"।

আশ্‌মানি (দুর্গেঃ ১/৫)। অনৈতিহাসিক চরিত্র। আশ্‌মানি প্রথমে ছিল মানসিংহের অন্তঃপুরের দাসী। সেখানে বিমলার সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয় এবং বীরেন্দ্রসিংহের

সঙ্গে গড়-মান্দারণে আসে। গজপতিকে বোকা কৃষ্ণ সাজিয়ে তার রাধিকারূপে কিছু স্থূল রসিকতা করেছে আশ্‌মানি। তারপর আর তার কোন বিশেষ কাজ দেখা যায় না। আশ্‌মানির সঙ্গে তিলোত্তমা কত্‌লু খাঁর আশ্রয় ত্যাগ করেছে এবং তিলোত্তমা ও জগৎসিংহের মিলনকালে বিমলার সঙ্গে কিঞ্চিৎ হাস্য-পরিহাসরত অবস্থায় তাকে দেখা গেছে। আশ্‌মানি সাধারণ পরিচারিকা অপেক্ষা একটু বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে। হাস্যরসেই তার স্বাভাবিক স্ফূর্তি।

আসিরুদ্দীন (রাজঃ ৬/৮)। জেব-উন্নিসার এক বিশ্বস্ত খোজা। মবারকের সর্প-দংশিত মৃতদেহ কবর থেকে তুলে বাঁচানো যায় কিনা, সে-বিষয়ে জেব-উন্নিসা ভার দিয়েছিলেন এর উপর।

ইন্দিরা (ইন্দিরা ১ম পরিঃ)। 'ইন্দিরা' উপন্যাসের নায়িকা ইন্দিরা একটি অসাধারণ চরিত্র। অসাধারণ এজন্য যে, তার জীবনে যে সকল ঘটনা ঘটেছে, সেগুলি সাধারণ মানুষের জীবনে সহজে ঘটে না। প্রথম শ্বশুরবাড়ী যাবার পথে ডাকাতের অপহরণের পর নিজের চেষ্টায় ইন্দিরা যেভাবে স্বামীর সঙ্গে পুনর্বার মিলিত হয়েছে, তাতে তার জীবনের এক সংঘাত-বহুল দিক প্রকাশিত।

ইন্দিরা ধনীর দুলালী। বাস্তবের সঙ্গে তার শ্বশুরবাড়ীতে যাবার পথেই প্রথম পরিচয়। কিন্তু উনিশ-কুড়ি বছরের যৌবনদীপ্ত মনে সে অনেক সাহস সঞ্চয় করেছিল। তাই ডাকাতের হাত থেকে পালাবার মতলব করেছিল। কিন্তু পারেনি। তারপর ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে সে কলকাতায় এসে সুভাষিণীর বাড়ীতে রাঁধুনীর চাকরি গ্রহণ করেছে। তবে ইন্দিরা তার স্বগ্রামের একদিনের পথ ত্যাগ ক'রে, কলকাতায় খুড়ার খোঁজে আসার ঘটনাতে বোকামির পরিচয় দিয়েছে।

ইন্দিরার জীবনে দুঃখের আঘাত তার হাস্যোজ্জ্বল মূর্তিটিকে ম্লান করতে পারেনি। বাড়ীর গৃহিণী এবং বামুনঠাকুরাণীকে নিয়ে নিত্য-নূতন রসিকতায় সে নিজের দুঃখকে ভুলে ছিল। সুভাষিণীর সঙ্গে তার হাস্য-পরিহাস কিন্তু গভীরতর ভালবাসায় সিঞ্চিত। দুজনের হাসি বেদনা ও ভালবাসায় অশ্রুসিক্ত।

ইন্দিরার মধ্যে আছে অকপট সারল্য। এই সরলতা দ্বারা সে নিঃসঙ্কোচে তার সমস্ত দোষ-গুণ, ন্যায়-অন্যায় স্বীকার করেছে। ইন্দিরার সাধারণ মানুষের প্রতি দরদেরও অন্ত নেই। বৃদ্ধা বামুনঠাকুরাণীর সঙ্গে সে রসিকতা করলেও, তাকে যথেষ্ট ভালবাসে। শ্বশুরবাড়ী যাবার পথে গরীব সঙ্গী-সাথীদের বিশ্রাম করায় প্রথমে ইন্দিরা বিরক্ত হলেও, শেষ পর্যন্ত নিজেকে ধিক্কার দিয়েছে।

ইন্দিরা তার স্বামীর সঙ্গে যেভাবে প্রেমাভিনয় করেছে, তাতে ওকে অসচ্চরিত্রা বলে

অভিহিত করা যেত ; কিন্তু প্রথম কটাক্ষটা অন্যায় হলেও, কিছুক্ষণের মধ্যেই সে স্বামীকে চিনেছে। তাই এই ভাগ্য-বিড়ম্বিত নারীর স্বামীর সঙ্গে মিলনের আগ্রহাতিশয্যে কোন ব্যবহারকেই অন্যায় বলে মানা যায় না। কিন্তু নিজেকে ডাইনী প্রতিপন্ন ক'রে উপেন্দ্র-বাবুকে বিব্রত করার পিছনে তার রসিকা-মনের তৃপ্তি ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য আছে বলে মনে হয় না।

সবশেষে এই উপন্যাসের কথক ইন্দিরার কাব্যকুশলতা ও চরিত্র-বিশ্লেষণের দক্ষতার বিশেষ প্রশংসা করতে হয়। সে তার দেখা সমস্ত জিনিসই খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করেছে। রূপসী, সাহসী, রসিকা ইন্দিরা নিজগুণে তার জীবনের কালো মেঘকে অপসারিত করেছে। তার স্নিগ্ধোজ্জ্বল চরিত্রটি সমগ্র উপন্যাসের এক অনন্য সম্পদ্।

ইব্রাহিম লদী (দুর্গেঃ ১/৩)। 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে নামোল্লখমাত্র আছে। ইব্রাহিম লদী (লোদী) জাতিতে আফগান। ভারতবর্ষে সুলতানী আমলের তিনিই শেষ নিদর্শন। তাঁর রাজত্বকাল ১৫১৭ খ্রীঃ—১৫২৬ খ্রীঃ। অপক্ষপাত বিচারের জন্য তিনি অভিজাত আফগানদের বিরাগভাজন হন। তাঁরা বারবার ইব্রাহিমকে সিংহাসন-চ্যুত করবার ষড়যন্ত্র করেন, কিন্তু ব্যর্থ হন। অবশেষে তাঁরা বাবরকে দিল্লী আক্রমণের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবর ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত ও নিহত ক'রে ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

ইম্‌লিবেগম (রাজঃ ৭/২)। ঔরঙ্গজেব নির্মলকুমারীকে ইম্‌লিবেগম বলে ডাকতেন। (দ্রঃ নির্মলকুমারী।)

ইলিস্ সাহেব (চন্দ্রঃ ২/৫)। ঐতিহাসিক ব্যক্তি। আজিমাবাদ বা পাটনা কুঠির প্রধান ইংরেজ কর্মচারী ছিলেন। এঁকে এবং এঁর কুঠিকে কেন্দ্র ক'রেই প্রধানতঃ ইংরেজ ও মীরকাশেমের মধ্যে বিবাদ সুরু হয়। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে নামোল্লেখ-মাত্র আছে।

ইস্‌মাইল গাজি (দুর্গেঃ ১/৫)। পাঠান সম্রাট হোসেন শাহর বিখ্যাত সেনাপতি। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, ইনিই গড়-মান্দারণ দুর্গের নির্মাণকর্তা।

ইসাবেলা (রাজঃ ২/২)। স্পেনের রানী। তিনি স্বামী ফার্ডিনাণ্ডের সঙ্গে মিলিত হয়ে ত্রিশ বছর রাজ্যশাসন করেন। তাঁর সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা—আমেরিকা আবিষ্কার এবং স্পেন থেকে মুরগণের বিতাড়ন।

পাশ্চাত্য দেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষে মহিলা শাসকের আধিক্য দেখাতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র এঁর নামোল্লেখ করেছেন।

উদিপুরী (রাজঃ ২/৫)। উদিপুরী বেগম ছিলেন ঔরঙ্গজেবের সর্বাপেক্ষা

প্রিয়তমা মহিষী। "সে একজন খ্রীষ্টিয়ানী ; উদিপুরী নামে ইতিহাসে পরিচিতা। উদয়পুরের সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধ ছিল বলিয়া ইহার নাম উদিপুরী নহে। আসিয়া খণ্ডের দূরপশ্চিমপ্রান্তস্থিত যে জর্জিয়া এখন রুশিয়া রাজ্যভুক্ত, তাহাই ইহার জন্মস্থান। বাল্যকালে একজন দাস-ব্যবসায়ী ইহাকে বিক্রয়ার্থে ভারতবর্ষে আনে, ঔরঙ্গজেবের অগ্রজ দারা ইহাকে ক্রয় করেন। বালিকা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে অদ্বিতীয় রূপলাবণ্যবতী হইয়া উঠিল। তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া দারা তাহার অত্যন্ত বশীভূত হইলেন।" প্রথমে দারা উদিপুরীকে বিবাহ করেন। দারাকে ঔরঙ্গজেব পরাজিত করলে উদিপুরীকেও গ্রহণ করেন। বঙ্কিম উদিপুরী সম্বন্ধে এই ঐতিহাসিক তথ্যটুকু পরিবেশন করেন।

ইতিহাসের সঙ্গে এ বর্ণনার গরমিল খুবই কম। যদুনাথ সরকারের বর্ণনায়—The Contemporary Venetian traveller Manucci speaks of her as a Georgian slave-girl of Dara Shukoh's harem, who, on the downfall of her first master, became the concubine of his victorious rival She seems to have been a very young woman at the time, as she first became a mother in 1667, when Auranzib was verging on fifty She retained her youth and influence over the Emperor till his death and was the darling of his old age. Under the spell of her beauty he pardoned the many faults of Kam Bakhsh and overlooked her freaks of drunkenness, which must have shocked so pious a Muslim." (Sarkar : *History of Aurangzib*, Vol. I, Chap. IV, P. 64) তবে যদুনাথের মতে, উদিপুরী ঔরঙ্গজেবের বিবাহিতা ছিলেন বলে মনে হয় না।—"That Udipuri was a slave and no wedded wife is proved by Auranzib's own words. When her son Kam Bakhsh intrigued with the enemies at the siege of Jinji, Auranzib angrily remarked,—

'A slave-girl's son comes to no good
Even though he may have been begotten by a King.'

(*Ibid*. P. 64, F. N.)

'রাজসিংহ উপন্যাসে বর্ণিত উদিপুরী চরিত্রটি একরঙা। পাপে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত পঙ্কলিপ্ত এই চরিত্র।' উদিপুরীর যেমন অতুল্য রূপ, তেমনি অতুল্য মদ্যাসক্তি। উপন্যাসে দেখানো হয়েছে ঔরঙ্গজেবের উপর উদিপুরীর প্রভাব অসীম। এ তথ্য মানুসীর

বর্ণনায় আছে।—"The other wives and concubines were jealous that Aurengzib was so fond of Udipuri." (Manucci's *Storia do Mogor*, Vol II—Translated by William Irvine, P. 107-8)

উদিপুরীর গর্ব ও অহঙ্কার চঞ্চলকুমারী ও নির্মলকুমারী দ্বারা আহত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তাঁকে রাজকুমারীর তামাক সাজতে হয়েছে। কিন্তু এর দ্বারা পাঠকের কিঞ্চিৎ উল্লাস জাগলেও, উদিপুরীর চরিত্রে কোন পরিবর্তন আসেনি। শেষ পর্যন্ত তিনি একই রকম উন্নাসিক থেকে গেছেন।

উপেন্দ্র (ইন্দিঃ ১ম পরিঃ)। উপেন্দ্রবাবু ইন্দিরার স্বামী। তিনি যেভাবে অর্থোপার্জন করবার জন্য, সেই রেলহীন কালে, সুদূর পাঞ্জাবে গিয়ে সাফল্য লাভ করেন, তাতে ক'রে এই ভদ্রলোকের চরিত্রের দৃঢ়তার ও কর্মদক্ষতার পরিচয় মেলে। কিন্তু তিনি উপন্যাসমধ্যে যেভাবে ইন্দিরার রূপসাগরে হাবুডুবু খেয়েছেন, ইন্দিরার সাজানো ডাইনীর গল্পে বিশ্বাস করেছেন এবং শ্যালিকা ও পাড়া-প্রতিবাসীদের হাতে বিপর্যস্ত হয়েছেন, তাতে তাকে নিতান্তই গোবেচারা ধরনের লোক বলে মনে হয়। মনোরমা-বেশী ইন্দিরার কাছে যেভাবে তিনি রূপ-পিপাসা ব্যক্ত করেছেন, তাতে তাঁর চরিত্র-হীনতার পরিচয় মেলে। তবে রক্ষা এই বঙ্কিম সেই রূপলালসাকে ব্যভিচারে পরিণত হতে দেননি, প্রেমে সিদ্ধ ক'রে নিয়েছেন। আর উপেন্দ্রবাবুর মনে ইন্দিরার স্মৃতিটা বেঁচেছিল বলেই তবু চরিত্রটির মান রক্ষা হয়েছে।

উর্বশী (রাজঃ ২/৩)। স্বর্গের অপ্সরী। বিভিন্ন পুরাণে উর্বশী সম্বন্ধে বিভিন্ন কাহিনী প্রচলিত আছে। পদ্মপুরাণে আছে, ইন্দ্রের উরু থেকে উর্বশীর জন্ম। আবার কোন কোন পুরাণের মতে, তিনি সমুদ্রমন্থনজাত। পুরুরবা ও উ ীর বহু কাহিনী এদেশে প্রচলিত।

উর্মিলা দেবী (দুর্গেঃ ২/৭)। 'মহারাজ মানসিংহের কণ্ঠে অগণিতসংখ্যা রমণী-রাজি গ্রথিত থাকিত।' 'যোধপুর সম্ভূতা উর্মিলা দেবী' তাঁদের একজন। জগৎ-সিংহকে লেখা আত্ম-পরিচয়-সম্বলিত পত্রে বিমলা জানিয়েছেন যে, তিনি কিছুদিন এই উর্মিলা দেবীর পরিচারিকার কাজ করেছিলেন।

এদমণ্ড্ বর্ক (দেঃ চৌঃ ১/৮)। Edmand Burke একজন আইরিশ রাজনীতিবিদ্, বাগ্মী এবং সাহিত্যিক। তিনি আয়র্ল্যাণ্ডের ডাবলিন শহরে জন্মগ্রহণ করেন ১৭২৯ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর মৃত্যু হয় ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের সদস্য ছিলেন। ওয়ারেন হেষ্টিংসকে অভিযুক্ত ক'রে তিনি যে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেন, তা 'Impeachment of Warren Hastings' নামক গ্রন্থে লেখা আছে। এই

গ্রন্থে দেবী সিংহের অত্যাচারের কথাও তিনি বলেছেন। 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে দেবী সিংহের অত্যাচারের বর্ণনা-প্রসঙ্গে বার্ক-এর নাম উল্লিখিত হয়েছে।

এলিজাবেথ (রাজঃ ২/২)। ইংলণ্ডের রানী। রাজত্বকাল ১৫৫৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দ। তাঁর সময়ে ইংলণ্ডের যথেষ্ট উন্নতি হয়। তিনি শিল্প ও সাহিত্যের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর সময়েই বিখ্যাত কবি ও নাট্যকার সেক্সপীয়রের জন্ম হয়। 'রাজসিংহ' উপন্যাসে নামোল্লেখমাত্র আছে।

ওয়ারেন হেস্টিংস (চন্দ্রঃ ৬/৩ ; আনন্দঃ ৩/১)। ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলার প্রথম গভর্নর জেনারেল। ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর ইংলণ্ডের অক্সফোর্ড প্রদেশের চার্চিল নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে কেরানীরূপে তিনি এদেশে আসেন। দীর্ঘকাল বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত থেকে, ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বাংলার গভর্নর নিযুক্ত হন। এদেশে কোম্পানির প্রচুর ঋণ হয়েছিল। সেই ঋণ থেকে মুক্ত হবার জন্য তিনি নানাপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। বাদশাহের বৃত্তি বন্ধ, বারাণসীর রাজা চৈৎসিংহের বেগমদের কাছ থেকে অর্থসংগ্রহ, নন্দকুমারের কাছ থেকে উৎকোচগ্রহণ প্রভৃতি কুকীর্তির তিনি নায়ক। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এদেশ ত্যাগ করেন। কিন্তু ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে তাঁর বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল ধরে বিচার চলে। তাঁর বিরুদ্ধে বিখ্যাত বাগ্মী বার্কের একাদিক্রমে বিশদিনের বক্তৃতা Burke's Impeachment of Warren Hastings নামে খ্যাত। অবশেষে হেস্টিংস নির্দোষ প্রতিপন্ন হন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে আগস্ট হেস্টিংস-এর মৃত্যু হয়।

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে ওয়ারেন হেস্টিংসকে স্ত্রীলোকের প্রতি সৌজন্য প্রকাশ করতে দেখা যায়। তিনি নবাবের কাছে কুল্‌সম সম্বন্ধে যে পত্র দিয়েছিলেন, তা এই—"এ স্ত্রীলোক কে, তাহা আমি চিনি না, সে নিতান্ত কাতর হইয়া আমার নিকটে আসিয়া মিনতি করিল যে, কলিকাতায় সে নিঃসহায়, আমি যদি দয়া করিয়া নবাবের নিকট পাঠাইয়া দিই, তবে সে রক্ষা পায়। আপনাদিগের সঙ্গে আমাদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হইতেছে, কিন্তু আমাদের জাতি স্ত্রীলোকের সঙ্গে বিবাদ করে না। এজন্য ইহাকে আপনার নিকট পাঠাইলাম। ভাল মন্দ কিছু জানি না।" (৬/৩)

বঙ্কিমচন্দ্র হেস্টিংসকে একটু সুনজরে দেখেছেন। ঐতিহাসিকরা কিন্তু বঙ্কিমের এরূপ সিদ্ধান্ত মানেন না।

'আনন্দমঠ' উপন্যাসে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ দমনে হেস্টিংস-এর চিন্তা ও কিঞ্চিৎ তৎপরতা বর্ণিত হয়েছে।

ওয়াটসন (আনন্দঃ ৩/১০)। কাপ্তেন টমাসের সহযোগী একজন ইংরাজ লেপ্টেনাণ্ট।

ওসমান (দুর্গেঃ ১/১৮)। যদুনাথ সরকার ওসমানের ঐতিহাসিকতা স্বীকার করেছেন। (বঃ শতঃ সং-এর ভূমিকা।) ওসমানের পিতা খাজা ঈসা ছিলেন কুত্‌লুর দেওয়ান। এছাড়া তিনি আরও জানিয়েছেন—"বঙ্কিমের অজ্ঞাত, ১৯১৯ সালে আমার দ্বারা আবিষ্কৃত একখানা ফার্সী হস্তলিপি হইতে ওসমানের বীরচরিত্র সত্য ইতিহাসের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানির নাম "বহারিস্তান্-ই-খাইবী"। ইহা মির্জাশথন্ নামক একজন মুঘল কর্মচারীর আত্মকাহিনী এবং ইহাতে জাহাঙ্গীর বাদশার প্রায় সমস্ত রাজ্যকাল ব্যাপিয়া (১৬০৮—১৬২৫ পর্যন্ত) বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যা ও আসামের ঘটনাবলীর অতি বিস্তৃত বিবরণ আছে; কারণ, এই সমস্ত সময় শথন্ বঙ্গদেশে সেনাপতির কাজ করিতেন। জগতে ইহার একমাত্র পুঁথি আছে, তাহা প্যারিস নগরীর সরকারী পুস্তকালয়ে রক্ষা পাইয়াছে। দুই বৎসর গত হইল, ঢাকার অধ্যাপক ডাক্তার বোরা ইহার ইংরেজী অনুবাদ ছাপিয়েছেন।"

যদুনাথ সেই কপির যে বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেছেন, তা ওসমানের বীরত্ব সম্যক্ উপলব্ধির জন্য উল্লেখযোগ্য—"এদিকে বাদশাহী দক্ষিণ বাহুর নেতা ইফ্‌তিখার খাঁ কয়েকজন মাত্র অনুচর লইয়া জলা পার হইয়া (ওসমানের শিবিরের দিকে) পৌছিয়া ওসমানের ভ্রাতা ওলীকে এমন কাবু করিলেন যে, তিনি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত হন আর কি।

"ওসমান কেন্দ্র হইতে ইহা দেখিয়া ওলীকে ছেলেমানুষ বলিয়া গালি দিয়া, ও নিজ পাশে সজ্জিত দুই তিন হাজার পরিপক্ক সৈন্য ও বিখ্যাত রণহস্তীগুলি লইয়া আফগান রণ-নাদ "হু" "হু" গর্জন করিয়া, ছুটিয়া ইফ্‌তিখার খাঁকে আক্রমণ করিলেন। ......আফগানেরা রণ-শৃঙ্গার নামক বিখ্যাত বাদশাহী হস্তীকে চারিদিকে ঘিরিয়া শত আঘাতে কাবাবের মাংসের মত করিয়া কাটিয়া ফেলিল, মুঘলদের ঘোড়াগুলির পায়ের রগ কাটিয়া নিমেষে আরোহীদের ধরাশায়ী করিল।

"একজন আফগানের সহিত ইফ্‌তিখার খাঁর দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলিতেছিল। তিনি এক আঘাতে উহাকে ভূমিশায়ী করিলেন, কিন্তু উহার ভাই ছুটিয়া আসিয়া তরবারি ছুঁড়িয়া খাঁর বাম হস্তের চর্মসহিত কব্‌জা কাটিয়া ফেলিল তখন ইফ্‌তিখারের একজন অনুগত সৈন্য প্রভুর দুর্দশা দেখিয়া, নিজের ঘোড়া ছুটাইয়া, ওসমানের হাতীর সম্মুখে পৌছিয়া তাঁহার মুখ লক্ষ্য করিয়া তীর ছুঁড়িল। তীরটি ওসমানের বাম চক্ষু দিয়া মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল। কিন্তু ওসমানের নিক্ষিপ্ত বর্শা বুকে বিদ্ধ হইয়া শেখ পড়িয়া গেল।...

"নিজ সৈন্যগণ যেন তাঁহাকে জখম দেখিতে না পায়, এজন্য ওসমান এত মারাত্মক আঘাত পাইবার পরও দুই হাতে তীরটি টানিয়া বাহির করিলেন, তাঁহার দক্ষিণ চক্ষুও

ঐ সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িল ; কারণ দুই চোখের রগগুলি জড়িত থাকে থাকে। বাম হাতে রুমাল লইয়া নিজমুখ ঢাকিয়া, ওসমান মাহুতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "উমর! সুজায়েৎ খাঁর সৈন্যবিভাগ কোন্ দিকে ?"...... সে উত্তর করিল, "মিয়া, সালামৎ ! ঐ যে সামনে মহুয়া গাছ দেখিতেছেন, তাহার নীচে পতাকা দেখা যাইতেছে। সুজায়েৎ খাঁ নিশ্চয়ই উহার নীচে দাঁড়াইয়া আছেন।" ওসমানের তখন কথা বলিবার শক্তি ছিল না ; দক্ষিণ হস্ত মাহুতের পিঠে রাখিয়া সেখানে হাতী চালাইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন।

"তাহার পর অনেকক্ষণ যুদ্ধ চলিল, মুঘলেরা অনেকে হতাহত হইলেও পরাস্ত হইল না ; আফগানদের চেষ্টা ব্যর্থ হইল। ইতিমধ্যে ওসমানের প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার পুত্র মুমরেজ পিতার মৃতদেহ হস্তীপৃষ্ঠে সঙ্গে লইয়া আবার মুঘলদের সম্মুখীন হইল।· ···।"

ওসমান সম্বন্ধে যে উপরি-উক্ত ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া গেছে, বঙ্কিম তার কোথাও কোথাও পরিবর্তন সাধন করলেও, তাঁর কল্পনা অনেকাংশে ইতিহাসানুসারী হয়েছে। তিনি ওসমানকে কত্‌লু খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র বলে উল্লেখ করেছেন।

গড়-মান্দারণ দুর্গজয়ে ওসমান পাঠান সেনাপতি হিসাবে যেমন কৌশল দেখিয়েছেন, তেমনি সাহসিকতারও পরিচয় দিয়েছেন। এত অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে দুর্গজয় তাঁর চতুর রণনীতির পরিচয়। ওসমান যথার্থ বীর, তাই বীরের মর্যাদা তিনি দিতে জানেন। কত্‌লু খাঁর আদেশ অনুসারে জগৎসিংহকে তাঁর পিতার কাছে গিয়ে সন্ধিপ্রস্তাব করতে বলেছিলেন, কিন্তু অন্তরের দিক থেকে বীর হিসাবে জগৎসিংহের এরূপ কাপুরুষ ভাব চাননি। তাই জগৎসিংহ যখন এ প্রস্তাবে রাজী হলেন না, তখন—"ওসমানের মুখভঙ্গীতে, সন্তোষ অথচ ক্ষোভ উভয়ই প্রকাশ হইল,···"

এই উপন্যাসে ওসমান ব্যর্থপ্রেমিক ! কিন্তু সেই ব্যর্থপ্রেমিকের জন্য আমাদের মনে কোন বেদনাবোধ জাগে না—এইটাই আশ্চর্য। তার কারণ, ওসমান প্রেমের আদর্শ-লোকে বিচরণ ক'রে হতাশার অন্ধকারে ডুবে যেতে চাননি, তিনি বাস্তবের মাটিতে প্রেমকে বীরের মতো কেড়ে এনে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তাই জগৎসিংহ ও আয়েষাকে নিভৃতে আলাপরত দেখে হিংসায় ফেটে পড়া ও শ্লেষবাক্য প্রয়োগ করা অত্যন্ত স্বাভাবিক হয়েছে। এই ঈর্ষার বশেই অবশেষে প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী জগৎসিংহকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেছেন। এই প্রেমিক বীরপুরুষটি সাধারণ মানুষের অত্যন্ত কাছাকাছি।

ঔরঙ্গজেব (রাজঃ ১/২)। ইতিহাস-খ্যাত মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবকে বঙ্কিমচন্দ্র 'রাজসিংহ' উপন্যাসে প্রতিপক্ষের নায়করূপে দাঁড় করিয়েছেন। সম্রাট শাহজাহানের

তৃতীয় পুত্র ঔরঙ্গজেব ১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার অসুস্থতার সুযোগে ভ্রাতাদের দমন ক'রে ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে "আলমগীর" অর্থাৎ "জগৎবিজেতা" নাম নিয়ে দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। সুদীর্ঘকালের রাজত্বে তাঁর হিন্দুবিদ্বেষ এবং মারাঠা ও রাজপুতদের সঙ্গে সংঘর্ষ সুবিদিত। ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে অত্যন্ত অশান্তির মধ্যে আহমদনগরে তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

ইতিহাসের সুস্পষ্ট একটি চরিত্রকে উপন্যাসে গ্রহণ করার অনেক অসুবিধা আছে। সাধারণতঃ এসব ক্ষেত্রে সর্বজনবিদিত ঐতিহাসিক সত্যের ব্যতিক্রম করলে উপন্যাসের রসহানি হবার সম্ভাবনা আছে, আলঙ্কারিকরা যাকে বলেন সিদ্ধ রসের ব্যতিক্রম। বঙ্কিমচন্দ্রকে এজন্য বর্তমান কাল অবধি অনেক বিরূপ সমালোচনা সহ্য করতে হলেও, ঔরঙ্গজেবের চরিত্র অঙ্কনে তিনি ঐতিহাসিক সত্য ও ঔপন্যাসিক কল্পনার সার্থক সমন্বয় ঘটাতে পেরেছেন।

ইতিহাসের ঔরঙ্গজেবের মূল্যায়ন-প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকগণ তাঁকে পরধর্মবিদ্বেষী, সঙ্কীর্ণচেতা ও কূটকৌশলী বলে অভিহিত করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রও 'রাজসিংহ' উপন্যাসে ঔরঙ্গজেবকে পরধর্মবিদ্বেষীরূপে অঙ্কন করেছেন। হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর আরোপ, হিন্দু মন্দির ধ্বংস ও গো-হত্যার আদেশ তাঁর ধর্মদ্বেষের প্রমাণ দেয়। কিন্তু তাঁর অন্তঃপুরে রাজপুত মহিষীর হিন্দু আচরণ বা নির্মলকুমারীর প্রতি সম্রাটের ব্যবহারের দ্বারা পরধর্মবিদ্বেষের রূপটি ততটা উগ্র হয়ে ওঠেনি! মানুসীর বর্ণনায় বাদশাহের এক মহিষীর অসুস্থতার সময় দেবদেবীর পূজার উল্লেখ আছে। কিন্তু তার ওপর ভিত্তি ক'রে বলা যায় না যে, ঔরঙ্গজেব অন্তঃপুরে হিন্দুয়ানী সর্বদাই সহ্য করতেন। অছাড়া, উপন্যাসের দিক দিয়েও ঘরে বাইরে ঔরঙ্গজেবের এরূপ বিপরীত আচরণ বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে পড়ে।

ঔরঙ্গজেব যেভাবে রাজসিংহের সঙ্গে শর্তভঙ্গ ক'রে পুনরায় যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন, নিজ অন্তঃপুরের কলঙ্কমোচনের জন্য মবারকের প্রাণদণ্ডের বিধান দিয়েছেন, তাতে তাঁর সঙ্কীর্ণ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। সাম্রাজ্য পরিচালনার জন্য ঔরঙ্গজেব যে সমস্ত কূটকৌশল প্রয়োগ করতেন, তার দ্বারা তাঁর কুখ্যাতি ও সুখ্যা ত দুই-ই লাভ হয়েছে।

ঔরঙ্গজেবের উপর যেভাবে উদিপুরী এবং জেব-উন্নিসার প্রভাব দেখানো হয়েছে, তাতে তাঁকে স্ত্রৈণ এবং স্বাধীনবুদ্ধিহীন সম্রাট বলে মনে হয়। কিন্তু এই ঘটনা যে একেবারে অনৈতিহাসিক, তা নয়। ঔরঙ্গজেব যখন দাক্ষিণাত্যে সম্রাট শাহজাহানের প্রতিনিধি ছিলেন, তখন এক নর্তকীর প্রতি তাঁর আসক্তি জন্মে। এই নর্তকীর নাচ-গানে ও তার সঙ্গে সুরাপানে তিনি দিনরাত মত্ত থাকতেন। এই নর্তকীর মৃত্যুর পর

তিনি নাকি মদ্যপান বর্জন করার এবং সঙ্গীত শ্রবণ না করার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন (দ্রঃ Manucci's *Storia do Mogor*, Vol. I, P. 231—Translated by William Irvine)

যদুনাথ সরকার হীরাবাঈ নামক এক ক্রীতদাসী-কন্যার প্রতিও ঔরঙ্গজেবের দুর্বলতার কাহিনী বর্ণনা করেন। (দ্রঃ Sarkar: *History of Aurangzib*—Vol. I, Chap. IV, Pp. 65-66)। এই দুটি ঘটনাই ঔরঙ্গজেবের ৩৫ বছর বয়সের সময় দাক্ষিণাত্যে থাকাকালীন ঘটেছিল। সুতরাং পরবর্তী জীবনে তাঁর স্ত্রৈণ হওয়া অসম্ভব নয়। তাই একজনের (নির্মলকুমারীর) প্রতি বৃদ্ধ ঔরঙ্গজেবের আসক্তির (প্রেমই বলা চলে) সম্ভাব্যতাকেও অস্বীকার করা যায় না। বরং এই ঘটনা দ্বারা ঔরঙ্গজেবের জীবনের ব্যর্থতা ও হতাশার রূপটিই যেন ফুটে উঠেছে। সব পেয়েও তিনি রিক্ত। পরবর্তী কালের ব্যর্থতার বীজ যেন তাঁর অন্তরের মধ্যেই সঞ্চিত ছিল!

উদিপুরীর প্রতি ঔরঙ্গজেবের দুর্বলতার বর্ণনা মানুসীর গ্রন্থে দেওয়া আছে।

রাজসিংহ কর্তৃক সঙ্কীর্ণ পার্বত্য পথে ঔরঙ্গজেব যেভাবে আবদ্ধ হয়েছিলেন, তাকে অনেকে অনৈতিহাসিক এবং বঙ্কিমের মুসলমান-বিদ্বেষের পরিচয়রূপে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বঙ্কিম বলেছেন, তিনি এ ঘটনা অর্ম এবং মানুসীর বর্ণনা থেকে নিয়েছেন। সুতরাং ঘটনার সত্যাসত্য নিয়ে ঐতিহাসিকরাই মাথা ঘামাবেন। (দ্রঃ Orme: *Historical Fragments of the Mogul Empire*—Pp. 85-86 এবং Manucci's *Storia do Mogor*, Vol. II, Pp. 236—242—Translated by William Irvine)

উপন্যাসের দিক থেকে এ ঘটনার বর্ণনা যথাযথ হয়েছে। বাদশাহও যে মানুষ, তাঁরও যে প্রাণে ভয় আছে, ক্ষুধা-তৃষ্ণা আছে, তা মূষিকের ন্যায় বন্দী ঔরঙ্গজেবের আচরণে যেমন প্রকাশিত হয়েছে, তেমনটি আর অন্য কোথাও হয়নি। এরূপ গুরুত্বপূর্ণ বিপদ্ থেকে উদ্ধার পেয়ে ঔরঙ্গজেব যেভাবে সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করেছেন, তাতে তাঁর চরিত্র আরও মসীলিপ্ত হয়েছে।

ঔরঙ্গজেবের ইতিহাস-সম্মত চরিত্রবৈশিষ্ট্য অপেক্ষা, নির্মলকুমারীর প্রতি তাঁর অনুরাগ, মবারকের প্রতি ক্রোধ, ক্ষুধার্ত অবস্থায় নিষ্ফল আক্রোশ প্রভৃতি মানবিক বৈশিষ্ট্যগুলিই, আমাদের অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট করে। বঙ্কিমের হাতে ইতিহাসের ঔরঙ্গজেব সজীব হয়ে উঠেছেন।

কতলু খাঁ (দুর্গেঃ ১/৩)। পাঠান নবাব কত্‌লু খাঁ ঐতিহাসিক চরিত্র। 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে তাঁর উপস্থিতি মাত্র তিনবার। অন্যান্যদের মুখেমুখেই তাঁর

চরিত্র বর্ণিত হয়ে গেছে—তিনি অত্যাচারী ও লম্পট। বীরেন্দ্রসিংহের বিচারের দৃশ্যে কিন্তু আমরা কত্‌লু খাঁকে দেখেছি রাজোচিত গাম্ভীর্যের মধ্যে। নিজের জন্মদিনে সুরাপানোন্মত্ত কত্‌লু খাঁকে আমরা বিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে দেখলাম। এ দৃশ্যটি যেন অত্যন্ত নাটকীয় মনে হয়। সবশেষে কত্‌লু খাঁর মৃত্যুদৃশ্যে হঠাৎ এ চরিত্রের একটা মহান দিক দেখা গেল। তিনি জগৎসিংহকে বলে গেলেন—তিলোত্তমা 'পবিত্রা'। অবশ্য, এর পিছনে তাঁর কন্যা আয়েষার হাত কতখানি, সে-বিষয়ে সঠিক ধারণা করা যায় না। কারণ, কত্‌লু খাঁ যখন জগৎসিংহের সঙ্গে সন্ধিপ্রস্তাবে কৃতকার্য হলেন, তখন স্বস্তিলাভ করলেন। সেখানে বঙ্কিম এরূপ বর্ণনা দিয়েছেন—"জগৎসিংহ চলিয়া যান, আয়েষা মুখ অবনত করিয়া পিতাকে কি কহিয়া দিলেন। কত্‌লু খাঁ খাজা ইসার প্রতি চাহিয়া আবার প্রতিগমনকারী রাজপুত্রের দিকে চাহিলেন। খাজা ইসা রাজপুত্রকে কহিলেন, 'বুঝি আপনার সঙ্গে আরও কথা আছে'।"

এই বর্ণনা থেকে বোঝা মুশকিল যে, তিলোত্তমার পবিত্রতার কথা জগৎসিংহকে জানাতে কত্‌লু খাঁ, না আয়েসা—কার প্রয়োজন বেশি ছিল।

যাই হোক, এই উপন্যাসে স্বল্প উপস্থিতির মধ্যেও দোষে-গুণে মিশ্রিত কত্‌লু খাঁর চরিত্রটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

কন্দর্প (রাজ: ২/৩)। প্রণয়ের দেবতা। এঁর সৌন্দর্যের যথেষ্ট খ্যাতি আছে। ইনি কামদেব মদন নামেও পরিচিত। এঁর পত্নী রতি। ইনি ব্রহ্মার মানসপুত্র। হরকোপানলে ভস্মীভূত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের ঔরসে রুক্মিণীর গর্ভে প্রদ্যুম্নরূপে ইনি পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন।

কপালকুণ্ডলা (কপা: ১/৫)। বঙ্কিমচন্দ্রের "কপালকুণ্ডলা" -পন্যাসের নায়িকা এবং প্রাণকেন্দ্র হল কপালকুণ্ডলা চরিত্র। বঙ্কিম তাঁর সমস্ত শিল্পকর্মের মাধুর্য দিয়ে এই চরিত্রটিকে গড়ে তুলেছেন। আবার বঙ্কিমের আদর্শের অভিজ্ঞতা হিসাবেও কপালকুণ্ডলা চরিত্রটি উল্লেখযোগ্য।

কপালকুণ্ডলার চরিত্র-রচনার পূর্বে বঙ্কিমের মনে একটি তত্ত্বের উদয় হয়েছিল। সে তত্ত্বটি হল, প্রাকৃতিক পরিবেশে গঠিত নারীকে জনসমাজে এনে স্থাপন করলে তার অবস্থাটি কেমন দেখায় তার পরীক্ষা। তিনি এ সম্বন্ধে অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র ও বন্ধু দীনবন্ধুকে প্রশ্ন করেন। কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্র ব্যাপারটিকে পরিহাস ক'রে উড়িয়ে দেন। (দ্রঃ বঙ্কিম-জীবনী : শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)। তারপরই বঙ্কিম তাঁর চিন্তার পরীক্ষারূপে সৃষ্টি করেন এই চরিত্রকে। এই পরীক্ষা বঙ্কিমের পূর্বে অনেকেই করেছেন। কালিদাসের শকুন্তলা তপোবনের শান্ত-স্নিগ্ধ প্রকৃতিতে লালিত পালিত। সেই প্রকৃতির কাছে স্থৈর্যের

শিক্ষালাভ ক'রে পরবর্তী জীবনের আলোড়নে শকুন্তলা স্থির থাকতে পেরেছে। সেক্সপীয়রের 'টেম্পেস্ট' নাটকের মিরাণ্ডা-ও নির্জন দ্বীপে অনেক সময় কাটিয়েছে। তার জীবনেও নির্জনতা ব্যর্থতার হাহাকার এনে দেয়নি। কিন্তু কপালকুণ্ডলার চরিত্র অন্যতর পরিণামমুখী হয়েছে।

সাধারণভাবে কৌতূহল তৃপ্তির জন্য বঙ্কিমচন্দ্র অধিকারীর দ্বারা কপালকুণ্ডলার পূর্ব-বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বলে দিয়েছেন—"ইনি ব্রাহ্মণকন্যা।···ইনি বাল্যকালে দুরন্ত খ্রীষ্টিয়ান তস্কর কর্তৃক অপহৃতা হইয়া যানভঙ্গপ্রযুক্ত তাহাদিগের দ্বারা কালে এ সমুদ্রতীরে ত্যক্ত হয়েন।······কাপালিক ইঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া আপন যোগসিদ্ধিমানসে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। অচিরাৎ আত্মপ্রয়োজন সিদ্ধ করিতেন। ইনি এ পর্যন্ত অনূঢ়া ; ইহার চরিত্র পরম পবিত্র।" (১/৮)

কপালকুণ্ডলার প্রথমজীবনে আছে প্রকৃতির পরিবেষ্টনী। ভয়ঙ্কর কাপালিকের সান্নিধ্যে কপালকুণ্ডলা মানুষ হয়ে উঠলো সমুদ্র-তীরবর্তী নির্জন অরণ্যে। কপালকুণ্ডলার দেহ-সৌন্দর্যের মধ্যেও বঙ্কিমচন্দ্র ফুটিয়ে তুলেছেন সেই প্রকৃতির রূপ। তার অবিন্যস্ত কেশরাজির বারংবার বর্ণনা আমাদের প্রকৃতির অবিন্যস্ত কেশরাজির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। তার সৌন্দর্য ও স্বভাবের মধ্যে রয়েছে প্রকৃতির স্নিগ্ধ শ্যামলিমা। কাপালিকের চরিত্র তার উপর প্রভাব বিস্তার করেনি, তবে কোথাও খানিকটা ছায়াপাত করেছে। কাপালিকের সান্নিধ্যে থেকেই কপালকুণ্ডলার ঈশ্বর বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়েছে। তাই স্বামীগৃহে যাত্রার প্রাক্কালে দেবতার বিরূপতা তার মনকে বিষণ্ন করে। আবার, আকাশে ভবানীর প্রতিরূপ দর্শন ক'রে তার মন আত্মাহুতি দেবার জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে। তাছাড়া, কপালকুণ্ডলার নির্ভীকচিত্ততা এবং দৃঢ় অনমনীয় মনোভাবও মনে হয় কাপালিক সূত্রে প্রাপ্ত।

সরলতা কপালকুণ্ডলা চরিত্রের অন্যতম দিক। মতিবিবির দেওয়া মহার্ঘ্য গহনাগুলি অনায়াসে ভিখারীকে দান ক'রে দেওয়ায় তার সংসার অনভিজ্ঞতা ও সরলতার পরিচয় পাই। নবকুমারকে কাপালিকের হাত থেকে রক্ষা করার ঘটনা একদিকে কপালকুণ্ডলার সরলতা ও সহানুভূতিশীল মনোবৃত্তির পরিচায়ক !

কপালকুণ্ডলা চরিত্রের আর একটি দিক হল তা'র পরোপকারের প্রবৃত্তি। এই পরোপকারের বৃত্তির ফলেই ঘটনাচক্রে তার সঙ্গে নবকুমারের বিবাহ হয়েছে। আবার, শ্যামার সুখের জন্য রাত্রিকালে ঔষধ সন্ধানের সময় নবকুমারের মনে সন্দেহ উৎপাদন করেছে। শেষ পর্যন্ত মতিবিবির উপকারসাধনের জন্যই কপালকুণ্ডলা স্বামীর উপর অধিকার ত্যাগ করতে স্বীকৃত হয়েছে।

কপালকুণ্ডলার মধ্যে কি শেষ পর্যন্ত স্বামীপ্রেম জেগেছিল? এ প্রশ্নের উত্তর বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্ট ক'রে কোথাও দেননি। নবকুমারকে বিবাহ করার মধ্যে কপালকুণ্ডলার যে হৃদয়বৃত্তির তাড়না ছিল, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অধিকারীর তাগিদই এখানে প্রধান। অধিকারীর কাছে বিবাহ সম্বন্ধে সামান্য উপদেশ নিয়েই (তাও সে ভালভাবে বুঝেছে মনে হয় না) তার সংসারী জীবনের সুরু।

সংসারী জীবনে প্রবেশের মুখে অজ্ঞাতকুলশীলা এই রমণীকে নিয়ে, সংসারে যে আলোড়নের সুযোগ ছিল, সেরকম কিছুই হয়নি। ননদিনী শ্যামার সুমধুর সান্নিধ্যে দিনগুলি বেশ কাটছিল। কিন্তু কপালকুণ্ডলার মনে প্রণয় ও পত্নীভাবের সাক্ষাৎ তখনো কোথাও পাওয়া যায় না। চতুর্থ খণ্ড তৃতীয় পরিচ্ছেদে একবার বঙ্কিম 'কপালকুণ্ডলার হৃদয়সমুদ্রে যে তরঙ্গমালা উৎক্ষিপ্ত হইতেছিল' তা গণনা করার চেষ্টা করেছেন—কিন্তু সেখানেও কাপালিকের ছবি। আবার, চতুর্থ খণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে কপালকুণ্ডলা—"অন্তঃকরণ মধ্যে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন—তথায় তো নবকুমারকে দেখিতে পাইলেন না।" জীবনের শেষলগ্নে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও কপালকুণ্ডলা নবকুমারের জন্য কোন আবেগ প্রকাশ করেননি। তাই বঙ্কিম-প্রদত্ত 'মৃন্ময়ী' নাম সার্থক হয়েছে বলে মনে হয়।

কিন্তু, কপালকুণ্ডলার মধ্যে এই প্রণয়, পত্নীভাব ও মাতৃভাবের অভাব দেখা গেলেও, তাকে শুষ্ক-কঠোর মনে হয় না। এ অভাব পূরণ করেছে—তার সরলতা, পবিত্রতা ও করুণা।

কপালকুণ্ডলা ঘরণী নয়, যোগিনী। সত্য নয় স্বপ্ন। কপালকুণ্ডলা রোমান্টিক কবি-মানসের রোমান্টিক নায়িকা।

কমলমণি (বিষঃ ৫ম পরিঃ)। "বিষবৃক্ষ" উপন্যাসে নগেন্দ্রের ভগ্নী কমলমণি পদ্মের মতই শুভ্র সুন্দর সদাহাস্যময়ী। স্বামী শ্রীশচন্দ্রের প্রতি ভক্তি তার অসীম। কিন্তু সূর্যমুখীর স্বামীভক্তি যেমন নিরুচ্চার, কমলমণির তেমন নয়। স্বামীর সঙ্গে তার মান-অভিমান চুম্বন লেগেই আছে। কমলমণির স্নেহের ধন শচীশচন্দ্র তার মাতৃমহিমাকে উজ্জ্বল করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে যে কটি স্বল্পসংখ্যক মাতৃচরিত্র আছে, তার মধ্যে কমলমণি অন্যতম। কমলমণির সহজ-সরল সদাহাস্যময় ব্যবহারের জন্য, তার আবির্ভাবে উপন্যাসের বিষবাষ্প বারবার উধাও হয়েছে। তবে কমলমণির জীবনে কোনদিন দুঃখের মেঘ এসে দেখা দেয়নি বলে সূর্যমুখীর বেদনার গুরুত্ব সে হয়তো সম্যক্ উপলব্ধি করতে পারেনি। অপরদিকে, কুন্দের প্রতি তার অসীম মমত্ববোধ থাকলেও, তার প্রতি মাঝে মাঝে সে অবিচার করেছে। আসলে, কমলমণিকে উপন্যাসের কোন দুঃখ-বেদনাই স্পর্শ করতে পারেনি। তাই সে কেবলমাত্র হাল্‌কা হাসির ফোয়ারা ছুটিয়েছে।

সূর্যমুখীর এবং কুন্দের মনের কথা প্রকাশ করবার জন্যই উপন্যাসে কমলমণির প্রয়োজন ছিল।

করিমন (চন্দ্রঃ ৬/২)। এই দাসী তকি খাঁর আলয়ে দলনীর থাকাকালীন অর্থের লোভে দলনীকে বিষ এনে দিয়েছিল।

করিমবক্স (দুর্গেঃ ১/১১)। ওসমান খাঁর একজন সৈনিক। সে গড়-মান্দারণ দুর্গ-জয়কালে লুক্কায়িত তিলোত্তমার সন্ধান দিয়ে পুরস্কার প্রার্থনা করেছিল। করিমবক্স আগে মোগল সৈন্যবাহিনীতে ছিল বলে তাকে সকলে মোগল সেনাপতি বলে ডাকে। এই 'মোগল সেনাপতি' বিশেষণটি শুনে বিমলা শিউরে উঠেছিলেন ; কারণ, অভিরাম স্বামী গণনা ক'রে বলেছিলেন, মোগল সেনাপতি দ্বারা তিলোত্তমার সর্বনাশ হবে। কিন্তু মোগলের সঙ্গে বীরেন্দ্রসিংহ বন্ধুত্ব করায় তা হয়নি। কিন্তু ভাগ্যের ফল অমোঘ— এটা দেখাবার জন্যই বোধ হয় করিমবক্সকে 'মোগল সেনাপতি' জানিয়ে এবং তিলোত্তমার সন্ধান বলিয়ে দিয়ে, তার দ্বারা ভাগ্য গণনার ফলটি সার্থক ক'রে তুলেছেন।

কল্যাণী (আনন্দঃ ১/১)। কল্যাণী মহেন্দ্রের স্ত্রী। স্বামীর সুখ-দুঃখের সমান ভাগীদার। দুর্ভিক্ষের কালে পথে বেরিয়েছে নিজের প্রাণরক্ষার্থে নয়, যাতে স্বামী-কন্যা বাঁচে সেই আশায়।

ডাকাতদলের হাতে প'ড়ে কল্যাণী ভীত হলেও, বিপদ্‌কালে তার বুদ্ধিভ্রংশ হয়নি। তাই ডাকাতদের ঝগড়ার সুযোগে সে পলায়ন করেছে। তারপর আনন্দমঠের নিরাপদ আশ্রয়ে এসে স্বামীর জন্য চিন্তিত হয়ে পড়েছে। সত্যানন্দের সনির্বন্ধ অনুরোধে কেবল-মাত্র একটু পাদোদক পান করেছে। কল্যাণী সাধ্বীশিরোমণি।

কিন্তু মহেন্দ্রকে নিয়ে কল্যাণী যখন আনন্দমঠ থেকে বেরিয়ে এসেছে, তখন তার জীবনে এক চরম আঘাত নেমে এসেছে। মহেন্দ্র সন্তানধর্মে দীক্ষা নেবার সঙ্কল্প প্রকাশ করেছেন। কিন্তু কল্যাণী বুঝেছে, এ পথে একমাত্র বাধা সে। তাই স্বেচ্ছায় বিষপানে প্রাণত্যাগ করেছে। স্বপ্নে দেখা দেবতার নির্দেশ অপেক্ষা স্বামীর প্রতি অবিচল নিষ্ঠাই কল্যাণীর এই আত্মত্যাগের কারণ। মৃত্যুকালে কল্যাণীর কথায় স্বামীভক্তির সঙ্গে বাঙালী বধূর সহজ সরল দেবভক্তিও মিশ্রিত হয়েছে।

মৃত কল্যাণীকে বাঁচাল ভবানন্দ। কল্যাণীর নূতন জন্মলাভ হল বটে, কিন্তু নূতন মন গড়ে উঠল না। ভবানন্দের শত প্রলোভনের মধ্যেও স্বামী-কন্যার প্রতি তার আকর্ষণ প্রগাঢ়ভাবে বিদ্যমান ছিল। অবশ্য, সেই সময় সত্যানন্দ ঠাকুরের কাছে পাঠগ্রহণ নিশ্চয়ই কল্যাণীর মনকে আরো শক্ত ক'রে তুলেছিল।

সবশেষে স্বামীর সঙ্গে মিলনকালে শান্তির সঙ্গে যোগসাজসে কল্যাণী যেভাবে

মহেন্দ্রকে বিপর্যস্ত করেছে—তার মাধ্যমে কল্যাণীর সুখময় জীবন আরো বেশি সুন্দর হয়ে উঠেছে।

আনন্দমঠের কল্যাণী আগাগোড়া বাঙালী গৃহস্থবধূর চরিত্র।

কাজী সাহেব (সীতাঃ ১/১)। এই কাজী সাহেবের কাছে গঙ্গারামের বিচার হয়। তিনি লোক মন্দ ছিলেন না, কিন্তু ধর্মের গোঁড়ামির জন্য অন্যায় করতেও তিনি কসুর করেন না।

কাপালিক (কপাঃ ১/৪)। আমাদের দেশে তান্ত্রিক সন্ন্যাসী সম্বন্ধে যে সমস্ত ভয়াবহ কাহিনী প্রচলিত ছিল, বঙ্কিমচন্দ্র সে সম্বন্ধে সম্যক্ অবহিত ছিলেন। মেদিনীপুরে বাসকালে এক কাপালিক সন্ন্যাসীর সঙ্গে বঙ্কিমের পরিচয়ের কথাও অনেকে বলেছেন। তাই বঙ্কিমচন্দ্র কাপালিক চরিত্র-রচনায় কল্পনা অপেক্ষা বাস্তবকেই স্থান দিয়েছেন সর্বাধিক।

বঙ্কিমচন্দ্র কাপালিককে গড়ে তুলেছেন ভীষণদর্শন ও ভয়াবহ ক'রে। নবকুমারই প্রথম কাপালিককে আবিষ্কার করলেন—"তাহার বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসর হইবে। পরিধানে কোন কার্পাসবস্ত্র আছে কিনা, তাহা লক্ষ্য লইল না; কটিদেশ হইতে জানু পর্যন্ত শার্দূলচর্মে আবৃত। গলদেশে রুদ্রাক্ষমালা; আয়ত মুখমণ্ডল শ্মশ্রুজটা পরিবেষ্টিত।"

কাপালিকের চরিত্রের মধ্যে কোথাও কোমলতা বা স্নেহ-মমতা নাই। নিজ সাধনায় সিদ্ধিলাভই তাঁর একমাত্র কাম্য। সেই উদ্দেশ্যেই তিনি নবকুমারকে বলি দিতে চেয়েছেন এবং বলি হাত-ছাড়া হওয়ায় ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের মতো তাকে খুঁজে বেড়িয়েছেন।

কপালকুণ্ডলাকে মানুষ করা কাপালিকের পক্ষে একটু আশ্চর্য ব্যাপার বলে মনে হয়; সেই সঙ্গে সন্দেহ হয়, বুঝি কাপালিকের মধ্যে খানিকটা স্নেহপ্রবণ মন ছিল। কিন্তু অধিকারীর মুখ থেকে জানতে পারি, কপালকুণ্ডলাকে সাধনকার্যের উপায় হিসাবেই কাপালিক বড় ক'রে তুলেছিলেন। কপালকুণ্ডলার প্রতি তাঁর যে কোন মমতা ছিল না, তার আরও প্রমাণ রয়েছে কপালকুণ্ডলার মৃত্যু-কামনায়। কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে নিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই কাপালিকের একমাত্র উদ্দেশ্য হল কপালকুণ্ডলার নিধন, তখন থেকেই তিনি তাঁদের পিছু নিয়েছেন।

নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য কাপালিক নবকুমারের কাছে যে রকম ছলনার আশ্রয় নিয়েছেন, তাতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি অপেক্ষা পাঠকের ঘৃণা বর্ধিত হয়। কিন্তু তবুও কাপালিক ধর্মের নাম করতে ছাড়েননি। কপালকুণ্ডলার মৃত্যু নাকি মা ভবানীর কাম্য। স্বার্থপর, ধর্মধ্বজী, ভয়ানক এই চরিত্রটি উপন্যাসে বীভৎসরস সৃষ্টি করেছে এবং

উদ্দেশ্যের দিক থেকে চরিত্রটি সু-অঙ্কিত। "কপালকুণ্ডলা" উপন্যাসে কাপালিককে খল চরিত্র বলে মনে হয়।

কাপ্তেন টমাস (আনন্দঃ ৩/১)। ঐতিহাসিক চরিত্র। এঁর উপর সন্ন্যাসী বিদ্রোহ দমনের ভার পড়েছিল। বঙ্কিম উপন্যাসমধ্যে এঁকে যেভাবে অঙ্কন করেছেন, তাতে লরেন্স ফস্টরের দ্বিতীয় সংস্করণ বলে মনে হয়। তবে টমাস লরেন্স ফস্টরের মতো কাপুরুষ নন। দুঃসাহসী, অত্যাচারী টমাস মৃত্যুকালে দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন—"ইংরেজ! আমি ত মরিয়াছি, প্রাচীন ইংলণ্ডের নাম তোমরা রক্ষা করিও, তোমা-দিগকে খ্রীষ্টের দিব্য দিতেছি, আগে আমাকে মার, তারপর এই বিদ্রোহীদিগকে মার।"

কাপ্তেন হে (আনন্দঃ ৩/১০)। কাপ্তেন টমাসের সহযোগী একজন ইংরেজ সৈনিক।

কামাখ্যানাথ (রাধাঃ ২য় পরিঃ)। কামাখ্যানাথবাবু হাইকোর্টের উকিল। তিনি রাধারাণীদের বিষয়-সম্পত্তির জন্য শেষ পর্যন্ত মামলা চালিয়ে জিতেছিলেন। কিন্তু কেবলমাত্র অর্থের সম্পর্ক নয়, রাধারাণী ও তার মার প্রতি তাঁর একটা অন্তরের টান লক্ষ্য করা যায়। রাধারাণীর মার মৃত্যুর পর তিনি রাধারাণীর বিষয়-সম্পত্তি রক্ষা ও বৃদ্ধি করেন। তিনি উদার চরিত্রের লোক ছিলেন। তাই রাধারাণীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ না দিয়ে, তার 'রুক্মিণীকুমার'কেই খোঁজার চেষ্টা করেছিলেন।

কামিনী (ইন্দিরা ১ম পরিঃ)। ইন্দিরার ছোট বোন। ইন্দিরার মতই আমুদে। প্রধানতঃ তার উদ্যোগেই ইন্দিরার স্বামী উপেন্দ্রবাবুকে ভূত দেখিয়ে মজা করা হয়েছিল।

কালীচরণ বসু (রজনী ১/১)। রজনীর প্রতিবেশী। তিনি কায়স্থ। চীনা-বাজারে তাঁর একখানি খেলনার দোকান ছিল। এঁর শিশুপুত্র বামাচরণের সঙ্গে রজনীর ভাব ছিল।

ক্যাথারাইন (রাজঃ ২/২)। ইতিহাসে ক্যাথারীন নামে দুজন সাম্রাজ্ঞীর উল্লেখ আছে। রুশ সাম্রাজ্ঞী ক্যাথারীন স্বামীর মৃত্যুর পর কিছুদিন রাজ্যশাসন করেন।

ফ্রান্সের রাজা দ্বিতীয় হেনরীর পত্নী ক্যাথারীনের রাজত্বকাল ১৫১৯—১৫৮৯ খ্রীঃ। নাবালক পুত্রের অভিভাবিকা হিসাবে তিনি রাজ্যশাসন করতেন।

'রাজসিংহ' উপন্যাসে পাশ্চাত্য দেশে নারী শাসকদের প্রসঙ্গে এঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

কুবের (রাজঃ ২/৩)। যক্ষরাজ কুবের ধনাধিপ বলে খ্যাত। ঋষি বিশ্রবার ঔরসে ইলবিলার গর্ভে এঁর জন্ম। প্রথমে ইনি লঙ্কায় বাস করতেন, তারপর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাবণ কর্তৃক বিতাড়িত হলে কৈলাসশিখরে বাস করেন। কুৎসিত হয়েছে

বের (শরীর) যার, এই অর্থে কুবের। কথিত আছে, কুবেরের তিনখানি পা ও আটটি দাঁত।

কুমুদ (বিষঃ ১১শ পরিঃ)। সূর্যমুখীর এক দাসী। সূর্যমুখী কমলমণিকে এক পত্রে এই দাসী সম্বন্ধে লিখেছেন—"এখন একজন নূতন দাসী রাখিয়াছি। তাহার নাম কুমুদ। বাবু তাহাকে কুমুদ বলিয়া ডাকেন। কখন কখন কুমুদ বলিয়া ডাকিতে কুন্দ বলিয়া ফেলেন। আর কত অপ্রতিভ হন। অপ্রতিভ কেন ?"

এই দাসীর নামটিকে কেন্দ্র ক'রে সূর্যমুখী এবং নগেন্দ্রের মধ্যে কুন্দের উপস্থিতি বোঝানো হয়েছে।

কুমুদিনী (ইন্দিরা ৬ষ্ঠ পরিঃ)। রাঁধুনী থাকাকালীন ইন্দিরার ছদ্মনাম। (দ্রঃ ইন্দিরা)

কুন্দনন্দিনী (বিষঃ ২য় পরিঃ)। "বিষবৃক্ষ" উপন্যাসে কুন্দনন্দিনী চরিত্র গীতি-কবিতার মূর্ছনা এনে দিয়েছে। এই শান্ত-স্নিগ্ধ দুঃখী চরিত্রটি উপন্যাসমধ্যে বেশির ভাগই নিষ্ক্রিয় থেকে গেছে। অথচ তাকে কেন্দ্র ক'রেই কাহিনীর জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই অনাঘ্রাত কুন্দ কুসুমটি গ্রামের নির্জন প্রান্তে বৃদ্ধ পিতার সান্নিধ্যে একাকিনী বেড়ে উঠেছিল বলেই বোধ হয় তার চরিত্র ও ব্যবহার এত শান্ত। তাছাড়া, একে একে বহু প্রিয়জনের মৃত্যুও তাকে বেদনাবিদ্ধ ক'রে তুলেছে। তার আচার-আচরণের মধ্যেও বিষণ্ণতার ছাপ পড়েছে।

নগেন্দ্রকে কুন্দ প্রথমে উপকারী দেবতারূপেই দেখেছিল। তখন তার যা বয়স, তাতে প্রেম জাগ্রত হওয়ার কোন সুযোগ হয়ত ছিল না। তারপর তারাচরণের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেল। কুন্দনন্দিনী তারাচরণের সঙ্গে ঘর করেছিল তিন বছর। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কখনো কুন্দনন্দিনীকে তারাচরণের এতটুকু স্মৃতিচারণ করতে দেখা যায়নি। তবে কি—বিবাহের পূর্ব থেকেই কুন্দ নগেন্দ্রকে মনে মনে হৃদয়েশ্বর ক'রে ফেলেছিল ? এক জায়গায় অবশ্য বঙ্কিম বলেছেন—"বিবাহের অগ্রে (নগেন্দ্রের সঙ্গে), বাল্যকালাবোধ কুন্দ নগেন্দ্রকে ভালবাসিয়াছিল—কাহাকে বলে নাই, কেহ জানিতে পারে নাই। নগেন্দ্রকে পাইবার কোন বাসনা করে নাই—আশাও করে নাই, আপনার নৈরাশ্য আপনি সহ্য করিত।" (৪২ পরিঃ)

কুন্দ অকৃতজ্ঞ নয়। সূর্যমুখীর সর্বনাশ সে করতে চায় না। তাই তার হৃদয় বিদীর্ণ হলেও, কমলমণির সঙ্গে সে কলকাতা চলে যেতে স্বীকৃত হয়েছে। তারপর বাগানে নগেন্দ্রের স্পর্শে কুন্দর জীবন সফল হলেও, সে নগেন্দ্রের বিবাহ-প্রস্তাবে কোনক্রমে 'না' বলেছে। নগেন্দ্রের সঙ্গে বিয়ে হবার ব্যাপারে কুন্দ অপেক্ষা সূর্যমুখীর সক্রিয়তাই অধিক।

কুন্দনন্দিনী সরলা হলেও, দুঃখের অভিঘাতে তার জীবনের অনেক শিক্ষা হয়েছে। বিবাহের পরই সে বুঝেছে—এ বিবাহ সুখের হবে না। সূর্যমুখীর গৃহত্যাগের পর তার প্রতি নগেন্দ্রের অবহেলা অনেক বেড়েছে। অবশেষে নগেন্দ্রও গৃহত্যাগ করল। কিন্তু ঝি-চাকরদের অবহেলা সহ্য ক'রেও কুন্দ স্বামীগৃহ আঁকড়ে পড়ে রইল। স্বামীর প্রতি তার এতই অনুরাগ যে, স্বামী তাকে চিঠি না লিখলেও, নায়েবকে দেওয়া চিঠি এনে নিজের কাছে রেখে দিত।

নগেন্দ্র-সূর্যমুখী ফিরে এলে, দত্তবাড়ীর আনন্দমুখরতার অন্তরালে নিঃশব্দে বিষপানে কুন্দনন্দিনী মৃত্যুবরণ করল। মৃত্যুকালে কুন্দ মুখরা হয়ে উঠেছিল। স্বামীর প্রতি অকুণ্ঠ ভালবাসা নিয়ে সে প্রাণত্যাগ করেছে।

কুন্দ চরিত্র-পরিকল্পনায় দুটি অলৌকিক স্বপ্নকে কাজে লাগানো হয়েছে। কুন্দের মাতার প্রথম আবির্ভাব ও দুটি মূর্তি দেখিয়ে তাদের কাছ থেকে দূরে থাকার উপদেশ দানের কিছু পরেই যখন আমরা দেখি, সে দুজন নগেন্দ্রনাথ ও হীরা, তখন আমরা কুন্দের ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে শঙ্কিত হয়ে উঠি। দ্বিতীয়বার কুন্দের মাতার আহ্বানে কুন্দের মৃত্যুবরণে অক্ষমতা, তার জীবনের চরম পরিণতির ফলটিকেই স্পষ্ট ক'রে তুলেছে।

কুন্দের প্রথমবার বিবাহ ও বৈধব্য ঘটানোর কি কোন প্রয়োজন ছিল? এই তিন বছরের কালক্ষেপণে বঙ্কিমের কী উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে? মনে হয়, এর দ্বারা তিনটি কাজ হয়েছে। প্রথমতঃ, কুন্দনন্দিনীর তিন বছর বয়স বেড়েছে। দ্বিতীয়তঃ, এই সময়েই তার সঙ্গে দেবেন্দ্রের পরিচয় হয়েছে। তৃতীয়তঃ, এর ফলে বিধবা বিবাহের ফলাফল দেখানো সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এর কোনটিই তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়।

কুন্দনন্দিনীর মৃত্যু-ঘটনা আর একটি বিতর্কিত বিষয়। অনেকে বলেন, এই মৃত্যুতে নীতির জয় হয়েছে বটে, কিন্তু আর্টের মাহাত্ম্য খর্ব হয়েছে। এই অভিযোগ সর্বাংশে সত্য বলে মানা যায় না। উপন্যাসের পরিকল্পনা এমনভাবেই করা হয়েছিল যে, কুন্দের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। সূর্যমুখী শেষ পর্যন্ত কুন্দের সাথে একত্রেই ঘর করবে ঠিক করেছিলেন, কিন্তু প্রথমেই তাঁর পক্ষে মানিয়ে নেওয়া সম্ভব ছিল না। নগেন্দ্রের হৃদয়েও কুন্দ অপেক্ষা সূর্যমুখীর গুরুত্ব ছিল অধিক। ঘটনাচক্রে কুন্দের প্রতি সকলের উপেক্ষা তাকে মৃত্যুর দিকেই এগিয়ে দিয়েছে। সবশেষে কুন্দনন্দিনী মৃত্যুবরণ ক'রে যেভাবে নগেন্দ্র-সূর্যমুখী-কমলমণি এবং পাঠকগণের হৃদয় দখল করতে সমর্থ হয়েছে, এমন আর কিছুতেই সম্ভব ছিল না।

কুলসম (চন্দ্রঃ ২/১)। কুলসম দলনী বেগমের পরিচারিকা। সাধারণ পরিচারিকার মতোই অর্থের প্রতি সে আসক্তি দেখিয়েছে। গুরগণ খাঁর কাছে পত্র

দিয়ে যাবার সময় তাই সে দলনীকে বলে—"আমি দাসী। পত্র দাও—আর কিছু নগদ দাও।"

কিন্তু অন্তরের দিক থেকে কুল্‌সম দলনীর সখীত্বের স্তরে উন্নীত হয়েছে। দলনীর ভাগ্য-বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে কুল্‌সমের কাছেও নবাব-হারেমের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়। তবুও পরিচারিকা হিসাবে তার অন্য উপায় ছিল। কিন্তু সে দলনীর সঙ্গেই চন্দ্রশেখরের আশ্রয় গ্রহণ করেছে, এবং সেখান থেকে ইংরেজের নৌকায় উঠেছে। যদিও সে নবাবের ভয়ে দলনীর সঙ্গ ছাড়তে চায়নি, তবুও দলনীর প্রতি কিছুটা মায়াও ছিল। অবশেষে কুল্‌সম দলনীকে ত্যাগ ক'রে গেলে, দলনীর জীবনে সর্বনাশ ঘটল।

কিন্তু দলনীর মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে, এককালের নবাব-ভয়ে ভীতা কুল্‌সমই দৃপ্তা হয়ে উঠেছে। নবাবের মুখের উপর তাকে 'মূর্খ' বলেছে। তখনই এই নারী হয়ে উঠেছে একটি চরিত্র, তার আগে ছিল দলনীর ছায়ামাত্র।

কৃষ্ণকমল চক্রবর্তী (চন্দ্রঃ ২/৪)। সুন্দরী ও রূপসীর পিতা। তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে, তিনি সুন্দরীর অত্যন্ত বশীভূত। তাই সহজেই রূপসীর শ্বশুরালয়ে, অর্থাৎ চন্দ্রশেখরের গৃহে যেতে সম্মতি দিলেন।

কৃষ্ণকান্ত রায় (কৃঃ উঃ ১/১)। হরিদ্রাগ্রামের জমিদার। অহিফেন-সেবনে সর্বদাই নিমীলিতলোচন কৃষ্ণকান্ত রায় রসিকও বটেন। বঙ্কিমের কমলাকান্তের সঙ্গে যেন তাঁর খানিকটা সাদৃশ্য দেখা যায়। কৃষ্ণকান্ত সৎ লোক। তিনি ভ্রাতার সম্পত্তি, তার মৃত্যুর সুযোগেও, ফাঁকি দেননি। গোবিন্দলালকে তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য উইল ক'রে দিয়েছেন। তবে গোবিন্দলালের প্রতি তাঁর স্নেহ-দৌর্বল্যের অন্ত ছিল না। আগেকার দিনের একান্নবর্তী পরিবারের কর্তা যেমন হয়ে থাকেন, কৃষ্ণকান্তও তেমনি। এইসব লোকের সততা ও স্বার্থত্যাগের জন্যই একান্নবর্তী পরিবার টিকেছিল। অসৎচরিত্র, নিজপুত্র হরলালের প্রতি কৃষ্ণকান্তের কঠোর ব্যবহার তাঁর প্রতি পাঠকের শ্রদ্ধাই জাগিয়ে তোলে। রোহিণীকে পুলিশে না দিয়ে নিজে শাস্তি দেবার সঙ্কল্পে কৃষ্ণকান্তের সেকালের দৃঢ়চিত্ত জমিদারের মনোবৃত্তিই প্রকাশিত। বৃদ্ধ বয়সে তাঁর একটু বাৎসল্যরসই প্রবল। রোহিণীকে চোরের দায় থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য গোবিন্দলালের চেষ্টাকে বুড়ো কৃষ্ণকান্ত যেভাবে সরল আদিরসাত্মক রসিকতার দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন, তাতে তাঁর রসিক মনেরই পরিচয় পাওয়া যায়। কৃষ্ণকান্তের ভ্রমরের প্রতিও যথেষ্ট স্নেহ ছিল। তাই গোবিন্দলালের হাবভাবে সন্দেহ প্রকাশ ক'রে তিনি মৃত্যুকালে ভ্রমরকে সম্পত্তির অধিকার দিয়ে যান। এই ঘটনাই ভ্রমর-গোবিন্দলালের বিচ্ছেদকে অবশ্যম্ভাবী ক'রে তুলেছে। উইল সংক্রান্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই কৃষ্ণকান্তের উপস্থিতি প্রয়োজন ছিল।

কৃষ্ণকান্তের গৃহিণী (কৃ: উ: ১/১)। কৃষ্ণকান্তের গৃহিণীর ভাগে ৵০ আনা বিষয়ের উইল ছাড়া উপন্যাসে আর কিছু জোটেনি।

কৃষ্ণগোবিন্দ দাস (দেবী: ১/৯)। প্রফুল্ল বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে যে বৃদ্ধের মৃত্যুকালে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল, তার নাম কৃষ্ণগোবিন্দ দাস। 'কৃষ্ণগোবিন্দ কায়স্থের সন্তান'। অনেক বয়সে এক সুন্দরী বৈষ্ণবীর হাতে পড়ে তার ভবঘুরে জীবন সুরু হল। শেষ পর্যন্ত বৈষ্ণবীর সৌন্দর্য লুকোবার জন্য তাকে বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে গিয়ে বাস করতে হয়। তবুও বৈষ্ণবী থাকল না। মৃত্যুকালে বুড়োকে ফেলে পালালো। বুড়ো মৃত্যু-কালে তার উদ্ধার-করা গুপ্তধন প্রফুল্লকে দান ক'রে যায়। প্রফুল্লর অর্থপ্রাপ্তির প্রয়োজনে উপন্যাসে এই বৃদ্ধের উপস্থিতি।

কৃষ্ণগোবিন্দের বৈষ্ণবী (দেবী: ১/৯)। উপন্যাসে প্রত্যক্ষ উপস্থিতি নেই। বৈষ্ণবীর স্বভাবচরিত্র মোটেই ভালো ছিল না।

কৃষ্ণদাস বসু ও কৃষ্ণদাস বসুর স্ত্রী (ইন্দিরা ৪র্থ পরি:)। এই কৃষ্ণদাস বসু ও তাঁর পরিবারের সঙ্গেই ইন্দিরা কলকাতা যাত্রা করেছিল।

কৃষ্ণমোহন দত্ত (ইন্দিরা ১৮শ পরি:)। ইন্দিরার খুড়া। ইনি বিবাহকালে ইন্দিরাকে সম্প্রদান করেছিলেন। উপন্যাসে প্রত্যক্ষ উপস্থিতি নেই।

কেশব (মৃণা: ৪/৩)। মনোরমার পিতার নাম। উপন্যাসে উল্লেখমাত্র আছে।

কোম্‌ত্ (রজনী ৩/৩)। এখানে ফরাসী চিন্তানায়ক Auguste Comte (১৭৯৮—১৮৫৭)-এর কথা বলা হয়েছে। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের মঁপেলিয়ারের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। আঠারো বছর বয়সে স্কুল থেকে এবং পিতার কাছ থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর বন্ধুর গৃহে আশ্রয় নেন। এক ভ্রষ্টা নারীকে তিনি বিবাহ করেন, কিন্তু কিছুকাল পরেই বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়। তাঁর 'পজিটিভ ফিলজফি' ৫ খণ্ড প্রকাশিত হওয়ায়, দেশে আলোড়ন জাগে ও আর্থিক অবনতি ঘটতে থাকে। বন্ধুরা তাঁকে সাহায্য করতে থাকেন। এক বিবাহিতা রমণীর তিনি প্রেমে পড়েন। এই নারীর মৃত্যু তাঁর জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এই দার্শনিকের মৃত্যু ঘটে।

খস্রু (কপা: ৩/১ ; রাজ: ৮/৮)। সেলিম বা জাহাঙ্গীরের প্রধানা মহিষী, যিনি রাজা মানসিংহের ভগিনী, খস্রু তাঁর পুত্র। আকবরের মৃত্যুর পর তাঁকে দিল্লীর সিংহাসনে বসাবার চেষ্টা হয়, কিন্তু আকবরের চেষ্টায় তা ব্যর্থ হয়। "কপালকুণ্ডলা" উপন্যাসে এই ব্যর্থতার কথা সংক্ষেপে উল্লিখিত আছে। ইতিহাসও এই ঘটনার সমর্থন করে—"…Khan-i-Azam, Raja Man Singh and some other nobles of

the court, plotted to secure the succession for Salim's son, Khusrau." (*An Advanced History of India.*) "রাজসিংহ" উপন্যাসে খস্রু কর্তৃক রাজপুতদের ক্ষতির কথা উল্লিখিত হয়েছে।

খাজা আয়াস (কপাঃ ৩/৩)। "আকবর শাহের কোষাধ্যক্ষ (আকতিমাদ-উদ্দৌলা)"। তিনি মেহেরউন্নিসার পিতা। ইতিহাস বলে, পরে মেহেরউন্নিসার পিতার নাম হয়েছিল—ইতিমাদ-উদ্দৌলা (I'timad-ud-daulah)। উপন্যাসে নামোল্লেখমাত্র আছে।

খাঁ আজিম (দুর্গেঃ ১/৩)। "মুসলমানদিগের প্রধান খাঁ আজিম, তিনি প্রধান রাজমন্ত্রী, তিনি খস্রুর শ্বশুর।" (কপাঃ) "দুর্গেশনন্দিনী" উপন্যাসে আকবরের আদেশে তাঁর উড়িষ্যা এবং বঙ্গদেশে পাঠান বিদ্রোহ দমনের ব্যর্থতার কথা এবং "কপালকুণ্ডলা" উপন্যাসে জামাতা খস্রুর সিংহাসনলাভের ব্যাপারে সাহায্য করার কথা উল্লিখিত হয়েছে।

খাজা ইসা (দুর্গেঃ ২/১৭)। কতলু খাঁর একজন কর্মচারী।

খাঁ জাঁহা খাঁ (দুর্গেঃ)। "৯৮৬ অব্দে দিল্লীশ্বরের প্রতিনিধি খাঁ জাঁহা খাঁ পাঠানদিগের দ্বিতীয়বার পরাজিত করিয়া উৎকল দেশ নিজ প্রভুর দণ্ডাধীন করিলেন।" (দুর্গেঃ)

খিজির শেখ (রাজঃ ১/৫)। তসবিরওয়ালী বুড়ীর পুত্র। দিল্লীতে তার দোকান আছে। তার বিবির নাম ফতেমা। সে মায়ের কাছ থেকে সুকৌশলে রূপনগরের রাজকন্যা চঞ্চলকুমারী কর্তৃক ঔরঙ্গজেবের চিত্রদলনের কাহিনীটি জেনে নিয়ে অর্থলোভে এই সংবাদ নবাবের কাছে বিক্রী করবার ব্যবস্থা করেছিল। উপন্যাসের স্বল্প পরিসরেই সে বেশ চতুরতার পরিচয় দেয়।

ক্ষীরোদা বা ক্ষীরি (কৃঃ উঃ ১/১৪)। কৃষ্ণকান্তের গৃহের একজন দাসী। উপন্যাসে তার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। ভ্রমরের কথা শুনে সে রোহিণীকে মরতে বলেছিল। আবার, ভ্রমরের কাছ থেকে চড় খেয়ে সে পাড়ার সকলের কাছে গোবিন্দলাল-রোহিণী বৃত্তান্ত রং ফলিয়ে বলেছিল। অবশ্য, ভ্রমরের সর্বনাশসাধন যে তার উদ্দেশ্য ছিল, তা নয়। গ্রাম্য কলহপ্রিয় সাধারণ দাসীচরিত্র এই ক্ষীরি।

গঙ্গাধর স্বামী (সীতাঃ ১/১৩)। ললিতগিরির পদতলে হস্তিগুম্ফা নামে এক গুহায় "পরম যোগী মাহাত্মা গঙ্গাধর স্বামী বাস করিতেন।" সন্ন্যাসিনী জয়ন্তী শ্রীর হস্তরেখা গণনার জন্য এঁর কাছে নিয়ে যায়। ইনি গণনা ক'রে তাদের কর্তব্য নির্ধারণ ক'রে দেন।

গঙ্গারাম দাস (সীতাঃ ১/১)। গঙ্গারাম শ্রীর ভাই। গঙ্গারাম ও ফকিরের

কলহকে কেন্দ্র ক'রেই "সীতারাম" উপন্যাসের সুরু। শুধু তাই নয়, গঙ্গারামই উপন্যাসের গতি বারবার পরিবর্তিত করেছে।

উপন্যাসের প্রথমে গঙ্গারামকে যথেষ্ট ধৈর্যশীল ও শান্ত নিরীহ লোক বলেই মনে হয়। ফকিরের সঙ্গে বিবাদে তার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু কাজীর বিচারের প্রহসন দেখে গঙ্গারাম শাহ সাহেবের মুখে লাথি মেরে নির্ভীকতার ভাব প্রকাশ করেছে। সীতারাম কর্তৃক উদ্ধারের সময় গঙ্গারাম বলেছে—সীতারামের প্রাণের বিনিময়ে সে প্রাণলাভ করতে চায় না। আবার, সুযোগ বুঝে তার আকস্মিক পলায়নের পিছনে কোন পূর্ব পরিকল্পনা ছিল কি না, তাও সঠিক নির্ধারণ করা যায় না। তবে গঙ্গারামের আসল পরিচয় এখানেও পাওয়া যাবে না।

সীতারাম রাজ্যস্থাপন করলে, গঙ্গারাম তাঁর অন্যতম সহায় ছিল। বঙ্কিম গঙ্গারামের যে গুণ বর্ণনা করেছেন, তা হল তার ক্ষিপ্রকারিতা। তার এই ক্ষিপ্রকারিতার পরিচয় কিন্তু উপন্যাসে কোথাও নেই। যাই হোক, "গঙ্গারাম সীতারামের একান্ত অনুগত ও কার্য্যকারী হইয়া মহম্মদপুরে বাস করিতেছিল।"

সীতারামের অনুপস্থিতিতে গঙ্গারাম বেশ ভালভাবেই কাজ চালাচ্ছিল। কিন্তু গোলমাল বাধাল রমা। রমার সঙ্গে গোপন সাক্ষাতে তার রূপরাশি গঙ্গারামের বাসনা-বহ্নি জাগিয়ে তুলল। "একে ভালবাসা বলে না···। এ একটা সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট চিত্তবৃত্তি—যাহার হৃদয়ে প্রবেশ করে; তার সর্বনাশ করিয়া ছাড়ে।"

রমার প্রতি গঙ্গারামের আসক্তির জন্য তাকে হয়ত তত দোষ দেওয়া যায় না, কিন্তু সভামধ্যে গঙ্গারাম যখন রমাকে অপযশ দেবার চেষ্টা করতে থাকে, তখন তার ঘৃণ্য প্রবৃত্তিগুলি চোখে পড়ে। জয়ন্তীর ত্রিশূল স্পর্শে যেভাবে গঙ্গারাম অপরাধ স্বীকার করেছে, তাতে তার চরিত্রের কোন পরিবর্তন অপেক্ষা ভয়ের ভাবই প্রকাশিত। তাই কারাগারের মধ্যেও সে রমার সর্বনাশসাধনের কথা চিন্তা করেছে। কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে "ছদ্মবেশে ছলনা দ্বারা তাহাকে (রমাকে) লাভ করিবার জন্যই মুসলমান সেনার গোলন্দাজ হইয়া আসিয়াছিল।"

গঙ্গারামের জীবনের একমাত্র প্রশংসনীয় গুণ হল ভগ্নী শ্রীর প্রতি ভালবাসা। এই ভালবাসার জন্য তাকে মৃত্যুবরণ করতে হল। শ্রী যখন তার কামানের সামনে বুক পেতে দিল, তখন সে আর তোপ দাগতে পারল না। তখন সীতারামের হাতে তার মাথা কাটা গেল।

গঙ্গারামের মা (সীতা: ১/১)। উপন্যাসে গঙ্গারামের মার মৃত্যুকালের উল্লেখমাত্র আছে।

গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ (দুর্গেঃ ১/৫)। সংস্কৃত নাটকের বিদূষক চরিত্র ও যাত্রার ভাঁড় চরিত্র বঙ্কিমের মনে বোধ হয় গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজের চরিত্র-রচনার প্রেরণা জাগিয়েছিল। এই চরিত্রটি উপন্যাসে মাত্র দুটি কাজে লেগেছে—একবার বিমলার সঙ্গে শৈলেশ্বরের মন্দিরে যাবার জন্য, আর একবার জগৎসিংহকে তিলোত্তমা সম্বন্ধে ভুল সংবাদ দিয়ে জগৎসিংহের মনে সন্দেহ সৃষ্টি ক'রে উপন্যাসের জটিলতা বৃদ্ধি করার জন্য। তারপর উপন্যাসের মধ্যে এই বোকারামটিকে নিয়ে ভাঁড়ামির উপকরণ গড়ে তোলা হয়েছে। তাই বঙ্কিম তার রূপ এঁকেছেন,—"দিগ্‌গজ মহাশয় দৈর্ঘ্যে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাত হইবেন, প্রস্থে বড় জোর আধ হাত তিন আঙ্গুল। পা দুইখানি কাঁকল হইতে মাটি পর্য্যন্ত মাপিলে চৌদ্দপুয়া চারিহাত হইবেক; প্রস্থে রলা কাষ্ঠের পরিমাণ। বর্ণ দোয়াতের কালি; বোধ হয়, অগ্নি কাষ্ঠ ভ্রমে পা দুখানি ভক্ষণ করিতে বসিয়াছিলেন, কিছুমাত্র রস না পাইয়া অর্দ্ধেক অঙ্গার করিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন। দিগ্‌গজ মহাশয় অধিক দৈর্ঘ্যবশতঃ একটু একটু কুঁজো, অবয়বের মধ্যে নাসিকা প্রবল, শরীরের মাংসাভাব সেইখানেই সংশোধন হইয়াছে। মাথাটি বেহারা-কামান, কামান চুলগুলি যাহা আছে তাহা ছোট ছোট, আবার হাত দিলে সূচ ফুটে। আর্ক-ফলার ঘটাটা জাঁকাল রকম।" এই রূপ-বর্ণনার মধ্যে যেমন বাহুল্য আছে, তেমনি চরিত্রটিকে নিয়েও বাড়াবাড়ি করা হয়েছে। বঙ্কিম প্রথমদিকের রচনায় যে আদিরসকে ত্যাগ করতে পারেননি, এটি তার উজ্জ্বলতম নিদর্শন।

গণেশ জ্যোতিষী (রাজঃ ২/১)। এই জ্যোতিষীর নিকট দরিয়া জোর ক'রে মবারকের ভাগ্য গণনা করিয়েছিল।

গণেশবাবু (বিষঃ ১০ম পরিঃ)। ইনি একজন জমিদার। ইনি দেবেন্দ্রের শ্বশুর। উপন্যাসে নামোল্লেখমাত্র আছে।

গভর্নর ভ্যান্সিটার্ট (চন্দ্রঃ ২/৫)। একজন পদস্থ ইংরেজ কর্মচারী। ইনি ভ্যান্সিটার্ট নামেও খ্যাত। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইভ স্বদেশে গমন করলে, ইনি বঙ্গদেশের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। মীরজাফর ইংরাজদের উপযুক্ত অর্থ দিতে না পারায়, তিনি তাঁর জামাতা মীরকাশেমকে নবাব নিযুক্ত করেন। "চন্দ্রশেখর" উপন্যাসে এ সম্পর্কে এঁর নামোল্লেখ আছে।

গয়াদীন পাঁড়ে (সীতাঃ ৩/২২)। সীতারামের একজন বিশ্বস্ত সিপাহী।

গলস্টন (চন্দ্রঃ ২/৭)। অমিয়টের সহচর ইংরেজ। অমিয়টের আদেশ সে কার্যে পরিণত করেছে। মাঝে মাঝে অমিয়টকে পরামর্শ দানও করেছে। শেষ পর্যন্ত অমিয়টের সঙ্গেই বীরত্ব প্রদর্শন ক'রে মৃত্যুবরণ করেছে।

গিরিজায়া (মৃণাঃ ১/৩)। গিরিজায়া বৈষ্ণবী ভিখারিণী। এই চরিত্রটি "মৃণালিনী" উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা জীবন্ত চরিত্র। সে কেবল গান গেয়ে গেয়েই বেড়ায় না, পরোপকারেও তার প্রবৃত্তি আছে। গানের সাহায্যেই সে হেমচন্দ্রের মৃণালিনীকে খুঁজে বের করেছে। আবার, মৃণালিনীকে হেমচন্দ্রের সঙ্গে মিলিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে। গিরিজায়া মৃণালিনীকে যথার্থ ই ভালবেসেছিল। তাই তার জন্য হেমচন্দ্রের কাছে অপমান সহ্য ক'রেও আবার দূতিগিরি করেছে।

গিরিজায়া সুচতুরা রমণী। কিন্তু মহিলাসুলভ বোকামি যে করেনি তা নয়। তার বোঝবার দোষেই মৃণালিনী-হেমচন্দ্রের সম্পর্ক অনেকটা বিষময় হয়ে উঠেছিল। রসিকতা করা এবং গান গাওয়া গিরিজায়ার স্বভাব। তাই গুরুতর বিষয়েও সে গান এবং রসিকতা করে। কিন্তু তার সে-সময়ের সমস্ত কথাগুলিই বঙ্কিম অর্থবোধক ক'রে তুলেছেন।

হেমচন্দ্র গিরিজায়াকে বেত্রাঘাত করতে উদ্যত হলে, গিরিজায়া তাকে যেভাবে কথা শুনিয়েছে, তাতে এই চরিত্রটির দৃঢ়তায় চমকিত হতে হয়। পাপিষ্ঠ ব্যোমকেশের হাত থেকে মৃণালিনীকে রক্ষা করার সময়েও গিরিজায়া সাহসের পরিচয় দিয়েছে।

দিগ্বিজয়ের প্রতি গিরিজায়ার প্রেমনিবেদনের ধরনটি একটু নূতন ধরনের। অবশ্য, শেষ পর্যন্ত উভয়ের পরিণয়ে গিরিজায়া চরিত্রের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

গুড্ল্যাড্ সাহেব (দেবীঃ ১/৮)। 'গুড্ল্যাড্ সাহেব রংপুরের প্রথম কালেক্টর। ফৌজদারী তাঁহারই জিম্মা। তিনি দলে দলে সিপাহী ডাকাত ধরিতে পাঠাইতে লাগিলেন। সিপাহীরা কিছুই করিতে পারিল না।'—উপন্যাসে এইটুকুই তাঁর ভূমিকা।

গুরগণ খাঁ (চন্দ্রঃ ১/১)। 'তিনি জাতিতে আরমানি; ইস্পাহান তাঁহার জন্মস্থান; কথিত আছে যে, তিনি পূর্বে বস্ত্রবিক্রেতা ছিলেন। কিন্তু অসাধারণ গুণ-বিশিষ্ট এবং প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। রাজকার্যে নিযুক্ত হইয়া তিনি অল্পকাল মধ্যে প্রধান সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হইলেন। কেবল তাহাই নহে, সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হইয়া, তিনি নূতন গোলন্দাজ সেনার সৃষ্টি করেন। ইউরোপীয় প্রথানুসারে তাহাদিগকে সুশিক্ষিত এবং সুসজ্জিত করিলেন, কামান বন্দুক যাহা প্রস্তুত করাইলেন, তাহা ইউরোপ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট হইতে লাগিল; তাঁহার গোলন্দাজ সেনা সর্বপ্রকারে ইংরেজের গোলন্দাজদিগের তুল্য হইয়া উঠিল। মীরকাশেমের এমত ভরসা ছিলো যে, তিনি গুরগণ খাঁর সহায়তায় ইংরেজদিগকে পরাভূত করিতে পারিবেন। গুরগণ খাঁর আধিপত্যও এতদনুরূপ হইয়া উঠিল; তাঁহার পরামর্শ ব্যতীত মীরকাশেম কোন কর্ম

করিতেন না ; তাঁহার পরামর্শের বিরুদ্ধে কেহ কিছু বলিলে মীরকাশেম তাহা শুনিতেন না। ফলতঃ গুরগণ খাঁ একটি ক্ষুদ্র নবাব হইয়া উঠিলেন। মুসলমান কার্যাধ্যক্ষেরা সুতরাং বিরক্ত হইয়া উঠিলেন।' (চন্দ্রঃ ২/২)

সংক্ষেপে বঙ্কিমচন্দ্র গুরগণ খাঁ সম্বন্ধে এই যে পরিচয় দান করেছেন, তার সঙ্গে ইতিহাসের কোথাও অমিল নেই। ইতিহাসে আছে—"...an Armenian called Qhadja-gurghin,......was put at the head of the artillery, with orders to new-model it after the European fashion ;...To raise his character, he was henceforward called Gurghinqhan, and distinguished by many favours, and he soon became a principal man is the Nawab's service" (Syed Gholam Hossein **Khan's** *Seir Mutaqherin*—Translated by M. Raymond under the pseudonym : Nota-Manus. Reprinted by D. C. Kerr, Vol. II, Sec. X, P. 389)

মীরকাশেমের উপর গুরগণের ছিল অসামান্য প্রতিপত্তি। তাই সয়ের মুতাক্ষরীণ-এ আছে—"Nawab seem to have sold himself to him totally." গুরগণের প্রাধান্যে অন্যান্য মুসলমান রাজকর্মচারীদের বিরক্ত হওযার কথাও ঐ গ্রন্থে আছে।

গুরগণ খাঁর জীবনের একমাত্র আশা বাংলা তথা ভারতবর্ষের সিংহাসনে আরোহণ করা। মীরকাশেমের প্রধান সেনাপতি তিনি হয়েছেন বটে, কিন্তু তা-ও তাঁর স্বার্থসিদ্ধির জন্য। তাঁর আশা—"আমি বাঙ্গালার অধিপতি হইতে চাহি—মীরকাশেমকে গ্রাহ্য করি না—যে দিন মনে করিব, সেই দিন উহাকে মস্‌নদ হইতে টানিয়া ফেলিয়া দিব।" ইতিহাসেও গুরগণ খাঁর এরূপ উচ্চাকাঙ্ক্ষী গর্বিত চরিত্র অঙ্কিত আছে।—"Gurghin-qhan......was both extremely imprudent, and extremely proud, and detested in his heart every man of birth or understanding..." (*Seir Mutaqherin*, P. 455)

গুরগণ খাঁর হৃদয়ে কোন মায়া-মমতা বা সদ্‌গুণ নাই। নিজ ভগ্নীকেও তিনি স্বার্থসিদ্ধির উপায়রূপে ব্যবহার করেছেন। এমন কি দলনী যখন মীরকাশেমের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করেছেন, তখন তিনি তাঁর নবাব-হারেমে প্রবেশের পথ রুদ্ধ ক'রে মরণের পথে ঠেলে দিয়েছিলেন। এর জন্য কখনো তাঁকে অনুশোচনা করতে দেখা যায়নি।

গুরগণ খাঁর কূটবুদ্ধি অসীম। তিনি অর্থের জন্য জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে দোস্তি করেছেন এবং পরবর্তী কালে সাহায্য পাবার আশায় নবাব-শত্রু অমিয়টকে মিথ্যা কথা বলে নবাবের রোষ থেকে রক্ষা করেছেন।

ফস্টর যেমন শৈবলিনীর জীবনের সর্বনাশে ইন্ধন জুগিয়েছে, তেমনি গুরগণ খাঁ-ও মীরকাশেমের জীবনে সর্বনাশ ডেকে এনেছেন। মীরকাশেম-দলনী কাহিনীর সহায়তায় যতটুকু প্রয়োজন, বঙ্কিম ততটুকুও গুরগণকে এনেছেন। তাই শেষ পর্যন্ত গুরগণ খাঁ-র কী হল তা জানা যায় না।

গোপাল উড়ে (বিষ: ৯ম পরি:)। প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালা। ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' গান ক'রে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। উড়িষ্যার কটক জেলার জাজপুর গ্রামে তাঁর পৈতৃক নিবাস। পিতা মুকুন্দদাস ছিলেন সাধারণ কৃষক। যৌবনে গোপাল অর্থোপার্জনের জন্য কলকাতায় আসেন এবং বীরসিংহ মল্লিকের বাড়ীতে পরিচারক নিযুক্ত হন। মল্লিক মহাশয় এক যাত্রাদল গঠন ক'রে 'বিদ্যাসুন্দর' অভিনয় করালে, গোপাল মালিনী সাজেন। তাঁর সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরের জন্য তিনি খ্যাতিলাভ করেন। পরে এই পালাটি তিনি নিজের দল ক'রে দীর্ঘকাল অভিনয় করেন। তিনি ঐ পালার জন্য কয়েকটি গানও রচনা করেন। আনুমানিক ৪০ বছর বয়সে নিঃসন্তান অবস্থায় তিনি পরলোকগমন করেন।

গোপাল বসু (রজনী ১/৪)। গোপালের সঙ্গে রজনীর বিয়ে ঠিক করে লবঙ্গলতা। 'গোপালের বয়স ত্রিশ বৎসর—একটি বিবাহ আছে, কিন্তু সন্তানাদি হয় নাই। গৃহধর্ম্মার্থে তাহার গৃহিণী আছে—সন্তানার্থে অন্ধ পত্নীতে তাহার আপত্তি নাই।' অবশ্য, শেষ পর্যন্ত এঁর সঙ্গে রজনীর বিয়ে হতে পারেনি।

গোবরার মা (দেবী: ১/১৩)। প্রফুল্লর 'হাটেঘাটে' যাবার জন্য ভবানী পাঠক গোবরার মাকে নিযুক্ত করেন। গোবরার মার—'বয়স তিয়াত্তর বছর, কালো আর কালা। যদি একেবারে কাণে না শুনিত, ক্ষতি ছিল না, কোন মতে ইসারা ইঙ্গিতে চলিত; কিন্তু এ তা নয়। কোন কোন কথা কখন কখন শুনিতে পায়, কখন কোন কথা শুনিতে পায় না। এরকম হইলে বড় গণ্ডগোল বাধে।' এই গণ্ডগোলের কিছু পরিচয় দিয়ে বঙ্কিম হাস্যরসের অবতারণা করেছেন।

গোবিন্দ অধিকারী (বিষ: ৯ম পরি:)। গোবিন্দ অধিকারী যাত্রাগানের দল ক'রে খ্যাতিলাভ করেন। রাসলীলা-বিষয়ক গানে তাঁর দল কৃতিত্ব দেখায়। আনুমানিক ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জাঙ্গীপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এই জাঙ্গীপাড়া গ্রাম অনেকে নদীয়া জেলায় বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ গ্রাম হুগলী জেলার অন্তর্গত জাঙ্গীপাড়া হওয়াই সম্ভব। কারণ, গোবিন্দ যেখানে কীর্তন শিক্ষা করেন, সেই আমতা থানার ধুরখালি গ্রাম, এই জাঙ্গীপাড়ারই নিকটস্থ।

গোবিন্দ জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণব ছিলেন। বাল্যকালে গ্রামের পাঠশালায়

অধ্যয়ন শেষ ক'রে আমতা থানার ধুরখালি গ্রামের গোলকদাস অধিকারীর কাছে কীর্তন শিক্ষা করেন। পূর্ববঙ্গ-নিবাসী জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যাত্রাদলে তিনি যোগ দেন। পরে নিজে দল গঠন করেন। তিনি স্বয়ং অভিনয় ক'রে খ্যাতিলাভ করেন। 'শুক সারির পালা' ও 'চূড়া নূপুরের দ্বন্দ্ব' নামে তাঁর দুখানি নাটক আছে। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

গোবিন্দকান্ত দত্ত (রজনী ২/২)। ইনি কাশীবাসী। কাশীতেই কথোপকথন-কালে তিনি অমরনাথকে রজনীর জীবন-সংক্রান্ত অনেক তথ্য পরিবেশন করেন। তার ফলেই অমরনাথ রজনীর খোঁজ করেন।

গোবিন্দলাল (কৃঃ উঃ ১/১)। "কৃষ্ণকান্তের উইল" উপন্যাসের নায়ক গোবিন্দ-লাল হরিদ্রাগ্রামের জমিদার কৃষ্ণকান্ত রায়ের আদরের ভ্রাতুষ্পুত্র—নয়নের মণি। গোবিন্দলাল শিক্ষিত, সচ্চরিত্র, সুন্দর, সর্বগুণান্বিত। গৃহে তাঁর মমতাময়ী পত্নী ভ্রমর। এই সব পাওয়ার মধ্যেও গোবিন্দলালের অতৃপ্তির আগুন, এই সুখের মধ্যেও দুঃখের ঘটনার বীজের অঙ্কুরই গোবিন্দলালকে স্মরণীয় ক'রে তুলেছে।

উপন্যাসের প্রথমে দেখা যায়, গোবিন্দলাল বারুণী পুষ্করিণী-তীরে ফুলবাগান নিয়েই সন্তুষ্ট। ভ্রমরকালো স্ত্রী ভ্রমরের সঙ্গে কৃত্রিম কলহের মধ্য দিয়ে স্ত্রীর প্রতি গভীর ভালবাসা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু বারুণী পুষ্করিণী-তীরে রোহিণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ-ই তাঁর জীবনে বিপর্যয়ের সূচনা করল। প্রথম দর্শনে রোহিণীর দুঃখের প্রতি সহানুভূতিই তিনি দেখিয়েছিলেন। তারপর কৃষ্ণকান্তের হাতে ধৃতা রোহিণীকে দয়া প্রদর্শন করতে গিয়ে গোবিন্দলাল আরো জড়িয়ে পড়েছেন।

স্ত্রীলোকের ছলনার কাছে গোবিন্দলালের মতো সরলস্বভাব পুরুষ বালকমাত্র। রোহিণীকে গোবিন্দলাল দেশত্যাগের পরামর্শ দিলে, রোহিণী গোবিন্দলালের কাছে তাঁর প্রতি অনুরাগের কথা জানায়।

তখন থেকেই গোবিন্দলালের মনে কিছুটা আত্ম-বিশ্বাসের অভাব দেখা যায়। তাই তাঁর সঙ্গে রোহিণীর যাতে আর সাক্ষাৎ না হয়, তার ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত। ভ্রমরের কাছে গোবিন্দলালের কিছু অপ্রাপনীয় ছিল কিনা তা স্পষ্ট ক'রে জানা যায় না, কিন্তু বেশ বোঝা যায়, ভ্রমরের কালো রূপের জন্যই হোক বা অন্য যে-কোন কারণেই হোক, রোহিণীর রূপের প্রতি তাঁর মোহ জন্মায়। কিন্তু ঘটনার গতি গোবিন্দলালের চিত্ত-বিপর্যয়কে আরো ত্বরান্বিত করেছে। ভ্রমরের বাক্যে রোহিণীর বারুণী পুষ্করিণীতে নিমজ্জন, গোবিন্দলালের উদ্ধার ও 'ফুল্লরক্তকুসুমকান্তি অধরযুগলে ফুল্লরক্তকুসুমকান্তি

অধরযুগল স্থাপিত করিয়া—রোহিণীর মুখে ফুৎকার' দান প্রভৃতি গোবিন্দলালকে আরো দুর্বল ক'রে ফেলেছে।

কিন্তু তখনো গোবিন্দলাল আদর্শবাদের সঙ্গে লড়াই ক'রে যাচ্ছেন।—'তখন গোবিন্দলাল সেই বিজন কক্ষ মধ্যে সহসা ভূপতিত হইয়া ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। মাটিতে মুখ লুকাইয়া, দরবিগলিত লোচনে ডাকিতে লাগিলেন, 'হা নাথ! নাথ! তুমি আমায় এ বিপদে রক্ষা কর!—তুমি বল না দিলে কাহার বলে আমি এ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইব?—আমি মরিব—ভ্রমর মরিবে। তুমি এই চিত্তে বিরাজ করিও—আমি তোমার বলে আত্মজয় করিব।' (১/১৭)

কিন্তু এই ঘটনা ভ্রমরের কাছে গোপন ক'রে গোবিন্দলাল একটি বড় ভুল ক'রে বসলেন। তার উপর জমিদারী কার্য দেখার নাম ক'রে দূরে পলায়নও তাঁর অপরিণামদর্শিতার পরিচয় দেয়। তারপর আর গোবিন্দলালের কোন হাত ছিল না ঘটনার উপর। লোকের রটনা, রোহিণীর ছলনা, ভ্রমরের অভিমান ও বাপের বাড়ী যাত্রা ইত্যাদি ঘটনা ভ্রমর ও গোবিন্দলালের মধ্যে ক্রমাগত ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। গোবিন্দলাল ভ্রমরের কাছেই ফিরে আসতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ভ্রমরের ব্যবহার তাঁকে ক্ষুব্ধ ক'রে তুলল। তারপর কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুকালে ভ্রমরকে সম্পত্তি দানের ঘটনা গোবিন্দলালের জীবনকে আমূল পরিবর্তিত ক'রে দিল।

এর পর থেকে গোবিন্দলাল রোহিণীর পিছনে ছুটে চলেছেন মদমত্ত মাতঙ্গের মতো। নেশা ভাঙল যেদিন রোহিণী আবার আঘাত দিল গোবিন্দলালকে। গোবিন্দলাল হত্যা করলেন রোহিণীকে। উত্তেজনার মাথায় গোবিন্দলাল হঠাৎ রোহিণীকে গুলি ক'রে হত্যা করলেও, অন্তরে অসন্তোষ বহুদিন থেকেই সঞ্চিত হচ্ছিল। এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র ক'রে তা হঠাৎ বহিঃপ্রকাশ লাভ করল মাত্র।

ভ্রমর ও রোহিণী—এই দুই নারীর টানা-পোড়েনে গোবিন্দলালের জীবন বিপর্যস্ত। ভ্রমরের মৃত্যুর পর বঙ্কিমচন্দ্র বিস্তারিতভাবে গোবিন্দলালের জীবনে এই দুই নারীর প্রভাবের স্বরূপ নির্ধারণ করেছেন।—'গোবিন্দলাল দুইজন স্ত্রীলোককে ভালবাসিয়াছিলেন—ভ্রমরকে আর রোহিণীকে।...রোহিণীর রূপে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন—যৌবনের অতৃপ্ত রূপতৃষ্ণা শান্ত করিতে পারেন নাই। ভ্রমরকে ত্যাগ করিয়া রোহিণীকে গ্রহণ করিলেন। রোহিণীকে গ্রহণ করিয়াই জানিয়াছিলেন যে, রোহিণী, ভ্রমর নহে—এ রূপতৃষ্ণা, এ স্নেহ নহে—এ ভোগ, এ সুখ নহে—এ মন্দারঘর্ষণপীড়িত বাসুকিনিশ্বাসনির্গত হলাহল, এ ধন্বন্তরিভাণ্ডনিঃসৃত সুধা নহে। বুঝিতে পারিলেন যে, এ হৃদয়সাগর, মন্থনের উপর মন্থন করিয়া যে হলাহল তুলিয়াছি, তাহা অপরিহার্য, অবশ্য পান

করিতে হইবে—নীলকণ্ঠের ন্যায় গোবিন্দলাল সে বিষ পান করিলেন। নীলকণ্ঠে কণ্ঠস্থ বিষের মত, সে বিষ তাঁহার কণ্ঠে লাগিয়া রহিল। সে বিষ জীর্ণ হইবার নহে— সে বিষ উদ্গীর্ণ করিবার নহে। কিন্তু তখন সেই পূর্ব্বপরিজ্ঞাতস্বাদ বিশুদ্ধ ভ্রমরপ্রণয়সুধ —স্বর্গীয় গন্ধযুক্ত, চিত্তপুষ্টিকর, সর্ব্বরোগের ঔষধস্বরূপ, দিবারাত্রি স্মৃতিপথে জাগিতে লাগিল। যখন প্রসাদপুরে গোবিন্দলাল রোহিণীর সঙ্গীতস্রোতে ভাসমান, তখনই ভ্রম তাঁহার চিত্তে প্রবলপ্রতাপযুক্তা অধীশ্বরী—ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে। তখন ভ্রম অপ্রাপনীয়া, রোহিণী অত্যাজ্যা,—তবু ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে। তাই রোহি অতশীঘ্র মরিল। যদি কেহ সেকথা না বুঝিয়া থাকেন, তবে বৃথায় এ আখ্যায়িক লিখিলাম।' (২/১৫)

গোবিন্দলালের জীবনে দুটি জিনিস তাঁর সর্বনাশের সহায়তা করেছে। একটি দয় অপরটি অভিমান। রোহিণীর প্রতি দয়াই ক্রমে ভালবাসায় পর্যবসিত হয়েছে। আবা ভ্রমরের ব্যবহারে অভিমানাহত হয়েই তিনি নিজের সর্বনাশের পথ প্রস্তুত করেছেন।

গোবিন্দলালের পরিণামটি অতি নাটকীয় বলে মনে হয়। এই উপন্যাসের প্রথ সংস্করণে, উন্মত্তাবস্থায় বারুণী পুষ্করিণীতে নিমজ্জনের দ্বারা গোবিন্দলালের পাপের শা দিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। কিন্তু, ১৮৯২ খ্রীঃ চতুর্থ সংস্করণ থেকে গোবিন্দলাল সন্ন্যা হয়ে ভ্রমরের স্মৃতি ভোলার চেষ্টা করেছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি ঈশ্বরের পায়ে সম কামনা-বাসনা সমর্পণ ক'রে শান্তি পেয়েছেন। প্রথমটির অপেক্ষা শেষোক্ত পরিণাম অনেকটা শিল্পসম্মত হলেও, ভ্রমরের মৃত্যুশয্যায় গোবিন্দলালের হাহাকারের মধ্য দি কাহিনীর সমাপ্তি হলেও বোধ হয় সর্বাঙ্গসুন্দর হত।

গোবিন্দলালের মাতা (কৃঃ উঃ ১/৩০)। 'পতিহীন কিছু আত্মপরায়ণা' মহিলার উপস্থিতি নিতান্তই গৌণ। কিন্তু বঙ্কিম তাঁকে কিছুটা দায়ী করেছেন ভ্রমর গোবিন্দলালের বিচ্ছেদের জন্য। তিনি যদি পাকা গৃহিণী হতেন, তাহলে হয় এ অঘটন ঘটত না। কিন্তু তিনি পুত্রবধূর বিষয়-সম্পত্তি পাওয়াতে সংসার ভাসিয়ে দি কাশীতে গেলেন। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

গোবর্ধন (আনন্দঃ ২/১)। সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণের পর শান্তিকে—'গোবর্ধন না একজন পরিচারক—সেও ক্ষুদ্রদরের সন্তান—প্রদীপ হাতে করিয়া ঘর দেখাই বেড়াইতে লাগিল। কোনটাই শান্তির পছন্দ হইল না।'...উপন্যাসে এইটুকু ম তার উপস্থিতি।

গৌরীঠাকুরাণী (আনন্দঃ ৩/৪)। 'আনন্দমঠে'র গুরুগম্ভীর পরিবেশে গৌ ঠাকুরাণীর রসবতী চরিত্রটি লঘুরসের অবতারণা করেছে। বঙ্কিম সামান্য কল

আঁচড়েই এই চরিত্রটি সৃষ্টি করেছেন। ভবানন্দকে দেখে তার স্থূল দেহে খাটো আঁচলখানি মাথা পর্যন্ত আনবার প্রয়াস, ভবানন্দের সাঙ্গা করার প্রস্তাবে তার আনন্দ—পাঠকের রঙ্গরস উপভোগের উৎস।

চঞ্চলকুমারী (রাজঃ ১/১)। চঞ্চলকুমারী চঞ্চলমতী রাজকুমারী। উপন্যাসে রূপনগর নামে এক ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজকন্যারূপে তাকে অভিহিত করা হয়েছে। টডের 'The Annals and Antiquities of Rajasthan' গ্রন্থে রূপনগরের এক রাজকুমারের কাহিনী বর্ণিত আছে। (দ্রঃ The Annals and Antiquities of Rajasthan, James Tod—Published by S. K. Labiri & Co., 1894 Vol. I. P. 351-52)। কিন্তু যদুনাথ সরকারের মতে, "রাজসিংহ" উপন্যাসের রাজকুমারী চঞ্চলকুমারী আসলে কিসনগড়ের রাজকুমারী চারুমতী। ঔরঙ্গজেব চারুমতীকে বিয়ে করতে চাইলে, রাজকন্যা কুলপুরোহিতকে দিয়ে রাজসিংহের কাছে বিবাহ প্রস্তাব পাঠান। রাজসিংহের সঙ্গে চারুমতীর বিয়ে হলেও, এ নিয়ে ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে কোন সংঘর্ষ হয়নি। (দ্রঃ সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাবলী—বঙ্কিম শতবার্ষিকী সংস্করণে আচার্য যদুনাথ সরকার লিখিত ভূমিকা, ।৵০)।

কিন্তু চারুমতীই হোন, বা রূপনগরের রাজকুমারীই হোন, বঙ্কিম যাকে 'রাজসিংহ' উপন্যাসে চঞ্চলকুমারীরূপে গড়ে তুললেন, তাকে ইতিহাসে কোথাও পাওয়া যাবে না।

উপন্যাসে চঞ্চলকুমারীর আবির্ভাব একটি অতি-নাটকীয় আচরণের মাধ্যমে। ঔরঙ্গজেবের চিত্রদলনের মধ্যে যত উত্তেজনার খোরাক থাক, এর পেছনে এক অপরিণত-বুদ্ধি বালিকার অহেতুক উত্তেজনা ও অসঙ্গত রসিকতার মনোবৃত্তিই প্রকাশিত। অবশ্য, এর দ্বারা বঙ্কিমের একটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। মুঘল রাজত্বের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ রাজপুত জাতির মধ্যে এত প্রবল আকার ধারণ করেছিল যে, তার ঢেউ রাজপুত অন্তঃপুরেও এসে প্রতিশোধের বাসনা জাগিয়ে তুলেছিল। তার প্রকাশ চঞ্চলকুমারীর চিত্রদলনে।

উপন্যাসের মধ্যে মুঘল-রাজপুত সংঘর্ষের যে ভয়াবহ বহ্নি জ্বলে উঠল, তার মূলে রয়েছে চঞ্চলকুমারীর ওই ভ্রান্তি। নাটকের দিক থেকে হলে এ-কে বলা যেত 'Tragedy of Error'। এই ঘটনার জন্য চঞ্চলকুমারীকে যে মূল্য দিতে হয়েছে, তা তাঁর জীবনের Tragedy-র চেয়ে কিছু কম নয়।

চঞ্চলকুমারী রাজকুমারী। রাজসিংহের চিত্রদর্শনে যেভাবে তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়েছেন, তাকে কিছুটা অস্বাভাবিক বল্লে মনে হওয়া অন্যায় নয়। বঙ্কিম নিজেও এ নিয়ে গণ্ডগোলের মধ্যে পড়েছিলেন।—'চঞ্চলকুমারীর কি হইয়াছে, তা তো বলিতে

পারি না। শুধু ছবি দেখিয়া কি হয়, তা তো জানি না। অনুরাগ ত মানুষে মানুষে— ছবিতে মানুষে হইতে পারে কি? পারে, যদি তুমি ছবিছড়াটুকু, আপনি ধ্যান করিয়া লইতে পার। পারে, যদি আগে হইতে মনে মনে তুমি কিছু গড়িয়া রাখিয়া থাক, তার পর ছবিখানাকে (বা স্বপ্নটাকে) সেই মনগড়া জিনিসের ছবি বা স্বপ্ন মনে কর। চঞ্চলকুমারীর কি তাই কিছু হইয়াছিল? তা আঠারো বছরের মেয়ের মন আমি কেমন করিয়া বুঝিব বা বুঝাইব?' (১/৩)

রাজসিংহের প্রতি আত্ম-নিবেদনে চঞ্চলকুমারী সর্বদাই সংযত থেকেছেন। রাজসিংহের প্রতি চঞ্চলকুমারীর ভালবাসা, ব্রত—বীরপূজা বলেই মনে হয়। চঞ্চল প্রথমদিকে বালিকাসুলভ চপলতা দেখালেও, ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে ক্রমশঃ তিনি গম্ভীর হয়েছেন। তা না হলে বোধ হয় প্রৌঢ় রাজসিংহের সহধর্মিণীরূপে তাঁকে সহ্য করা যেত না।

চঞ্চলকুমারীর দৃঢ় মনোবলও লক্ষ্য করার বিষয়। রাজসিংহের নিকট থেকে কোন সংবাদ না পেয়ে যখন তাঁকে মোগলবাহিনীর সঙ্গে পাঠাবার আয়োজন চলছে, তখনো তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে আত্মহত্যার সংকল্পে অটল থেকেছেন। আবার, রাজসিংহ মবারকের মুখোমুখি সংগ্রামে চঞ্চলকুমারীর আবির্ভাব তাঁর সাহসিকতার পরিচয় দেয়। বঙ্কিম সে সময় তাঁকে ভৈরবী মূর্তিতে রূপান্তরিত করেছেন। তাঁর জন্যই যে বিরাট রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম সুরু হয়েছে, তা স্বচক্ষে দেখে তাঁর নারী-হৃদয় কেমন ক'রে নিশ্চল থাকবে! তাই চঞ্চল সর্বপ্রথম মরবার অধিকার চেয়েছেন। মবারক চঞ্চলকুমারীকে ছেড়ে দিলে, তিনি মবারকের বিপদের কথাও চিন্তা করেছেন। কিন্তু রাজসিংহের প্রাসাদে নিঃসঙ্গতা কাটাবার জন্য যখন চঞ্চল সদ্য-বিবাহিত স্বামী মাণিকলালকে ছেড়ে নির্মলকুমারীকে নিজের কাছে থাকতে বাধ্য করেছেন, তখন একটু স্বার্থপরতার ভাব বা নারীসুলভ দয়ামায়ার অভাব দেখা যায়। উদিপুরীকে দিয়ে তামাক সাজানোর ঘটনায় চঞ্চলকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, তিনি উপযুক্ত ব্যবহারই করেছেন। অথচ, জেব-উন্নিসার প্রতি তাঁর কি সৌজন্যসূচক আচরণ!

রাজসিংহের অন্তঃপুরে থেকেও যেভাবে চঞ্চল পিতৃআদেশের অপেক্ষায় দীর্ঘদিন ব্রহ্মচারী-জীবন যাপন করেছেন, তাতে তাঁকে শ্রদ্ধা করা চলে। কিন্তু বাইরে রণোন্মাদনার মধ্যে চঞ্চলকুমারীর নিঃসঙ্গ বেদনার অশ্রুসিক্ত প্রতীক্ষার দিনগুলো উপন্যাসে অনুক্তই থেকে গেল।

চঞ্চলা (ইন্দিরা ২১ পরিঃ)। ইন্দিরার স্বামীর সঙ্গে ইনি রসিকতা করতে এসেছিলেন।

চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার (সীতাঃ ১/৩)। সীতারামের গুরুদেব। তিনি কেবল পণ্ডিতই নন, শাসনকার্যেও দক্ষ। চন্দ্রচূড় সীতারামকে শুধু পরামর্শই দান করেননি। তাঁর বিপদে তিনি দৃঢ়হস্তে রাজ্যের হাল ধরেছিলেন। তোরাব খাঁর সঙ্গে সীতারামের রাজ্যের দর-কষাকষির ছলে কালক্ষেপ করার নীতিতে তাঁর কূটনীতিজ্ঞানের পরিচয় মেলে।

সীতারামের চিত্তবিভ্রমের সময় চন্দ্রচূড় অনেক চেষ্টা করেছিলেন রাজাকে ফেরাবার। কিন্তু অত্যাচারের মাত্রা যখন সীমা ছাড়িয়ে গেছে, তখন একদিন কাউকে কিছু না বলে তিনি তীর্থযাত্রা করেছেন। আর মহম্মদপুরে ফেরেননি।

চন্দ্রশেখর শর্মা (চন্দ্রঃ উপক্রমণিকা, ৩য় পরিঃ)। বঙ্কিমচন্দ্র আলোচ্য উপন্যাসটির নাম যদি "চন্দ্রশেখর" না রাখতেন, তাহলে চন্দ্রশেখর চরিত্রটির গুরুত্ব নিয়ে সমস্যায় পড়তে হত না। কিন্তু চন্দ্রশেখর চরিত্রের উপর বঙ্কিমের যে যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল, তা গ্রন্থটির নামকরণ থেকেই বোঝা যায়। অথচ, উপন্যাসমধ্যে চন্দ্রশেখর নিতান্ত সাধারণভাবেই বিদ্যমান। শৈবলিনীকে বিবাহ, শৈবলিনীকে হারানো এবং শৈবলিনীর প্রত্যাগমনের মধ্যে যেন সমান মনোভাব চন্দ্রশেখরের। আসলে, চন্দ্রশেখর বঙ্কিমের আদর্শবাদেরই প্রতিচ্ছবি। তাই তাঁর এত গুরুত্ব।

চন্দ্রশেখর জীবনের দীর্ঘকাল অধ্যয়ন ক'রে কাটিয়েছেন। ৩২ বছর তাই তিনি সংসারবিমুখ ছিলেন। কিন্তু শৈবলিনী হঠাৎ তাঁর জীবনে এসে পড়লো। শৈবলিনীকে তিনি বিবাহ করলেন বটে, কিন্তু অধ্যয়নেই মেতে থাকলেন।

চন্দ্রশেখর একটু উদাসী ধরনের, কিন্তু একেবারে যে মানব-চরিত্র সম্বন্ধে অজ্ঞ তা নন। তাই মাঝে মাঝে শৈবলিনীর জন্য তাঁর মনে জাগে বেদনাবোধ।—"হায়! কেন আমি ইহাকে বিবাহ করিয়াছি। এ কুসুম রাজমুকুটে শোভা পাইত—শাস্ত্রানুশীলনে ব্যস্ত ব্রাহ্মণপণ্ডিতের কুটীরে এ রত্ন আনিলাম কেন? আনিয়া আমি সুখী হইয়াছি, সন্দেহ নাই। কিন্তু শৈবলিনীর তাহাতে কি সুখ? আমার যে বয়স, তাহাতে আমার প্রতি শৈবলিনীর অনুরাগ অসম্ভব—অথবা আমার প্রণয়ে তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষা নিবারণের সম্ভাবনা নাই। বিশেষ, আমি ত সর্ব্বদা আমার গ্রন্থ লইয়া বিব্রত; আমি শৈবলিনীর সুখ কখন ভাবি? আমার গ্রন্থগুলি তুলিয়া পাড়িয়া, এমন নবযুবতীর কি সুখ? আমি নিতান্ত আত্মসুখপরায়ণ—সেইজন্যই ইহাকে বিবাহ করিতে প্রবৃত্তি হইয়াছিল। এ ক্ষণে আমি কি করিব? এই ক্লেশসঞ্চিত পুস্তকরাশি জলে ফেলিয়া দিয়া আসিয়া রমণীমুখপদ্ম কি এ জন্মের সারভূত করিব? ছি, ছি, তাহা পারিব না।

তবে কি এই নিরাপরাধিনী শৈবলিনী আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে? এই সুকুমার কুসুমকে কি অতৃপ্ত যৌবনতাপে দগ্ধ করিবার জন্যই বৃন্তচ্যুত করিয়াছিলাম?" (১/২)

চন্দ্রশেখরের মধ্যে যদি এই আত্মানুসন্ধানটুকু না থাকত, তাহলে তিনি আদর্শের পুতুল হয়ে যেতেন, পাঠকমনে মানবতার আবেদন জাগাতে পারতেন না।

চন্দ্রশেখর কেবলমাত্র পণ্ডিত নন, হস্তরেখাবিশারদ্ও। রাজদরবারে তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তিও আছে। মীরকাশেমের ভাগ্য-গণনার জন্য যখন তিনি বাড়ী ছেড়েছিলেন, সেই অবসরে শৈবলিনীকে ফস্টর হরণ ক'রে চন্দ্রশেখরের সর্বনাশসাধন করল। গৃহিণীহীন গৃহে ফিরে চন্দ্রশেখর চারিদিক অন্ধকার দেখলেন। শৈবলিনীকে যে তিনি কতখানি ভালবাসতেন, তা অনুভব করতে পারলেন। তাই সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে, প্রাণাপেক্ষা প্রিয় গ্রন্থরাজিকে ভস্মীভূত ক'রে বেরিয়ে পড়লেন পথে।

তারপর চন্দ্রশেখরকে দেখি রামানন্দ স্বামীর শিষ্যরূপে উপদেশ গ্রহণ করতে। এবং বিভিন্ন কার্যে সহায়তা করতে। শৈবলিনীকে মৃত্যুর হাত থেকে রামানন্দ স্বামী ও চন্দ্রশেখর রক্ষা করলেন, কিন্তু চিত্তশুদ্ধির জন্য নানাপ্রকার ক্রিয়াকলাপ আরোপ করতে লাগলেন। অনশনক্লিষ্টা, নরকভয়ে ভীতা শৈবলিনীর সামনে যে চন্দ্রশেখরকে আমরা দেখি, তিনি নিরাসক্ত ব্রহ্মচারীমাত্র। কিন্তু ব্রহ্মচারীর হৃদয়েও স্ত্রীর প্রতি প্রেম প্রচ্ছন্ন-ভাবে বিদ্যমান। তাই শৈবলিনীর মধ্যে উন্মত্ততার লক্ষণ দেখা গেলে, চন্দ্রশেখর গুরুদেবকে সকাতরে প্রশ্ন করলেন—"গুরুদেব! একি করলে? এ কি করলে?"

তারপর রামানন্দ স্বামীর যোগাভ্যাস প্রয়োগ ক'রে চন্দ্রশেখর শৈবলিনীর কাছ থেকে জেনেছেন যে, সে ইংরাজ কর্তৃক অপহৃতা হলেও অশুচি হয়নি। সমাজ-শাসক বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে এই প্রমাণের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের মহিমা এর জন্য কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। বিশেষ ক'রে চন্দ্রশেখরের শৈবলিনীর প্রতি প্রেমের যে গভীরতা দেখানো সম্ভব ছিল, তা ব্যর্থ হয়েছে।

চন্দ্রশেখর আবার শৈবলিনী সম্বন্ধে প্রতাপকে বলেছেন—"এক্ষণে জানিলাম যে, ইনি নিষ্পাপ। যদি লোকরঞ্জনার্থ কোন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, তবে তাহা করিব। করিয়া ইহাকে গৃহে লইব। কিন্তু সুখ আর আমার কপালে হইবে না।"

শৈবলিনীর পবিত্রতার ব্যাপারটায় এতটা বাড়াবাড়ি না করলে, চন্দ্রশেখর চরিত্রটি প্রেমের উদারতায় মহান হয়ে উঠতে পারতো। সুখ হবে না জেনেও চন্দ্রশেখরের শৈবলিনীকে গ্রহণ, রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' গল্পের চরম Tragic পরিণতি এনে দিতে পারত।

চম্পকলতা (রজনী ১/৫)। দ্রঃ চাঁপা (রজনী ১/৫)।

চাঁদ শাহ (সীতা: ১/৯)। মুসলমান ফকিরদের মধ্যে যে ভালো লোকও ছিলেন এটা প্রমাণ করার জন্যই, "সীতারাম" উপন্যাসের জন্য একজন অত্যাচারী ফকিরের বিপরীত চিত্ররূপে, বঙ্কিম এই চাঁদ শাহ ফকিরের অবতারণা করেছেন। এই ফকির হিন্দু-মুসলমানের প্রতি সমদর্শী। বিশেষভাবে সীতারামের প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রবল। গঙ্গারামের বিশ্বাসঘাতকতা-বৃত্তান্ত তিনি সভায় বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই নিরীহ ভালমানুষটিও শেষ পর্যন্ত সীতারামের উচ্ছৃঙ্খলতায় মর্মাহত হয়ে তাঁর রাজ্য ত্যাগ করেছেন এই বিশ্বাস নিয়ে—"যে দেশে হিন্দু আছে, সে দেশে আর থাকিব না। এই কথা সীতারাম শিখাইয়াছে।"

চাঁদ সুলতানা (চন্দ্র: ৩/৩)। শৈবলিনীকে একজন নবাবের সৈনিক একবার চাঁদ সুলতানার সঙ্গে তুলনা করে।

চাঁদ সুলতানা বিজাপুররাজ আদিলশাহের পত্নী। স্বামীর মৃত্যুর পর আক্রান্ত রাজ্য রক্ষার জন্য তিনি নিজে মুঘলবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তিনি আহমদনগরের নিজাম শাহী রাজবংশের তৃতীয় ভূপতি হোসেনশাহের কন্যা। হামিদ খাঁ নামক এক দুর্বৃত্তের হাতে এই মহিলার মৃত্যু ঘটে। তাঁর মৃত্যুর অল্পকাল পরেই আহমদনগর মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

চাঁপা (বিষ: ৪র্থ পরি:)। কুন্দের এক প্রতিবাসিনীর কন্যা। কুন্দের বাবার মৃত্যুর পর কুন্দকে সঙ্গ দেবার জন্য এক প্রতিবাসিনী কুন্দের সমবয়সী নিজ কন্যা চাঁপাকে পাঠিয়ে দিয়েছিল। চাঁপার কাছেই কুন্দ ব্যক্ত করেছে—মার সঙ্গে তার দর্শনের অলৌকিক বৃত্তান্ত। মার প্রদর্শিত দুজন ব্যক্তির একজন যে নগেন্দ্র—একথাও চাঁপার সামনেই কুন্দ প্রকাশ করেছে। শেষোক্ত ঘটনাটি সংঘটনের জন্যই বোধ হয় চাঁপা-চরিত্রের অবতারণা।

চাঁপা, চম্পকলতা (রজনী ১/৫)। গোপাল বসুর বিবাহিতা পত্নী। চাঁপা বড় শক্ত মেয়ে। রজনী তার সপত্নী হবে শুনে, তার বাড়ী গিয়ে বিয়ে ভাঙবার সব ব্যবস্থা করেছে।

চিকিৎসক বা মহাপুরুষ (আনন্দ: ৪/৭)। চিকিৎসক বা মহাপুরুষের অলৌকিক চরিত্রটি বঙ্কিমের আদর্শের প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। উপন্যাসের শেষদিকে দুবার ইনি উপস্থিত হয়েছেন। প্রথমে চিকিৎসকবেশে তিনি মৃত জীবানন্দকে উদ্ধার ক'রে শান্তির হাতে সমর্পণ করেছেন। কিন্তু শান্তিকে কোন উপদেশ তিনি দেননি। অকস্মাৎ অন্তর্হিত হয়েছেন। শান্তির নির্ধারিত পথ সঠিক পথ বলেই বোধ হয় বঙ্কিমের আর কিছু বলার ছিল না।

কিন্তু মহাপুরুষরূপে সত্যানন্দকে ইনি কিছু উপদেশ দিয়েছেন। সত্যানন্দের কর্মোদ্যমকে স্তিমিত ক'রে ভাগ্যের বিধানকে ইনি মেনে নিয়েছেন। আসলে, বঙ্কিম ইতিহাসের বিধানকে অমান্য ক'রে কাহিনীকে অবাস্তব করতে চাননি। তাই ইংরেজ রাজত্বই কায়েম থাকল। তবে ইংরেজের প্রতি বঙ্কিমের যে মনোভাব তা অনুরক্ত ভক্তের নয়, জাতিগঠনকারী মহামানবের। তাই আমাদের দেশে বহির্বিষয়ক জ্ঞানের জন্য যে ইংরাজ রাজত্বের প্রয়োজন আছে, একথা তিনি মহাপুরুষের মুখ দিয়ে ব্যক্ত করেছেন।

চিত্রা (রাধাঃ ৮ম পরিঃ)। রাধারাণীর দাসী। মণিবাণীর দয়িতের সঙ্গে মিলনে সে পুরস্কার আদায় করতে পটু।

চুণিলাল দত্ত (কৃঃ উঃ ২/১০)। প্রসাদপুরে বসবাসকালে গোবিন্দলালের ছদ্মনাম। দ্রঃ গোবিন্দলাল।

জগৎশেঠ [স্বরূপচন্দ ও মাহতাবচন্দ] (চন্দ্রঃ ২/৬)। মুর্শিদাবাদস্থ বণিক পরিবারের পদবী ছিল জগৎশেঠ। এঁদের আদি বাসস্থান ছিল রাজপুতনার যোধপুর রাজ্যের শগর নামক নগরে। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে স্বরূপচন্দ ও মাহতাবচন্দ নামক শেঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে গুরগণ খাঁ নবাবের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ দৃঢ় করার জন্য অর্থাগমের পরামর্শ করেছিলেন।

এঁরা ঐতিহাসিক ব্যক্তি। দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক হিসাবে এঁদের নাম ইতিহাসে কলঙ্কিত। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মীরকাশেম এঁদের বন্দী করার আদেশ দেন। উধুয়ানালার যুদ্ধে নবাব পরাজিত হলে এঁদের নিয়ে মুঙ্গেরে আসেন। অবশেষে নবাবের ক্রোধে এঁদের প্রাণবিনাশ হয়।

জগৎসিংহ (দুর্গেঃ ১/১)। জগৎসিংহ "দুর্গেশনন্দিনী" উপন্যাসের নায়ক। অম্বরাধিপতি মানসিংহের পুত্র তিনি। বর্তমান উপন্যাসে জগৎসিংহের যে কাহিনী বর্ণিত আছে—তার উৎস 'Stewart's *History of Bengal*'। কিন্তু এই বর্ণনায় অনেক ভুল তথ্য আছে। যদুনাথ সরকারের মতে, আকবরের সমসাময়িক পারসিক ইতিহাসগুলির মধ্যে আকবরনামা (৩য় খণ্ডে—ভলুমে) গ্রন্থটিতেই জগৎসিংহের যুদ্ধের বিশ্বাসযোগ্য বর্ণনা আছে। যদুনাথ সরকার আকবরনামার যে প্রয়োজনীয় অংশটুকুর বঙ্গানুবাদ করেছেন তাতে জানা যায়, মানসিংহ পুত্রের অধীনে এক ফৌজ দিয়ে পাঠানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পাঠালে, কত্‌লু খাঁর সেনাপতি মদের নেশায় অচেতন ও অনভিজ্ঞ জগৎসিংহকে সহজেই বন্দী করেন। এর থেকে জানা যায়, জগৎসিংহের চরিত্র ছিল নিতান্তই মদ্যলিপ্ত। এবং অতিরিক্ত মদ খাওয়ার ফলেই ৬ই অক্টোবর ১৫৯৯

খ্রীষ্টাব্দে আগ্রার নিকট তিনি অকালে মৃত্যুবরণ করেন। বলা বাহুল্য, উপন্যাসের জগৎসিংহ সম্পূর্ণ ভিন্নধরনের চরিত্র।

উপন্যাসে জগৎসিংহের বীরত্ব সর্বত্রই প্রকাশিত হয়েছে। গড়-মান্দারণ দুর্গে বন্দী অবস্থায় তিনি জ্ঞান না হারানো পর্যন্ত বীরের মতো যুদ্ধ করেছেন। ওসমানের সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধেও তাঁর বীরত্বের মহিমা ঘোষিত হয়েছে। বীরত্বের সঙ্গে এই চরিত্রের মধ্যে আদর্শবাদী মনোভাবটিও সংমিশ্রিত হয়েছে। তাই ওসমান কর্তৃক প্রলোভিত হয়ে তিনি বাদশাহের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে সন্ধিস্থাপনে স্বীকৃত হননি।

জগৎসিংহ কেবল বীর নন, প্রেমিকও। প্রেমিকাকে দর্শনের জন্য তিনি বিমলার সঙ্গে গড়-মান্দারণ দুর্গে চোরের মতো প্রবেশ করেছিলেন, অথচ সেই জগৎসিংহই আয়েষার সাহায্যে কত্‌লু খাঁর বন্দীত্ব থেকে পালাতে চাইলেন না,—এমনি প্রেমের মহিমা!

প্রেমিক হিসাবে জগৎসিংহের সঙ্গে ওসমানের পার্থক্য এই যে, একজন না চাইতেই পান—অপরজন চেয়েও প্রত্যাখ্যাত হন। তবে জগৎসিংহের প্রেমেও একনিষ্ঠতা আছে। তিলোত্তমার সম্বন্ধে ভুল সংবাদ শুনে তার প্রতি জগৎসিংহের যতই ক্রোধ জন্মাক এবং তিলোত্তমাকে যতই রূঢ় আঘাত দিন না কেন, আয়েষার মতো রমণীরত্নের প্রেমোপহার গ্রহণ না ক'রে যথার্থই প্রেমিকরূপে চিহ্নিত হয়েছেন। জগৎসিংহের কোমলহৃদয়ে আয়েষার জন্য ছিল অকৃত্রিম মমত্ববোধ। অবশ্য, এই দুই নায়িকার আকর্ষণের মধ্যে পড়ে পরবর্তী কালের ঔপন্যাসিকদের হাতে জগৎসিংহের মধ্যে হৃদয়দ্বন্দ্বের ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি হ'তে পারত, বঙ্কিমের উপন্যাসে তার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়নি। সাধারণ মান-অভিমানের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত স্বাভাবিক মিলনান্তক পরিণতিই ঘটেছে উপন্যাসের মধ্যে।

বঙ্কিমচন্দ্র এই চরিত্রটিকে নায়কের আদর্শানুসারে যত্নের সঙ্গে গড়লেও, উপযুক্ত বিশ্লেষণের অভাবে চরিত্রটি সক্রিয় হয়ে উঠতে পারেনি।

জন স্ট্যালকার্ট (চন্দ্রঃ ৬/৪)। সমরুর কাছে ফস্টর এই নামে পরিচয় দিয়েছিল।

জন্‌সন্‌ (চন্দ্রঃ ২/৭)। অমিয়টের সহচর ইংরেজ। স্বতন্ত্র চরিত্র হিসাবে নয়, অমিয়টের ছায়ারূপেই 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে বিদ্যমান।

জনার্দন (মৃণাঃ ২/২)। জনার্দন মনোরমার প্রতিপালক। বৃদ্ধ জনার্দন তাঁর বৃদ্ধা স্ত্রী ও মনোরমাকে নিয়ে নবদ্বীপের এক কুটীরে বাস করতেন। ঝড়ে সে কুটীর ভেঙে যাওয়ায়, রাজপুরুষদের অনুগ্রহে তিনি এক রাজগৃহে স্থান পেয়েছিলেন। জনার্দন বধির। তাঁর সঙ্গে হেমচন্দ্রের কথোপকথনে বঙ্কিম হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন।

বিশেষ ক'রে যখন জনার্দন তাঁর স্ত্রীকে 'কালা' অপবাদ দেন, তখন হাস্যরস আরো জমে ওঠে।

কিন্তু উপন্যাসে জনার্দনের প্রয়োজন অন্যত্রও আছে। জনার্দন মনোরমার পিতা কেশবের আচার্য। মৃত্যুকালে কেশব এঁর হাতে মনোরমার ভার দিয়ে যান এবং পশুপতি যে মনোরমার স্বামী, সেকথা বলে যান। উপন্যাসে অনুক্ত থাকলেও মনে হয়, জনার্দনের কোন সন্তানাদি ছিল না, তাই মনোরমাকে তাঁরা প্রাণাপেক্ষা ভালবাসতেন।

জনার্দনের ব্রাহ্মণী (মৃণা: ২/২)। উপন্যাসে নামোল্লেখমাত্র আছে।

জয়ধর সিংহ (দুর্গে: ১/৫)। জয়ধর সিংহ বীরেন্দ্রসিংহের পূর্বপুরুষ। তিনি হোসেনশাহার একজন হিন্দু সৈনিক ছিলেন। কালক্রমে গড-মান্দারণ তিনি জায়গির হিসাবে প্রাপ্ত হন। কোন চরিত্র-বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়নি।

জয়ন্তী (সীতা: ১/১১)। প্রফুল্লর নিষ্কাম ধর্মানুশীলন-জীবনের সঙ্গিনী ছিল নিশি, শ্রীর সন্ন্যাস-জীবনের সঙ্গিনী জয়ন্তী। কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য প্রচুর। নিশি প্রধানতঃ প্রফুল্লর চিন্তার দ্বারা আচ্ছন্ন, অথচ শ্রী জয়ন্তীর দ্বারাই প্রভাবিত।

জয়ন্তী সন্ন্যাসিনী। বঙ্কিম অপ্রয়োজনবোধে তাঁর পূর্বজীবনের কোন কথা বলেননি। কিন্তু জয়ন্তীর মধ্যে সন্ন্যাসধর্মের কঠোরতা অপেক্ষা স্নেহের কোমলতা অধিক পরিমাণে বিদ্যমান। তাই দুঃখিনী শ্রীকে তিনি বোনের মতোই ভালবেসেছেন। নিজের পথে শ্রীকে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছেন।

জয়ন্তী শ্রী ও সীতারামের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী। গঙ্গারামের বিশ্বাসঘাতকতায় সীতারামের নিশ্চিত সর্বনাশকালে জয়ন্তীই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রতিরোধ দান করেছেন। আবার, শ্রীর মুখের দিকে তাকিয়েই তিনি গঙ্গারামের দ্বিতীয় বারের প্রাণদণ্ড মকুব ক'রে দিয়েছেন। শ্রীকে উদ্ধার করার সময়ও জয়ন্তীর স্নেহভাবই প্রকাশিত।

কিন্তু সর্বক্ষেত্রে জয়ন্তীর বুদ্ধির প্রশংসা করা চলে না। তাহলে সীতারামের নৈতিক অবনতির কারণ সম্বন্ধে সম্যক্ অবহিত হয়েও তিনি কেন শ্রীকে সংসারধর্মে প্রবেশ করতে অনুরোধ করলেন না।

জয়ন্তীকে বঙ্কিম বাইরে সন্ন্যাসিনী সাজিয়েছেন, কিন্তু অন্তরের মানবীভাবকে দূরে সরিয়ে দেননি। সীতারামের আদেশে জয়ন্তী নিজেই বিবস্ত্রা হতে গিয়ে নিজেই নারীত্বের লজ্জা ও সঙ্কোচকে আবিষ্কার ক'রে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন।

সন্ন্যাসিনী জয়ন্তী অপেক্ষা এই মানবী জয়ন্তীই উপন্যাসে সর্বাপেক্ষা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

জয়সিংহ (রাজঃ ৫/৬)। জয়পুরের রাজা জয়সিংহ ঔরঙ্গজেবের অনুগত ছিলেন। তিনি ঔরঙ্গজেবের সেনাপতিত্বও করেছিলেন। কিন্তু—"বিশ্বাসঘাতক বন্ধুহন্তা ঔরঙ্গজেবের কৌশলে বিষপ্রয়োগ দ্বারা তাঁহার মৃত্যু সাধিত হইয়াছিল।"

জাঁহাগীর (কপাঃ ৩/১)। দ্রঃ সেলিম।

জীবন ভাণ্ডারী (সীতাঃ ১/২)। সীতারামের পরিবারের ভাণ্ডাররক্ষক। "জীবন ভাণ্ডারীর বয়স কিছু বেশী, কতকগুলো চাবি ঘুন্‌সিতে ঝোলান। মুখ বড় রুক্ষ।" কিন্তু প্রাপ্তিযোগ থাকলে জীবন ভাণ্ডারী বেশ প্রসন্ন হয়, এটা বোঝা যায়।

জীবানন্দ (আনন্দঃ ১/৮)। 'আনন্দমঠে'র একই শ্রেণীর সন্ন্যাসী-চরিত্রের মধ্যে জীবানন্দই সর্বাপেক্ষা ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। জীবানন্দের পূর্বকাহিনীর কিছু আভাষ দান ক'রে এবং সন্ন্যাসী থাকাকালীন কিছু কিছু দোষের প্রকাশ দেখিয়ে লেখক তাঁর মধ্যে রক্তমাংসের প্রলেপ লাগিয়েছেন।

জীবানন্দকে প্রথম আমরা দেখলাম যে, তিনি মহেন্দ্রের কন্যাকে নিয়ে নিজ ভগ্নীর কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। সেখানে তিনি ভগ্নী নিমাইয়ের সঙ্গে রসিকতায় মেতেছেন, তাতে সন্ন্যাসীর আবরণটুকু খসে পড়েছে। সাধারণ মানুষের মতোই ভোজনরসিক জীবানন্দ—তিনজনের খাদ্য, একটি পাকা কাঁঠাল উদরসাৎ ক'রেও প্রতীক্ষা করেছেন নূতন কোন খাবারের।

জীবানন্দ যে সম্পূর্ণভাবে হৃদয়কে বশে আনতে পারেননি, তা বুঝতে পারি স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতে প্রবল আপত্তিতে। কিন্তু নিমাইয়ের উপরোধ অনুরোধে ও মনের নিভৃত আকাঙ্ক্ষার তাড়নায় শেষ পর্যন্ত স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। শান্তির ছিন্ন-মলিন বেশ দেখে জীবানন্দের অন্তর কর্তব্যবোধ জেগে উঠল। তিনি আবার শান্তির সঙ্গে ঘর বাঁধতে চাইলেন সন্ন্যাসধর্ম ত্যাগ ক'রে। বেশ বোঝা যায়, জীবানন্দ একটু আবেগপ্রবণ অস্থিরমতি চরিত্র।

কিন্তু শান্তি তার যথার্থ সহধর্মিণী। তাই স্বামীকে সে ব্রতভঙ্গ করতে বারণ করেছে। শান্তিই জীবানন্দের প্রেরণা। শুধু এখানেই নয়, শান্তি বারবার জীবানন্দকে সঠিকপথে চালিত করেছে। সত্যানন্দের নিকট দীক্ষা নিয়ে নবীনানন্দরূপে শান্তির প্রধান কাজ জীবানন্দকে নিজ পথে অটল রাখা। কারণ, জীবানন্দ সন্তানসেনার দক্ষিণহস্তস্বরূপ।

জীবানন্দ বেশ রসিক। নবীনানন্দরূপী শান্তিকে দেখে তাঁর রসবোধ ও কৌতুকপ্রিয়তা বেড়ে গেছে। সে সময়ের কথোপকথন বেশ উপভোগ্য। তাই জীবানন্দ যখন

শান্তির প্রতি তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে বলেন—'আপনার বরণখানি বলপূর্বক গ্রহণান্তর অধরসুধা পান।' তখন অশ্লীল বলে মনে হয় না।

যুদ্ধক্ষেত্রে জীবানন্দ অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুবরণ যুদ্ধের স্বাভাবিক গতিতেই সম্ভব হতে পারত, কিন্তু বঙ্কিম তাকে শান্তির সঙ্গে সাক্ষাৎরূপ পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য মৃত্যুবরণের সংকল্প দান ক'রে, নীতিবাদী মনোবৃত্তিরই আর একবার প্রকাশ দেখিয়েছেন।

মৃত্যুর পর পুনর্জীবনপ্রাপ্ত জীবানন্দকে সম্পূর্ণ অন্য মানুষ বলে মনে হয়। গৃহ-জীবনের সুখনীড় রচনা করবার কল্পনা তখন তাঁর মনে একবারের জন্যও স্থান পায়নি। প্রথমে তিনি আজীবন মাতৃসেবাই করতে চেয়েছেন, কিন্তু শান্তির কাছ থেকে তাতে আর অধিকার নেই শুনে—দুজনে চির ব্রহ্মচর্য পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

জীবানন্দ চরিত্রে শান্তির প্রভাব যেভাবে দেখানো হয়েছে, তাতে অনেকে তাকে স্ত্রৈণ বলে মনে করতে পারে। কিন্তু স্ত্রীর সৎপরামর্শ শোনাকে কোনমতেই এ অপবাদ দেওয়া যায় না। জীবানন্দ এবং শান্তি মিলিতভাবে অতুলনীয়।

জুলিয়েট (রজনী ৩/৩)। সেক্সপীয়রের Romio and Juliet নাটকের নায়িকা।

জেনোবিয়া (রাজঃ ২/২)। পালমিরার রাজার পত্নী। স্বামীর মৃত্যুর পর ইনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। ২৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রোম সম্রাটের কাছে ইনি পরাজিত হন। 'রাজসিংহ' উপন্যাসে পাশ্চাত্য দেশীয় মহিলা শাসকদের উদাহরণপ্রসঙ্গে নামোল্লেখ মাত্র আছে।

জেব-উন্নিসা (রাজঃ ১/২)। জেব-উন্নিসা নামে একটি চরিত্র ইতিহাসে আছে, কিন্তু সেই চরিত্রটিই বঙ্কিম উপন্যাসের এই চরিত্র কিনা, তা নিয়ে ঐতিহাসিক ও সমালোচকদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে।

বঙ্কিম বলেছেন—জেব-উন্নিসা ঔরঙ্গজেবের অবিবাহিতা জ্যেষ্ঠা কন্যা এবং এই প্রসঙ্গে পাদটীকায় তিনি সংযুক্ত করেছেন—"মুসলমান ইতিহাসে ইনি জেব-উন্নিসা বা জয়ের্-উন্নিসা নামে পরিচিতা। পাদ্রি কত্রু বলেন, ইঁহার নাম যথর-উন্নিসা।"

ঔরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠা কন্যার নাম জেব-উন্নিসা সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনিই যে যথর-উন্নিসা, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। প্রিঙ্গল কেনেডির The History of the Great Moghuls গ্রন্থে বলা হয়েছে, যথর-উন্নিসা জেব-উন্নিসার নামান্তর মাত্র। কিন্তু মানুসীর গ্রন্থে বলা হয়েছে, যথর-উন্নিসা ঔরঙ্গজেবের চতুর্থ কন্যা। যদুনাথ সরকারও শতবার্ষিকী সংস্করণের ভূমিকায় জেব-উন্নিসা ও যথর-উন্নিসাকে স্বতন্ত্র

শরীররূপে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর History of Aurangzib, Vol. I. গ্রন্থে জেব-উন্নিসার চরিত্র সম্বন্ধে এরূপ কথা আছে—"She seems to have inherited her father's keenness of intellect and literary tastes...

Scandal connected her name with that of Agilmana Khan, a noble of her father's court and a versifier of some repute in his own day

ইতিহাস-অনুগত হোক বা না হোক, 'রাজসিংহ' উপন্যাসে সর্বাপেক্ষা দৃষ্টি আকর্ষণ-কারী চরিত্র জেব-উন্নিসা। রবীন্দ্রনাথের মতে, তিনি উপন্যাস অংশের নায়িকা।

জেব-উন্নিসা চরিত্রে প্রথমে যে ক্ষমতালিপ্সা, উচ্ছৃঙ্খলতা ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতা দেখানো হয়েছে, তা মুঘলহারেমের বাদ্‌শাজাদীদের চরিত্রের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। সুতরাং ঔরঙ্গজেবের কন্যাও যে বিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেবেন, তাতে আশ্চর্য কি!

কিন্তু বঙ্কিম সমস্যা সৃষ্টি করেছেন মবারককে এনে। মবারক জেব-উন্নিসার অনু-গৃহীত ব্যক্তি। এরকম অনুগ্রহ তিনি অনেককেই ক'রে থাকেন। কিন্তু মবারকের প্রতি দুর্বলতার মাত্রাটা একটু অধিক। মবারক বাদ্‌শাজাদীকে বিবাহের প্রস্তাব করলে যেভাবে ব্যঙ্গ ক'রে জেব-উন্নিসা তা প্রত্যাখ্যান করেছেন, তাতে তাঁর চরিত্র-বৈশিষ্ট্যই বজায় থেকেছে। ঐশ্বর্যের সুখাসনে বসে প্রেমের জ্বালা তিনি অনুভব করতে পারেননি। বিবাহ ও বিরহের জ্বালাকে তিনি চাষীর দুঃখভোগ বলে অভিহিত করেছেন।

কিন্তু মবারক দরিয়াকে বিবাহ ক'রে সুখের জীবন যাপন করছে শুনে যখন জেব-উন্নিসার মনে ঈর্ষ্যা দেখা দিল, তখনই ভালবাসার সূচনা হল তাঁর জীবনে। ঈর্ষ্যাই প্রেমের প্রথম সোপান। কিন্তু তখনো তাঁর রয়েছে ক্ষমতার মদমত্ততা। তাঁর আদেশে মবারকের প্রাণহানি হল।

"মবারকের বধ-সংবাদও আসিয়া পৌঁছিল। জেব-উন্নিসা প্রত্যাশা করিয়াছিলেন যে, তিনি এই সংবাদে অত্যন্ত সুখী হইবেন। সহসা দেখিলেন যে, ঠিক বিপরীত ঘটিল। সংবাদ আসিবামাত্র সহসা তাঁহার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল—এ সুকনা মাটিতে কখনও জল উঠে নাই। দেখিলেন, কেবল তাই নহে, গণ্ড বাহিয়া ধারায় ধারায় সে জল গড়াইতে লাগিল। শেষ দেখিলেন, চীৎকার করিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছে। জেব-উন্নিসা দ্বার রুদ্ধ করিয়া হস্তিদন্তনির্মিত রত্নখচিত পালঙ্কে শয়ন করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।" (৬/৯)

বিরহে প্রেমের গভীরতা যেমন বোঝা যায়, এমন ক'রে আর কখনো বোঝা যায় না। তারপর প্রেমের প্রকাশে বাদশাজাদী জেব-উন্নিসার নবজন্ম হল। রবীন্দ্রনাথের

মধুর লিপিতে সে পরিবর্তন যেভাবে দেখানো হয়েছে, তা আর কারুর দ্বারাই প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাই উদ্ধৃতি দিয়েই ক্ষান্ত থাকতে হল—

"বিলাসিনী জেব-উন্নিসাও মনে করিয়াছিল সম্রাট-দুহিতার পক্ষে প্রেমের আবশ্যক নাই, সুখই একমাত্র শরণ্য। সেই সুখে অন্ধ হইয়া যখন সে দয়াধর্মের মস্তকে আপন জরিজহরৎজড়িত পাদুকাখচিত সুন্দর বাম চরণখানি দিয়া পদাঘাত করিল তখন কোন অজ্ঞাত গুহাতল হইতে কুপিত প্রেম জাগ্রত হইয়া তাহার মর্মস্থলে দংশন করিল, শিরায় শিরায় সুখ মন্থরগামী রক্তস্রোতের মধ্যে একেবারে আগুন বহিতে লাগিল, আরামের পুষ্পশয্যা চিতাশয্যার মতো তাহাকে দগ্ধ করিল—তখন সে ছুটিয়া বাহির হইয়া উপেক্ষিত প্রেমের কণ্ঠে বিনীত দীনভাবে সমস্ত সুখসম্পদের বরমাল্য সমর্পণ করিল, দুঃখকে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া হৃদয়াসনে অভিষেক করিল। তাহার পরে আর সুখ পাইল না, কিন্তু আপন সচেতন অন্তরাত্মাকে ফিরিয়া পাইল। জেব-উন্নিসা সম্রাট-প্রাসাদের অবরুদ্ধ অবচেতন আরামগর্ভ হইতে তীব্র যন্ত্রণার পর ধূলায় ভূমিষ্ঠ হইয়া উদার জগতাতলে জন্মগ্রহণ করিল। এখন হইতে সে অনন্তজগৎবাসিনী রমণী।"

জ্ঞানানন্দ (আনন্দ: ১/১৭)। আনন্দমঠের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের একজন। সে ভবানন্দকে এসে খবর দিয়েছে যে—'সত্যানন্দ-প্রভু গেরুয়া পরিয়া একা নগরাভিমুখে গিয়াছেন।'

টিণ্ডল (রজনী ২/৪)। উনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত পদার্থ-বিজ্ঞানী জন্ টিণ্ডল (Jhon Tyndall—১৮২০—১৮৯৩)।

ডনিওয়ার্থ (আনন্দ: ৩/২)। শিবগ্রামের রেশম কুঠির অধ্যক্ষ তিনি টমাসকে আশ্রয় দান করেন। উপন্যাসে নাম উল্লেখ আছে।

ডাইস সম্বর (চন্দ্র: ৬/৪)। দ্রঃ সমরু।

ডার্বিন, ডারউইন (রজনী ২/৪ ; চন্দ্র: ৪/১)। বিখ্যাত প্রাণিতত্ত্ববিদ্ ও দার্শনিক ডারউইনের কথা বলা হয়েছে। তাঁর পুরো নাম Charles Robert Darwin (১৮০৯—১৮৯২)। তিনি পৃথিবীর বহু প্রাণীর জীবনযাত্রা সম্বন্ধে গবেষণা ক'রে এবং বহু স্থানে ভ্রমণ ক'রে 'The Origin of Species' নামে একটি বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় হল, বানর-জাতীয় জীবই ক্রম-পরিবর্তনের ফলে বর্তমান মানুষে পরিণত হয়েছে। এরূপ মতবাদ পৃথিবীর চিন্তা-জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে। মানব-সৃষ্টির এই তত্ত্ব Laws of Evolution বা বিবর্তনবাদ বা অভিব্যক্তিবাদ নামে খ্যাত।

ডেসডিমনা (রজনী ৩/৩)। সেক্সপীয়রের Othelo নাটকের নায়িকা।

তকি খাঁ (চন্দ্রঃ ৩/৩)। তকি খাঁর চরিত্র-চিত্রণে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের নির্দেশ অমান্য করেছেন। ইতিহাসে আছে, তকি খাঁ মীরকাশেমের বিশ্বস্ত সেনাপতি এবং সিংহাসন রক্ষার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম প্রথম তকি খাঁকে বিশ্বস্ত রাজকর্মচারীরূপেই অঙ্কন করেছেন। দলনীকে উদ্ধারের ভার পড়েছিল তাঁরই ওপর। কিন্তু দলনীর উদ্ধারে ব্যর্থ হয়ে, নিজের কৃতিত্ব অক্ষুণ্ন রাখার জন্য শেষ পর্যন্ত তিনি মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন। তবে তকি খাঁর মধ্যে মাঝে মাঝে অনুশোচনাও জেগেছে। দলনী বিষপান করতে রাজী হলে—'মহম্মদ তকি মর্মের ভিতর লজ্জায় মরিয়া গেল।' কিন্তু আবার দলনীর রূপ-যৌবন দর্শনে তিনি মনে মনে পাপ আশাও পোষণ করেছেন—তিনি বলেছেন—'শুন সুন্দরী আমাকে ভজ।' তকি খাঁ পাপী, কিন্তু নির্বোধ পাপী। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাঁকে করতে হয়েছে নবাবের তরবারি নিজের রক্তে রঞ্জিত ক'রে।

তসবিরওয়ালী (রাজঃ ১/১)। অল্প-পরিসরে বুড়ী তসবিরওয়ালীর চরিত্রটি বিশিষ্টতা লাভ করেছে। একরাশ সুন্দরী যুবতীর সামনে তার বিহ্বলভাব এবং চঞ্চলকুমারীর অপূর্ব সৌন্দর্য দর্শনে বিভ্রম—হাস্যরসের খোরাক জুগিয়েছে। কিন্তু বুড়ী সেখানে নিজ পুত্রের নিকট রূপনগরে চিত্রদলন বৃত্তান্ত বর্ণনা করেছে, সেখানেই তার ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করার মতো। চরিত্রটি হাস্যরসের আমদানি করলেও উপন্যাসের মূল ঘটনার সূত্রপাতে তার ভূমিকা অনেক।

তারাচরণ (বিষঃ ৬ষ্ঠ পরিঃ)। তারাচরণ সূর্যমুখীর আপন ভাই নয়। ছেলে-বেলায় শ্রীমতী নামে এক কায়স্থ বিধবা সূর্যমুখীকে লালন-পালন করত। 'শ্রীমতীর একটি শিশুসন্তান ছিল, তাহারই নাম তারাচরণ। সে সূর্যমুখীর সমবয়স্ক। সূর্যমুখী তাহার সহিত বাল্যকালে খেলা করিতেন এবং বাল্যসখীত্বপ্রযুক্ত তাঁহার প্রতি তাঁহার ভ্রাতৃবৎ প্রেম জন্মিয়াছিল।'

অল্প-পরিসরে তারাচরণের চরিত্রটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সে ইংরাজী বিদ্যা কোন রকম আয়ত্ত ক'রে গ্রামে স্কুল ক'রে সেখানকার দেবতাস্বরূপ হয়ে উঠেছে। সে ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য হয়ে মুখস্থ বক্তৃতা দেয়। স্ত্রী-স্বাধীনতার কথা বলে। কিন্তু নিজের স্ত্রীকে বাইরে বের করায় সময় তার কুণ্ঠার অন্ত নেই। বঙ্কিম-সমকালে এই ধরনের মূর্খ ব্যক্তিরা সমাজ-সংস্কারের নামে কি প্রকার হাসির খোরাক যোগাত, তারাচরণ তার সার্থক প্রতিলিপি। তারাচরণ কুন্দের মতো নারীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিল সত্য, কিন্তু বানরের গলায় মুক্তার মালার মতো তা সহ্য হল না। তাই

তারাচরণকে মৃত্যুবরণ করতে হল। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে দুর্ভাগ্য যে, সে তিন বছরের সংসার-জীবনেও কুন্দনন্দিনীর মনে এতটুকু দাগ কাটতে পারল না।

তারার মা (দেবী: ১/২)। হরবল্লভের বাড়ীর একজন চাকরানী। সে দুই-একবার প্রফুল্লদের বাড়ী গিয়েছিল। তাই সে সহজেই প্রফুল্লর মাকে চিনতে পারে।

তাসিতস (রজনী ৩/৩)। প্রাচীন রোমের বিখ্যাত ঐতিহাসিক। তার পুরো নাম—Tacetus, C·ius Cornelias (অনুমানিক ৫২—১২০ খ্রীঃ)।

তিনকড়ি (রজনী ২/৭)। দাসী। অমরনাথ রজনীকে উদ্ধার ক'রে কলকাতা নিয়ে যাবার সময় রজনীর মন প্রসন্ন রাখবার জন্য এই দাসীটিকে সঙ্গে নিয়েছিলেন।

তিলোত্তমা (দুর্গেঃ ১/১)। 'দুর্গেশনন্দিনী'র রোমান্টিক নায়িকা হিসাবে বঙ্কিম তিলোত্তমাকে তিল তিল সৌন্দর্য দিয়ে গড়ে তুলেছেন। তাই এই চরিত্রটি সমগ্র উপন্যাসে নেপথ্যে সঙ্গীতের মতো সুরঝঙ্কার দিয়েছে। নেপথ্যে বলার কারণ এই যে, অত্যন্ত যত্ন সত্ত্বেও বঙ্কিম চরিত্রটিকে জীবন্ত ক'রে তুলতে পারেননি। কথার ইন্দ্রজালে তিলোত্তমা সুন্দরী হয়ে উঠেছেন, কিন্তু ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে তার ভাগ্য শুধু ভেসে চলেছে মাত্র, সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারেনি।

উপন্যাসের সূচনাতে তিলোত্তমাকে শৈলেশ্বরের মন্দিরে দেখা গেলেও, সেখানে বঙ্কিম তিলোত্তমার রূপের বিস্তারিত বর্ণনা দেননি। যে বর্ণনাটুকু দিয়েছেন, তাতে তিলোত্তমার আভিজাত্যের লক্ষণগুলিই ফুটে উঠেছে। কিন্তু সপ্তম পরিচ্ছেদে তিলোত্তমার রূপের যে বিস্তারিত বর্ণনা আছে তার সঙ্গে সঙ্গে এই চরিত্রটির অন্যান্য গুণগুলিও প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে লক্ষ্য করবার বিষয়, তিলোত্তমার রূপের ঔজ্জ্বল্য আছে কিন্তু মাধুর্যও কম নেই। যাঁরা দুর্গেশনন্দিনীর চরিত্রগুলিকে স্কটের 'আইভ্যান হো'র প্রভাবজাত বলে থাকেন, তাঁরা লক্ষ্য করবেন—তিলোত্তমাচরিত্রে পরপুরুষের প্রতি প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার নূতনত্ব থাকলেও, বাঙালী নারীর কোমলমধুর সমস্ত গুণাবলীই বঙ্কিম তার ওপর আরোপ করেছেন।

উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তিলোত্তমা ও জগৎসিংহের চার চক্ষুর মিলনকালে তিলোত্তমাকে কিছুটা জীবন্ত ও চপলস্বভাবা বালিকা বলে মনে হয়। তার পরই সপ্তম পরিচ্ছেদে বঙ্কিম তিলোত্তমাকে একেবারে জগৎসিংহের প্রতি অনুরক্তা করে তুলেছেন। এর মধ্যে বঙ্কিম কোন মনবিশ্লেষণের অবকাশ রাখেননি। এই ধরনের প্রেমবন্ধন কিছুটা অস্বাভাবিক হলেও আমরা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারি না। অভিরাম স্বামীর মত আমরাও বলতে পারি—'দর্শনমাত্র গাঢ় অনুরাগ জন্মিতে পারে না, তবে স্ত্রীচরিত্র, বিশেষতঃ বালিকাচরিত্র, ঈশ্বরই জানেন।' (১।৮)

বিমলা জগৎসিংহের সঙ্গে শৈলেশ্বরের মন্দিরে সাক্ষাৎ করতে যাবার আগে যখন তিলোত্তমার সঙ্গে কথাবার্তা বলে, তখন তিলোত্তমাকে আমরা আনন্দোচ্ছলরূপেই দেখি। তারপর ইতিহাসের জটিল আবর্তনে মোগল-পাঠানের বিরোধে তিলোত্তমা লুপ্তপ্রায়। পাঠানহস্তে বন্দিনী তিলোত্তমার দুঃখের কথা বঙ্কিম বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তাকে সক্রিয় ক'রে তুলতে পারেননি। বিমলার কাছ থেকে অঙ্গুরীয় নিয়ে তিলোত্তমা জগৎসিংহের সঙ্গে কারাগারে দেখা করেছে, কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হয়ে ছিন্নমূল তরুর মতো হতচৈতন্য হয়ে পড়েছে। তারপর তিলোত্তমাকে দেখতে পাই অভিরামস্বামীর তত্ত্বাবধানে বিরহাতুরা শীর্ণকায়া মৃত্যুপথযাত্রিণীরূপে। অভিরামস্বামীর আমন্ত্রণে জগৎসিংহের সঙ্গে তিলোত্তমার সাক্ষাৎদৃশ্যে তিলোত্তমা যেন যোগিনী। চিরন্তন বাঙালী নারীর মতোই তার হৃদয়ে পুঞ্জীভূত অভিমান, কিন্তু কোন ধিক্কার নেই। কেবলমাত্র সে বলেছে—'তোমার জন্য যে কুসুমনিগড় রচিয়াছিলাম, বুঝি তাহা সত্যই আত্মচরণে লৌহনিগড় হইয়া ধরিয়াছে। যে কুসুমমালা পরাইয়াছিলাম, তাহা অসির আঘাতে ছিঁড়িয়াছে।'

কিন্তু জগৎসিংহ যখন তিলোত্তমাকে বিবাহ করিতে রাজী হয়েছে, তখন তিলোত্তমা কোন প্রতিবাদ করেনি। এমনকি শেষে বিবাহের দিনে আয়েষার বহুমূল্য অলঙ্কারে তিলোত্তমাকে চমৎকৃতা ক'রে বঙ্কিম তাকে অলঙ্কারপ্রিয় সাধারণ বাঙালী মেয়ে ক'রে ফেলেছেন। আসলে, উপন্যাসের প্রথমদিকে তিলোত্তমা যেমন বঙ্কিমের মন অধিকার করেছিল, শেষের দিকে তেমনি আয়েষা প্রাধান্য পেয়েছে। তাই তিলোত্তমা অস্ফুট চরিত্র।

তৃতীয় জর্জ (চন্দ্রঃ ৫/১)। ইংলণ্ড-অধিপতি তৃতীয় জর্জের নামোল্লেখমাত্র আছে।

তৈমুরলঙ্গ (দুর্গেঃ ১/৩, চন্দ্র ৪।১)। প্রকৃত নাম আমির তৈমুর বা তাইমুর। কিন্তু তিনি খোঁড়া ছিলেন বলে তৈমুরলঙ্গ (খোঁড়া) নামেই সম্যক্ পরিচিত। মধ্য এশিয়ার অন্তর্গত প্রাচীন সগদনিয়া রাজ্যের কুশনগরে ১৩৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিল, মঙ্গলবার তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম আমির তুরা খাই এবং মাতার নাম তকিনা খাতুন। তিনি প্রসিদ্ধ চেঙ্গিস বা জঙ্গিনা খাঁর বংশধর। আবার, তাঁর বংশধর বাবর ভারতবর্ষে স্থায়ী রাজত্ব স্থাপন করেন। তৈমুর ছিলেন চযতাই তুর্কীদের নেতা। ১৩৭০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তারপর সমরকুশলী তৈমুর ক্রমে ক্রমে পারস্য, বোগদাদ, কান্দাহার প্রভৃতি স্থানে রক্তের বন্যা বইয়ে ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। ভারতবর্ষে তাঁর অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনী ইতিহাসে তাঁকে কলঙ্কিত ক'রে রেখেছে। তৈমুরের রাজধানীর নাম ছিল সমরখন্দ। ১৪০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারি বুধবার তাঁর মৃত্যু হয়।

'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে তৈমুরলঙ্গ বংশীয়দের অর্থাৎ মুঘল শাসকদের উল্লেখ আছে।

তোরাব খাঁ (সীতাঃ ১/৯)। ফৌজদার তোরাব খাঁ চরিত্রটির উল্লেখ ইতিহাসে পাওয়া যায়। সীতারামের বিরুদ্ধে আক্রমণ করার চেষ্টা তিনি বারবার করেছেন। উপন্যাসে তোরবা খাঁর কৌশলী মনোবৃত্তির পরিচয় অনেক পাওয়া যায়।

থুকিদিদিস্ (রজনী ৩।৩)। থুকিদিদিস্ (Thucydides—৪৭১ খ্রীঃ পূর্বাব্দ) প্রাচীন গ্রীসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক। তিনি পেলোপনেসিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণ ক'রে সেই যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনা করেন। কিন্তু তিনি ঘটনা বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্লেষণও করতেন। এই রীতি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস রচনার রীতি বলে গৃহীত হয়েছে।

দয়াল সাহা (রাজঃ ৮/৮)। রাজসিংহের একজন কর্মচারী। তিনি রাজসিংহকে পরামর্শ দিয়েছিলেন ঔরঙ্গজেবকে বন্দী অবস্থায় বধ করার।

দরিয়া বিবি বা দবীর-উন্নিসা (রাজঃ ১/৫)। সমগ্র 'রাজসিংহ' উপন্যাসে দরিয়া বিবি প্রেতাত্মার মতো বিচরণ করেছে। এমন স্থান নেই যেখানে তার গতি রুদ্ধ। এই অতি নাটকীয় উপকরণেই দরিয়ার চরিত্র গড়ে উঠেছে।

দরিয়া মবারকেব বিবাহিতা স্ত্রী, কিন্তু মবারক কর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা। দরিয়া অবশ্য আপন বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রেখেছে—একদিন সে মবারককে পাবেই।

দরিয়ার সমস্ত আচরণই রহস্যজনক। উপন্যাসের প্রথমেই সে মবারককে জোর ক'রে ভাগ্য গণনা করিয়েছে। কিন্তু নিজে ভীড়ের অন্তরালে থেকে রহস্যময়তা বজায় রেখেছেন। যেন বঙ্কিম দরিয়াকে মবারকের নিয়তির সোচ্চার প্রতিরূপ হিসাবেই অঙ্কন করেছেন। আবার, দরিয়া শাহজাদী জেব-উন্নিসার কাছে গিয়ে মবারক সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা বলেছে, তার উদ্দেশ্য মবারকের প্রতি শাহজাদীর বিদ্বেষ জন্মান হলেও, তার পরিণাম যে কী ভয়ানক তা দরিয়ার মতো বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোকের পক্ষে বোঝা শক্ত নয়। কিন্তু তবুও দরিয়া আগুন নিয়ে খেলা করেছে। এক দরিদ্র স্ত্রীলোক কেবলমাত্র প্রেমের বহ্নিতে দুনিয়ার ঐশ্বর্যের মালিক জেব-উন্নিসার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছে।

দরিয়া ছদ্মবেশ ধারণেও পটু। সে নৃত্যগীতে মুঘল-সেনাপতিকে মুগ্ধ ক'রে রূপনগরে মুঘল-সৈন্য মধ্যে স্থান গ্রহণ করেছে। উদ্দেশ্য—মবারকের পাশে পাশে থাকা। কূপের মধ্যে পতিত মবারককে বাঁচিয়ে দরিয়া স্ত্রীর কর্তব্য করেছে।

তারপর মবারকের সঙ্গে দরিয়ার সুখময় সংসার-জীবনের ছবি কিছুদিন আমরা দেখেছি। কিন্তু সে সুখ দরিয়ার বেশি দিন সহ্য হল না। জেব-উন্নিসার চক্রান্তে মবারকের মৃত্যু হল। উন্মাদিনী দরিয়া কিন্তু প্রতিশোধের বাসনা ত্যাগ করেনি। তাই

সে ছুটে গিয়েছে জেব-উন্নিসার কাছে। কিন্তু শাহাজাদীর চোখে জল দেখে বুঝলো এর চেয়ে ভালো প্রতিশোধ আর নেওয়া সম্ভব নয়।

তারপর দীর্ঘকাল দরিয়ার উপস্থিতি নেই। যুদ্ধক্ষেত্রে মবারক জেব-উন্নিসার পুনর্মিলনে বাধ সেধেছে দরিয়া। দরিয়ার হস্তনিক্ষিপ্ত বন্দুকের গুলিতেই মবারকের মৃত্যু হয়েছে। দরিয়াচরিত্র যেমন সাহসিক, তেমনি প্রতিশোধ-স্পৃহায় প্রচণ্ড। মবারকের নিয়তিরূপেই যেন তার উপস্থিতি।

দলনী (চন্দ্রঃ ১/১)। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের দলনী বেগম একটি সুন্দর সুগন্ধিযুক্ত দলিত কুসুম। যদিও ঐতিহাসিক চরিত্র গুরগণ খাঁর ভগিনী হিসাবে উপন্যাসে দলনী বেগমকে অঙ্কিত করা হয়েছে এবং মীরকাশেমের বেগমরূপে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, তবু এই চরিত্রটি ঐতিহাসিক চরিত্র নয় বলেই মনে হয়। বঙ্কিম নিজস্ব কল্পনা দ্বারাই এই চরিত্রটিকে জীবন্ত ক'রে তুলেছেন।

দলনী চরিত্রের প্রধান এবং একমাত্র বৈশিষ্ট্য বা গুণ হল—স্বামীপ্রেম। তার ভাই নবাব হারেমে তাকে নবাবের সর্বনাশসাধনের জন্য প্রেরণ করলেও, নবাবকে মনেপ্রাণে ভালবেসেছে। শেষ পর্যন্ত এই ভালবাসার জন্যই ভাইয়ের বিরোধিতা করতেও তার বাধেনি। সেই মুহূর্তেই এই সহজ-সরল-সুন্দর-সাবলীল নারীটির জীবনে নেমে এসেছে দুর্যোগের ঘনঘটা।

দলনীর জীবনে যে ভয়ানক পরিণাম নেমে এসেছে, তার জন্য তার কোন অন্তর্নিহিত দোষকে দায়ী করা যায় না।. ইতিহাসের জটিল ঘটনার আবর্তে তার জীবন হয়েছে নিষ্পেষিত। দলনীর সরলতাই তার সর্বনাশ করেছে। গুরগণ খাঁর কৌশলে তার সামনে প্রাসাদের দ্বার রুদ্ধ হয়েছে। শুধু তাই নয়, ভাগ্যচক্রে প্রতাপের বাড়ী থেকে ইংরাজ কর্তৃক অপহৃতা হয়ে শেষ পর্যন্ত তকি খাঁর হাতে পড়তে হয়েছে। অবশেষে এই পতিগতপ্রাণা নারী স্বামীর আদেশ পালনের জন্য বিষপানে মৃত্যু বরণ করেছে।

দলনী চরিত্রের ট্রাজেডী গ্রীক ট্রাজেডীর মতো নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসের ফলে সংগঠিত হয়েছে। তবে দলনীর এই করুণ পরিণামের মধ্যে পাঠক-হৃদয়ে একটু সান্ত্বনা এই যে, দলনীর পতিপ্রেম নিষ্ফল হয়নি, শেষ পর্যন্ত মীরকাশেমকে দলনীর জন্য হাহাকার করতে হয়েছে। দলনীর প্রতি মীরকাশেমের ঘৃণা নয়, প্রেমই দলনী চরিত্রের গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে।

দাউদ খাঁ (দুর্গেঃ ১/৩)। বাংলার পাঠান সুলেমান কররানীর পুত্র। দাউদ শাহ নামেও তিনি খ্যাত। ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর পিতা আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন, কিন্তু তিনি স্বাধীন নৃপতির

মতো চলতে থাকেন। তখন আকবর মুনাইম খাঁর সাহায্যের জন্য রাজা টোডরমল, লাল খাঁ, রাজা ভগবন্ত দাস, মানসিংহ, জৈন খাঁ, খোকা প্রভৃতি অনেক সেনাধ্যক্ষ প্রেরিত হয়। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে দাউদ পরাজিত হন এবং তাঁর ছিন্নশির সম্রাটের কাছে প্রেরিত হয়।

'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে দাউদ খাঁ এবং আকবরের সংঘর্ষের উল্লেখ আছে। তবে সেখানে বঙ্কিম লিখেছেন—'দাউদ ৯৮২ খ্রীঃ অব্দে উড়িষ্যায় পলায়ন করিলেন…।'

দানেশ খাঁ (কৃঃ উঃ ২/৬)। প্রসাদপুরে গোবিন্দলালের গানের আসরের একজন গায়ক।

দামোদর (মৃণাঃ ২/১)। গৌড়েশ্বরের সভাপণ্ডিত। রাজার মতোই এঁকেও গুণলেশহীনরূপে অঙ্কন করা হয়েছে। তিনি বিশ্বাস করেন যে, শাস্ত্রে লিখিত আছে—তুরকীয়েরা এদেশ অধিকার করবে। কিন্তু মাধবাচার্যের কাছে শাস্ত্র-গ্রন্থটির নামোল্লেখে অপারগ হয়ে পাঠকের কাছে হাস্যাস্পদ হয়ে ওঠেন। তবে পশুপতির নির্দেশে দামোদর, পুঁথির পৃষ্ঠা পরিবর্তন ক'রে, রাজাকে ভুল বোঝানোর চেষ্টা, তার শঠতার পরিচয় বহন করে।

দিগ্বিজয় (মৃণাঃ ১/১)। দিগ্বিজয় হেমচন্দ্রের বিশ্বস্ত ভৃত্য। সে হেমচন্দ্রকে যেমন ভালবাসে, তেমনি ভয়ও করে। সে হেমচন্দ্রের ছায়াস্বরূপ। এই চরিত্রটি গিরিজায়ার কাছে তবু দু'একবার মুখ খুলেছে। কিন্তু কখনও গিরিজায়ার সঙ্গে পেরে ওঠেনি। শেষ পর্যন্ত গিরিজায়াকে বিয়ে ক'রে, তার শ্রীহস্তে সম্মার্জনীর আঘাত সহ্য ক'রে সুখে কালাতিপাত করেছে। কিন্তু এই চরিত্রটিকে বিশিষ্টতা লাভ করতে দেখি উপন্যাসের শেষভাগে একটিমাত্র ঘটনা—"একদিন কোন দৈবকারণবশতঃ গিরিজায়া ঝাঁটা মারিতে তুলিয়াছিলেন, ইহাতে দিগ্বিজয় বিষণ্ণ বদনে গিরিজায়াকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'গিরি, আজ তুমি আমার উপর রাগ করিয়াছ নাকি?" (মৃণাঃ পরিশিষ্ট)

দিবা (দেবীঃ ১/১৩)। দিবাকে নিশির বোন বলে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু দীক্ষা সম্পর্কে বোন হওয়াই সম্ভব। দিবা মিতবাক্। সাহেবকে প্রকৃত দেবী সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করার সময় দিবা একবার মুখরা হয়েছিল। দিবা অশিক্ষিতা।

দুর্গাদাস (মৃণাঃ ৪/১৫)। ইনি পশুপতির অষ্টভুজার নিত্যসেবা করতেন। মূর্তিসমেত পশুপতি দগ্ধ হলে, ইনিই প্রথম তা আবিষ্কার ক'রে তার সৎকারের ব্যবস্থা করেন। তারপর মনোরমা সহমরণের জন্য এসে উপস্থিত হয়। ব্রাহ্মণ কিন্তু গোঁড়া নয়, তাই তিনি মনোরমাকে সহমরণ থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেছিলেন।

দুর্গাদাস (রাজঃ ৮/১৬)। ইনি যশোবন্ত সিংহের শিশুপুত্র অজিত সিংহের পক্ষে থেকে ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।

দুর্মদসিংহ (সীতাঃ ৩/২২)। সীতারামের একজন বিশ্বস্ত সিপাহী।

দুর্মুখ (রাজঃ ২/২)। কৃত্তিবাসী রামায়ণের মতে, রামচন্দ্রের গুপ্তচর। ইনি রাজ্যের বিভিন্ন সংবাদ রাজাকে সরবরাহ করতেন। প্রজাদের সীতার প্রতি বিরূপতার কথাও ইনি রামচন্দ্রকে বলেন।

দুর্লভচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (দেবীঃ ১/৮)। উপন্যাসের অল্প পরিসরে দুর্লভ চক্রবর্ত্তীর চরিত্রটি অপূর্ব। তিনি প্রফুল্লদের গ্রামের জমিদারের গোমস্তা। অর্থের জন্য এইসব লোকদের অকরণীয় কিছুই নাই। প্রফুল্লকে অপহরণের হীন ষড়যন্ত্রে তিনি লিপ্ত। কিন্তু ডাকাতের ভয়ে পলায়নরত দুর্লভের চরিত্রটিই সর্বাপেক্ষা দৃষ্টি আকর্ষণ করে।—"ফুলমণি যত ডাকে, ও গো দাঁড়াও গো! আমায় ফেলে যেও না গো!' দুর্লভচন্দ্র তত ডাকে, 'ও বাবা গো! ঐ এলো গো!' কাঁটা-বনের ভিতর দিয়ে, পগার লাফাইয়া, কাদা ভাঙ্গিযা, উর্ধ্বশ্বাসে দুর্লভ ছোটে—হায়! কাছা খুলিয়া গিয়াছে, একপায়ের নাগরা জুতা কোথায় পড়িয়া গিয়াছে, চাদরখানা একটা কাঁটা-বনে বিঁধিয়া তাঁহার বীরত্বের নিশানস্বরূপ বাতাসে উড়িতেছে। তখন ফুলমণি সুন্দরী হাঁকিল, 'ও অধঃপেতে মিনসে—ওরে মেয়েমানুষকে ভুলিয়ে এনে—এমনি ক'রে কি ডাকাতের হাতে সঁপে দিয়ে যেতে হয় রে মিনসে?' শুনিয়া দুর্লভচন্দ্র ভাবিলেন, তবে নিশ্চিত ইহাকে ডাকাতে ধরিয়াছে। অতএব দুর্লভচন্দ্র বিনাবাক্যব্যয়ে আরও বেগে ধাবমান হইলেন।" (১/১০)।

দেবী (রাজঃ ২/৭)। দেবী যোধপুরী বেগমের পরিচারিকা। সে রাজপুত। যোধপুর থেকে বেগমের সঙ্গে এসেছিল। দীর্ঘদিন পরে চঞ্চলকুমারীকে সংবাদ দেবার প্রয়োজনে যোধপুরী বেগম তাকে মুক্তি দিলেন। দেবীর বেশ কিছু বুদ্ধি আছে। তাই সে চঞ্চলের কাছে ইচ্ছা করেই বেগমের দেওয়া পাঞ্জাটা ফেলে গিয়েছিল।

দেবী চৌধুরাণী (দেবীঃ ১/১)। দ্রঃ প্রফুল্ল।

দেবী সিংহ (দেবীঃ ১/৮)। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে দেবী (সিং) পূর্বপুরুষের বাসস্থান পানিপথ থেকে বাংলা দেশে এসে বসবাস করতে থাকেন। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ কোম্পানী দেবী সিংহকে রাজস্ব-বিভাগের দেওয়ানী পদে নিযুক্ত করেন। তাঁর সময়ে ইংরেজের রাজস্ব বৃদ্ধি পায়, কিন্তু তিনি জনগণের উপর নানা অত্যাচারের জন্য ইতিহাসে কুখ্যাত। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মে ইনি পূর্ণিয়া, এদ্‌রকপুর, রংপুর ও দিনাজপুর জেলার ইজারা গ্রহণ করেন। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে রংপুরের প্রজাগণ তাঁর বিরুদ্ধে

প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করায় তাঁর পদচ্যুতি ঘটে। তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগের বিচার হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। এডমণ্ড বার্কের রচনায় দেবী সিংহের অত্যাচারের কথা জীবন্ত হয়ে আছে। (দ্রঃ এডমণ্ড বার্ক)

১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল দেবী সিংহের মৃত্যু হয়।

"দেবী চৌধুরাণী"তে দেবী সিংহের অত্যাচারের উল্লেখ আছে।

দেবেন্দ্র (বিষঃ ৬ষ্ঠ পরিঃ)। দেবেন্দ্র মন্থপ জমিদার। তাঁর অনেক সদ্গুণ ছিল। তিনি রূপবান, গুণবান, সঙ্গীতজ্ঞ। কিন্তু সংসারে গৃহিণীর জ্বালায় তিনি বহির্বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং মদের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেন। ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা, নারী স্বাধীনতা প্রভৃতির জন্য তাঁকে ইয়ং বেঙ্গলের প্রতিভূ বলে মনে হয়। কুন্দনন্দিনীর প্রতি আসক্তি তাঁর অত্যন্ত প্রবল। এজন্য তাঁকে বৈষ্ণবীবেশে নগেন্দ্রের অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে দেখি। এতে দেবেন্দ্রের দুঃসাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। হীরার প্রতি দেবেন্দ্রের আচরণ তাঁকে নিষ্ঠুর প্রমাণিত করে। দেবেন্দ্রের পাপের ফলে তাঁর 'মৃত্যুশয্যা' কণ্টকময় হয়ে উঠেছে।

দেবেন্দ্রনারায়ণ রায় (রাধাঃ ৭ম পরিঃ)। রুক্মিণীকুমারের প্রকৃত নাম। (দ্রঃ রুক্মিণীকুমার)

ধনদাস (যুগঃ ১ম পরিঃ)। হিরণ্ময়ীর পিতা। তিনি দৈবে বিশ্বাসী। তাই গুরুর পরামর্শমতো কন্যার বিবাহের ব্যবস্থা করেছেন। তবে কন্যার সুখের জন্য তারই মনোমত পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন। এতে তাঁর উদার মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

ধরমসিংহ (দুর্গেঃ ১/২)। একজন রাজপুত সৈনিক। শৈলেশ্বরের মন্দিরে জগৎসিংহকে দুজন মহিলার সঙ্গে দেখে ধরমসিংহ বিস্মিত হয়েছিল। তাছাড়া, জগৎসিংহ যখন মহিলাদের জন্য শিবিকা আনার কথা বলল, তখন তার যথেষ্ট কৌতূহল হয়। কিন্তু যথার্থ সৈনিক হিসাবে সে নির্বিবাদে সেনাপতির আদেশ মান্য করল।

ধীরানন্দ গোস্বামী (আনন্দঃ ১/১২)। ধীরানন্দ সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত। ভবানন্দকে পরীক্ষা করার জন্য সত্যানন্দ কর্তৃক প্রেরিত হয়ে যখন তিনি বিশ্বাসঘাতকতার ষড়যন্ত্র করেন, তখন তাঁকে আমরা বিশেষভাবে চিনতে পারি। তিনি যে সত্যানন্দ কর্তৃক প্রেরিত, একথা সে সময় না জানা থাকায়, আমাদের এই চরিত্রটির তৎকালীন ব্যবহারে মনে ঘৃণা জন্মে।

কিন্তু ধীরানন্দ কর্তব্যপরায়ণ। সর্বোপরি স্নেহশীল। তাই ভবানন্দের মৃত্যুকালে তিনি ভবানন্দকে সান্ত্বনার বাণী শুনিয়েছেন, ভবানন্দকে ঘৃণা করেননি।

নগেন্দ্রনাথ দত্ত (বিষঃ ১ম পরিঃ)। "বিষবৃক্ষ" উপন্যাসের নায়ক নগেন্দ্রনাথ বঙ্কিম-উপন্যাসের এক স্মরণীয় পুরুষচরিত্র। 'বিষবৃক্ষে'র পূর্ববর্তী উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র যে সকল নায়ক-চরিত্র অঙ্কন করেছেন, তাঁরা রূপে-গুণে অতুলনীয় হলেও, দোষে-গুণে সাধারণ মানুষ থেকে অনেক দূরের। নগেন্দ্রনাথই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম নায়ক, যিনি আমাদের মাটির মানুষের অত্যন্ত কাছাকাছি।

'জগদীশ্বর তাঁহাকে সকল সুখের অধিপতি করিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। কান্ত রূপ; অতুল ঐশ্বর্য; নীরোগ শরীর; সর্বব্যাপিনী বিদ্যা, সুশীল চরিত্র, স্নেহময়ী সাধ্বী স্ত্রী—এ সকল এক জনের ভাগ্যে প্রায় ঘটে না। নগেন্দ্রের এ সকলই ঘটিয়াছিল।' (২৯ পরিঃ)। কিন্তু নগেন্দ্র এর জন্য স্মরণীয় নন। তিনি স্মরণীয় তাঁর দোষে। নগেন্দ্রনাথের চরিত্রদোষই 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের বিষের বীজ। তা থেকেই উপন্যাসরূপ মহীরূহের সৃষ্টি হয়েছে। নগেন্দ্রনাথের চরিত্রের এই দোষটি কি ? সেটি হল 'রিপুর প্রাবল্য'। কুন্দের প্রতি তাঁর যে রূপজ মোহ, এটিই তাঁর চরিত্রের অবনতির মূল কারণ। এছাড়া, আরও একটি কারণ বঙ্কিম নির্দেশ করেছেন। সেটি স্থির চিত্ত-সংযমে অক্ষমতা। তাঁর নিরবচ্ছিন্ন সুখই তাঁর দুঃখের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে।—'দুঃখী না হইলে লোভে পড়িতে হয় না। যাহার যাহাতে অভাব, তাহার তাহাতেই লোভ। কুন্দনন্দিনীকে লুব্ধলোচনে দেখিবার পূর্বে নগেন্দ্র কখনও লোভে পড়েন নাই; কেন না, কখনও কিছুরই অভাব জানিতে পারেন নাই। সুতরাং লোভ সম্বরণ করিবার জন্য যে মানসিক অভ্যাস বা শিক্ষা আবশ্যক, তাহা তাঁহার হয় নাই। এই জন্যই তিনি চিত্ত সংযমে প্রবৃত্ত হইয়াও সক্ষম হইলেন না।' (২৯ পরিঃ)।

এই দোষের জন্য কি আমাদের নগেন্দ্রকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা করে ? নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি—না। সূর্যমুখীর দুর্দশা, কুন্দনন্দিনীর জীবনত্যাগ প্রভৃতি ঘটনায় এক-একবার নগেন্দ্রের প্রতি মন বিরূপ হয়ে ওঠে বটে, কিন্তু যখন নগেন্দ্রের মানসিক টানা-পোড়েনের ছবিটি বঙ্কিম উপস্থাপিত করেন তখন মনে হয়—এই মানুষটিও কম বিড়ম্বিত নন।

সূর্যমুখীর প্রতি নগেন্দ্রের ভালবাসার কোন ফাঁকি ছিল না। কিন্তু তবুও কুন্দকে তাঁর কি প্রয়োজন ছিল। উপন্যাস মধ্যে দুটি প্রয়োজনের কথা প্রচ্ছন্ন আছে বলে মনে হয়। একটি হল—সূর্যমুখীর রূপ, আর কুন্দের রূপের পার্থক্য। সূর্যমুখীর রূপ স্নিগ্ধ—গৃহের কল্যাণশ্রীমণ্ডিত, কুন্দর রূপ উজ্জ্বল—বনের অনাঘ্রাত পুষ্পের উৎকট গন্ধযুক্ত। প্রথমটি নগেন্দ্রনাথ এত অপর্যাপ্ত পরিমাণে পেয়েছেন যে, তার মূল্য বুঝতে পারেননি। তাই দ্বিতীয়টিতে হঠাৎ আকৃষ্ট হয়েছেন। দ্বিতীয় কারণটি হল—সূর্যমুখী সন্তানহীনা।

নগেন্দ্র তাঁর দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করার সময় এ যুক্তিটিকে গ্রহণ করেছেন। নগেন্দ্রনাথ কুন্দকে ভালবেসেছেন প্রথমদর্শনেই, কিন্তু সে ভালবাসা প্রবল হয়ে উঠল কুন্দ বিধবা হবার পর। তারাচরণের সঙ্গে কুন্দের বিয়ে হবার আগেই যে নগেন্দ্রের আকর্ষণ কেন প্রবল হয়ে উঠল না, তা বোঝা যায় না। দীর্ঘ তিন বছর পর বিধবা কুন্দের প্রতি নগেন্দ্রের আবার আকর্ষণ বৃদ্ধির কারণ কি? অবশ্য, অনুমান করা চলে কুন্দের ভাগ্যবিপর্যয় নগেন্দ্রকে কুন্দের প্রতি আরও সহানুভূতিশীল ক'রে তোলে।

নগেন্দ্র সূর্যমুখীর গুরুত্ব প্রথমে বুঝতে না পারলেও, সূর্যমুখীর গৃহত্যাগের পর সাংঘাতিক ভাবে বুঝতে পারলেন। তাই গৃহত্যাগ ক'রে তাঁকেও পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। আবার, কুন্দের মর্যাদা তিনি বুঝতে পারলেন কুন্দের মৃত্যুর পর। কুন্দের মূর্তি তাঁকে প্রাচীন বয়স পর্যন্ত হৃদয়ে অঙ্কিত রাখতে হয়েছে। উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত জিনিসের মর্যাদা বুঝতে না পারায়—নগেন্দ্রনাথকে অনুশোচনা করতে হয়েছে।

বিষবৃক্ষের ফলভোগ যাদের করতে হয়েছে, তাদের মধ্যে হীরা-দেবেন্দ্রের প্রায়শ্চিত্ত বাহ্যিক দিক থেকে নিদারুণ হলেও অন্তর্নিহিত বিষজ্বালা নগেন্দ্রকে কম ভোগ করতে হয়নি। সূর্যমুখীকে হারিয়ে তাঁর জ্বালা যে তীব্রতর হয়েছিল, তার সুদীর্ঘ বর্ণনা আছে নগেন্দ্রের পদব্রজে ভ্রমণে, শ্রীশচন্দ্রের সঙ্গে কথা বলার সময় নিজের হাতে নিজের গলা টিপে ধরায় এবং শয্যাগৃহে সূর্যমুখীর ছায়া দর্শনে। কুন্দের জন্য তাঁর বেদনাবোধ কতখানি গভীর, বঙ্কিম অপ্রয়োজনীয়বোধে তা বর্ণনা করেননি। কিন্তু প্রাচীন বয়স পর্যন্ত যাঁর মর্মান্তিক মৃত্যু সর্বদা বুকে ধরে রাখতে হয়, সেখানে জ্বালা যে কত তীব্রতর, তা' যাঁর ক্ষত আছে তিনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন।

নন্দা (সীতাঃ ১/৮)। সীতারামের স্ত্রীদের মধ্যে নন্দাই সর্বাপেক্ষা স্বাভাবিক। সীতারামের রাজসংসারে সে গৃহিণী। দৃঢ়তার সঙ্গে সে সংসারের হাল ধরে রেখেছে। বিশেষভাবে সীতারামের অনুপস্থিতিতে তার দৃঢ়তা দেখবার মতো। রমার ভীতি-বিহ্বলতাকে দূর করবার জন্য সে যথেষ্ট সাহস জুগিয়েছে। পৌরস্ত্রীদেরও সে যথাসম্ভব বুঝিয়েছে—"ভয় কি মা! পুরুষমানুষের চেয়ে তোমরা কি বেশী বুঝ? তাঁরা যখন বলিতেছেন ভয় নাই, তখন ভয় কেন?" এই কথার মধ্যে রাজবাড়ীর সামান্য স্ত্রীলোকের প্রতিও সুগৃহিণীসুলভ কোমলতা ও মাধুর্যপূর্ণ ব্যবহার চোখে পড়ে। নন্দার সাংসারিক বুদ্ধি প্রবল। রমার কলঙ্কমোচনের জন্য সে তাকে রাজসভায় নিজের সমস্ত কথা খুলে বলবার পরামর্শ দিয়েছে। রমা সপত্নী বলে তার প্রতি নন্দার কোন ঈর্ষা প্রকাশ পায়নি। বরং সীতারামের অদর্শনে রমা যখন তিলে তিলে নিজেকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দিচ্ছে, তখন তার বালিশের নীচে ওষুধ আবিষ্কার ক'রে "নন্দারও চক্ষে জল আসিল।"

স্বামীর প্রতি নন্দার অবিচল ভক্তি। কিন্তু রমার মৃত্যুতে সে একবার অধৈর্য হয়ে রাজাকেই রমার মৃত্যুর জন্য দায়ী করেছে। আবার, স্বামীকে অধর্মের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যই জয়ন্তীর চূড়ান্ত অপমানের সময় সে নিজে রাজসভায় দৃঢ়তার সঙ্গে হুকুম করেছে। নন্দার এই রূপ আমাদের মুগ্ধ করে।

শ্রীকে না জেনে ডাকিনী বলে অভিহিত করলেও, নন্দার শ্রীর প্রতি কিছু ভালবাসার ভাবও ছিল—"নন্দা। যাহাকে আমরা ডাকিনী বলিয়া জানিতাম, সে শ্রী? এত দিন বল নাই কেন, মহারাজ?"

নন্দারও পুত্রকন্যা আছে। কিন্তু নন্দার মাতৃত্ব অপেক্ষা সহধর্মিণীর ভাবটিই উজ্জ্বল। স্বামীর ধর্মের পথে সে যথার্থ সঙ্গী। সীতারামের বিপদের শেষ সীমায় সীতারাম যখন নন্দাকে প্রশ্ন করল—"নন্দা! এত লোক পলাইল—তুমি পলাইলে না কেন? তাহা হইলে ইহারা রক্ষা পাইত।"

নন্দা। তোমার মহিষী হইয়া আমি কার সঙ্গে পলাইব মহারাজ? তোমার পুত্রকন্যা আমি তোমাকে না বলিয়া কাহার হাতে দিব? পুত্র বল, কন্যা বল, সকলই ধর্মের জন্য। আমার ধর্ম তুমি। আমি তোমাকে ফেলিয়া পুত্রকন্যা লইয়া কোথায় যাইব?"

এমনিভাবে গৃহধর্মে ও স্বামীপ্রেমে নন্দার চরিত্রটি বাঙালী নারীর সার্থক রূপ গ্রহণ করেছে।

নবকুমার (কপাঃ ১/১)। "কপালকুণ্ডলা" উপন্যাসের নায়ক নবকুমার একজন মহান ব্যক্তি। তার অনেকগুলি সদ্‌গুণ আছে। তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হ'ল তার পরোপকার-প্রবৃত্তি। কাহিনীর প্রথমাংশেই নবকুমার কাষ্ঠাহরণ ক'রে নৌকাযাত্রীদের উপকার-সাধন করতে চেয়েছিল। তার ফলে তাকে ভীষণ সমুদ্রতীরে বনবাসে বিসর্জিত হতে হল। নবকুমারের এই পরোপকার-প্রবৃত্তির সঙ্গে কপালকুণ্ডলার পরোপকারের তুলনা চলে না। কপালকুণ্ডলা শেষ পর্যন্ত পরের মঙ্গলের জন্য সুখ বিসর্জন দিতে রাজী হয়েছে, কিন্তু নবকুমারের কপালকুণ্ডলার প্রতি আকর্ষণ নিজের প্রতি মমতার সঞ্চার করেছে। তাই উপন্যাসের শেষে আবার সুখে বাঁচবার জন্য নবকুমারের আবেদন শোনা যায়। আত্মসুখ বিসর্জনই তো আদর্শ পরোপকারীর লক্ষণ।

নবকুমারের মধ্যে পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব ছিল যথেষ্ট। সমুদ্র-দর্শনের জন্য তার গঙ্গাসাগর যাত্রা এবং "আহা! কি দেখিলাম! জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না।"

"দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী-
তমালতালী বনরাজিনীলা।

আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে-

ধারানিবন্ধেব কলঙ্করেখা ॥”—

প্রভৃতি উক্তি এই অভিমতেরই পোষকতা করে।

নবকুমার একজন মার্জিত রুচিসম্পন্ন যুবক। ঈশ্বরচিন্তা সম্পর্কেও তার মনোবৃত্তি আধুনিক। তাই সে নৌকাতে প্রাচীনের সঙ্গে কথোপকথন প্রসঙ্গে বলেছে—তীর্থদর্শনে যেরূপ পরকালের কাজ হয়, বাড়ী বসেও তেমনি হতে পারে।

নবকুমারের উপস্থিতবুদ্ধি ও নির্ভীকচিত্ততা লক্ষণীয়। কুজ্ঝটিকায় দিগ্‌ভ্রান্ত নৌকার মঝিরা পর্যন্ত যখন হতাশ্বাস, নবকুমার তখন তাদের হাল ছেড়ে স্রোতে ভেসে যাবার নির্দেশ দিয়েছে। সমুদ্রতীরে বিসর্জিত হয়েও নবকুমার ভীত হয়নি। শুধু তাই নয়, কপালকুণ্ডলা যখন তাকে কাপালিকের কাছ থেকে পালাতে বলেছে, তখন নবকুমার ভেবেছে—“পালাইব বা কেন? সে দিন যদি বাঁচিয়াছি, আজিও বাঁচিব। কাপালিক মনুষ্য, আমিও মনুষ্য।”

নবকুমারের জীবনে বিপর্যয় এনে দিয়েছে কপালকুণ্ডলার সান্নিধ্য। সমুদ্রতীরে কপালকুণ্ডলার মোহিনীমূর্তি দর্শনে নবকুমার যেমন বিস্মিত হয়েছিল, তেমনি ক্রমে ক্রমে এই নারীর মধুর ব্যবহার তার হৃদয়ে অনুরাগের সঞ্চার করেছে। তারপর দ্রুত ঘটনার আলোড়নে নবকুমারের প্রণয়মুগ্ধ হৃদয়ের প্রকাশ ঘটাতে পারেনি। বিবাহের পর সে সুযোগ এসেছে। এত বিলম্বের একটা কৈফিয়ৎ টেনেছেন বঙ্কিমচন্দ্র—

“যখন নবকুমার দেখিলেন যে, কপালকুণ্ডলা তাঁহার গৃহমধ্যে সাদরে গৃহীতা হইলেন, তখন তাঁহার আনন্দ-সাগর উছলিয়া উঠিল। অনাদরের ভয়ে তিনি কপালকুণ্ডলা লাভ করিয়াও কিছুমাত্র আহ্লাদ বা প্রণয়লক্ষণ প্রকাশ করেন নাই —অথচ তাঁহার হৃদয়াকাশ কপালকুণ্ডলার মূর্তিতেই ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছিল। এই আশঙ্কাতেই তিনি কপালকুণ্ডলার পাণিগ্রহণ প্রস্তাবে অকস্মাৎ সম্মত হয়েন নাই; এই আশঙ্কাতেই পাণিগ্রহণ করিয়াও গৃহাগমন পর্যন্তও বারেকমাত্র কপালকুণ্ডলার সহিত প্রণয়সম্ভাষণ করেন নাই; পরিপ্লবোন্মুখ অনুরাগসিন্ধুতে বীচিমাত্র বিক্ষিপ্ত হইতে দেন নাই। কিন্তু সে আশঙ্কা দূর হইল; জলরাশির গতিমুখ হইতে বেগনিরোধকারী উপলমোচনে যেমন দুর্দ্দম স্রোতোবেগ জন্মে, সেইরূপ বেগে নবকুমারের প্রণয়সিন্ধু উচ্ছলিয়া উঠিল।”

নবকুমারের প্রেমের মধ্যে উদ্দামতা নেই, আছে শান্ত সংযত প্রকাশ। বঙ্কিমের বর্ণনায়—“এই প্রেমাবির্ভাব সর্ব্বদা কথায় ব্যক্ত হইত না, কিন্তু নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে দেখিলেই যেরূপ সজললোচনে তাঁহার প্রতি অনিমিষ চাহিয়া থাকিতেন, তাহাতেই প্রকাশ পাইত; যেরূপ নিষ্প্রয়োজনে, প্রয়োজনে কল্পনা করিয়া কপালকুণ্ডলার কাছে

আসিতেন, তাহাতে প্রকাশ পাইত; যেরূপ বিনাপ্রসঙ্গে কপালকুণ্ডলার কাছে আসিতেন, তাহাতে প্রকাশ পাইত; যেরূপ বিনাপ্রসঙ্গে কপালকুণ্ডলার প্রসঙ্গ উত্থাপনের চেষ্টা পাইতেন, তাহাতে প্রকাশ পাইত; যেরূপ দিবানিশি কপালকুণ্ডলার সুখস্বচ্ছন্দতার অন্বেষণ করিতেন, তাহাতে প্রকাশ পাইত; সর্ব্বদা অন্যমনস্কতাসূচক পদবিক্ষেপও প্রকাশ পাইত। তাঁহার প্রকৃতি পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। যেখানে চাপল্য ছিল, সেখানে গাম্ভীর্য্য জন্মিল; সেখানে অপ্রসাদ ছিল, সেখানে প্রসন্নতা জন্মিল; নবকুমারের মুখ সর্ব্বদাই প্রফুল্ল। হৃদয় স্নেহের আধার হওয়াতে অপর সকলের প্রতি স্নেহের আধিক্য জন্মিল; বিরক্তিজনকের প্রতি বিরাগের লাঘব হইল; মনুষ্যমাত্র প্রেমের পাত্র হইল; পৃথিবী সৎকর্ম্মের জন্য মাত্র সৃষ্ট বোধ হইতে লাগিল; সকল সংসার সুন্দর বোধ হইতে লাগিল।"

এরূপ হওয়ার কারণ আছে। প্রথমতঃ, নবকুমারের এটি দ্বিতীয় বিবাহ এবং সে বয়সেও পরিণত যুবক। তাই বর্তমান প্রণয়ে তার পক্ষে বেশি উচ্ছ্বাস না থাকাই স্বাভাবিক। দ্বিতীয়তঃ, নবকুমারের প্রেম একতরফা। কপালকুণ্ডলার উচ্ছ্বাসবিহীন ব্যবহার তাকে সংযত হতে বাধ্য করেছে।

প্রথমা স্ত্রী পদ্মাবতীর পরিচয় পাওয়ার পর নবকুমারের চরিত্রে আলোড়ন জাগার সুযোগ ছিল। কিন্তু যেহেতু নবকুমার সচ্চরিত্র, আদর্শবাদী, নির্লোভ, সেইজন্য পদ্মাবতীর রূপ-ঐশ্বর্য তাকে প্রলোভিত করতে পারেনি, ঘৃণা জুগিয়েছে। এর জন্য বরং নবকুমারের চরিত্র আরো দৃঢ় হয়ে উঠেছে।

নবকুমার কপালকুণ্ডলার প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করেছে সত্য, কিন্তু সেই সন্দেহের অবকাশ জুগিয়েছে কপালকুণ্ডলা নিজেই। নবকুমারের মন থেকে তখন মুছে গেছে অরণ্যচারী কপালকুণ্ডলার স্মৃতি। সে তখন তার কাছে কুলবধূ মৃন্ময়ী। তাই সামাজিক আচরণে অভ্যস্ত নবকুমার, কপালকুণ্ডলার রহস্যময় আচরণ সহ্য করতে পারেনি। বিশেষভাবে কাপালিকের প্ররোচনা এবং পুরুষবেশী মতিবিবির সঙ্গে কপালকুণ্ডলার ঘনিষ্ঠতা নবকুমারকে উদ্দাম ক'রে তুলেছে। এমনিভাবে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে নবকুমারের সন্দেহকে অপরাধ বলে মনে হয় না, বরং তার প্রতি আমাদের জাগে সহানুভূতি।

শেষ দৃশ্যে কপালকুণ্ডলার প্রতি নবকুমারের গভীর প্রেম, তাকে নিয়ে সুখের সংসার বাঁধার নিবিড় আগ্রহ উন্মত্তবেগে প্রকাশিত হয়েছে—"কাঁদিব কেন? তুমি কি জানিবে মৃন্ময়ি! তুমি ত কখন রূপ দেখিয়া উন্মত্ত হও নাই—বলিতে বলিতে নবকুমারের কণ্ঠস্বর যাতনায় রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। তুমি ত কখনও আপনার হৃৎপিণ্ড আপনি ছেদন

করিয়া শ্মশানে ফেলিতে আইস নাই।" এই বলিয়া সহসা নবকুমার চীৎকার করিয়া রোদন করিতে করিতে কপালকুণ্ডলার পদতলে আছাড়িয়া পড়িলেন।

"মৃন্ময়ি!—কপালকুণ্ডলে! আমায় রক্ষা কর। এই তোমার পায়ে লুটাইতেছি—একবার বল যে, তুমি অবিশ্বাসিনী নও—একবার বল, আমি তোমায় হৃদয়ে তুলিয়া গৃহে লইয়া যাই।"

প্রবল বাত্যা-বিক্ষুব্ধ নদী-তরঙ্গে নবকুমারের নিমজ্জন তার হৃদয়ের জ্বালা নিবারণ করেছে।

বঙ্কিমচন্দ্র নবকুমার চরিত্রটিকে আদর্শবাদী নায়ক হিসাবে গড়ে তুলেছেন। 'নবকুমার'কে দিয়ে বাংলা উপন্যাসে যথার্থ এক নব-কুমারের সৃষ্টি হল।

নবীনানন্দ (আনন্দঃ ২/৭)। সন্ন্যাসীরূপে শান্তির ছদ্মনাম। দ্রঃ শান্তি।

নয়নতারা, নয়ানবৌ (দেবীঃ ১/৪)। ব্রজেশ্বরের দ্বিতীয়া স্ত্রী নয়ানতারা যেমন কুরূপা, তেমনি কর্কশ স্বভাবের। নারীসুলভ মাধুর্য বলে তার চরিত্রে কিছু নেই। সংসারের কাজে [illegible] পটু। সারাদিন কাজ-কর্মে সে নিজেকে নিয়োজিত রাখে। কিন্তু তার বুদ্ধি ব'লে কিছু নেই। সাগরবৌ তাকে নিয়ে যখন রসিকতা করে, তখন সে সহজে বুঝতে পারে না। তারপর বুঝতে পারলেও, সে এমন প্রত্যুত্তর দেয় যে, হাসির উপাদান জোগায়। নয়ানবৌয়ের এই বোকামির জন্যই পাঠকের এই চরিত্রটির উপর রাগ করবার কোন কারণ ঘটেনি, বরং তার উপস্থিতিতে হাস্যরসের প্রবাহ দেখা দিয়েছে।

নয়ানবৌয়ের সতীনদের সহ্য করবার মতো উদারতা নেই। সাগরকে সে সহ্য করতে না পারলেও, তার কথাকে সে ভয় করে, কিন্তু প্রফুল্লর কুৎসায় ন সানন্দে যোগ দেয়। প্রফুল্লর মৃত্যু-সংবাদে অশৌচ স্নান ক'রে নয়ানবৌ বলেছে—"এইবার আর একটার জন্য নাওয়াটা নাইতে পারলে হাড় জুড়ায়।"

এই ধরনের স্বার্থপর চরিত্র সংসারে অনেক আছে।

নিদিয়া (রজনীর বিজ্ঞাপন)। লিটনের 'লাস্ট ডেজ্ অব পম্পেই' উপন্যাসের অন্যতম নারী-চরিত্র। নিদিয়া অন্ধ। সে গ্লকাসকে ভালবাসে। কিন্তু ভালবাসার জন্য নীরব আত্মত্যাগই তার চরিত্রটিকে মহান ক'রে তুলেছে। অনেকে রজনী চরিত্রের সঙ্গে নিদিয়ার মিল খুঁজে থাকেন।

নিদ্রাসিংহ (কৃঃ উঃ ২/৪)। হরিদ্রাগ্রামের পুলিশ স্টেশনের কনেস্টবল। মাধবীনাথ ব্রহ্মানন্দকে ভয় দেখাবার জন্য একে নিয়ে এসেছিল।

নিমাই (আনন্দঃ ১/১৫)। জীবানন্দের ভগিনী নিমাই সন্ন্যাসধর্মের আদর্শের

ছোঁয়াচ-বিহীন অন্যতম গৃহিচরিত্র। স্বামীর সঙ্গে তার সুখের সংসার। কেবলমাত্র একটি শিশুর অভাবে তার মাতৃহৃদয় রিক্ত। তাই জীবানন্দের কাছে শিশু সুকুমারীকে পেয়ে তার আনন্দের শেষ নেই। আবার যখন তাকে ফিরিয়ে দিতে হল, তখন তার মাতৃহৃদয়ের হাহাকারই ধ্বনিত হয়ে ওঠে। সাধারণ গৃহস্থের মতোই ভ্রাতার সঙ্গে ভ্রাতৃজায়ার মিলনে সে আগ্রহী। বৌদির সঙ্গে রসিকতায় সে আনন্দ উপভোগ করে। দাদাকে সব খাইয়েও তার তৃপ্তি হয় না। এ চরিত্র বাঙালী ঘরের একান্ত নিজস্ব।

নির্মলকুমারী (রাজঃ ১/২)। রাজসিংহের সহচর যেমন মাণিকলাল, তেমনি রাজকুমারী চঞ্চলকুমারীর সখী নির্মলকুমারী। রাজসিংহ ও চঞ্চলকুমারীর মতো নির্মলকুমারী ও মাণিকলালের হৃদয়ে সেতু বাধা হয়েছে বিবাহের দ্বারা। বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য উপন্যাসের মতো এই উপন্যাসেও সখী-চরিত্র নির্মলকুমারী। কিন্তু এখানে নির্মলকুমারী নিজ চরিত্রবৈশিষ্ট্য আরো একটু বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে নিয়েছে।

নির্মলকুমারীর অতীত ইতিহাস কিছু বলা হয়নি। কেবলমাত্র সে একবার বলেছে যে, সে ছেলেবেলায় বাঘ পুষেছিল। অর্থাৎ, নির্মলকুমারী যে বাল্যকাল থেকেই দুরন্ত প্রকৃতির, তা বোঝা যায়। উপন্যাসের মধ্যে বারবার তার সাহস ও মনোবলের পরিচয় আমরা পেয়েছি। পদব্রজে চঞ্চলকুমারীর অনুসরণ, মুঘল-হারেমে চঞ্চলকুমারীর পত্র নিয়ে উদিপুরীকে প্রেরণ তার মধ্যে অন্যতম।

চঞ্চলকে নির্মল প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। তাই তার অনিষ্টের কথা ভেবে প্রথমেই সে তসবিরওয়ালী বুড়ীর মুখ বন্ধ করার ব্যবস্থা করেছিল। তারপর রাজকুমারীর দুঃখে অনবরতই তাকে সঙ্গী হতে দেখি। এমনকি সখীর অনুরোধে সদ্য-বিবাহিত স্বামীকে ত্যাগ ক'রে, মাণিকলালের কন্যার মা হওয়া শিকেয় তুলে রেখে, তাকে চঞ্চলকুমারীর কাছে থাকতে হয়েছে। সখীগতপ্রাণা নির্মলকুমারী নিজের জন্য কিছুই করেনি।

ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে নির্মলকুমারীর সম্পর্কটা বড়ো জটিল। একসময় সে পরিহাস করে ঔরঙ্গজেবকে বিবাহ করার কথা বলেছিল। কিন্তু সত্যই যখন ঔরঙ্গজেব মনপ্রাণ দিয়েছিল নির্মলকুমারীকে, তখন কি নির্মলের মনেও দোলা লাগেনি ? নির্মল একবার বলেছে—"আমার ভাগ্যবশতঃই অবিবাহিত অবস্থায় আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় নাই।" ঔরঙ্গজেবের প্রতি মমতাবশতঃ তার দুর্দশার দিনে নির্মলকুমারী সাহায্য করেছে। নির্মলকুমারীর চেষ্টাতেই মুঘল-রাজপুত যুদ্ধের গতি অনেকটা পরিবর্তিত হয়েছে। এই কারণে নির্মলকুমারীর চরিত্রটি উপেক্ষণীয় নয়।

নির্মলকুমারী ও মাণিকলালের সম্পর্ক অস্পষ্ট। মাণিকলালকে দায়ে পড়ে বিবাহ করতে হলেও, মাণিকলালের প্রতি নির্মলের অনুরাগ না জন্মাবার কোন কারণ নেই।

চতুরতায় উভয়েই উভয়ের যোগ্য। বিবাহের পর দু'জনের মিলিত বুদ্ধিতে বহুকাজ অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গেই সাধিত হয়েছে।

নির্মলা (ইন্দিরা: ৫ম পরি:)। দ্রঃ অমলা।

নিশাকর দাস (কৃ: উ: ২/৫)। "কলিকাতায় নিশাকর দাস নামে মাধবীনাথের একজন বড় আত্মীয় ছিলেন। নিশাকর মাধবীনাথের অপেক্ষা আট দশ বৎসরের বয়ঃকনিষ্ঠ। নিশাকর কিছু করেন না—পৈতৃক বিষয় আছে—কেবল একটু একটু গীতবাদ্যের অনুশীলন করেন। নিষ্কর্মা বলিয়া সর্ব্বদা পর্য্যটনে গমন করিয়া থাকেন।" প্রসাদপুরে রোহিণীর হাত থেকে গোবিন্দলালকে উদ্ধার করার কাজে মাধবীনাথ নিশাকরের সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন। নিশাকর রূপবান, বুদ্ধিমানও বটেন। তিনি একটুতেই বুঝতে পেরেছেন, রোহিণী তাঁর রূপে মজেছে। সোনা-রূপোকেও যেভাবে তিনি রোহিণীর সর্বনাশে ও নিজের স্বার্থসিদ্ধিতে ব্যবহার করেছেন, তাতে তাঁর কৌশলীমনেরই পরিচয় দেয়। নিশাকরবাবু একেবারে দয়ালেশহীন নন। তাই রোহিণীর সর্বনাশ করতে গিয়ে তাঁর মন কেঁদে উঠেছে। রোহিণীর জন্য পুষ্করিণী-তীরে অপেক্ষা করবার সময় তাঁর মনে আলোড়ন জেগেছে—"আমি কি নৃশংস! একজন স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য কত কৌশল করিতেছি! অথবা নৃশংসতাই বা কি? দুষ্টের দমন অবশ্যই কর্ত্তব্য। যখন বন্ধুর কন্যার জীবনরক্ষার্থ এ কার্য্য বন্ধুর নিকট স্বীকার করিয়াছি, তখন অবশ্য করিব। কিন্তু আমার মন ইহাতে প্রসন্ন নয়। রোহিণী পাপীয়সী, পাপের দণ্ড দিব; পাপস্রোতের রোধ করিব; ইহাতে অপ্রসাদই বা কেন? বলিতে পারি না, বোধ হয় সোজা পথে গেলে এত ভাবিতাম না। বাঁকা পথে গিয়াছি বলিয়াই এত সঙ্কোচ হইতেছে। আর পাপ-পুণ্যের দণ্ড-পুরস্কার দিবার আমি কে? আমার পাপ-পুণ্যের যিনি দণ্ড-পুরস্কার করিবেন, রোহিণীরও তিনি বিচারকর্ত্তা। বলিতে পারি না, হয়ত তিনিই আমাকে এই কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছেন। কি জানি, "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

বলা বাহুল্য, স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, এ কৈফিয়ৎ নিশাকরের, না স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের।

নিশি (দেবী: ১/১৩)। "দেবী চৌধুরাণী" উপন্যাসের হাস্যোজ্জ্বল নিশি চরিত্রের পূর্ব ইতিহাসে একটি দুঃখময় কাহিনী রয়েছে। সে বামুনের মেয়ে। বাল্যকালে ছেলেধরায় নিয়ে গিয়ে তাকে এক রাজার কাছে বিক্রী করে। বয়সকালে সেই রাজা তাকে রক্ষিতা রাখতে মনস্থ করলে, নিশি রাজবাড়ী থেকে

পলায়ন করে। তারপর পথিমধ্যে ভবানী পাঠকের ডাকাতদলের হাতে পড়ে রক্ষা পায়।

নিশি ভবানী পাঠকের যথার্থ শিষ্যা। প্রফুল্লর শিক্ষাদানকার্যে ভবানী পাঠক নিশিকে নিয়োগ করেছিলেন। সুতরাং প্রফুল্লর শিক্ষাগুলি সে পূর্বেই সমাপ্ত করেছিল। তবুও ভবানী পাঠক তাকে কেন যে আগেই দলনেত্রী নির্বাচিত করেননি, তা বোঝা যায় না। অবশ্য, নিশিচরিত্রে সে দৃঢ়তাও ছিল না।

নিশি সদাহাস্যময়ী চরিত্র। সর্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ ক'রে সে নিজে ভারমুক্ত। প্রফুল্লকে সে বারবার বোঝাতে চেয়েছে নিষ্কামধর্মের মহিমা। কিন্তু সংসারের সুখস্পর্শের পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টি নিশির ছিল না। তাই তার জীবন নিষ্ফলা কৃষ্ণপ্রীতিতেই সমাপ্ত হল।

নিশিকে দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র নিষ্কামধর্মের অন্যতর ফলশ্রুতি ঘটিয়েছেন।

নীলাম্বর দেব (দেবীঃ ১/৯)। নীলধ্বজবংশীয় নীলাম্বর দেব উত্তরবঙ্গের একজন প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। গৌড়ের বাদশাহের সঙ্গে যুদ্ধকালে তিনি নিহত হন। তাঁর প্রোথিত ধনরত্নই ঘটনাচক্রে দেবী চৌধুরাণীর হাতে আসে। এ কাহিনীর কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কিনা জানা যায় না, তবে সম্ভাব্যতা যথেষ্ট আছে।

নুরজাহান (চন্দ্রঃ ২/২)। মোগল-সাম্রাজ্ঞী। তাঁর প্রথম স্বামী ছিল বর্ধমানাধিপতি শের আফগান। জাহাঙ্গীর কর্তৃক নিযুক্ত লোক শের আফগানকে হত্যা করে। তারপর নুরজাহান জাহাঙ্গীরকে বিবাহ ক'রে মোগল সাম্রাজ্যের সর্বময় কর্তৃত্ব হস্তগত করে। বাল্যকালে ইনি মেহের-উন্নিসা নামে পরিচিতা ছিলেন। এক দরিদ্র অথচ সম্ভ্রান্ত পারসীক বংশে তাঁর জন্ম হয়। পিতার নাম মির্জা ঘিয়াস। ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

নুর মহম্মদ খাঁ (রাজঃ ৩/১০)। একজন মোগল সৈনিক। এই বোকা সৈনিকটি পানওয়ালীর প্রেমপত্রে বিভ্রান্ত হয়ে সহজেই মাণিকলালের ফাঁদে পা দিয়েছে। পানওয়ালীর সঙ্গে তার প্রেমাভিনয়কালে প্রেমিকার স্বামীর ভয়ে স্থূল শরীর নিয়ে যেভাবে সে তক্তাপোষের নীচে স্থান গ্রহণ করেছে, তাতে পাঠকের হাসি আর বাধা মানে না।

নুরজাঁহা বেগম (রাজঃ ১/১)। দ্রঃ নুরজাহান।

পদ্মলোচন শাহা (রাধাঃ ১ম পরিঃ)। রাধারাণীর বাড়ীর কাছে কাপড়ের দোকান ছিল পদ্মলোচন শাহার। সাধারণ দোকানদারের চেয়ে তার লোভ অনেক বেশী। রুক্মিণীকুমারের কাছ থেকে বেশী দাম নিয়ে সে রাধারাণীর কাছে কাপড় দিতে এসেছিল।

পদ্মাবতী (কপাঃ)। দ্রঃ মতিবিবি।

পরাণ চৌধুরী (দেবীঃ ১/৮)। প্রফুল্লদের গ্রামের জমিদার। তাঁর কোন উপস্থিতি নেই, কেবলমাত্র নামোল্লখ আছে। তবে বুঝা যায়, অধিকাংশ জমিদারের মতো তিনিও লম্পট ও দুশ্চরিত্র।

পশুপতি (মৃণাঃ ২/১)। "গৌড়দেশের ধর্ম্মাধিকার পশুপতি অসাধারণ ব্যক্তি ; তিনি দ্বিতীয় গৌড়েশ্বর। রাজা বৃদ্ধ ; বার্দ্ধক্যের ধর্ম্মানুসারে পরমতাবলম্বী এবং রাজকার্য্যে অযত্নবান্ হইয়াছিলেন, সুতরাং প্রধানামাত্য ধর্ম্মাধিকারের হস্তেই গৌড়রাজ্যের প্রকৃত ভার অর্পিত হইয়াছিল। এবং সম্পদে অথবা ঐশ্বর্য্যে পশুপতি গৌড়েশ্বরের সমকক্ষ ব্যক্তি হইয়া উঠিয়াছিলেন।

পশুপতির বয়ঃক্রম পঞ্চত্রিংশৎ বৎসর হইবে। তিনি দেখিতে অতি সুপুরুষ। তাঁহার শরীর দীর্ঘ, বক্ষ বিশাল, সর্ব্বাঙ্গ অস্থিমাংসের উপযুক্ত সংযোগে সুন্দর। তাঁহার বর্ণ তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ ; ললাট অতি বিস্তৃত, মানসিক শক্তির মন্দিরস্বরূপ। নাসিকা দীর্ঘ এবং উন্নত চক্ষু ক্ষুদ্র, কিন্তু অসাধারণ ঔজ্জ্বল্য-সম্পন্ন। মুখকান্তি জ্ঞানগাম্ভীর্য্য-ব্যঞ্জক এবং অনুদিন বিষয়ানুষ্ঠানজনিত চিন্তার গুণে কিছু পুরুষভাবপ্রকাশক। তাহা হইলে কি হয়, রাজসভাতলে তাঁহার ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুরুষ আর কেহই ছিল না। লোকে বলিত, গৌড়দেশে তাদৃশ পণ্ডিত এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিও কেহ ছিল না।

পশুপতি জাতিতে ব্রাহ্মণ, কিন্তু তাঁহার জন্মভূমি কোথা, তাহা কেহ বিশেষ জ্ঞাত ছিল না। কথিত ছিল যে, তাঁহার পিতা শাস্ত্রব্যবসায়ী দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন।

পশুপতি কেবল আপন বুদ্ধিবিদ্যার প্রভাবে গৌড়রাজ্যের প্রধান পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

পশুপতি যৌবনকালে কাশীধামে পিতার নিকট থাকিয়া শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতেন। তথায় কেশব নামে এক বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। হৈমবতী নামে কেশবের এক অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা ছিল। তাহার সহিত পশুপতির পরিণয় হয়। কিন্তু অদৃষ্টবশতঃ বিবাহের রাত্রেই কেশব, সম্প্রদানের পর, কন্যা লইয়া অদৃশ্য হইল। আর তাহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। সেই পর্য্যন্ত পশুপতি পত্নীসহবাসে বঞ্চিত ছিলেন। কারণবশতঃ একাল পর্য্যন্ত দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহ করেন নাই। তিনি এক্ষণে রাজপ্রাসাদতুল্য উচ্চ অট্টালিকায় বাস করিতেন, কিন্তু বামায়ননিঃসৃত জ্যোতির অভাবে সেই উচ্চ অট্টালিকা আজি অন্ধকারময়।"

বঙ্কিমচন্দ্র-প্রদত্ত পশুপতির এই বর্ণনায় তাঁকে সর্বাঙ্গসুন্দর পুরুষ-চরিত্র বলে মনে হয়। পশুপতির জীবনের দুটি দিক—একদিকে গৌড়েশ্বর হবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে

মনোরমার পাণিগ্রহণ। পশুপতির এই দুটি উদ্দেশ্য কিন্তু সুক্ষ্মভাবে একসূত্রে গ্রথিত। মনোরমা বিধবা। তাই তাকে পেতে গেলে সমাজের ভ্রূকুটি সহ্য করতে হবে। কিন্তু সে সাহস পশুপতির নেই। তাই তিনি ভেবেছেন যে, তিনি রাজা হলে এ সম্বন্ধে আর কেউ কিছু বলতে পারবে না। কিন্তু এই যুক্তি দিয়ে পশুপতির দোষ স্খালন করা যায় না। বরং মনে হয়, পশুপতি যদি মনোরমাকে যথার্থ ভালবাসতেন, তাহলে সমাজের শাসন মানতেন না। আবার, পশুপতির মনে রাজ্যলাভের আকাঙ্ক্ষাও ছিল। সেই আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করবার জন্য তিনি বিধর্মী যবনসেনার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছেন। এর কি কোন প্রয়োজন ছিল? তিনি যদি যথার্থ স্বদেশপ্রেমিক হতেন, তাহলে নিজের অধীনেই সৈন্যসামন্তকে রাখতে পারতেন। কিন্তু তাহলে ইতিহাসের বিধানকে অমান্য করতে হয়। সপ্তদশ অশ্বারোহীর দ্বারা বঙ্গাধিকারের কলঙ্কমোচনের জন্য বঙ্কিম পশুপতিকে ইতিহাসের যূপকাষ্ঠে বলি দিয়েছেন।

পশুপতি নিজের জালে নিজে জড়িয়ে পড়েছেন। অবশ্য, যবনগণ যখন তাঁকে ধর্মান্তরিত করতে চাইল, তখন তিনি যথার্থ সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। আবার, মনোরমাকে গৃহে বন্দী ক'রে রাখায় পশুপতির হীন মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

উপন্যাসের শেষাংশে পশুপতির মনে অনুশোচনা জেগেছিল বলেই মনে হয়। তাই মনোরমাকে উদ্ধার করবার জন্য এবং প্রতিমাকে রক্ষা করবার জন্য জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে তাঁকে ঝাঁপ দিতে দেখি। পশুপতিকে তাঁর পাপের প্রায়শ্চিত্ত এমনিভাবেই করতে হল। পশুপতির জীবনের এই নিদারুণ পরিণামের জন্যই শেষ পর্যন্ত পাঠকের সহানুভূতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন।

পাদ্রি কক্র (রাজঃ ২/২)। "রাজসিংহ" উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র কোন কোন ক্ষেত্রে এঁর নাম করেছেন।

পানওয়ালী (রাজঃ ৩/১০)। রূপনগরের বাজারের রসিকা পানওয়ালী মাণিক-লালের আবিষ্কার। পানওয়ালী একটু আনন্দ উপভোগের জন্য একজন মোগল সৈনিকের সঙ্গে প্রেমাভিনয় করতে সম্মত হয়েছিল। তার সাহায্যেই মাণিকলাল মোগল সৈনিকের পোশাক সংগ্রহ ক'রে চঞ্চলকুমারীর পিছু পিছু মোগল সেনার সঙ্গে গমন করে।

পার্বতী (চন্দ্রঃ ২/৬)। ফস্টরের নৌকায় শৈবলিনীর সঙ্গী ছিল পুরন্দরপুরের দাসী পার্বতী।

পাঁচকড়ির মা (সীতাঃ ১/২)। শ্রী ও গঙ্গারামের এক বর্ষীয়সী প্রতিবাসিনী। তার সাহায্যেই শ্রী সীতারামের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পায়। পাঁচকড়ির মার রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করবার কৌশলটি বেশ রপ্ত।

পিয়াদা (কৃঃ উঃ ২/৩)। দ্রঃ পোস্টমাস্টার।

পিয়ারী ঠান্‌দিদি (ইন্দিরা ২১ পরিঃ)। "পাড়ার পিয়ারী ঠান্‌দিদি, জাতিতে বৈদ্য—বয়স পঞ্চষষ্ঠি বৎসর, তার মধ্যে পঞ্চবিংশতি বৎসর বৈধব্যে কাটিয়াছে—তিনি সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কার পরিয়া ঘাঘরা পরিয়া, রাধিকা সাজিয়া আসিয়াছেন।" এমনিভাবে ইনি ইন্দিরার স্বামীর সঙ্গে রঙ্গরসে মেতেছিলেন।

পিয়ারীলাল (সীতাঃ ২/১৩)। সীতারামের একজন গোলন্দাজ সৈন্য। জয়ন্তী এ-কে গঙ্গারামের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে দুর্গদ্বারের কামান চালানোর কাজে নিযুক্ত করে। এই বীর গোলন্দাজ শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ ক'রে মৃত্যুবরণ করে।

পীরবক্স (চন্দ্রঃ ৩/৫)। অমিয়টের খানসামা। তারই নির্বুদ্ধিতায় বন্দী প্রতাপের সঙ্গে শৈবলিনীর নৌকায় সাক্ষাৎ হয়েছিল।

পীরবক্‌স্ খাঁ (সীতাঃ ২/১৬)। ফৌজদারের একজন সেনাপতি। তিনি মৃন্ময়ের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন।

পুরন্দর (যুগঃ ১ম পরিঃ)। পুরন্দর 'যুগলাঙ্গুরীয়ে'র নায়ক। পূর্বকালে পিতৃ আদেশ মান্য করা প্রথা ছিল। পুরন্দরও জোর ক'রে হিরণ্ময়ীকে বিবাহ করতে চাননি। আবার, পিতার আদেশে অজ্ঞাত কন্যাকে বিবাহও করলেন। পুরন্দরের প্রেম হিরণ্ময়ীর মতো গভীর নয়। তিনি হিরণ্ময়ীকে ভুলতে পেরেই দেশে ফিরেছিলেন। তাই স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হতে তাঁর আপত্তি নেই, তবে তিনি সচ্চরিত্রা কিনা তার প্রমাণ আবশ্যক। যখন দেখা গেল, হিরণ্ময়ীই পুরন্দরের বিবাহিতা স্ত্রী, তখন সেটি হল তাঁর উপরি পাওনা।

পুরুষোত্তম (কপাঃ ১/৮)। পুরীর জগন্নাথদেবকেই পুরুষোত্তম বলা হয়। কৃষ্ণ ও বিষ্ণু পুরুষোত্তম নামে অভিহিত হন।

প্লুটার্ক (রজনীঃ ৩/৩)। প্লুটার্ক (Plutarch), (আনুমানিক ৪৬—১২০ খ্রীষ্টাব্দ), প্রাচীন গ্রীস ও রোমের বিখ্যাত ব্যক্তিদের নিয়ে 'Lives' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। আধুনিক লেখক ও ঐতিহাসিকরা তা থেকেই উপাদান সংগ্রহ করেন। ইনি গ্রীসের অধিবাসী হলেও, জীবনের অধিকাংশ কাল রোমেই কাটিয়েছিলেন।

পেষমন্ (কপাঃ ৩/২)। পেষমন্ লুৎফ-উন্নিসার সহচরী। মাত্র তিনটি দৃশ্যে তাকে দেখা যায়। লুৎফ-উন্নিসা তথা পদ্মাবতীর হৃদয়ের পরিবর্তন দেখবার জন্য পেষমনের প্রয়োজন ছিল। তবে পেষমন্ একেবারে সাধারণ বাঁদী শ্রেণীর নয়। লুৎফ-উন্নিসার সঙ্গে তার কিছুটা হৃদয়ের সম্পর্ক, অর্থাৎ সখী সম্পর্ক ছিল। তাই

লুৎফ-উন্নিসা যখন সমস্ত ঐশ্বর্য ত্যাগ করতে চেয়েছে, তখন পেষমন্ তাকে নিবৃত্ত করতে চেয়েছিল। শেষ পর্যন্ত মতিবিবির সঙ্গে তাকে সপ্তগ্রামেও আসতে হয়েছে।

পোস্টমাস্টার ও পিয়াদা (কৃঃ উঃ ২/৩)। হরিদ্রাগ্রামের পোস্টমাস্টার ও পিয়াদার চরিত্র দুটি একটি পরিচ্ছেদে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। মাধবীনাথের সঙ্গে ব্যবহারে পোস্টমাস্টারের পদমর্যাদার হাস্যকর গর্ব, লোভ প্রভৃতি গুণগুলি প্রকাশিত হয়ে পড়ে। এদের দ্বারা কিঞ্চিৎ হাস্যরসের সৃষ্টি করা হয়েছে।

প্রতাপ (চন্দ্রঃ উপঃ ১ম পরিঃ)। "চন্দ্রশেখর" উপন্যাসের এই প্রতাপশালী প্রতাপ চরিত্র বীরত্বে ও প্রেমের মহিমায় সমুজ্জ্বল। শৈবলিনীর জীবন যেমন চন্দ্রশেখর ও প্রতাপের মধ্যে পড়ে দোদুল্যমান, তেমনি পাঠকমনেও নায়ক-নির্বাচনে এই দুজনকে নিয়ে সংশয়ের অন্ত নাই। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের নায়ক হিসাবে দুজনেরই দাবি সমান। তবে আমাদের মনে হয়, 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাস নায়কহীন। নায়িকা শৈবলিনীরই একচ্ছত্র প্রাধান্য। সুতরাং চন্দ্রশেখর এবং প্রতাপ সমপর্যায়ের চরিত্র।

প্রতাপ শৈবলিনীকে ভালবেসেছিল। সে ভালবাসার মধ্যে যে খাদ ছিল না, তা সে প্রমাণ করেছে গঙ্গাবক্ষে মৃত্যুবরণের দৃঢ়তায়। কিন্তু তার তরুণমনের মৃত্যুবরণের সুখকে নষ্ট ক'রে দিল শৈবলিনী। প্রতাপের মনে শৈবলিনীর প্রতি জেগে উঠল নিদারুণ ঘৃণা। কিন্তু প্রতাপের মনের পরিচয় বঙ্কিমচন্দ্র গোপন রেখেছেন। শৈবলিনীকে ফস্টরের হাত থেকে রক্ষা করার পিছনে পুরাতন প্রেমিকার প্রতি মোহ অপেক্ষা, প্রতাপের উদ্ধারকারী চন্দ্রশেখরের প্রতি কৃতজ্ঞতাই সক্রিয় ছিল বলে মনে হয়। শৈবলিনীকে উদ্ধারের পর, যখন প্রতাপের সঙ্গে শৈবলিনীর দেখা হল, তখন প্রতাপের ব্যবহারে শৈবলিনীর প্রতি ঘৃণাই প্রকাশিত হয়েছে। প্রতাপ শৈবলিনীকে বলেছে—"ঈশ্বর জানেন, আমি কোন দোষে দোষী নহি। ঈশ্বর জানেন, ইদানীং আমি তোমাকে সর্প মনে করিয়া, ভয়ে তোমার পথ ছাড়িয়া থাকিতাম। তোমার বিষের ভয়ে আমি বেদগ্রাম ত্যাগ করিয়াছিলাম। তোমার নিজের হৃদয়ের দোষ—তোমার প্রবৃত্তির দোষ। তুমি পাপিষ্ঠা, তাই আমার দোষ দাও। আমি তোমার কি করিয়াছি?" কিন্তু প্রতাপ যখন শৈবলিনীর মুখ থেকে শুনল, প্রতাপকে পাবার আশাতেই সে গৃহত্যাগ করেছিল, তখন 'প্রতাপের মাথায় বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল'।

এর পর আবার প্রতাপের জীবনে ঘটনার ঘনঘটা। জনস্টন ও গুলস্টনের আক্রমণে সে বন্দী হয়ে ভেসে চললো গঙ্গাবক্ষে ইংরাজ নৌকায়। এবার তাকে উদ্ধার করলো শৈবলিনী। শৈবলিনীর সঙ্গে গঙ্গাবক্ষে সন্তরণের সময় প্রতাপ-হৃদয়ের সমস্ত আবরণ উন্মোচিত হয়েছে। শৈবলিনীর প্রতি ঘৃণার বিষবাষ্পের মধ্যেও যে বাল্যপ্রেমের

সুগন্ধটুকু বিদ্যমান ছিল, গঙ্গাবক্ষে চন্দ্রালোকিত রজনীর অনাবিল সৌন্দর্যের মধ্যে তার পুনঃপ্রকাশ হল। প্রতাপ শৈবলিনীকে সেই পুরানো সম্বোধন করল—'শৈ।'

প্রতাপ স্বীকার করল, সে-ও শৈবলিনীর মতো নিঃস্ব-রিক্ত। রূপসীর সঙ্গে বিবাহে প্রতাপের সংসার-জীবন যে মধুময় হয়ে ওঠেনি, সে প্রমাণ এখানে রয়েছে। তাই প্রতাপ আজও রাজী শৈবলিনীর সঙ্গে মৃত্যুবরণ করতে। কিন্তু আজ শৈবলিনী প্রতাপকে মরতে দিল না, সে প্রতিজ্ঞা করল প্রতাপের সঙ্গে আর তার কখনো সাক্ষাৎ হবে না।

কিন্তু প্রতাপ শৈবলিনীকে ভুলতে পারল না। যখন তার ধারণা হল যে, শৈবলিনীর মৃত্যু ঘটেছে, তখন—"প্রতাপ প্রথমে মনে করিলেন, 'আমিই শৈবলিনীর মৃত্যুর কারণ।' কিন্তু ইহাও ভাবিলেন, 'আমার দোষ কি। আমি ধর্ম্ম ভিন্ন অধর্ম্মপথে যাই নাই। শৈবলিনী যে জন্য মরিয়াছে, তাহা আমার নিবার্য্য কারণ নহে।' অতএব প্রতাপ নিজের উপর রাগ করিবার কারণ পাইলেন না। চন্দ্রশেখরের উপর কিছু রাগ করিলেন—চন্দ্রশেখর কেন শৈবলিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন? রূপসীর উপর একটু রাগ করিলেন, কেন শৈবলিনীর সঙ্গে প্রতাপের বিবাহ না হইয়া রূপসীর সঙ্গে বিবাহ হইয়াছিল? সুন্দরীর উপর আরও একটু রাগ করিলেন—সুন্দরী তাঁহাকে না পাঠাইলে, প্রতাপের সঙ্গে শৈবলিনীর গঙ্গাসন্তরণ ঘটিত না, শৈবলিনীও মরিত না। কিন্তু, সর্ব্বাপেক্ষা লরেন্স ফষ্টরের উপর রাগ হইল—সে শৈবলিনীকে গৃহত্যাগিনী না করিলে এ সকল কিছুই ঘটিত না।" এমনিভাবে অসংলগ্ন চিন্তার ফলে প্রতাপ হয়ে উঠল ইংরাজ-বিদ্বেষী। বাইরের কর্মচাঞ্চল্যে ভুলিয়ে রাখতে চাইল হৃদয়ের অশান্তিকে।

ইতিহাসের আলোড়নের যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আবার দেখা হল প্রতাপ-শৈবলিনীর। প্রথমে শৈবলিনী পাগল হয়ে গেছে শুনে প্রতাপ যেমন দুঃখিত হয়েছিল, শৈবলিনীর প্রকৃতিস্থতার পরিচয় পেয়ে ততোধিক আনন্দলাভ করল। তারপর—" 'আশীর্ব্বাদ করি, তুমি এবার সুখী হও।' এই বলিয়া প্রতাপ নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।" শৈবলিনীর কাছ থেকে একেবারে দূরে সরে গেল প্রতাপ, শৈবলিনীকে সুখী করার জন্য।

এই আত্মত্যাগের মহিমায় প্রতাপ চরিত্র সার্থক হয়ে উঠেছে। বীরত্বে সে যেমন অদ্বিতীয়, প্রেমের ক্ষেত্রেও সে বীরত্ব দেখিয়েছে। তবে সে বীরত্ব পরস্ত্রী অপহরণে নয়, নীরব আত্মদানে। প্রতাপের ভাষাতেই—"আমার ভালবাসার নাম—"জীবনবিসর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা।"

রামানন্দ স্বামীর মন্তব্য অনুসারে—প্রতাপ ইন্দ্রিয়জয়ী, চিত্তসংযমী, পরোপকারী পুরুষ—'দেবতারাও তোমার তুল্য পুণ্যবান্ নহেন।' 'দধীচির অপেক্ষাও তুমি স্বর্গের অধিকারী।'

প্রফুল্ল (দেবী: ১/১)। প্রফুল্ল প্রথমে সাধারণ, শেষেও সাধারণ। কিন্তু মাঝখানে সে অসাধারণ হয়ে উঠেছে। তখনি সে দেবী চৌধুরাণী। সাধারণ একজন নারীকে অসাধারণে পরিণত ক'রে পুনরায় সাধারণে পরিণত করার পিছনে বঙ্কিমের যে উদ্দেশ্য ছিল, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

প্রথমে প্রফুল্লকে আমরা দেখি অত্যন্ত দুঃখী চরিত্ররূপে। শ্বশ্রূগৃহে পরিত্যক্তা এই নারী দুঃস্থা বিধবা মাতার বোঝা বাড়িয়েছে মাত্র। কিন্তু দুঃখের মধ্যে পড়েও প্রফুল্ল তার দৃঢ়তা বিসর্জন দেয়নি। তাই সে উপোস ক'রে থাকার সংকল্প নিয়েছে, তবু পরের বাড়ী অন্ন ধার করার অপমান সহ্য করতে চায়নি। প্রফুল্ল চরিত্রের এই দৃঢ়তা তার স্বভাবসুলভ গুণ। এই দৃঢ়তার উপাদানেই পরবর্তী কালে বঙ্কিম তাকে ডাকাতের রানী দেবী চৌধুরাণীতে পরিণত করেছেন।

প্রফুল্ল মাতার সঙ্গে শ্বশুরগৃহে গিয়ে কিন্তু বধূজনোচিত আচরণই করেছে। ক্ষোভের বশবর্তী হয়ে রূঢ় আচরণ করেনি। প্রফুল্ল চরিত্রে এই কোমলতার সঙ্গে কঠোরতার মিশ্রণে এক অপূর্ব রূপলাবণ্য দেখা দিয়েছে।

ব্রজেশ্বরের সঙ্গে গোপন সাক্ষাতে প্রফুল্ল স্বামীভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে। একরাত্রি স্বামীর শয্যাপার্শ্বে থেকে সে বিদায়কালে স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনই করেছে। তাই প্রফুল্ল স্বামীকে বলে—"তুমি আমায় ত্যাগ কর নাই—গ্রহণ করিয়াছ। আমাকে এক দিনের জন্য শয্যার পাশে ঠাঁই দিয়াছ—আমার সেই ঢের। তোমার কাছে ভিক্ষা করিতেছি, আমার মত দুঃখিনীর জন্য বাপের সঙ্গে তুমি বিবাদ করিও না। তাতে আমি সুখী হইব না।"

তারপর প্রফুল্ল ফুলমণি ও হরবল্লভের চক্রান্তে অপহৃতা হল এবং ঘটনাচক্রে নির্জন বনমধ্যে পরিত্যক্তা হল। তারপরের ঘটনা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বাস্তবতাকে অতিক্রম ক'রে চলেছে। নির্জন বনমধ্যে মুমূর্ষু বৃদ্ধের সাক্ষাৎলাভ, তার সঞ্চিত ধনপ্রাপ্তি, ভবানী পাঠকের সাক্ষাৎলাভ, পাঁচ বছরের অনুশীলন, ডাকাতি জীবন—এই সব ঘটনা সহজ স্বাভাবিক জীবনে সচরাচর ঘটে না বলে পাঠকের সম্ভাব্যতাবোধের সীমা অতিক্রম করে। অবশ্য, বঙ্কিম কিছুটা বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য সে-সময়ের রাজনৈতিক অরাজকতার পরিচয় দিয়েছেন।

যাই হোক, প্রফুল্ল দেবী চৌধুরাণীতে পরিণত হল। দেবী চৌধুরাণী নামটি কোন

এক ডাকাতের সর্দারণীর। কিন্তু তার সঙ্গে প্রফুল্ল চরিত্রের কোনই সঙ্গতি নেই। সুতরাং প্রফুল্ল চরিত্রটি ঐতিহাসিক নয়, সম্পূর্ণ কাল্পনিক।

প্রফুল্ল নিষ্ঠাবতী। তাই পাঁচ বছরের মধ্যে অনন্যমনা হয়ে সে ভবানী পাঠক-নির্দিষ্ট সমস্ত বিদ্যা আয়ত্ত করল।

ভবানী পাঠক দেবী চৌধুরাণীকে কেন যে দলনেতা হিসাবে গ্রহণ করলেন, তা খুব স্পষ্ট নয়। অথচ বঙ্কিমের দ্বিধা ছিল দেবী চৌধুরাণীকে দিয়ে ডাকাতি করানোতে। তাই প্রফুল্ল ব্রজেশ্বরকে বলেছে—"আমি ডাকাইত নই। আমি তোমার কাছে শপথ করিতেছি, আমি কখন ডাকাইতি করি নাই। কখন ডাকাইতির এক কড়া লই নাই।" তাহলে সন্দেহ জাগে, প্রফুল্লর কাজ ছিল কি? কেবলমাত্র দান করা! সে টাকা কি শুধু ভবানী পাঠকই ডাকাতি ক'রে এনে দিয়েছে?

প্রফুল্ল স্বভাবতঃ নারী। তাই খুন-জখম, মানুষ-হত্যায় সে স্বভাবতঃই বীতরাগ। ইংরেজ সিপাহীদের সঙ্গে তাদের বরকন্দাজের যুদ্ধ আসন্ন হলে অনাবশ্যক হত্যাকাণ্ডের ভয়ে দেবী যুদ্ধ বন্ধ করার আদেশ দিল।

দেবীর উপস্থিতবুদ্ধি ও কৌশলের তারিফ করতে হয়। যেভাবে ঝড়ের সাহায্য নিয়ে সে নিজের বজরাকে মুক্ত করেছে, তাতে তার কৃতিত্ব অপেক্ষা ঈশ্বরের কৃতিত্বই বেশী পরিমাণে প্রকট হয়ে পড়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রফুল্ল উদ্দেশ্য-প্রণোদিত চরিত্র। বাঙালী ঘরের বধূ প্রফুল্লকে বঙ্কিম আবার কুলবধূরূপেই ফিরিয়ে দিলেন, কিন্তু মাঝখানে তাকে নিষ্কামধর্মের যে শিক্ষা দিলেন তাতে তার চরিত্র আরো মহনীয় হয়ে উঠেছে:

নারী চরিত্রের প্রতি বঙ্কিমের শ্রদ্ধা অসীম। নারীই পুরুষের শক্তি, কর্মোদ্যমের প্রেরণা। সুতরাং নারীকে উপযুক্ত ক'রে গড়ে তুলতে হবে। দেবী চৌধুরাণী তথা প্রফুল্লর মধ্যে আমরা সেই বঙ্কিম-মানসীরই এক রূপ দেখতে পেলাম—"এখন এসো, প্রফুল্ল! একবার লোকালয়ে দাঁড়াও—আমরা তোমায় দেখি। একবার এই সমাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বল দেখি, "আমি নূতন নহি, আমি পুরাতন। আমি সেই বাক্য মাত্র; কতবার আসিয়াছি, তোমরা আমায় ভুলিয়া গিয়াছ, তাই আবার আসিলাম—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

প্রফুল্লর মা (দেবীঃ ১/১)। প্রফুল্লর মা দুঃখী বিধবা। দুঃখের জ্বালায় তার কথার ধার একটু বেশী। কন্যাকে ভালবাসলেও সে তাকে 'পোড়ামুখী' সম্বোধন করে। পাড়ার লোকরা প্রফুল্লর বিবাহের সময় খাওয়া ত্যাগ ক'রে উঠে গেল—"প্রফুল্লের মার

সঙ্গে তাঁহাদের কোন্দল বাঁধিল; প্রফুল্লের মা বড় গালি দিল।" প্রফুল্লর শাশুড়ীকেও সে দুকথা শুনিয়ে দিয়েছে। তাই—

"গিন্নী। যদি খাওয়াইতেই পারিবে না, তবে পেটে ধরেছিলে কেন?

প্র, মা। তুমি কি খাওয়া পরা হিসাব করিয়া বেটা পেটে ধরেছিলে? তা হলে সেই সঙ্গে বেটার বউয়ের খোরাক পোষাকটা ধরিয়া নিতে পার নাই?

গিন্নী। আ মলো! মাগী বাড়ী ব'য়ে কোঁদল করতে এসেছে যে?

প্র, মা। না, কোঁদল করিতে আসি নাই। তোমার বউ একা আসতে পারে না, তাই রাখিতে সঙ্গে আসিয়াছি। এখন তোমার বউ পৌছিয়াছে, আমি চলিলাম।"

তবে প্রফুল্লর মার মর্যাদাজ্ঞান খুব। যে বাড়ীতে তার অপমান হয়, সে বাড়ীতে সে জল পর্যন্ত গ্রহণ করতে নারাজ। এই হতভাগিনী অকালে মৃত্যুবরণ ক'রে হৃদয়ের জ্বালা জুড়াল।

প্রফুল্লর শাশুড়ী (দেবী: ১/২)। হরবল্লভের গৃহিণী, হরবল্লভের সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্র। তিনি সংসারের কর্ত্রী হলেও, সংসারের ভার যে তিনি নিজ হাতে রেখেছেন এমন নয়। সংসারের ভার বৌদের হাতে অর্পণ ক'রে এখন তাঁর পা ছড়িয়ে পাকাচুল তোলবার সময়। কিন্তু স্বামীর আহারের সময় মাছি থাক আর না থাক, পাখা হাতে ক'রে সামনে বসা তাঁর কর্তব্য ও স্বামীভক্তির নিদর্শন। সেকালের নারীর স্বামীই যে ধ্যান-জ্ঞান ছিল, তার প্রকাশ হরবল্লভ-গৃহিণীর মধ্যেও আছে।

প্রফুল্লর শাশুড়ীর মধ্যে একটি কোমল হৃদয় ছিল। তাই নিজে স্ত্রী হয়ে, তিনি প্রফুল্লর দুঃখ অনুধাবন করলেন। অবশ্য, প্রফুল্লর রূপ ও কথাবার্তার মাধুর্য তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। কর্তার কাছে ওকালতিতে বিফল হয়ে তিনি মৃদু ভৎর্সনাও করেন স্বামীকে —"ঝাঁটা মারতে হয়, তুমি মার।" প্রফুল্লর স্বামীগৃহে রাত্রিবাসে তার শাশুড়ীর মৌন সম্মতি ছিল। হরবল্লভের মতো তাঁর গৃহিণীও পুত্রস্নেহে অন্ধ। প্রফুল্লর প্রত্যাবর্তনে তিনি পুত্রের মুখ চেয়েই হোক বা স্বভাবগুণেই হোক, তিনি খুশী হয়ে পুত্রকে বলছেন— "বাবা, এ হারাধন আবার কোথায় পেলে, বাবা?"

তারপর তিনি গিন্নীপনার জোরে হরবল্লভের তর্জন-গর্জন থামিয়েছেন।

প্লওর ফেয়ারলি (বিষ: ৫ম পরি:)। কমলমণির স্বামী শ্রীশচন্দ্র "প্লওর ফেয়ারলির বাড়ীর মুৎসুদ্দি" ছিলেন।

ফখর-উন্নিসা (রাজ: ২/২)। দ্রঃ জেব-উন্নিসা।

ফতেমা (রাজ: ১/৫)। খিজির শেখের বিবি। তার নাম জেব-উন্নিসার নিকট চিত্রদলনের সংবাদ সরবরাহে উল্লিখিত হয়েছে।

ফিচেল খাঁ (কৃঃ উঃ ২/১০)। একজন ডিটেক্‌টিব্‌। ইনি গোবিন্দলালের রোহিণী-হত্যা মামলার তদারক করেন।

ফুলমণি (দেবীঃ ১/৭)। "ফুলমণি নাপিতানীর বাস প্রফুল্লের বাসের নিকট।" "ফুলমণি প্রফুল্লের অপেক্ষা বয়সে দশ বছরের বড়। দেখিতে শুনিতে মন্দ নয়, বেশ-ভূষায় একটু পারিপাট্য রাখিত। একে ইতর জাতির মেয়ে, তাতে বালবিধবা ; চরিত্রটা বড় খাঁটি রাখিতে পারে নাই।"

প্রফুল্লর মাতার মৃত্যুর পর ফুলমণি তার কাছে রাত্রে শুত। কিন্তু এই সুযোগে সে দুর্লভ চক্রবর্তীর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে প্রফুল্লর সর্বনাশ করে। ডাকাতের ভয়ে পলায়নরত দুর্লভের প্রতি ফুলমণির কটুবাক্য প্রয়োগ কৌতুকপ্রদ। আবার, ফুলমণি গ্রামে ফিরে প্রফুল্ল সম্বন্ধে যে অলৌকিক গল্পের অবতারণা করে, তাতে তার চরিত্রবৈশিষ্ট্যই প্রকাশিত হয়েছে।

বকাউল্লা খাঁ (চন্দ্রঃ ২/৭)। ফস্টরের নৌকার তেলিঙ্গা অর্থাৎ এদেশীয় সৈনিক। "বকাউল্লার নিবাস, গাজিপুরের নিকট।" শৈবলিনীকে প্রতাপরা উদ্ধার করলে, সে গোপনে অনুসরণ ক'রে তাদের বাসস্থান দেখে গিয়েছিল। সহস্র মুদ্রা পারিতোষিকের লোভে সে অমিয়টকে তাদের সন্ধান বলে দেয়।

বখ্‌ত খাঁ (রাজঃ ৭/৩)। ঔরঙ্গজেবের একজন মনসবদার। সে-ই সওদাগর-বেশী মবারকের নির্দেশিত ভুল পথ দেখে এসে মোগল সৈন্যকে বিপদের মধ্যে নিয়ে যেতে অগ্রসর হয়।

বখ্‌তিয়ার খিল্‌জি (দুর্গেঃ ১/৩ ; মৃণাঃ ১/১)। "দুর্গেশনন্দিনী" উপন্যাসে বখ্‌তিয়ার খিল্‌জির নামোল্লেখ আছে। কিন্তু "মৃণালিনী" উপন্যাসে এঁর একটি ভূমিকা রয়েছে।

বখ্‌তিয়ার খিল্‌জি ঐতিহাসিক চরিত্র। ভারতে মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠাকারী মুহম্মদ ঘোরীর তিনি অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। বঙ্গদেশ-বিজয়ে তাঁর কৃতিত্ব অসীম। তিনি অসাধারণ বীররূপে খ্যাত। ১১৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অযোধ্যা ও মগধ জয় করেন। তারপর বাংলার বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণসেনের অকর্মণ্যতার কথা শুনে তিনি রাজধানী নবদ্বীপের দিকে রওনা হন। নগরীর অদূরে বনমধ্যে সৈন্য লুক্কায়িত রেখে সুযোগমতো মাত্র সপ্তদশ অশ্বারোহী সেনা নিয়ে তিনি রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করেন। বৃদ্ধ রাজা সপরিবারে পলায়ন করেন (১১৯৯ খ্রীঃ)। বঙ্গদেশ জয়ের পর তিনি কামরূপ জয় করতে গিয়ে বিফল হন। বখ্‌তিয়ার নিজেরই এক অনুচরের হাতে নিহত হন।

ইতিহাসের এই চরিত্রটিকে বঙ্কিমচন্দ্র "মৃণালিনী" উপন্যাসে উপস্থাপিত করেছেন। 'মৃণালিনী'র প্রথম কয়েকটি সংস্করণে 'রঙ্গভূমি' ও 'গজহস্তা' নামক দুটি পরিচ্ছেদ ছিল। এই পরিচ্ছেদে বখ্‌তিয়ারের হস্তিযুদ্ধ ও হেমচন্দ্র কর্তৃক হস্তীর হাত থেকে বখ্‌তিয়ারের রক্ষা কাহিনী বর্ণিত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সংস্করণে এই ঘটনার শুধুমাত্র উল্লেখ আছে। উপন্যাসে নবদ্বীপ অধিকারকালে বখ্‌তিয়ারকে সৈন্যদলের পরিচালনা করতে দেখা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে বেঁটে সৈনিক বলে অভিহিত করেছেন। পশুপতির সঙ্গে সাক্ষাৎকারে আর একবার বখ্‌তিয়ারকে দেখা গেছে। তাঁর কথাবার্তায়—চাতুর্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র বখ্‌তিয়ারের চরিত্র উপস্থাপন অপেক্ষা, তৎসংক্রান্ত ঘটনা-বর্ণনাকেই এই উপন্যাসে অধিক প্রয়োজন বলে মনে করেছেন।

বনাসী (রাজঃ ৪/৪)। যোধপুরী বেগমের বিশ্বাসী, নবাব-হারেমের একজন খোজা। যোধপুরী বেগম নির্মলকুমারীকে এর সাহায্যেই হারেমের বাইরে বের ক'রে দিতে চেষ্টা করেছিলেন।

বন্দেআলি (সীতাঃ ২/৯)। বন্দেআলি গঙ্গারামের একজন বিশ্বস্ত মুসলমান সহচর। এই বন্দেআলির মাধ্যমেই গঙ্গারাম তোরাব খাঁর সঙ্গে ষড়যন্ত্রের পথ প্রস্তুত করে।

বল্লালসেন (মৃণাঃ ২/৯)। কৌলীন্য-প্রথার প্রসঙ্গে নামোল্লেখমাত্র আছে। বল্লালসেন বাংলা দেশের সেন রাজবংশের রাজা। পিতা বিজয়সেন, মাতা বিলাসদেবী। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ইনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি বিদ্বান্ ও বিদ্যোৎসাহীরূপে পরিচিত। তাঁর রচিত দুখানি সংস্কৃত গ্রন্থ—'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর'। বল্লালসেনই কৌলীন্য-প্রথার প্রবর্তন করেন। ১১১৮ বা ১১১৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।

বসন্তকুমার (ইন্দিরা ১৮শ পরিঃ)। ইন্দিরার একমাত্র ভ্রাতার নাম। উল্লেখমাত্র আছে।

বসন্তকুমারী (রাধাঃ ৩য় পরিঃ)। রাধারাণীর সখী। কামাখ্যানাথবাবুর কন্যা। কাহিনীর অল্প অবসরে চরিত্রটির বিস্তারের সম্ভাবনাকে সীমিত করা হয়েছে। তবুও বসন্তকুমারীর রসিকা রূপটি প্রকাশিত।

বাঞ্ছারাম মিত্র (রজনী ২/৫)। শচীন্দ্রনাথের পিতামহের নাম বাঞ্ছারাম মিত্র। তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। কিন্তু বন্ধু মনোহর দাসকে তাঁর পুত্র অপমান করায়,

পুত্রকে সম্পত্তি না দিয়ে বন্ধুর উত্তরাধিকারীদের সম্পত্তিভোগের অধিকার দিয়ে যান। এটি তাঁর দৃঢ়চরিত্র ও আদর্শবাদী মনোভাবের পরিচয়।

বাল্সিসার্ট (গভর্নর) (চন্দ্রঃ ২/৫)। দ্রঃ গভর্নর বাল্সিসার্ট।

বাবর (দুর্গেঃ ১/৩)। উপন্যাসে নামোল্লেখমাত্র আছে। জন্ম ১৪৮৩ খ্রীষ্টাব্দ, মৃত্যু ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দ। তাঁর পুরা নাম—জহিরউদ্দিন মহম্মদ বাবর। পিতার দিক থেকে চেঙ্গিস খাঁ ও মাতার দিক থেকে তিনি ছিলেন তৈমুরলঙ্গের বংশধর। তাঁর পিতা রুশ-তুর্কীস্থানের অন্তর্গত ফারগানা নামক স্থানের অধিপতি ছিলেন। মাত্র বারো বছর বয়সে বাবর পিতার রাজ্যে অভিষিক্ত হন। তারপর আফগান সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে তিনি ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছেন। ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের তিনি প্রতিষ্ঠাতা। বাবর একাধারে সুদক্ষ সৈনিক, কবি ও সুসাহিত্যিক ছিলেন। রাসব্রুক-উইলিয়াম বাবর চরিত্রের বহু গুণের উল্লেখ করেছেন—"Babar possessed eight fundamental qualities—lofty judgement, noble ambition, the art of victory, the art of Government, the art of conferring prosperity upon his people, the talent of ruling mildly the people of God, the ability to win the heart of his soldiers and love of justice."

বামুন ঠাকুরাণী (ইন্দিরা ৭ম পরিঃ)। সুভাষিণীদের বাড়ীর এই বৃদ্ধা বামুন-ঠাকুরাণীর জায়গায় ইন্দিরা কাজে লাগে। বুড়ীকে নিয়ে ইন্দিরার রসিকতার অন্ত নেই। বুড়ী একদিন ছুঁড়ি সাজার জন্য কলপ মাখতে গিয়ে মুখময় মেখে ফেলে। শেষ পর্যন্ত তার কি কান্না! ইন্দিরা স্বামীর সঙ্গে চলে যাবার পর বুড়ী তাকে খারাপ বলত; কিন্তু যখন শুনল যে, সে অন্য পুরুষের সঙ্গে যায়নি, নিজের স্বামীর সঙ্গেই গিয়েছে, তখন খুশী হল। আসলে বুড়ী মুখে যাই বলুক, ইন্দিরাকে সে ভালবাসত।

বামাচরণ (রজনী ১/১)। রজনীর প্রতিবেশী কালীচরণ বসুর চার বছরের শিশুপুত্র। রজনীর খেলা চলত তার সঙ্গে। বামাচরণ বায়না ক'রে রজনীর 'বল' (বর) হয়ে বসল।

বিক্রমসিংহ বা বিক্রমসেলাঙ্কি (রাজঃ ১/১)। রূপনগরের রাজার নাম বিক্রমসিংহ। তিনি চঞ্চলকুমারীর পিতা। উপন্যাসের প্রথমদিকে তাঁর বিশেষ কোন চরিত্র-পরিচয় ব্যক্ত হয়নি। মুঘলের পদলেহী অন্যান্য কিছু রাজপুতের মতোই তাঁর মনোভাব। তাই নিজ কন্যার মুঘল বাদশাহের সঙ্গে বিবাহ দিতে তিনি উৎসুক।

তারপর মাণিকলাল যেভাবে বিক্রমসিংহের কাছে মিথ্যা কথা বলে তাঁর সৈন্যসামন্ত

নিয়ে এসে মুঘলদের বিরুদ্ধে কাজে লাগিয়েছে, তাতে রূপনগরের রাজাকে স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন না বলে উপায় নেই।

কিন্তু রাজসিংহের বিবাহ-প্রস্তাবের উত্তরে বিক্রমের পত্র তাঁর উগ্র ব্যক্তিত্বের পরিচয় বহন করে। তিনি রাজসিংহের প্রতি এবং কন্যার প্রতি কঠোর অভিশাপবাণী প্রয়োগ করেন। কিন্তু একথাও স্বীকার করেন, যদি কোনদিন রাজসিংহ যোগ্য বীরত্ব দেখাতে পারেন, তবে তিনি স্বেচ্ছায় তখন কন্যাসমর্পণ করবেন।

এই প্রতিশ্রুতি বিক্রম রেখেছিলেন। ঔরঙ্গজেবকে রাজসিংহ পরাজিত করলে, তিনি সসৈন্যে রাজসিংহের সৈন্যদলে যোগ দেন। কন্যাও সমর্পণ করেন এবং মুঘলের সঙ্গে যুদ্ধে যথেষ্ট রণকৌশলের পরিচয় দেন।

বিক্রমসিংহের চরিত্রের প্রথম ও শেষে সঙ্গতির অভাব আছে। প্রথমদিকে যেভাবে তাঁকে অঙ্কন করা হয়েছে, তার দ্বারা বুঝা যায় না পরবর্তী কালে তিনি এরূপ আচরণ করবেন। এরূপ হওয়ার কারণ, "রাজসিংহে"র প্রথম প্রকাশকালে বঙ্কিম যে পরিকল্পনা নিয়ে বিক্রমকে এঁকেছিলেন, পরবর্তী সংস্করণে তা পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু জোড়-মেলাবার চেষ্টা তিনি করেননি।

বিন্দু ঠাকুরাণী (ইন্দিরা ১৮শ পরিঃ)। ইন্দিরার বিয়ের সময় ইনি বরের কান মলে দিয়েছিলেন।

বিনোদ ঘোষ (বিষঃ ৪র্থ পরিঃ)। গ্রামবাসীরা নগেন্দ্রকে বলেছিল যে, শ্যামবাজারে কুন্দর মেসো বিনোদ ঘোষ থাকে, তার কাছে কুন্দকে পৌঁছে দিলে উপকার হবে। কিন্তু বিনোদ ঘোষকে খুঁজে পাওয়া গেল না। সুতরাং "কুন্দ নগেন্দ্রের গলায় পড়িল।"

বিনোদলাল (কৃঃ উঃ ১/১)। কৃষ্ণকান্ত রায়ের পুত্র। উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদে কৃষ্ণকান্তকে দ্বিতীয়বারের উইল-বদলের সময় হরলালের পুত্রের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। কোন চরিত্রবৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়নি।

বিমলা (দুর্গেঃ ১/১)। "দুর্গেশনন্দিনী" উপন্যাসের নারীচরিত্রগুলির মধ্যে বিমলাই সর্বাপেক্ষা সক্রিয়। এই চরিত্রে বেশ কিছু অতিনাটকীয়তা থাকলেও, চরিত্রটিকে জীবন্ত বলে মনে হয়।

বিমলা যে সাধারণ শ্রেণীর স্ত্রীলোক নয়, তা বঙ্কিম প্রথম থেকেই বুঝিয়ে দিয়েছেন। শৈলেশ্বরের মন্দিরে অপরিচিত পুরুষ জগৎসিংহের সঙ্গে কথাবার্তায় সে যথেষ্ট বাক্‌চাতুর্যের পরিচয় দিয়েছে। বিমলা যে প্রগল্‌ভা ও রসিকা, সে-কথা প্রথম থেকেই জানা যায়।

তবে গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজকে নিয়ে রসিকতাটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে, এতে বিমলা চরিত্রের অনেকখানি গুরুত্ব নষ্ট হয়েছে।

বিমলার বয়স পঁয়ত্রিশ বছর। কিন্তু তার রূপে ও সাজগোজে সে যৌবনকে ধরে রেখেছে। দশম পরিচ্ছেদে বঙ্কিম বিমলার রূপের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। এই রূপ-বর্ণনার মধ্যে বঙ্কিম বিমলাকে একটু সম্ভাদরের স্ত্রীলোকরূপে অঙ্কন করেছেন। প্রথমাবধি অবশ্য বিমলাকে পরিচারিকা বলা হয়েছে এবং বিমলার এই ধরনের রূপের আগুনে এককালে বীরেন্দ্রসিংহ ও পরে কত্‌লু খাঁ আত্মাহুতি দিয়েছে। বিমলা চরিত্র সম্বন্ধে সাধারণ নীতিবাগীশ মানুষের ধারণাটি জগৎসিংহকে লিখিত বিমলার পত্রের মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে—"আমি মহাপাপীয়সী, বহুবিধ অবৈধ কার্য্য করিয়াছি···।" "বিমলা নীচ-জাতিসম্ভবা, বিমলা মন্দভাগিনী, বিমলা দুঃশাসিত রসনা-দোষে শত অপরাধে অপরাধিনী; কিন্তু বিমলা গণিকা নহে। যিনি এখন স্বর্গে গমন করিয়াছেন (বীরেন্দ্রসিংহ), তিনি বিমলার অদৃষ্ট-প্রসাদে যথাশাস্ত্র তাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিমলা একদিনের জন্যে নিজ প্রভুর নিকটে বিশ্বাসঘাতিনী নহে।"

বিমলা যথার্থই বীরেন্দ্রসিংহকে ভালবাসত, তাই পরিচারিকার পরিচয়েও সে স্বামী-গৃহে থাকতে দ্বিধা করেনি। স্বামীহন্তা কত্‌লু খাঁকে হত্যা করায় অতিনাটকীয়তা থাকলেও, তার স্বামীভক্তির পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। কেবলমাত্র স্বামীপ্রেমে নয়, স্নেহশীলতাতেও বিমলা চরিত্র মহীয়সী। সপত্নীকন্যা তিলোত্তমার প্রতি তার অকৃত্রিম ভালবাসা। নিজের প্রাণের বিনিময়ে সে ওসমান-প্রদত্ত অঙ্গুরীয় তিলোত্তমাকে দান ক'রে তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র বিমলার সমগ্র পরিচয়টি অল্প অল্প ক'রে, রহস্য-উন্মোচনে মতো, প্রকাশ করেছেন। প্রথমেই জগৎসিংহের মুখে মানসিংহের নাম শুনে বিমলার চমক, মানসিংহের পুত্রের সঙ্গে তিলোত্তমার বিবাহ-সংগঠনে বিমলার উদ্যোগের সময় অভিরাম স্বামীর ভৎর্সনা পাঠককে এই চরিত্রটি সম্বন্ধে যথেষ্ট কৌতূহলী ক'রে তোলে। সেই কৌতূহলের অবসান ঘটে 'বিমলার পত্রে'র দ্বারা।

উপন্যাসের মধ্যে বিমলা চরিত্রের প্রয়োজন ছিল প্রধানতঃ দুটি কারণে—তিলোত্তমা ও জগৎসিংহের প্রণয়-সংগঠনে এবং কত্‌লু খাঁর হত্যায়। তাছাড়া, বিমলা-কৃত অসাবধানতার সুযোগ নিয়েই পাঠান সৈন্যরা গড় মান্দারণ দুর্গ অধিকার করেছে। পাঠান সৈনিক রহিম শেখকে ভুলিয়ে মুক্তিলাভ করার ঘটনায় বিমলার প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

সমগ্র উপন্যাসে এই চরিত্রটি অগ্নিশিখার মতোই জাজ্বল্যমান। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র শেষরক্ষা করতে পারেননি। জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার পুনর্মিলনকালে তাকে আশমানির সঙ্গে পরিহাসরত অবস্থায় দেখিয়ে, কত্‌লু খাঁ-হত্যায় পতিশোকাতুরা রমণীর চরিত্রটি লঘু ক'রে ফেলেছেন।

বিষ্ণুরাম সরকার (রজনী ২/৫)। বাঞ্ছারাম মিত্র তাঁর কলিকাতা-নিবাসী আত্মীয়কুটুম্ব বিষ্ণুরাম সরকারকে উইলের একৃজিকিউটর নিযুক্ত করেন। এই বিষ্ণুরাম-বাবুর সততাতেই শেষ পর্যন্ত রজনী বিষয়সম্পত্তি লাভ করে।

বিসমার্ক (রাজ: ২/২)। জার্মান রাজনীতিবিদ্। তিনি ১৮৫১ খ্রীঃ—১৮৮৮ খ্রীঃ পর্যন্ত জার্মানির বিভিন্ন কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। নামোল্লেখমাত্র আছে।

বুকনেয়র (রজনী ৩/৩)। জার্মান দার্শনিক। বিবর্তনবাদ সম্বন্ধে ইনি একাধিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

ব্যোমকেশ (মৃণা: ১/৫)। হৃষীকেশের পুত্র ব্যোমকেশ পাপিষ্ঠ। মৃণালিনীর প্রতি তার অনুরাগ জন্মে। তাই সে রাত্রে গোপনে মৃণালিনীকে আয়ত্তে আনবার চেষ্টা করে। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে তার নামে পিতার কাছে মিথ্যা কথা রটায়। এটি যথার্থ প্রেমের লক্ষণ নয়, লম্পটের প্রবৃত্তি মাত্র। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যোমকেশকে মৃণালিনীর জন্যই নবদ্বীপে গিয়ে যবনের হাতে প্রাণত্যাগ করতে হয়েছে। তখন তার মুখে কিন্তু মৃণালিনীর জন্য তীব্র আকূতি শোনা যায়।

ব্রজেশ্বর (দেবী: ১/৫)। "দেবী চৌধুরাণী" নায়িকাপ্রধান উপন্যাস হলেও, নায়ক হিসাবে যদি কাউকে গ্রহণ করতে হয়, তাহলে সে প্রফুল্লর স্বামী ব্রজেশ্বর। কিন্তু ব্রজেশ্বরের মধ্যে বঙ্কিম যে সব উপাদানের সমাবেশ করেছেন, তাতে নায়ক হিসাবে তাকে গ্রহণ করতে পাঠকের সংকোচের ভাব কাটতে চায় না।

ব্রজেশ্বর নিতান্ত সাধারণ ব্যক্তিত্ববিহীন চরিত্র। অন্ধ পিতৃভক্তিই তার জীবনের একমাত্র অবলম্বন। বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থখানি পিতৃদেবকে উৎসর্গ করার ফলেই ব্রজেশ্বরের চরিত্রে এ গুণটির বাড়াবাড়ি ঘটেছে কিনা, সে সম্বন্ধে সন্দেহ করার অবকাশ আছে। ব্রজেশ্বরের পিতৃভক্তি কোন যুক্তি-বিচার মানে না। পিতার আদেশে নিরীহ প্রথমা পত্নী প্রফুল্লকে ত্যাগ করতে তার বাধে না, আবার তারপর নয়ানবৌকে ও টাকার লোভে সাগরবৌকে ঘরে নিয়ে আসতেও তার আপত্তি নেই। বঙ্কিমচন্দ্র সেকালের দোহাই দিয়ে ব্রজেশ্বরের পিতৃভক্তিকে সমর্থনও জানিয়েছেন। "বাপের সাক্ষাতে বাইশ বছরের ছেলে—হীরার ধার হইলেও সেকালে কথা কহিত না—এখন যত বড় মূর্খ ছেলে, তত বড় লম্বা স্পীচ্ ঝাড়ে।" (১/৫)

ব্রজেশ্বর পিতার আদেশে প্রফুল্লকে তাড়িয়েই দিত। কিন্তু প্রফুল্লর সঙ্গে গোপন সাক্ষাতে তার অন্তরের অতৃপ্ত প্রেমাকাঙ্ক্ষা, যা দুই স্ত্রীর মধ্যে পায়নি, জেগে উঠল। প্রেমের জাগরণের সঙ্গে তার অন্তরে দৃঢ়তাও এসেছিল পিতার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার। প্রফুল্ল বারণ না করলে, পিতার নিকট কিছু বলা ব্রজেশ্বরের পক্ষে তখন অসম্ভব ছিল না।

শুধু তাই নয়, প্রফুল্লকে ব্রজেশ্বর আশ্বাস দিয়েছে—"...যাহাতে আমি দুই পয়সা রোজগার করিতে পারি, সেই চেষ্টা করিব। যেমন করিয়া পারি, আমি তোমার ভরণ-পোষণ করিব।" (১/৬) অবশ্য অনেকে বলতে পারেন, স্ত্রীর ভরণপোষণের জন্য তো তেমন কোন ব্যস্ততা দেখায়নি ব্রজেশ্বর। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, প্রফুল্ল ও ব্রজেশ্বরের প্রথম সাক্ষাতের পর ব্রজেশ্বর বেশী সময় পায়নি। কিছুদিনের মধ্যেই প্রফুল্ল অপহৃতা হল। ব্রজেশ্বর সে রাত্রেই প্রফুল্লর খোঁজে গিয়ে ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে এসেছে।

ব্রজেশ্বর প্রফুল্লর মৃত্যু-সংবাদ শুনে যেভাবে মুষ্‌ড়ে পড়েছিল, তাতে তার মনের গভীরে পিতার প্রতি বিদ্বেষ ও স্ত্রীর প্রতি ভালবাসার নীরব দ্বন্দ্বেরই পরিচয় মেলে। বঙ্কিম এই অংশের বর্ণনা দিয়েছেন—"প্রফুল্লের জন্য যখন বড় কান্না আসিত, তখন মনকে প্রবোধ দিবার জন্য বলিতেন—

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমস্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়স্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥

এইরূপে ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে ভুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ব্রজেশ্বরের পিতাই যে প্রফুল্লের মৃত্যুর কারণ, সেই কথা মনে পড়িলেই ব্রজেশ্বর ভাবিতেন—

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমস্তপঃ।"

'প্রফুল্ল গেল, কিন্তু পিতার প্রতি তবুও ব্রজেশ্বরের ভক্তি অচলা রহিল।' (১/১৬)

এ পর্যন্ত ব্রজেশ্বরকে সহ্য করা যায়। কিন্তু তারপর দেবী চৌধুরাণীর কাছে ব্রজেশ্বরের ব্যবহার নিতান্তই ব্যক্তিত্ববর্জিত। রঙ্গরাজের সঙ্গে ব্রজেশ্বরের যুদ্ধোদ্যমে কিছু বীরত্বের আভাস আছে, কিন্তু দেবীর নৌকায় সাহেবকে অকারণ চপেটাঘাতে কোন পৌরুষ প্রকাশ পায়নি।

ব্রজেশ্বরের নারীর প্রতি কোন শ্রদ্ধা নেই। তাই—"যে দেবী চৌধুরাণীর নামে উত্তর বাঙ্গালা কাঁপিত, তাহার কাছে আসিয়া ব্রজেশ্বরের হাসি পাইল। মনে ভাবিলেন, "মেয়েমানুষকে পুরুষে ভয় করে, এ ত কখনও শুনি নাই। মেয়েমানুষ ত পুরুষের

খাদী।" (২/৫) এই মনোভাব সেকালেরই মনোভাব। কিন্তু ব্রজেশ্বর দেবীকে নিয়ে রঙ্গরাজের সঙ্গে যে রসিকতা করেছে, তাতে তার চরিত্র-গৌরব বাড়েনি।

যে দেবীর ডাকাতিকার্যে ব্রজেশ্বরের ঘৃণা, সেই দেবীকে অপরিচিতা নারী জেনেও মুখচুম্বনের হঠকারিতা নিতান্তই দুর্বলচিত্ত রূপোন্মাদের লক্ষণ। দেবীর অর্থ নিয়ে কার্যোদ্ধার ক'রে সেই অর্থ সঞ্চয়ের উপায় সম্বন্ধে ঘৃণাপোষণ ও দেবীকে গঞ্জনাদান নিতান্তই সংকীর্ণচিত্তের পরিচয়।

উপন্যাসমধ্যে ব্রজেশ্বর সর্বদাই পিতার পুত্রমাত্র থেকে গেল। কোন কাজই সে করতে পারে না। পিতা দেবীর অর্থ সংগ্রহ করল কিনা সে জানে না। প্রফুল্লর সঙ্গে বিবাহের পরও তার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ করে। অবশেষে মাতার সাহায্যে ব্যাপারটির সুসমাধান ঘটলে সে আনন্দিত হয়।

ব্রজেশ্বরের এরূপ সাদামাঠা চরিত্রে উপন্যাসের আদর্শবাদের কোন ক্ষতি হয়নি। বরং এই রকম সাধারণ স্বামীর প্রতি অসাধারণ প্রফুল্লর ভালবাসা দ্বারা তার নিষ্কামধর্মের মহিমা আরও পরিস্ফুট হয়েছে।

ব্রহ্মচারী (বিষঃ ৩৪ পরিঃ)। সূর্যমুখীর গৃহত্যাগের পর এই ব্রহ্মচারী তাঁকে মৃত্যুমুখ থেকে উদ্ধার করেন। এঁর চেষ্টায় সূর্যমুখী স্বামীর কাছে ফিরে আসতে পারেন। চরিত্রটি পরোপকার প্রবৃত্তির প্রকৃষ্ট উদাহরণস্বরূপ।

ব্রহ্মঠানদি (দেবীঃ ১/৩)। ব্রহ্মঠানদি ব্রজেশ্বরদের বাড়ীতে কি সম্পর্কে সকলের ঠানদি তা জানা নেই, তবে তার সঙ্গে সকলেরই মধুর সম্পর্ক। ব্রজেশ্বরকে তিনি যার-পর-নাই স্নেহ করেন, তার মন বোঝার ভার পড়ে তাঁর উপর। সাগরবৌ তাঁর চরকা ভাঙে, আবার রূপকথা শোনার জন্য আবদারও করে। ব্রহ্মঠানদি মধুর বাৎসল্য-রসের উৎস।

ব্রহ্মানন্দ ঘোষ (কৃঃ উঃ ১/১)। কৃষ্ণকান্তের আশ্রিত। সে একজন নিরীহ ভাল-মানুষ। কৃষ্ণকান্ত তাকে দিয়েই লেখাপড়ার কাজ করাতেন। ব্রহ্মানন্দ সাধারণ মানুষের মতোই লোভী। তাই হরলালের এক হাজার টাকার লোভে সে উইল জাল করতে সম্মত হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাহসে কুলাল না। ব্রহ্মানন্দ একটু কবিতা-প্রিয়ও ছিল। সে রোহিণীর নামে কলঙ্কের কথা শুনে গোবিন্দলালকে পত্র লিখেছে—"ভাই হে! রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়—উলুখড়ের প্রাণ যায়।"

ভবানন্দ (আনন্দঃ ১/৬)। ভবানন্দকে আমরা সন্ন্যাসীরূপেই 'আনন্দমঠে' দেখি। তার কোন পূর্বজীবনের কথা বলা হয়নি। তবে মনে হয়, সন্ন্যাসজীবনে সে নারীসঙ্গ

লাভ করে ন্যা। তাই কল্যাণীকে দেখে তার আসক্তি জন্মেছিল। কল্যাণীকে প্রাণদান ক'রে, গোপনে রেখেছিল নিজের আয়ত্তে আনার জন্য। কিন্তু ভবানন্দ কোনদিন নীচ প্রবৃত্তির বশে কল্যাণীর উপর জোর করেনি। কল্যাণীকে সে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেয়েছিল, যেহেতু একবার তার মৃত্যু হয়েছে, অতএব, সে পুনরায় বিবাহ করতে পারবে।

ভবানন্দের মধ্যে এক শুষ্ক তৃষ্ণার্ত প্রাণের হাহাকার শুনতে পাই। তাই কল্যাণী যখন বলে—"কিসের জন্য এ সব অতল জলে ডুবাইবে ?" তখন ভবানন্দ বলে—"তোমার জন্য…যেদিন তোমায় প্রাণদান করিয়াছিলাম, সেই দিন হইতে আমি তোমার পদমূলে বিক্রীত। আমি জানিতাম না যে, সংসারে এ রূপরাশি আছে। এমন রূপরাশি আমি কখনও চক্ষে দেখিব জানিলে, কখনও সন্তানধর্ম্ম গ্রহণ করিতাম না।"

ভবানন্দের এই রিক্ত প্রাণেব হাহাকার আরো তীব্র হয়ে বাজে, যখন দেখি সে বিশ্বাসঘাতক নয়, সে ভীরু কাপুরুষ নয়। তাই সত্যানন্দ-প্রেরিত ধীরানন্দের সন্তান-সেনার সর্বনাশসাধনের প্ররোচনায় সে সম্মত হতে পারেনি। ভবানন্দ বলেছে—"আমি ইন্দ্রিয়পরবশ হইয়া থাকিব, কিন্তু বিশ্বাসহন্তা নই।"

ভবানন্দ পাপ কাজ ক'রেও শেষ পর্যন্ত ত্যাগ ও মহত্ত্বের দ্বারা সকলের হৃদয় জয় করেছে। মৃত্যুকালে সে গুরুদেবের আশীর্বাদ পেয়েছে—"পরলোকে তাহার বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হইবে।"

ভবানী পাঠক (দেবীঃ ১/১১)। ভবানী পাঠক দস্যুসর্দার। ইনি প্রফুল্লর দীক্ষাগুরু। ভবানী পাঠক নামে এক বিহারী ব্রাহ্মণ দস্যুসর্দারেব কথা ইতিহাসে আছে। কিন্তু তিনি ডাকাতি করতেন কোন মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে না। বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাস থেকে ভবানী পাঠকের নামটি গ্রহণ করলেও, ইনি সম্পূর্ণ নূতন উপাদানে প্রস্তুত। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর দেশে দুর্বলের উপর প্রবলের অত্যাচারের সময়, তিনি ডাকাতি ক'রে গরীব জনসাধারণকে সমস্ত অর্থ বিতরণ করতেন।

ভবানী পাঠক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ—"গায়ে নামাবলি, কপালে ফোঁটা, মাথা কামান। ব্রাহ্মণ দেখিতে গৌরবর্ণ, অতিশয় সুপুরুষ, বয়স বড় বেশী নয়।" ভবানী পাঠক শাস্ত্রজ্ঞও বটে। প্রফুল্লকে দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে তিনি শিক্ষাদান করেছিলেন।

ভবানী পাঠকের প্রফুল্লকে তাঁর ডাকাতদলের প্রধানরূপে নির্বাচিত করার কারণ কি থাকতে পারে, তা বোঝা যায় না। তিনি নিজেই তো সর্দারপদের যথেষ্ট উপযুক্ত। দুটি কাজের জন্য ভবানী পাঠক প্রফুল্লকে নিবাচিত করেছিলেন—প্রথমতঃ, দোকানদারি সাজাবার জন্য, দ্বিতীয়তঃ, প্রফুল্লর অর্থের জন্য।

প্রফুল্লকে রানীপদে অধিষ্ঠিত ক'রেই ভবানী পাঠক উপন্যাসের অন্তরালে চলে গেলেন। দু'একবার সাধারণ কাজে তাঁর দেখা পাওয়া গেল। কিন্তু তখন আর তাঁর হাতে কোন কর্তৃত্ব নেই বলেই মনে হয়।

এই উপন্যাসে ভবানী পাঠকের বিস্তারিত কার্যকলাপ অপ্রয়োজনবোধে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে অল্প সময়ের জন্যই উপস্থিত করেছেন। "ইংরেজ রাজ্য শাসনের ভার গ্রহণ করিল। রাজ্য সুশাসিত হইল। সুতরাং ভবানী ঠাকুরের কাজ ফুরাইল। দুষ্টের দমন রাজাই করিতে লাগিল। ভবানী ঠাকুর ডাকাইতি বন্ধ করিল।

তখন ভবানী ঠাকুর মনে করিল, "আমার প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন" এই ভাবিয়া ভবানী ঠাকুর ইংরেজকে ধরা দিলেন, সকল ডাকাইতি একরার করিলেন, দণ্ডের প্রার্থনা করিলেন। ইংরেজ হুকুম দিল, "যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে বাস।" ভবানী পাঠক প্রফুল্লচিত্তে দ্বীপান্তরে গেল।" (৩/১৪)

ভানুমতী (সীতাঃ ৩/২১)। সীতারাম তাঁর চিত্তবিশ্রামে যে সমস্ত সুন্দরীদের এনে জমায়েত করেছিলেন, তাদের একজনের নাম ভানুমতী। এই ভানুমতী সীতারামকে বলেছে—"মহারাজ! আজ জানিলে বোধ হয় যে, সত্যই ধর্ম্ম আছে। আমরা কুলকন্যা, আমাদের কুলনাশ, ধর্ম্মনাশ করিয়াছ, মনে করিয়াছ কি, তার প্রতিফল নাই? আমাদের কাহারও মা কাঁদিতেছে, কাহারও বাপ কাঁদিতেছে, কাহারও স্বামী কাঁদিতেছে, কাহারও শিশুসন্তান কাঁদিতেছে—মনে করিয়াছিলে কি, সে কান্না জগদীশ্বর শুনিতে পান না? মহারাজ, নগরে না, বনে যাও, লোকালয়ে আর মুখ দেখাইও না; কিন্তু মনে রাখিও যে, ধর্ম্ম আছে।" (৩/২১)

ভুবনেশ্বরী (রজনী ১/২)। রামসদয় মিত্রের প্রথমা স্ত্রী। তিনি চিররুগ্না।

ভ্রমর (কৃঃ উঃ ১/১০)। ভ্রমর চরিত্রের মূল সুর হল পতিপ্রেম। পতিগতপ্রাণা এই নারীর জীবনে যে কালবৈশাখীর ঝঞ্ঝা নেমে এসেছে, তাতে তার পতিপ্রেম আরো মহনীয় হয়ে উঠেছে।

ভ্রমর সার্থকনামা। শুধু রঙ কালো বলেই নয়, তার গুঞ্জনে হরিদ্রাগ্রামের জমিদার-বাড়ী সদাই মুখরিত। সপ্তদশী বালিকা ভ্রমর সংসারের কাজে অনভিজ্ঞা, এমন কি দাসী-চাকরাণী পর্যন্ত কেউ তাকে মান্য করে না। তা না করুক, ভ্রমরের তাতে কিছু এসে যায় না। সে যাকে খুশী, যখন-তখন চড়-চাপড়টা মেরে বসে, আবার পুরস্কৃতও করে। গোবিন্দলালের সঙ্গেও এমনি তার ছেলেমানুষী ঝগড়া লেগেই আছে। গোবিন্দলালও ভ্রমরকে রাগিয়ে আনন্দ পায়। পরে বঙ্কিম যখন বলেছেন, ভ্রমরের প্রথম সন্তানের মৃত্যু হয়েছিল, তখন সেটা বিশ্বাস করাই শক্ত হয়ে পড়ে।

মতিবিবি বা লুৎফ-উন্নিসা বা পদ্মাবতী (কপাঃ ২/১)। মতিবিবির চরিত্রটি যেমন বিচিত্র, তেমনি জটিল। মতিবিবিকে 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের মূল কাহিনীর উপনায়িকা এবং উপকাহিনীর নায়িকা বলা যেতে পারে।

পদ্মাবতী নবকুমারের প্রথমা স্ত্রী। কিন্তু বিবাহের অল্পকাল মধ্যেই নবকুমারের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ হয়। পদ্মাবতীর পিতা রামগোবিন্দ ঘোষাল। পিতার সঙ্গে পদ্মাবতী একবার পুরুষোত্তম দর্শনে যায়। পথে পাঠানরা রামগোবিন্দকে বন্দী ক'রে ধর্মান্তরিত করে। ফলে, নবকুমারের পিতা আর পদ্মাবতীকে গৃহে স্থান দেন না। তখন পদ্মাবতীর বয়স মাত্র ১৩ বছর। সেই বয়সে স্বামীর প্রতি তার কোন অনুরাগ না জাগাই ছিল স্বাভাবিক।

তারপর পদ্মাবতী পিতার ধর্মান্তর গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে নিজের নাম গ্রহণ করল লুৎফ-উন্নিসা। লুৎফ-উন্নিসা পদ্মাবতীর জীবনের কলঙ্কজনক অধ্যায়। মুঘল রাজপুরীতে নিজ প্রভাব বিস্তার ক'রে লুৎফ-উন্নিসা তখন ফুলে ফুলে মধু আহরণ ক'রে বেড়াতে থাকে। লুৎফ-উন্নিসার এই পাপজীবনে কোন বৈচিত্র্য নেই। সে বুদ্ধিমতী। বুদ্ধির খেলায় সে চেয়েছিল ভারত-সম্রাটের প্রধানা মহিষী হতে। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল মেহের-উন্নিসা, পরবর্তী কালে যিনি নূরজাঁহা বেগম নামে খ্যাত।

মতিবিবি ছদ্মনাম গ্রহণ ক'রে বাংলা দেশে এসেই পদ্মাবতী চরিত্রে পরিবর্তন দেখা দিল। পথে দেখা হল নবকুমারের সঙ্গে। সে চিনতে পারল পূর্বস্বামীকে। সেই মুহূর্তে তার হৃদয়ে জাগল পরিবর্তন। যে ঐশ্বর্য ও ক্ষমতার লোভে মতিবিবি শাহজাদাকে হাত করবার চেষ্টা করেছে, সেই মতিবিবি তখন অনায়াসে তাব সমস্ত গহনা কপালকুণ্ডলাকে দান ক'রে দিতে পারে। শুধু তাই নয়, আগ্রায় গিয়ে সে সেলিমের প্রেমও প্রত্যাখ্যান করে, কারণ—"লুৎফ-উন্নিসার হৃদয় পাষাণ। সেলিমের রমণীহৃদয়জি রাজকান্তিও কখন তাঁর মনঃমুগ্ধ করে নাই। কিন্তু এইবার পাষাণ মধ্যে কীট প্রবেশ করিয়াছিল।"

কীটই বটে! নবকুমারেব প্রতি প্রেম, পদ্মাবতীকে অনুশোচনায় বিদ্ধ ক'রে শুচিশুভ্র ক'রে তুলতে পারত। কিন্তু সে আঘাত পেল নবকুমারের কাছে প্রণয়-নিবেদনে ব্যর্থ হয়ে। মতিবিবি এতকাল প্রেম পেয়েই এসেছে, প্রত্যাখ্যাত হবার অভিজ্ঞতা তার নেই। তাই স্বাভাবিকভাবেই সে 'যেন তেন প্রকারেণ' নবকুমারকে পাবার বাসনা করল। তাই সে প্রথমেই কপালকুণ্ডলাকে সরাবার মতলব করেছে, কাপালিকের সঙ্গে পরামর্শ করেছে।

তবে তখনো পদ্মাবতীর মনে নারীসুলভ কোমলতা কিছু ছিল। তা নইলে কপালকুণ্ডলাকে হত্যা করবার জন্য কাপালিকের আগ্রহে সে-ও সম্মতি জানাতে পারত।

তাছাড়া, সে ধনরত্ন দিয়ে কপালকুণ্ডলাকে সুখে রাখতে চেয়েছিল, কিন্তু বিনিময়ে চেয়েছিল স্বামী।

পদ্মাবতীর স্বার্থসিদ্ধি—অর্থাৎ কপালকুণ্ডলার সম্মতিদানের পরই উপন্যাসে আর তাকে দেখা যায় না। উপন্যাসের কাহিনীর মধ্যে তখন আর তার কোন প্রয়োজন ছিল না বলেই বঙ্কিম তার কথা আর উল্লেখ করেননি।

পদ্মাবতী চরিত্রটি এই উপন্যাসে জটিলতা বৃদ্ধি করেছে এবং কাহিনীর পরিণতিকে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে।

মদনসেন (মৃণাঃ ৪/১)। সেনবংশীয় রাজা মদনসেনের উল্লেখমাত্র আছে।

মদনদেব (যুগঃ ৬ষ্ঠ পরিঃ)। দ্রঃ রাজা মদনদেব।

মনাইম খাঁ (দুর্গেঃ ১/৩)। মনাইম খাঁ আকবরের সেনাপতিরূপে দাউদ খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন।

মনোরমা (মৃণাঃ ২/২)। মনোরমা একটি রহস্যময়ী চরিত্র। কখনো বালিকা, কখনো প্রৌঢ়া। কখনো তাকে দেখি হেমচন্দ্রের সঙ্গে বালিকাসুলভ আচরণ করতে, কখনো দেখি পশুপতির সঙ্গে দৃঢ়ভাবে তর্কবিতর্ক করতে, আবার কখনো দেখি নির্জন অরণ্যে একাকী বসে থাকতে, কখনো যবনসেনার সন্ধান বলে দিতে।

মনোরমা পশুপতির বিবাহিতা স্ত্রী। কিন্তু তার দ্বারা স্বামীর প্রাণহানি হবে, এই আশঙ্কায় বিবাহের পরই তাকে স্বামীর কাছ-ছাড়া করা হয়। কিন্তু ভাগ্যচক্রে সেই পশুপতিকে মনোরমা আবার ভালবাসে। মনোরমা জানে সে বিধবা। পশুপতির সঙ্গে মনোরমার প্রণয়ের ইতিহাস বঙ্কিম অনুক্ত রেখেছেন। এমনিভাবে মনোরমাকে রহস্যময়ী রেখে বঙ্কিমচন্দ্র এই চরিত্রের আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছেন। মনোরমা যে পশুপতিকে যথার্থ ভালবাসে, তার প্রমাণ সর্বত্রই ছড়ানো। একদিকে পশুপতির প্রতি প্রেমের আকর্ষণ, অন্যদিকে পশুপতির আচরণের প্রতি ঘৃণা—এই দুয়ের দ্বন্দ্বে মনোরমার জীবন বিপর্যস্ত। তবে এই দ্বন্দ্বে মনোরমার জীবনে বিষময় ফল দেখানো হয়নি। মনোরমা অনেকটা ভাগ্যের হাতে ক্রীড়নক হয়ে শেষ পর্যন্ত স্বামীর চিতায় আত্মাহুতি দিয়েছে।

মনোরমা (ইন্দিরা)। রাঁধুনী থাকাকালীন ইন্দিরার ছদ্মনাম।

মনোহর দাস (রজনী ২/২)। মনোহর দাস হরেকৃষ্ণ দাসের এক ভাই। তাঁর সঙ্গে শচীন্দ্রের পিতামহ বাঞ্ছারাম মিত্রের নিগূঢ় বন্ধুত্ব ছিল। উভয়ে মিলিতভাবে প্রচুর অর্থোপার্জন করেন।

মবারক (রাজঃ ২/১)। মবারক চরিত্র ভালো ও মন্দ, পাপ ও পুণ্যের দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত। মবারক একদিন ভালবেসে দরিয়াকে বিবাহ করেছিল, কিন্তু কেন যে

তাকে ত্যাগ করল, তা জানা যায় না। সম্ভবতঃ, শাহাজাদী জেব-উন্নিসার রূপবহ্নিতে আত্মাহুতি দিয়ে দরিয়ার স্নিগ্ধ সৌন্দর্যকে উপেক্ষা করেছিল। কিন্তু মবারকের হৃদয়ে যে ভদ্র মার্জিত বিবেকবোধ বর্তমান ছিল, তার প্রভাবেই পাপের স্রোতে নির্বিকারচিত্তে সে গা ভাসিয়ে দিতে পারেনি। তাই তাকে জেব-উন্নিসাকে বিবাহ প্রস্তাব করতে দেখা যায়। কিন্তু শাহাজাদীর প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াবার তার সাহস ছিল না। ঘটনা-চক্রে দরিয়ার উপকার ও প্রেমের গভীরতার পরিচয় পেয়ে মবারক তাকে নিয়ে পুনরায় সুখের সংসার পাতল। কিন্তু এই সুখ বেশীদিন সইল না। শাহাজাদীর রোষানলে তাকে প্রাণত্যাগ করতে হল। কিন্তু আবার যখন জেব-উন্নিসার সঙ্গে মবারকের দেখা হল, তখন সেই সুপ্ত রূপোন্মাদনা জেগে উঠল। এবার কিন্তু শাহাজাদী মবারকের প্রতি যথার্থই প্রেমাসক্ত। কিন্তু মবারক জানে, দরিয়ার প্রতি যে অবিচার সে করেছে, সেই পাপের ফল তাকে ভোগ করতেই হবে। তাই দরিয়াকে দেখে সে নিজের ভবিষ্যৎ বাণী নিজেই করেছে—"ইয়া আল্লা! আমাকে মরিতেই হইবে।" মবারকের প্রেমজীবনের এই দ্বন্দ্বসংঘাতেই সে এত জীবন্ত।

মবারক চরিত্রে আর একটি দ্বন্দ্ব প্রভুভক্তি ও কৃতজ্ঞতাবোধকে কেন্দ্র ক'রে দেখা দিয়েছে। ঔরঙ্গজেব তার প্রতি যতই অবিচার করুক না কেন, মবারক বিশ্বাসঘাতক হতে চায়নি। কিন্তু জীবনদাতা মাণিকলালের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশতঃ তার অনুরোধে সে মুঘল সৈন্যদের বিপথে চালিত করেছে। কিন্তু তার বিনিময়ে সে রাজসিংহের কাছে পুরস্কার চেয়েছে মৃত্যু।

মবারক যথার্থ বীর এবং মহৎ চরিত্র। চঞ্চলকুমারীকে সম্মুখে দেখে মবারকের আচরণ ভদ্রতাবোধ ও বীরত্বের চূড়ান্ত সীমা স্পর্শ করে।

মসীমুদ্দিন (চন্দ্রঃ ৩/৩)। শৈবলিনী বন্দী প্রতাপের অনুসরণ করতে চাইলে, নবাব এই 'বিশ্বাসী, বলিষ্ঠ এবং সাহসী খোজাকে' তার সঙ্গে যেতে আদেশ দেন।

মহম্মদ আলি (মৃণাঃ ২/৬)। বখ্‌তিয়ার খিল্‌জির বিশ্বস্ত লোক। ইনিই বখ্‌তিয়ারের বক্তব্য পশুপতির কাছে ব্যক্ত করেন। মহম্মদ আলি চতুর ব্যক্তি। কথাবার্তা তাঁর মার্জিত এবং তিনি যথার্থ বীর। অঙ্গীকারমতো বখ্‌তিয়ার পশুপতির সঙ্গে ব্যবহার না করায়, মহম্মদ আলি অনুতপ্ত হন। তাই তিনি গোপনে পশুপতিকে মুক্তি দান করেন। মহম্মদ আলি যবনকুলের পাপ অনেকটা মোচন করেছেন।

মহম্মদ ইরফান (চন্দ্রঃ ৬/৩)। মীরকাশেমের অনুচর।

মহম্মদ ঘোরি (মৃণাঃ ২/৬)। "মৃণালিনী" উপন্যাসে উল্লেখমাত্র আছে। মহম্মদ ঘোরি ভারতে মুসলমান রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি একজন অসাধারণ

বীর ছিলেন। ইনি ১১৭৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। তারপর ক্রমে ক্রমে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। ১২০৫ সালে ঘোরনগরে প্রত্যাগমনের কালে সিন্ধুতীরে এক অসভ্য পার্বত্য জাতিদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মহম্মদ তকি (চন্দ্রঃ ৩/৩)। দ্রঃ তকি খাঁ।

মহেন্দ্র সিংহ (আনন্দঃ ১/১)। মহেন্দ্রই "আনন্দমঠ"-এর সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের বাইরের মানুষ, যাকে উপন্যাসের মধ্যে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত করা হয়েছে। পদচিহ্ন গ্রামের অবস্থাপন্ন ব্যক্তি হয়েও ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কবলে পড়ে মহেন্দ্রকে স্ত্রী-কন্যা নিয়ে গৃহত্যাগ করতে হয়েছে। মহেন্দ্র স্ত্রী-কন্যার প্রতি স্নেহশীল ও কর্তব্যপরায়ণ। কন্যার জন্য দুধ সংগ্রহে গিয়ে সে স্ত্রী-কন্যাকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছে। তারপর স্ত্রীর সন্ধানকালে সে সিপাহীদের হাতে ধৃত হয়েছে। মহেন্দ্র শক্তিবান পুরুষ। একজন সিপাহীর আঘাতের প্রত্যুত্তর সে উপযুক্তভাবেই দিয়েছে।

মহেন্দ্রের জীবনে পরিবর্তন দেখা দিল ভবানন্দ ও সত্যানন্দের প্রভাবে এসে এবং তাদের উদ্দেশ্যের কথা শ্রবণ ক'রে ও দেবীমূর্তি দর্শন ক'রে। কিন্তু এই পরিবর্তন একেবারে আকস্মিক বলে মনে হয় না। দেশের দারুন দুর্দিনের প্রতি মহেন্দ্রের মতো বুদ্ধিমান লোক নিশ্চয়ই সচেতন ছিল। এই অরাজকতার মধ্যে তার মন বিষিয়ে উঠেছিল। তাই যে মুহূর্তে মহেন্দ্র স্বাধীন হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠার একটা উপায় দেখতে পেল, সেই মুহূর্তেই তার মন সেইদিকে ছুটে গেল। কিন্তু মহেন্দ্রের সর্বাপেক্ষা বড় বাধা স্ত্রী-কন্যা। একদিকে দেশের জন্য সর্বত্যাগী সন্তানধর্ম যেমন তার কাছে আকর্ষণের বস্তু, অন্যদিকে কল্যাণময়ী স্ত্রী কল্যাণী ও স্নেহময়ী কন্যা সুকুমারী তার হৃদয়রাজ্য অধিকার ক'রে বসে আছে। মহেন্দ্রের এই বন্ধন নিজ হাতে মোচন করেছে কল্যাণী, বিষ খেয়ে। তা নাহলে হয়তো মহেন্দ্রের পক্ষে সন্তানধর্ম গ্রহণ করা সম্ভব হত না।

তারপর মহেন্দ্র সন্তানধর্মে দীক্ষা নিয়েছে। সত্যানন্দের সঙ্গে নগরের কারাগারে থাকাকালে, মহেন্দ্রের মনে একবার সন্তানধর্মের মহাব্রতে দ্বিধা জেগেছিল। কিন্তু সত্যানন্দের অলৌকিক শক্তির পরিচয় পেয়ে তার ভক্তি অচলা হল।

মহেন্দ্রের উপর সত্যানন্দ এক গুরুভার অর্পণ করলেন। পদচিহ্ন গ্রামে গিয়ে গড় তৈরির ভার পড়ল মহেন্দ্রের উপর। এর পর মহেন্দ্রকে আর স্বতন্ত্র ক'রে চেনা যায় না। সন্তানসেনার অঙ্গ হিসাবে তখন সে ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য-বর্জিত। যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা গেল, মহেন্দ্রকে কামান নিয়ে শত্রু আক্রমণ করতে।

তারপর সন্তানসেনার প্রাথমিক কার্য শেষ হলে, মহেন্দ্র কল্যাণী ও সুকুমারীকে পেয়ে আনন্দিতচিত্তে গার্হস্থ্য ধর্মে ফিরে এসেছে। কিন্তু শেষের দুটি ঘটনায় মহেন্দ্রের চরিত্র

কিছুটা কালিমালিপ্ত হয়েছে। প্রথমতঃ, ভবানন্দকে লক্ষ্য ক'রে মহেন্দ্রের উক্তি—"ভবানন্দ ঠাকুর কি বিশ্বাসী ছিলেন?" আপত্তিজনক। তখন ভবানন্দ মৃত। সে মৃত্যু তিনি বীরের মতো বরণ করেছেন। মহেন্দ্র সে-সব জেনেও ভবানন্দকে ক্ষমা করতে পারেনি, এটা তার সংকীর্ণতার পরিচয়। পুরুষবেশী শান্তির সঙ্গে স্ত্রী কল্যাণীকে দেখে মহেন্দ্র যেভাবে 'রুষ্ট' হয়েছে, তাতে তার ইন্দ্রিয়জয়ের কোন মহিমা বর্তমান থাকেনি।

আসলে—মহেন্দ্র উপন্যাসের প্রথমে যেমন সাধারণ মানুষ ছিল, উপন্যাসের শেষেও তেমনি দোষ-গুণসম্পন্ন সাধারণ মানুষরূপেই গার্হস্থ্য ধর্মে ফিরে এসেছে। মাঝখানে কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। মহেন্দ্র এবং কল্যাণীর বিচ্ছেদকে কেন্দ্র ক'রে যে অন্তর্বেদনার প্রকাশ স্বাভাবিক ছিল, বঙ্কিম তার গতি রুদ্ধ ক'রে ভালই করেছেন। এর ফলে মহেন্দ্রের চরিত্র আংশিক হলেও কাহিনীর উদ্দেশ্য বজায় থেকেছে।

মার্ক আন্তনি (রাজঃ ৭/২)। রোম সেনাপতি। মিশর জয় করতে এসে তিনি সেখানকার রানী ক্লিওপেট্রার রূপে মুগ্ধ হয়ে কর্তব্যপথ হতে ভ্রষ্ট হন। শেষ পর্যন্ত তাঁকে আত্মহত্যা করতে হয়। উপন্যাসে নামোল্লেখমাত্র আছে।

মাণিকলাল (রাজঃ ৩/৩)। 'রাজসিংহ' উপন্যাসের ঐতিহাসিক চরিত্রের ভীড়ে মাণিকলাল সম্পূর্ণ কাল্পনিক চরিত্র। মাণিকলাল প্রাণশক্তিতে চঞ্চল। ঘটনার চমকে তার বিস্ময়কর উপস্থিতি।

মাণিকলালকে প্রথমে আমরা দস্যুরূপে দেখি। রাজসিংহের হাতে ধরা পড়ে সে প্রাণভিক্ষা চেয়েছে নিজের জন্য নয়, একমাত্র মাতৃহারা কন্যার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। মাণিকলালের এই স্নেহপরায়ণ পিতৃহৃদয়ের জন্য, তার দস্যুতার সব অপরাধ ক্ষমা করতে আমাদের বেশী সময় লাগেনি। তাছাড়া, মাণিকলাল স্বহস্তে অঙ্গুলি ছেদন ক'রে নির্বিকারভাবে যন্ত্রণা সহ্য ক'রে যেভাবে নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত নিজেই সম্পন্ন করেছে, তাতে তার প্রতি একটা বিস্ময়-মিশ্রিত শ্রদ্ধা জাগে।

তারপর আমরা প্রভুভক্ত বিশ্বস্ত মাণিকলালকে দেখি। কখনো সে কৌশলে শত্রু-পক্ষকে পরাস্ত করেছে, কখনো সে দৌত্যকার্য নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করেছে। মাণিকলালের চতুরতাই হচ্ছে তার সাফল্যের অন্যতম উপাদান। দস্যু অবস্থাতেও তার পরামর্শের মধ্যে বুদ্ধির ছাপ আছে, কিন্তু পরবর্তী কালে সে অবিশ্বাস্যরূপে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে। মাণিকলালকে ঠিক বীর আখ্যা দেওয়া যায় না, সে চতুর।

মাণিকলালের জীবন নির্মলকুমারীর সঙ্গে যেভাবে জড়িয়ে গেছে, তাকে প্রেম বলা যায় না। তবে মাণিকলাল তার কন্যার মা হিসাবে নির্মলকুমারীকে গ্রহণ করলেও, হৃদয় না দিয়ে পারেনি। কিন্তু প্রখর বুদ্ধিমতী নির্মলের কাছে মাণিকলালের আনুগত্য

মাণিকলালকে যেন অনেকটা ব্যক্তিত্বহীন ক'রে ফেলেছে। মাণিকলাল মবারককে বাঁচাবার পিছনে তার চিত্তের দয়ালুতা বা অন্য কোন ভাব প্রকাশিত হয়েছে কিনা, তা সঠিক বোঝা যায় না।

মাণিকলালের চরিত্রে অন্তর্মুখীনতা নিতান্তই অল্প, ঘটনার চমকেই তার কর্মময় উপস্থিতি। অবিশ্রান্ত হলেও পাঠক-হৃদয়ে মাণিকলালের অধিষ্ঠান চিরন্তন।

মাণিকলালের পিসী (রাজঃ ৩/৯)। "মাণিকলালের কেহ ছিল না—কেবল এক পিসীর ননদের জায়ের খুল্লতাতপুত্রী ছিল। সৌজন্যবশতঃই হউক, আর আত্মীয়তার সাধ মিটাইবার জন্যই হউক—মাণিকলাল তাহাকে পিসী বলিয়া ডাকিত।" (৩/৯) সুতরাং, এই পিসীর মাণিকলালের প্রতি কোন আন্তরিক টান না থাকাই স্বাভাবিক। তিনি অর্থলোভী। মাণিকলালের কাছে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনায় যেভাবে তিনি খরচের ফর্দ দিয়েছেন, তাতে চরিত্রটি জীবন্ত হয়েছে।

মাধবাচার্য (মৃণাঃ ১/১)। মাধবাচার্য আদর্শ ব্রাহ্মণ এবং সন্ন্যাসী চরিত্র। তিনি যবনসেনা কর্তৃক দেশ অধিকারের বিরুদ্ধাচরণ করতে দৃঢ়সংকল্প। এইজন্য তাঁর চেষ্টার অন্ত নেই। তিনি নিজ শিষ্যদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার ক'রে যবন বিতাড়নের কার্যে ব্রতী হয়েছেন। এ-বিষয়ে তাঁর প্রধান সহায় হলেন হেমচন্দ্র। হেমচন্দ্রের সাহায্য তাঁর এতবেশী প্রয়োজন যে, তিনি হেমচন্দ্রের মনকে অন্যদিকে নিবিষ্ট করতে চান না। তাই মৃণালিনী হেমচন্দ্রের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় জেনেও, তাকে ছলনায় পিতৃগৃহ থেকে বের ক'রে এনে এক শিষ্যগৃহে গোপনে রেখে দেন। এই কাজ মাধবাচার্যের চরিত্র-মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ণ করেছে। শুধু তাই নয়, শিষ্যগৃহে মৃণালিনী কেমন আছে তার খোঁজ নেওয়াও তিনি প্রয়োজন মনে করেননি। এবং অনায়াসেই মৃণালিনীর চরিত্র সম্পর্কে কুৎসা-রটনায় বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। আসলে, মাধবাচার্য সন্ন্যাসী। তাই নারীচরিত্রের মহত্ত্ব, সতীত্ব ও দৃঢ়তা সম্পর্কে তিনি সম্যক্ অবহিত নন। তাই মৃণালিনীর প্রতি তিনি সুবিচার করতে পারেননি। মৃণালিনীকে তিনি গ্রহণ করেছেন হেমচন্দ্রকে দিয়ে তাঁর কার্যসিদ্ধির উপায়রূপে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য মাধবাচার্য্য সদ্‌বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। হেমচন্দ্র-মৃণালিনীর সকল বৃত্তান্ত "শুনিয়া মাধবাচার্য্য আনন্দ প্রকাশ করিলেন। কহিলেন, "বৎস বড় প্রীত হইলাম। তোমার প্রিয়তমা এবঞ্চ গুণবতী ভার্য্যাকে তোমার নিকট হইতে বিযুক্ত করিয়া তোমাকে অনেক ক্লেশ দিয়াছি। এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমরা দীর্ঘজীবী হইয়া বহুকাল একত্র ধর্ম্মাচরণ কর। যদি তুমি এক্ষণে সস্ত্রীক হইয়াছ, তবে তোমাকে আর আমি আমার সঙ্গে কামরূপ যাইতে অনুরোধ করি না। আমি অগ্রে যাইতেছি। যখন সময় বুঝিবেন, তখন তোমার নিকট

কামরূপাধিপতি দূত প্রেরণ করিবেন। এক্ষণে তুমি বধূকে লইয়া মথুরায় গিয়া বাস কর—অথবা অন্য অভিপ্রেত স্থানে বাস করিও।" (৪/১২)

বঙ্কিমচন্দ্র মাধবাচার্যকে দেশপ্রেমিক সন্ন্যাসীরূপে অঙ্কন করেছেন। এই চরিত্রেরই ক্রম-বিকাশ দেখা যায় 'চন্দ্রশেখর' ও 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে।

মাধবীনাথ সরকার (কৃঃ উঃ ২/২)। ভ্রমরের পিতা "মাধবীনাথ সরকারের বয়স একচত্বারিংশৎ বৎসর। তিনি দেখিতে বড় সুপুরুষ। তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে লোকমধ্যে বড় মতভেদ ছিল। অনেকে তাঁহার বিশেষ প্রশংসা করিত—অনেকে বলিত, তাঁহার মত দুষ্ট লোক আর নাই। তিনি যে চতুর, তাহা সকলেই স্বীকার করিত—এবং যে তাঁহার প্রশংসা করিত, সেও তাঁহাকে ভয় করিত।" (২/২) তিনি গোবিন্দলালকে বহু পরিশ্রম ক'রে খুঁজে বের করেছেন, তাকে বুদ্ধিবলে খুনের দায় থেকে বাঁচিয়েছেন। চরিত্রটি তৎকালীন জমিদারদের সার্থক প্রতিভূ। কন্যার প্রতি তাঁর যথেষ্ট স্নেহ ছিল।

মানসিংহ (দুর্গেঃ ১/২)। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ চরিত্র। অম্বরপতি বিহারীমল্লের পুত্র ভগবানদাসের ভ্রাতুষ্পুত্র তিনি। ভগবানদাস দিলেন আকবরের শ্যালক, আবার মানসিংহ ছিলেন আকবর-পুত্র জাহাঙ্গীরের শ্যালক। এই কারণে মোগল রাজদরবারে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। আবার, রাজপুতজাতির কাছে তিনি ছিলেন কলঙ্কস্বরূপ। বাংলায় পাঠানরা বিদ্রোহী হলে, আকবর মানসিংহকে সুবাদার ক'রে পাঠান। ইনি কয়েকবার পাঠানদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে বাংলায় শান্তিস্থাপন করেন। ১৫৮৯ খ্রীঃ থেকে ১৬০৪ খ্রীঃ পর্যন্ত মানসিংহ ছিলেন বাংলার সুবাদার। জাহাঙ্গীরের সময় তিনি বাংলার বারো ভুঁইঞাদের বিদ্রোহদমনের জন্য আসেন।

"দুর্গেশনন্দিনী" উপন্যাসে মানসিংহের স্থান নিতান্ত গৌণ. চরিত্র হিসাবে তাঁর বিশেষ কোন মহিমা প্রচারিত হয়নি। জগৎসিংহের পিতা হিসাবে তাঁর মর্যাদা। ঐতিহাসিক মানসিংহকে বঙ্কিমচন্দ্র যথাযথভাবে সংক্ষেপে চিত্রিত করেছেন। তবে জগৎসিংহকে যুদ্ধে প্রেরণ করার কালে তাঁর পিতৃহৃদয়ের পরিচয় ক্ষণেকের জন্য উদ্ভাসিত হয়েছে।

মারকুইস্ অব হেস্টিংস (দেবীঃ ২/১৩)। ইনি পিণ্ডারী নামক কুখ্যাত দস্যুদলকে দমন করেছিলেন।

মালতী গোয়ালিনী (বিষঃ ১৯ পরিঃ) দেবেন্দ্রবাবুর অনুগত এই স্ত্রীলোকটি হীরা ও দেবেন্দ্রের মধ্যে দূতীর কাজ করেছে। বেশ বোঝা যায়, এর চরিত্র ভালো নয়।

মালী (কৃঃ উঃ ১/১৫)। গোবিন্দলালের বারুণী পুষ্করিণী তীরের উদ্যানের উড়িয়া মালী। রোহিণীর জলমগ্ন অবস্থায় তার ব্যবহারে একটি পরিচ্ছেদেই সে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। কিঞ্চিৎ হাস্যরসের অবতারণাও সে করেছে। গোবিন্দলাল তাকে রোহিণীর মুখে ফুঁ দিতে বললে সে বলেছে—'সেহৈ পারিব না মুনিমা!'

মাহরু (দুর্গেঃ ২/৬)। ওসমানের বাল্যকালের নাম (দ্রঃ ওসমান)।

মাহতাবচন্দ্র জগৎশেঠ (চন্দ্রঃ ২/৬)। দ্রঃ জগৎশেঠ।

মিনহাজউদ্দিন (মৃণাঃ ৪/৪)। "যবন-ইতিহাসবেত্তা"-এর তথ্য অবলম্বনেই বঙ্কিম 'মৃণালিনী' উপন্যাসের ঐতিহাসিক পটভূমিকা রচনা করেন। কিন্তু তিনি যথার্থ বুঝেছিলেন যে, স্বজাতিপ্রীতির জন্য ইনি সত্য ঘটনাকে বহুল পরিমাণে অতিরঞ্জিত করেছেন।

মিল (রজনী ৩/৩)। ইংরাজ চিন্তানায়ক John Stuart Mill (১৮০৩—১৮৭৩)-এর কথা বলা হয়েছে। তিনি আধুনিক Logic বা ন্যায়শাস্ত্রে অনেক নূতন উপাদান যোগ করেন। সমাজ-দর্শনে তিনি Utilitarianism বা উপযোগবাদ নামে বিখ্যাত মতবাদের প্রবর্তক। এই মতবাদের মূলকথা হল—মানব-সমাজের উন্নতির ক্ষেত্রে যা উপযোগী তাই-ই সুন্দর, সত্য এবং তাতেই সুখ। তবে মিল্ কোম্‌ত-এর মতো মানব-পূজাকেই চরম বলে মানেননি।

মিস্ টেম্পল্ (বিষঃ ৫ম পরিঃ)। "নগেন্দ্রের পিতা মিস্ টেম্পল্ নাম্নী একজন শিক্ষাদাত্রী নিযুক্ত করিয়া কমলমণিকে এবং সূর্য্যমুখীকে বিশেষ যত্নে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন।"

মীরকাশেম (চন্দ্রঃ ১/১)। "চন্দ্রশেখর" উপন্যাসে ঐতিহাসিক চরিত্র মীরকাশেম একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন। মীরকাশেম ইংরাজ-প্রতিষ্ঠিত বাংলার দ্বিতীয় নবাব। তিনি ছিলেন মীরজাফরের জামাতা। ১৭৬০ খ্রীঃ—১৭৬৪ খ্রীঃ পর্যন্ত ছিল তাঁর রাজত্বকাল। তিনি চেয়েছিলেন এদেশ থেকে ইংরাজ কর্তৃত্বের অবসান ঘটাতে। তাই তিনি যুদ্ধের প্রস্তুতি চালাবার জন্য মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। মীরজাফরের সময় থেকে ইংরাজরা যে এদেশে বিনাশুল্কে বাণিজ্য করছিল, তাকে কেন্দ্র ক'রেই মীরকাশেমের সঙ্গে ইংরাজদের বিরোধ বাধে। ইংরাজগণ পাটনা শহর অধিকার ক'রে নেন। তখন মীরকাশেম যুদ্ধ করেন এবং তিনবার যুদ্ধে পরাজিত হন। এর মধ্যে উদয়নালা বা উধুয়ানালার যুদ্ধই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। তারপর তিনি অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা ও মোগল সম্রাট শাহ-আলমের সঙ্গে মিলিত হয়ে ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বক্সারে ইংরাজের সঙ্গে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ করেন। ঐ যুদ্ধে পরাজিত

হয়ে তিনি পলায়ন করেন, তারপর তাঁর সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না। (ইতিহাসের মীরকাশেমকে বিস্তারিতভাবে জানার জন্য অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়-র 'মীরকাশেম' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।)

বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের মীরকাশেমকে রক্তমাংসের মানুষরূপে অঙ্কন করেছেন 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে। মীরকাশেম এবং দলনীর উপাখ্যানটিকে বিস্তৃত স্থান দান করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। দলনী বেগমের প্রতি মীরকাশেমের সন্দেহ ও সেই সন্দেহের অবসানে মীরকাশেমের হতাশা, ঐতিহাসিক মীরকাশেমের পরাজয়ের অন্তর্নিহিত কারণও সূচিত করে। এ সম্বন্ধে বঙ্কিম লিখেছেন—"ইংরেজের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মীরকাশেমের অধঃপতন আরম্ভ হইল। মীরকাশেম প্রথমেই কাটোয়ার যুদ্ধে হারিলেন। তাহার পর গুরূগণ খাঁর অবিশ্বাসিতা প্রকাশ পাইতে লাগিল। নবাবের যে ভরসা ছিল, সে ভরসা নির্ব্বাণ হইল। নবাবের এই সময়ে বুদ্ধির বিকৃতি জন্মিতে লাগিল। বন্দী ইংরেজদিগকে বধ করিবার মানস করিলেন। অন্যান্য সকলের প্রতি অহিতাচরণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মহম্মদ তকির প্রেরিত দলনীর সম্বাদ পৌছিল। জ্বলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল। ইংরেজরা অবিশ্বাসী হইয়াছে—সেনাপতি অবিশ্বাসী বোধ হইতেছে—রাজ্যলক্ষ্মী বিশ্বাসঘাতিনী—আবার দলনীও বিশ্বাসঘাতিনী? আর সহিল না।" (৬/২)

একদিকে বাইরের বিশ্বাসঘাতকতা, অন্যদিকে অন্তরের এই শূন্যতা মীরকাশেমের প্রতি পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করেছে।

ইতিহাসের মীরকাশেমের মতো উপন্যাসেও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে আগাগোড়া ইংরাজ-বিদ্বেষীরূপে অঙ্কন করেছেন।

গুরগণ খাঁকে মীরকাশেম চিনতেন। কিন্তু তিনি জানেন যে, এখন গৃহশত্রু সৃষ্টি করলে অসুবিধা হবে; তাই তিনি চেয়েছিলেন আগে গুরগণকে দিয়ে ইংরাজদের হঠাতে, তারপর গুরগণের সঙ্গে মোকাবিলা করতে। এই ধরনের চিন্তা মীরকাশেমের বুদ্ধি ও কৌশলের পরিচয় দেয়।

এ উপন্যাসে মীরকাশেমের যে হস্তরেখা বিচারের ঘটনা আছে, তাও অনৈতিহাসিক নয়। যে 'সয়ের মতাক্ষরীণ'-এর ইংরাজী অনুবাদ পড়ে বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাস লিখতে প্রবৃত্ত হন, তাতে গণক মীরকাশেমের পরিচয় আছে। তাছাড়া—"মীরকাশেমের উপর গুরগণ খাঁর অসামান্য প্রভাব, ইহাতে অপরাপর কর্ম্মচারীর অসন্তোষ, ইংরেজ কর্ত্তৃক আজিমাবাদের পথে মুঙ্গেরে অস্ত্রবোঝাই নৌকা প্রেরণ, ইহা লইয়া 'অমিয়টের সঙ্গে নবাবের বাদানুবাদ' নবাবের আদেশমত মুর্শিদাবাদে তকি খাঁ কর্ত্তৃক ছল করিয়া

অমিয়টের সহিত বিবাদ এবং নবযৌবনের সহিত সঙ্ঘর্ষের ফলে অমিয়ট ও তাঁহার সহচরবর্গের মৃত্যু, সন্দেহপ্রযুক্ত শেঠভ্রাতৃদ্বয়কে মুঙ্গেরে নজরবন্দী রাখা—এ সকলই ইতিহাসের কথা।" (উপন্যাস-সাহিত্যে বঙ্কিম—প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত)

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে স্বতন্ত্র উপকাহিনীর নায়ক হিসাবেই নয়, চন্দ্রশেখর-শৈবলিনী কাহিনীতেও মীরকাশেমের প্রয়োজনীয় উপস্থিতি ; উপন্যাসে এই চরিত্রটিকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাদান করেছে।

মীরজাফর (আনন্দ: ১/৭)। 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে মীরজাফরের উল্লেখমাত্র আছে। মন্বন্তরের সময়ে মীরজাফরের উপর রাজ্যভার ছিল, একথা বলা হয়েছে। মীরজাফর সম্বন্ধে উপন্যাসে আছে—তিনি "পাপিষ্ঠ নরাধম বিশ্বাসহন্তা মনুষ্য-কুলকলঙ্ক।" "মীরজাফর আত্মরক্ষায় অক্ষম, বাঙ্গালা রক্ষা করিবে কি প্রকারে? মীরজাফর গুলি খায় ও ঘুমায়।" (১/৭)

মীরজাফরের এই চরিত্রবৈশিষ্ট্য ইতিহাস সমর্থন করে। সয়ের উল মুতাক্ষরীণে আছে—"......when once duly seasoned with his dose of bang, he (Mirdjaafar-qhan) was incapable of attending to business, specially after his meal." (Vol II, Sec. IX, P. 258)

তবে বঙ্কিম একটি ভুল করেছেন। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সঙ্গে মীরজাফরের কোন সম্পর্ক ছিল না। কারণ, তার পাঁচ বছর পূর্বে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে মীরজাফরের মৃত্যু হয়। তাঁর পুত্র সৈয়েফুদ্দৌলার সময় মন্বন্তর হয়। মন্বন্তরের বছর তিনি মারা যান (১০ই মার্চ, ১৭৭০ খ্রীঃ)। তখন তাঁর ভ্রাতা মুবারেফুদ্দৌলা নবাব হন।

মুন্সী রামগোবিন্দ রায় (চন্দ্র: ২/৩)। ইতিহাসে মীরকাশেমের বিশিষ্ট হিন্দু কর্মচারী নায়েব-নাজিম রামনারায়ণ রায়ের নাম আছে। ইনি বঙ্কিমের হাতে মুন্সী রামগোবিন্দ রায় হতে পারেন। ব্রহ্মচারীবেশী চন্দ্রশেখর দলনীর চিঠি মীরকাশেমকে দেওয়ার জন্য প্রথমে এঁর হাতে দেন।

মুরলা (সীতা: ২/৪)। সীতারামের রাজঅন্তঃপুরের দাসী। সীতারামের অনুপস্থিতিকালে তাঁর পত্নী রমা এই দাসীকে দিয়েই গঙ্গারামকে ডাকিয়ে আনতেন। মুরলার অর্থলোভ ছিল, তাই রানীর কাছে কিছু পেয়েও গঙ্গারামের কাছ থেকে কিছু পাবার আশা করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গঙ্গারামের যাতায়াত বন্ধ হওয়ায় সে কিছুটা খুশীই হয়েছিল, তাই গঙ্গারামকে পাঁচকথা শুনিয়ে দিতে কসুর করেনি। নন্দার চেষ্টায় মুরলা রমার হয়ে রাজসভাতে সত্য সাক্ষ্যই দিয়েছিল। কিন্তু বঙ্কিম মুরলার জন্য একটু বেশী শাস্তির ব্যবস্থাই করেছেন—"রাজা মুরলাকে মাথা মুড়াইয়া, ঘোল ঢালিয়া,

নগরের বাহির করিয়া দিবার আদেশ করিলেন। সে হুকুম তখন তামিল হইল। মুরলার নির্গমনকালে এক পাল ছেলে, এবং অন্যান্য রসিক লোক দল বাঁধিয়া করতালি দিতে দিতে এবং গীত গায়িতে গায়িতে চলিল।" (৩/৪)

মুরশিদ্‌কুলি খাঁ (সীতাঃ ২/১)। উপন্যাসের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ নেই, কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনাক্রমে নামোল্লেখ আছে।

মৃণালিনী (মৃণাঃ ১/১)। মৃণালিনী একজন বৌদ্ধ শ্রেষ্ঠীর কন্যা। একদিন তিনি মথুরার রাজকন্যার সঙ্গে যমুনায় জলবিহারে গিয়ে প্রবল ঝড়বৃষ্টিতে নদীতে নিমজ্জিত হন। তখন হেমচন্দ্র তাঁকে উদ্ধার করেন এবং বিবাহ করেন। কিন্তু বিবাহের কথা গোপন থাকে। মৃণালিনী পুনরায় পিতৃগৃহে গিয়ে কুমারীভাবে বসবাস করতে থাকেন। একদা হেমচন্দ্রের গুরু মাধবাচার্য হেমচন্দ্রের আংটি দেখিয়ে মৃণালিনীকে পিতৃগৃহ থেকে নিয়ে এসে তাঁর এক শিষ্যের বাড়ীতে রাখেন। মাধবাচার্যের মৃণালিনীকে লুকিয়ে রাখবার কারণ, দেশোদ্ধারের কাজে হেমচন্দ্রকে একাগ্র করা। কিন্তু মৃণালিনীকে সে গৃহ ত্যাগ ক'রে আবার বেরিয়ে পড়তে হল। নবদ্বীপে এসে হেমচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। অনেক বাধা বিপদের পর মিলন হল—হেমচন্দ্র-মৃণালিনীর।

মৃণালিনীর জীবনে এমনি বহু ঘটনার ঘনঘটা। কিন্তু এত ঘটনা সত্ত্বেও চরিত্রটি সক্রিয় নয়, ঘটনার স্রোতে ভাসমান পদ্মমাত্র। মৃণালিনী চরিত্রের একমাত্র বৈশিষ্ট্য হল—স্বামীপ্রেম। হেমচন্দ্রের প্রতি গভীর ভালবাসার জন্যই, তিনি সমস্ত দুঃখ-কষ্টকে হাসিমুখে সহ্য করেছেন। এমনকি এই শান্ত নির্বিরোধ নারী, যখন তাঁর দৈহিক পবিত্রতা ব্যোমকেশের হাতে নষ্ট হবার উপক্রম হয়েছে, তখন প্রবল শক্তি সঞ্চয় ক'রে—"সবলে ব্যোমকেশকে পদাঘাত করিলেন।" মৃণালিনী হেমচন্দ্রের জন্য পথে বেরুলেন। কিন্তু সেই পথের চরিত্র জীবন-সংগ্রামে ব্যক্তিত্বময় হয়ে ওঠেনি। গিরিজায়া নামক সঙ্গিনী চরিত্রটির পটুতায় মৃণালিনী অস্পষ্ট হয়ে গেছে। মৃণালিনীর প্রতি হেমচন্দ্রের অমূলক সন্দেহে মৃণালিনীর মনে কোনও রাগ বা বিদ্বেষ দেখা দেয়নি। বরং গিরিজায়ার মুখে হেমচন্দ্রের বিরূপ আচরণের পরিচয় পেয়ে গিরিজায়াকেই দোষারোপ করেছেন। সবশেষে, নিজের ভাগ্যকে দোষ দিয়ে অশ্রুবর্ষণে শীর্ণা হয়েছেন। আবার, হেমচন্দ্রের সামান্য আহ্বানেই তাঁর স্কন্ধে মাথা রেখে ভবিষ্যৎ সুখের স্বপ্ন দেখেছেন।

এই চরিত্রটি সাধারণ পতিগতপ্রাণা বাঙালী নারীরূপে দেখা দিয়েছে। এই চরিত্রের নামানুসারে গ্রন্থের নামকরণ করা হলেও, চরিত্রটি তেমন বিশিষ্টতা লাভ করতে পারেনি।

মৃন্ময় (সীতাঃ ১/৯)। ঐতিহাসিক চরিত্র। তিনি ছিলেন রাজা সীতারাম রায়ের প্রধান সেনাপতি। তাঁর প্রকৃত নাম মৃন্ময় হলেও, 'মেনাহাতী' নামেই তিনি সম্যক্ পরিচিত। এরূপ নামকরণ হওয়ার কারণ—'মৃন্ময়' থেকে অপভ্রংশ 'মেনা' এবং হাতীর মতো বলশালী বলে তাঁকে 'মেনাহাতী' বলা হত। বঙ্কিমও বলেছেন—'বলে ও সাহসে মৃন্ময়' সীতারামের অন্যতম সহায় ছিলেন। উপন্যাসে এই বীর যোদ্ধার নীরব আত্মদান লক্ষ্য করা যায়।

মেজর এড্ওয়ার্ডস (আনন্দঃ ৪/৪)। ঐতিহাসিক চরিত্র। ওয়ারেন হেস্টিংস-প্রেরিত সন্ন্যাসী বিদ্রোহ দমনের দ্বিতীয় সেনাপতি। প্রথমদিকে এই চরিত্রটি মেজর উড্ নামে রূপলাভ করেছিল। পরবর্তী সংস্করণে বঙ্কিম তা সংশোধন করেন। এড্ওয়ার্ডস কৌশলে মেলার দিন সন্ন্যাসীদের সর্বনাশসাধনের সংকল্প নিয়েছিলেন।

মেনকা (রাজঃ ২/৩)। মোগল দরবারের রমণীদের সৌন্দর্যের বর্ণনা দেবার সময় স্বর্গের অপ্সরী মেনকার নাম করা হয়েছে। বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গের জন্য ইন্দ্র এ-কে প্রেরণ করেন। তখন তাঁর গর্ভে শকুন্তলার জন্ম হয়। ইনি নবজাতিকাকে ফেলে রেখে স্বর্গে চলে যান।

মেরজা হবীব (চন্দ্রঃ ৬/২)। একজন হাকিম। এঁর কাছ থেকেই করিমন দাসী দলনীর জন্য বিষ সংগ্রহ করেছিল।

মেহের-উন্নিসা (কপাঃ ৩/১)। "আকবর শাহের কোষাধ্যক্ষ (আকতিমাদ-উদ্দৌলা) খাজা আয়াসের কন্যা মেহের-উন্নিসা যবনকুলে প্রধানা সুন্দরী। একদিন কোষাধ্যক্ষ রাজকুমার সেলিম ও অন্যান্য প্রধান ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে আনিলেন। সেইদিন মেহের-উন্নিসার সহিত সেলিমের সাক্ষাৎ হইল এবং সেইদিন সেলিম মেহের-উন্নিসার নিকট চিত্ত রাখিয়া গেলেন। তাহার পর যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। শের আফগান নামক একজন মহাবিক্রমশালী ওমরাহের সহিত কোষাধ্যক্ষের কন্যার সম্বন্ধ পূর্বেই হইয়াছিল। সেলিম অনুরাগান্ধ হইয়া সে সম্বন্ধ রহিত করিবার জন্য পিতার নিকট ধাবমান হইলেন। কিন্তু নিরপেক্ষ পিতার নিকট কেবল তিরস্কৃত হইলেন মাত্র। সুতরাং সেলিমকে আপাততঃ নিরস্ত হইতে হইল। আপাততঃ নিরস্ত হইলেন বটে, কিন্তু আশা ছাড়িলেন না। শের আফগানের সহিত মেহের-উন্নিসার বিবাহ হইল।" (৩/১)

বঙ্কিমচন্দ্র এইভাবে ইতিহাসের চরিত্রটিকে "কপালকুণ্ডলা" উপন্যাসে সামান্য ক্ষণের জন্য আনার চেষ্টা করেছেন। অবশ্য, মেহের-উন্নিসার পিতার নাম—মির্জা ঘিয়াস। যাই হোক, মতিবিবির কাহিনীকে পুষ্ট করার জন্য এই চরিত্রের ক্ষণিক উপস্থিতি

ঘটেছে। অপ্রয়োজনবোধে বঙ্কিম মেহের-উন্নিসার 'নূরজাঁহা'-জীবনের পরিচয় দেননি। (দ্রঃ নূরজাঁহা বেগম।)

মেহেরজান (রাজঃ ৩/৮)। এই ছদ্মনামে নর্তকীবেশে রূপনগরের মোগল সেনাপতিকে মুগ্ধ ক'রে দরিয়া বিবি মোগল সৈন্যমধ্যে স্থানলাভ করেছিল।

যমুনা দিদি (ইন্দিরা ২১ পরিঃ)। ইন্দিরার স্বামীর সঙ্গে রসিকতা করতে এসেছিলেন।

যশোবন্ত সিংহ (দুর্গেঃ ১/৪; রাজঃ ১/১)। ইনি যোধপুরের রাজা। প্রথমে ইনি ঔরঙ্গজেবের সহায়তা ক'রে অনুগ্রহভাজন হন এবং সেনাপতিত্ব লাভ করেন। অবশ্য, পরে ইনি ঔরঙ্গজেবের বিরোধিতা করেন। "রাজসিংহ" উপন্যাসে এঁর চিত্রের উল্লেখ আছে।

"দুর্গেশনন্দিনী"-তে যশোবন্ত সিংহের ভূমিকা এইটুকুমাত্র—রাজা মানসিংহ মাত্র দশ সহস্র সৈন্য নিয়ে কোন্ বীর কত্‌লু খাঁর বিদ্রোহ দমন করতে পারবে জিজ্ঞাসা করলে সকলে নীরব রইল। "পরিশেষে রাজার প্রিয়পাত্র যশোবন্তসিংহ নামক রাজপুত যোদ্ধা রাজাদেশ পালন করিতে অনুমতি প্রার্থিত হইলেন।"

এই রাজপুতযোদ্ধা যোধপুরাধিপতি নিশ্চয়ই নন।

যামিনী (কৃঃ উঃ ২/১১)। ভ্রমরের জ্যেষ্ঠা ভগিনী। ভগিনীর দুঃখের দিনে সে তার কাছে ছিল।

যোধপুরী বেগম (রাজঃ ২/৫)। "ঔরঙ্গজেবের প্রধানা মহিষী যোধপুরী বেগম। যোধপুরী বেগম প্রধানা মহিষী হইলেও প্রেয়সী মহিষী ছিলেন না।"

যোধপুরী বেগমের চরিত্রটি অনৈতিহাসিক বলে উল্লেখ করেছেন আচার্য যদুনাথ সরকার। (বঙ্কিম গ্রন্থাবলী: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ সংস্করণ-এর ভূমিকা) যোধপুরের কোন রাজকন্যাকে ঔরঙ্গজেব বিয়ে করেননি। ঔরঙ্গজেবের একমাত্র হিন্দু বেগমের নাম ছিল নবাব-বাঈ। তাও তাঁকে বাদশাহ বিয়ে করেছিলেন ইস্‌লাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করার পর। সরকার আরও বলেছেন—আকবরের পর কোন হিন্দু মহিষীই নবাব-মহলে হিন্দুয়ানী বজায় রাখতে পারতেন না। সুতরাং ঔরঙ্গজেবের মহিষীর পক্ষেও হিন্দুয়ানী বজায় রাখা সম্ভব ছিল না। তবে মানুসীর গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, ঔরঙ্গজেবের অসুস্থতার সময় নিজ পুত্রের সিংহাসনলাভের জন্য নবাব-বাঈ দেব-দেবীর পূজা দেন। এ ঘটনাটিকে ব্যতিক্রম বলেই ধরা যেতে পারে।

যোধপুরী বাঈয়ের চরিত্র-গঠনে ইতিহাসের উপাদানগত ত্রুটি যতই থাক না কেন, উপন্যাসের দিক থেকে চরিত্রটির আবেদন অপরিসীম। ঔরঙ্গজেবের পতন সুরু হয়েছিল

ঘরে-বাইরে। তাই যে হিন্দু নারী স্বামীকে দেবতাজ্ঞানে পুজা করে (সে-স্বামী যেমনই হোন না কেন), সেই হিন্দু নারী যোধপুরী বেগমও ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু কামনা করেছেন। শুধু তাই নয়, ঔরঙ্গজেবের পতনেও তিনি কিছু সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন। তিনি যদি নিজ দাসীকে পাঞ্জা দিয়ে চঞ্চলকুমারীর কাছে না পাঠাতেন, অথবা নির্মলকুমারীকে নবাব-হারেমে সাহায্য না করতেন, তাহলে হয়তো গল্পের গতিপথ পরিবর্তিত হত।

নবাব-হারেমে উদিপুরী এবং জেব-উন্নিসার অত্যাচারে যোধপুরী বেগম বিব্রত। তাই তিনি মনেপ্রাণে কামনা করেন তাদের বিনাশ। এতে নারীসুলভ প্রতিহিংসা-পরায়ণতা দেখা গেলেও, যোধপুরীর চরিত্রটি অনেক স্থানেই ধ্যানমগ্না যোগিনীর মতো মনে হয়েছে। দুঃখের আগুনে যেন তিনি সর্বসংহা হয়ে উঠেছেন।

রঘুবীর মিশ্র (সীতাঃ ৩/২২)। সীতারামের বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণ ও রাজপুত সিপাইদের মধ্যে একজন। শেষ পর্যন্ত এরা যুদ্ধে প্রাণ দেবার সংকল্প গ্রহণ করে।

রঙ্গময়ী (ইন্দিরা ২১ পরিঃ)। একজন রসিকা স্ত্রীলোক।

রঙ্গরাজ (দেবীঃ ১/১২)। রঙ্গরাজের "বলিষ্ঠ গঠন, চৌগোঁপ্পা ও ছাঁটা গালপাট্টা আছে।" চেহারার এই বৈশিষ্ট্য দেখে মনে হয়, রঙ্গরাজ বিহারের লোক। ভবানী পাঠকের সে যোগ্য সহচর। রঙ্গরাজ সাহসী ও বিশ্বস্ত। সর্বোপরি, তার নির্বিচারে দলপতিকে মান্য করার ক্ষমতা আছে। এটি রঙ্গরাজের চরিত্রের ব্যক্তিত্ব-হীনতার পরিচয় নয়, তার সদ্‌গুণ। রঙ্গরাজের উপর ভার পড়েছিল প্রফুল্লর রক্ষণাবেক্ষণের। আবার, প্রফুল্ল দেবী চৌধুরাণীতে পরিণত হলেও রঙ্গরাজ হল তার বিশ্বস্ত অনুচর।

রঙ্গরাজ দেবী চৌধুরাণীকে যথার্থ দেবীর মতোই ভক্তি করত। তাই ব্রজেশ্বর যখন দেবী সম্বন্ধে উক্তি করেছে—"তিনি নাকি যুবতী ?" তখন রঙ্গরাজ বলেছে—"তিনি আমাদের মা—সন্তানে মার বয়সের হিসাব রাখে না।

ব্র। শুনিয়াছি বড় রূপবতী।

রঙ্গ। আমাদের মা ভগবতীর তুল্য।" (২/৪)

দেবীকে রঙ্গরাজ যথার্থ মায়ের মতোই ভালবাসত। তাই দেবী যখন একাকী বজরায় ধরা দেবার জন্য প্রস্তুত, তখন রঙ্গরাজ মাকে বাঁচাবার জন্য সিপাহী নিয়ে এসেছে।

রঙ্গরাজের বিশ্বস্ততা ও আদেশ মান্য করার ক্ষমতা, তার চরিত্রের সর্বাপেক্ষা বড় গুণ।

রজনী (রজনী ১/১)। রজনীর চোখের সামনে রাত্রির অন্ধকার ছায়া মেলেছিল সত্য, কিন্তু সেই অন্ধকারের মধ্যে তার হৃদয়ে প্রেমের যে আলোকবর্তিকা জ্বলে উঠেছে,

তাতে তার চরিত্রটি উজ্জ্বল হয়েছে। লর্ড লিটনের "Last Day of Pompeii" উপন্যাসের কানা ফুলওয়ালী নিদিয়ার কাছে রজনীর ঋণের কথা বঙ্কিম স্বীকার ক'রে সমালোচকদের সাদৃশ্যদর্শনের পাণ্ডিত্যের অহমিকাকে নিবৃত্ত করেছেন। কিন্তু স্বীকার করতেই হবে—অন্ধত্ব এবং ফুলওয়ালীর বৃত্তি ছাড়া উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য খুবই কম। নিদিয়ার ভালবাসা এবং রজনীর ভালবাসার মধ্যে পার্থক্য অনেক।

রজনী ফুলওয়ালী হলেও, বঙ্কিম সর্বদাই তাকে মর্যাদা দান করেছেন। সাধারণ পসারিণীর মতো সে পথে পথে ফুল বিক্রি করে না। পিতামাতাকে মালা গেঁথে সাহায্য করে মাত্র। তবে দু-একটি ভদ্রগৃহে ফুল যোগান দিতে তার যাতায়াত আছে। তা নাহলে তো শচীন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার অসুবিধা।

রজনীর হৃদয়ে শচীন্দ্রের প্রতি অনুরাগের সঞ্চারণটি বড় অদ্ভুত। স্পর্শ এবং শব্দই রজনীর ভালবাসার উপকরণ। ফুলের স্পর্শে সে আজীবন অনুভব করেছে ভালবাসার কোমলতা। শচীন্দ্রের স্পর্শে সে খুঁজে পেল সেই ফুলের পেলবতা। তার হৃদয়ে জন্ম হল প্রেমের। কান দিয়ে শুনেছে সে এই আশ্চর্য পৃথিবীর পরিচয়, শচীন্দ্রের কণ্ঠস্বর তাকে আকর্ষণ করেছে। রজনীর প্রেমের তীব্রতা ও একাগ্রতা যথেষ্ট। শচীন্দ্রকে দুর্লভ জেনেও, সে মনে মনে তাকেই স্বামী বলে গ্রহণ করতে দ্বিধা করেনি। হয়তো অন্ধ বলেই শচীন্দ্রের ঐশ্বর্য এবং তার দারিদ্র্য, ভালবাসার আঙিনায় দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর তুলে দিতে পারেনি।

রজনীর সাহসও অসীম। শচীন্দ্রকে ভালবাসার মূল্য দিয়েছে সে গৃহত্যাগ ক'রে। একে নারী, তায় অন্ধ—তার পক্ষে অপরিচিত লোকের সঙ্গে গৃহত্যাগ করা যে কত বড় সাহসের পরিচয়, তা সহজেই অনুমেয়। রজনী শক্তির পরীক্ষা দিয়েছে হীরালালের লাঠি ভেঙে এবং সেই ভগ্নাংশ দিয়ে তাকে আঘাত হেনে।

রজনীর কৃতজ্ঞতাবোধ প্রবল। অমরনাথ তার বিষয় উদ্ধার ক'রে যতটা না হোক, তাকে দুষ্টের হাত থেকে উদ্ধার ক'রে রজনীর হৃদয়ে কৃতজ্ঞতার আসন পেতে বসেছিল। সে কৃতজ্ঞতাবোধ এত প্রবল যে, ভালবাসার পাত্রকেও দূরে সরিয়ে দিয়ে রজনী অমরনাথের কথামতো তাকে বিবাহ করতে রাজী হয়। দরিদ্রাবস্থায় সাহায্যের জন্য লবঙ্গলতা ও শচীন্দ্রের প্রতিও রজনী কৃতজ্ঞতা দেখিয়েছে, বিষয়সম্পত্তি গ্রহণে শৈথিল্য দেখিয়ে। রজনী শেষ পর্যন্ত অমরনাথকে ভোলেনি। অমরনাথের ত্যাগ ও মহানুভবতাকে সে আজীবন বাঁচিয়ে রেখেছে, পুত্রের অমরপ্রসাদ নামকরণের মধ্যে।

অন্ধের কাছে ঐশ্বর্য ও দারিদ্র্য সমতুল্য। তবুও রজনী যেভাবে বিষয়ভোগে অনাসক্তি দেখিয়েছে, তাতে তার নিরাসক্ত মনোবৃত্তিরই পরিচয় পাওয়া যায়।

রজনী চরিত্র সর্বাপেক্ষা সুপরিস্ফুট হয়েছে প্রথম খণ্ডে 'রজনীর কথা'র মধ্য দিয়ে। অন্ধের অনুভব, তার বিশ্লেষণের ক্ষমতা ও চিন্তার সুস্পষ্ট পরিচয় এতে পাওয়া যায়। প্রেমের ক্ষেত্রে যে রূপের মূল্য নিতান্তই নগণ্য, রজনী তা প্রমাণ করেছে।

রজনীর জীবন আগাগোড়াই দ্বন্দ্বসংকুল। শচীন্দ্রকে ভালবেসে তার হৃদয়ে দ্বন্দ্বের শেষ নেই। এই দ্বন্দ্বেরই পরিণাম তার গৃহত্যাগ। কিন্তু শেষাংশে একদিকে শচীন্দ্রের প্রতি ভালবাসা, অন্যদিকে অমরনাথের প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতাবোধে রজনী চরিত্রকে দ্বন্দ্বমুখর ক'রে তুলেছে। অমরনাথের স্বার্থত্যাগের সমাধান না করলে, রজনীর জীবনে ট্র্যাজেডী দেখা দিত। রজনী সরলস্বভাবও বটে। তাই সে অমরনাথের কাছে নিঃসংকোচে প্রণয়ের কথা স্বীকার ক'রে অমরনাথের সংশয় দূর করেছে।

নিদিয়ার জীবন শেষ হয়েছিল ব্যর্থ প্রেমে। কিন্তু রজনীর জীবনে এসেছে মিলনের মহালগ্ন। রজনীর অন্ধত্ব-বিমোচন যতই অবাস্তব হোক না কেন, তার অন্তর্লোকে যে আলোক সঞ্চারিত হয়েছে, চক্ষে আলোকের সঞ্চারকে তার রূপক বলে মেনে নিতে কোন বাধা নেই।

রতিপতি (রজনী ১/২)। দ্রঃ কন্দর্প।

রত্নদাস বণিক (মৃণাঃ ৪/১১)। মৃণালিনীর সঙ্গে "সাক্ষাতের জন্য হেমচন্দ্র মথুরায় এক দোকান করিয়া আপনি তথায় রত্নদাস বণিক বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন।"

রত্নময়ী (মৃণাঃ ৩/১)। রত্নময়ী এক পাটনীর কন্যা। নবদ্বীপে এদের গৃহেই গিরিজায়া এবং মৃণালিনী আশ্রয় গ্রহণ করে। তখন বিশেষভাবে গিরিজায়ার সঙ্গেই রত্নময়ীর সখীত্ব জন্মে। রত্নময়ীর কথাবার্তায় বেশ রসের পরিচয় পাওয়া যায়। হেমচন্দ্রের নতুন রাজ্যেও রত্নময়ী স্থান পেয়েছিল। এক সম্পন্ন পাটনীকে বিয়ে ক'রে সেখানেও গিরিজায়ার সঙ্গে সখীভাবে দিন কাটাতে লাগল।

রমণবাবু (ইন্দিরা ৭ম পরিঃ)। সুভাষিণীর স্বামী রমণবাবু উকিল। উকিলের মতোই তিনি কৌশলের সঙ্গে মিলিত করেছেন ইন্দিরা ও উপেন্দ্রকে। উকিলের মতোই তিনি সীল-করা কাগজে ইন্দিরার সব কথা লিখে দিয়েছিলেন যথাসময়ে খোলবার জন্য; কারণ, তাতে সকলের বিশ্বাস জন্মাবে। রমণবাবু স্ত্রীকে পরামর্শ দেন এবং স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করেন। স্ত্রীর মতো স্বামীও কম রসিক নন।

রমা (সীতাঃ ১/৮)। সীতারামের কনিষ্ঠা স্ত্রী রমা দুর্বলচিত্ত এবং বাতিকগ্রস্ত হলেও, তার চরিত্রমাধুর্যও নিতান্ত কম নয়। রমাও সুন্দরী। তার রূপের মধ্যেও যেমন একটা কোমলতা আছে, তেমনি "জলে ধোয়া যুঁইফুলের মত বড় কোমলপ্রকৃতি।"

তার বয়সও নিতান্ত অল্প। এই সংসার-অনভিজ্ঞতা ও বালিকাসুলভ মনোবৃত্তির জন্যই রমার সর্বনাশ হয়েছে।

রমার সঙ্গে "দেবী চৌধুরাণী" উপন্যাসের সাগরবৌয়ের তুলনা করা চলে। কিন্তু সাগরবৌ বালিকা ও চপলা হলেও, স্বামীর প্রতি নিষ্ঠা বর্তমান রেখে সে নিজের খেয়ালেই চলেছে। রমা কিন্তু স্বামীর উপর আস্থা রাখতে না পেরে স্বামীর অনুপস্থিতিতে গঙ্গারামকে ডেকে নিয়ে গিয়ে নিজের সর্বনাশ করেছে।

রমার সীতারামের প্রতি ভয়ের কারণ তার শক্তিমত্তা। কিন্তু তার চেয়েও বড় কারণ সে মা। তার পুত্রের মঙ্গলকামনাই তাকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলেছে।

গঙ্গারামের সঙ্গে গোপনে কথাবার্তায় যে কোন অপরাধ আছে, এ-কথা রমার মনে উদয়ই হয়নি। কিন্তু মুরলার কথায় যখন সে নিজের অপরাধ বুঝতে পেরেছে, তখন সে আঘাতে ম্রিয়মাণ হয়েছে।

এই আঘাতের ফলেই রমার মধ্যে জেগে উঠেছে পৌরুষের ভাব। সে রাজসভার মধ্যে দাঁড়িয়ে নিজের কথা বলতে ভয় পায়নি। রমার যে গঙ্গারামের প্রতি কোন আসক্তিই ছিল না, এমনকি গঙ্গারামকে সে ভ্রাতা সম্বোধনই করেছে, এ সত্য বঙ্কিম স্পষ্টভাবেই দেখিয়ে দিয়েছেন। তাই যখন এই নিরপরাধিনী নারীকে রাজসভায় দাঁড়াতে দেখি, তখন সীতার অপমানের মতোই আমাদের হৃদয় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে।

রমা জনসাধারণের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলেও, স্বামীর কাছে অপরাধ স্বীকার করবার কোন সুযোগই পায়নি। সীতারাম তখন শ্রীর জন্য উন্মাদ। এখানে স্বামীর প্রতি রমার সূক্ষ্ম অভিমানও প্রকাশ পেয়েছে। তাই ঔষধপত্র ফেলে দিয়ে রমা আত্মহত্যার পথ প্রস্তুত করেছে।

রমার চরিত্রে মাতৃত্ব এবং স্বামীভক্তি দুটিই শেষ পর্যন্ত প্রাধান্য লাভ করেছে। তাই মৃত্যুকালে সে যেমন স্বামীকে অনুরোধ করেছে—"মার দোষে ছেলেকে ত্যাগ করিও না। এই তোমার কাছে আমার শেষ ভিক্ষা।" তেমনি সীতারামকে বলেছে—"এ জন্মের মত বিদায় হইলাম। আশীর্ব্বাদ করিও জন্মান্তরে যেন তোমাকেই পাই।"

রম্ভা (রাজ: ২/৩)। একজন অপ্সরী।

রহমত মোল্লা (বিষ: ১ম পরি:)। "বিষবৃক্ষ" উপন্যাসের প্রথমে নগেন্দ্রের নৌকাপথে কলকাতা যাত্রার কালে রহমত মোল্লা ছিল মাঝি। এই অনভিজ্ঞ মাঝির বাগাড়ম্বর চরিত্রটিকে অল্প অবকাশেই জীবন্ত ক'রে তুলেছে।

রহিম সেখ (দুর্গে: ১/১৮)। কত্লু খাঁর সেনাবাহিনীর একজন সৈনিক। ওসমান রাত্রির অন্ধকারে যখন গড়-মান্দারণ দুর্গ অধিকার করার জন্য বিমলার হাত

থেকে দুর্গের চাবি গ্রহণ করলেন, তখন ছাদে বন্দিনী বিমলাকে লক্ষ্য রাখার জন্ত এই রহিম সেখকে ভার দিয়ে যান। কিন্তু রহিম সেখ বিমলার কটাক্ষে বিভ্রান্ত হয়ে অবশেষে তাকে মুক্ত হতে সাহায্য করেছে। এই উপন্যাসে রহিম সেখের সাহসিকতা অপেক্ষা বোকামিই বেশী প্রকাশিত হয়েছে।

রাজচন্দ্র দাস (রজনী ২/২)। রাজচন্দ্র দাস রজনীর মেসো। তিনি রজনীকে বাল্যকাল থেকে পিতার ন্যায় প্রতিপালন করেন। রাজচন্দ্রের রজনীর প্রতি যথার্থ পিতৃস্নেহ ছিল। তবে শেষের দিকে তাঁকে কিঞ্চিৎ অর্থলোভাতুররূপে অঙ্কন করা হয়েছে।

রাজসিংহ (রাজঃ ১/২)। রাজসিংহ ঐতিহাসিক চরিত্র। তাঁর নামানুসারেই গ্রন্থের নামকরণ। কিন্তু তিনি যে নায়ক বলেই তাঁর নামে গ্রন্থের নামকরণ করা হয়েছে তা নয়, বঙ্কিমের প্রতিপাদ্য বিষয় যে হিন্দুর বাহুবলের প্রতিষ্ঠা তা রাজসিংহকে কেন্দ্র ক'রেই প্রকাশিত বলে, আদর্শ হিসাবে তাঁর নামানুসারেই গ্রন্থের নামকরণ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ রাজসিংহকে এককভাবে নায়ক বলতে রাজী হননি। তাঁর মতে— "ঐতিহাসিক অংশের নায়ক ঔরঙ্গজেব, রাজসিংহ এবং বিধাতাপুরুষ।" এ-কথা সত্য যে, "রাজসিংহ" উপন্যাসে কাহিনীর ঘনঘটায় কখন কখন রাজসিংহকে গৌণ বলে মনে হয়েছে। কিন্তু বঙ্কিম সমস্ত ঘটনার কেন্দ্রে রাজসিংহের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

রাজসিংহ রাজপুত বীর। তাঁর চরিত্রে বীরত্ব, মহত্ত্ব এবং রণকৌশলের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। এগুলি তাঁর ইতিহাস-সম্মত গুণাবলী। তিনি দেশপ্রেমিক। পরাধীনতার প্রতি তাঁর স্বাভাবিক ঘৃণা। কিন্তু এ-সবের চেয়ে বঙ্কিম যেখানে স্বীয় কল্পনা দ্বারা রাজসিংহের চরিত্রে নূতন ঘটনার সংযোগসাধন করেছেন, সেখানেই চরিত্রটি সজীব হয়ে উঠেছে।

চঞ্চলকুমারীর বিপদে রাজসিংহের রূপনগর যাত্রার পিছনে তাঁর বীরত্বের অভিমান, শরণাগতের প্রতি কর্তব্যপালন প্রভৃতি মনোভাব রয়েছে। বয়সে তিনি প্রৌঢ়। তাই নূতন নারীর প্রতি আকর্ষণ তাঁর পক্ষে অনিবার্য নয়। কিন্তু মবারকের সামনে দাঁড়িয়ে যখন তিনি চঞ্চলকুমারীর অলৌকিক রূপ দর্শন করলেন, তখন সৌন্দর্যের কাছে তাঁকে মাথা নত করতে হল।

তারপর রাজসিংহের হৃদয়ে ধীরে ধীরে চঞ্চলকুমারীর স্মৃতি জাগরুক হলেও, রাজোচিত মহিমায় এবং বয়সোচিত গাম্ভীর্যে তিনি তা দমন করেছেন। চঞ্চলকুমারীর মন পরীক্ষা তাঁর বিচক্ষণতারই পরিচয় দেয়। চঞ্চলকুমারীর পিতার অমতে বিবাহ

করতে সম্মত না হওয়ায় অনেকে হয়তো রাজসিংহকে কাপুরুষ বলে মনে করতে পারেন। কিন্তু গভীরভাবে বিচার করলে দেখা যাবে, রাজসিংহ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন, তা ব্যক্তিগতভাবে ও রাজনৈতিক দিক থেকে সঙ্গত। তখনি চঞ্চলকে বিবাহ করলে তার পক্ষে পিতামাতার অভিশাপ যেমন সুখকর হত না, তেমনি বিক্রমসেলাঙ্কির বিরুদ্ধতার দ্বারা ঘরে-বাইরে শত্রু সৃষ্টি করাও সমীচীন হত না।

চঞ্চলকুমারী ও রাজসিংহের মিলনে যে রোমান্সের গন্ধ ছিল, বঙ্কিম তা সমূলে বিনাশ ক'রে ভালোই করেছেন। প্রৌঢ় রাজসিংহের প্রেমে চাপল্য দেখালে তাঁর চরিত্র-মহিমা ক্ষুণ্ণ হত। চঞ্চলকুমারী সংক্রান্ত ঘটনা ছাড়া রাজসিংহের সাংসারিক জীবনের আর কোন উল্লেখ না থাকায়, চরিত্রটি আংশিক প্রকাশিত বলে মনে হতে পারে। কিন্তু তা করতে গেলে ঘটনার ঐতিহাসিক তৎপরতা বিনষ্ট হয়ে যেত।

রাজসিংহের অন্যান্য গুণের মধ্যে দয়ার্দ্রচিত্ততা ও কৃতজ্ঞতাবোধ অন্যতম। ডাকাত মাণিকলালকে তিনি যেমন দয়াপরবশ হয়ে রক্ষা করেছেন, তেমনি তার কার্যে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে উপযুক্ত মর্যাদা দানও করেছেন। মবারকের কার্যে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে জেব-উন্নিসাদান তাঁর সম্মতিক্রমেই সম্ভব হয়েছিল।

যুদ্ধে ছলে-বলে শত্রুকে পরাস্ত করা নীতি হলেও, হিন্দুর নীতি একটু স্বতন্ত্র। তাই পারিষদদের বিরোধিতা সত্ত্বেও ক্ষুধার্ত ঔরঙ্গজেব ও তাঁর সৈন্যদের মুক্তি দিতে তিনি দ্বিধা করেননি।

ঔরঙ্গজেবের পাশে রাজসিংহ চরিত্রবলে হিমালয়ের মতোই মহান ও গগনস্পর্শী।

রাজা ঔশীনর (সীতাঃ ১/৪)। চন্দ্রবংশীয় রাজা। এঁর পুত্রের নাম শিবি। ইনি নানা যজ্ঞ ক'রে ইন্দ্রের চেয়েও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন। মহাভারতে এঁর সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে। একদা ইন্দ্র ও অগ্নি এঁর ধর্মবল পরীক্ষা করবার জন্য কপোত ও শ্যেনপক্ষীর ছদ্মবেশ ধারণ করেন। শ্যেনের তাড়া খেয়ে কপোত রাজার কোলে এসে বসলে, রাজা নিজের মাংস দিয়ে শ্যেনের ক্ষুধা মেটাতে চান। কিন্তু কপোতের সমান মাংস ওজন করতে গিয়ে রাজাকে পুরোপুরি দাঁড়িপাল্লার একদিকে দাঁড়াতে হয়। তখন ইন্দ্র ও অগ্নি সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করেন যে, তাঁর কীর্তি জগতে অক্ষয় হয়ে থাকবে। উপন্যাসে নামোল্লেখমাত্র আছে।

রাজা মদনদেব (যুগঃ ৬ষ্ঠ পরিঃ)। "রাজা পরম ধার্মিক এবং জিতেন্দ্রিয় বলিয়া খ্যাত। তাঁহার প্রতাপে কোন রাজপুরুষও কোন স্ত্রীলোকের উপর কোন অত্যাচার করিতে পারে না।" মদনদেব যেভাবে হিরণ্ময়ী-পুরন্দরের মিলনে সাহায্য করেছেন, তাতে তাঁকে স্নেহশীল বলে মনে হয়।

রাধারাণী (রাধাঃ ১ম পরিঃ)। "রাধারাণী" কাহিনীর নায়িকা। মধুর গল্পটিতে মধুর রসের যোগান দিয়েছে এই কোমল-মধুর চরিত্রটি। বালিকা রাধারাণীর সারল্য ও কথোপকথনের ভঙ্গী আমাদের মুগ্ধ করে। রাধারাণী শিক্ষিতা ও সুন্দরী। তথাপি তার বাল্য-কৃতজ্ঞতা থেকে জন্ম যে প্রেমের, সেই অবুঝ প্রণয়-প্রতীক্ষার বৈরাগ্য আমাদের মনে তার রূপটিকে শুচিশুভ্র ক'রে তোলে। রুক্মিণীকুমারের সঙ্গে মিলনে রাধারাণীর আবেগোচ্ছল কথোপকথন তার মার্জিত রুচি ও অনুরাগের গভীরতার পরিচয় বহন করে।

রাধারাণীর চরিত্রটি যেভাবে অঙ্কন করা হয়েছে, তাতে সাধারণভাবে তার বাস্তব-গ্রাহীতা সম্বন্ধে সন্দেহ থেকে যায়। একজন বালিকার পক্ষে রথের মেলায় বিপদের মুখ থেকে রক্ষাকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ কতদিন হৃদয়ে জাগরুক থাকতে পারে, তা ভাববার বিষয়। তবুও এ-কথা স্বীকার করতে হয়, প্রেমের ব্যাপারে যতই অঘটন সম্ভব হয়, ততই তা মনোরম হয়ে ওঠে। রাধারাণীর মাধুর্যও সেইখানে।

রাণা অমরসিংহ (রাজঃ ১/২)। মেবারের রাণা প্রতাপসিংহের পুত্র। চঞ্চল-কুমারী কর্তৃক তাঁর চিত্রদর্শনের ইঙ্গিত আছে।

রাণা কর্ণ (রাজঃ ১/২)। এই রাজপুত রাণার চিত্রের উল্লেখ আছে।

রাণা প্রতাপ (রাজঃ ১/২)। মেবারের বিখ্যাত রাণা। তিনি আকবরের কাছ থেকে তাঁর রাজধানী চিতোর উদ্ধারের জন্য দৃঢ়সংকল্প করেন। আকবরের জ্যেষ্ঠপুত্র সেলিম এবং মানসিংহের সঙ্গে ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে হলদিঘাটের যুদ্ধে তাঁর বীরত্ব ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। ১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

রামকান্ত রায় (কৃঃ উঃ ১/১)। গোবিন্দলালের পিতা। উপন্যাসে নামোল্লেখ-মাত্র আছে।

রামকৃষ্ণ রায় (বিষঃ ৩৫ পরিঃ)। ইনি বৈদ্য। সূর্যমুখীর রোগ ইনিই সারান। ইনি অর্থপিশাচ ছিলেন না। নগেন্দ্রকে ইনি সংবাদ দেন যে, সূর্যমুখী বদ্ধগৃহে পুড়ে মরেছে।

রামগোবিন্দ ঘোষাল (কপাঃ ১/৮)। পদ্মাবতীর পিতার নাম রামগোবিন্দ ঘোষাল। পুরুষোত্তম দর্শনে গিয়ে তিনি পাঠানগণ কর্তৃক বন্দী হন এবং পরে ধর্মান্তরিত হন। ধর্মান্তরের পর স্ব-সমাজে চ্যুত হওয়ায়, তিনি ঢাকায় গিয়ে রাজকার্যে নিযুক্ত হন। তারপর বাদশাহের অনুগ্রহলাভের আশায় আগ্রায় যান। সেখানে নিজগুণে বাদশাহের প্রধান ওমরাহদের মধ্যে স্থানলাভ করেন। ধর্মান্তরগ্রহণের পরও কিন্তু আচার-আচরণের দিক থেকে তিনি শুদ্ধ ছিলেন বলে মনে হয়। তাই কন্যার

চরিত্র-দোষ দেখা দিলে, তিনি কন্যাকে পরিত্যাগ করেন। তাছাড়া—"রামগোবিন্দ কিছু উগ্রস্বভাব।"

রামগোবিন্দ ঘোষালের চরিত্রটি বর্ণনার মাধ্যমে ঘটনাসূত্র নিধারণের জন্যই আনা হয়েছে।

রামচরণ (চন্দ্রঃ ২/৫)। রামচরণ প্রতাপের ভৃত্য। এই চরিত্রটিকে অবলম্বন ক'রে হাস্যরসের অবতারণা করা হয়েছে। সে ব্রহ্মচারী চন্দ্রশেখরের সঙ্গে দুজন নারীকে দেখে চিন্তান্বিত হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে ঠিক করেছে, চন্দ্রশেখর তাঁদের সহমরণে প্রবৃত্তি দেবার জন্যই নিয়ে এসেছেন। এই চিন্তা হাস্যরসের খোরাক জুগিয়েছে। প্রতাপের শৈবলিনী-উদ্ধারকার্যে রামচরণ বন্দুকের সাহায্যে বীরত্ব প্রদর্শন করেছে। বহু স্থানে রামচরণের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। বিপদের দিনেও প্রতাপের সঙ্গে থেকে রামচরণ যথার্থ প্রভুভক্তির পরিচয় দিয়েছে। নিতান্ত সাধারণ চরিত্র হলেও রামচরণ পাঠকের হৃদয় জয় ক'রে নিয়েছে।

রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদ (সীতাঃ ৩/৯)। মহম্মদপুরের দুজন সাধারণ নাগরিক। তাদের কথাবার্তায় উপন্যাসের অনেক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

রামরাম দত্ত (ইন্দিরা ৬ষ্ঠ পরিঃ)। সুভাষিণীর শ্বশুর। ভদ্রলোকের যেটুকু পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে তাঁকে বেশ রসিক বলেই মনে হয়।

রামসদয় মিত্র (রজনী ১/২)। উপন্যাসমধ্যে বৃদ্ধ রামসদয় মিত্র তাঁর তরুণী ভার্যা লবঙ্গলতার কৌতুকপ্রবণতায় বিপর্যস্ত। কিন্তু তিনি যেভাবে পিতার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে নিজ চেষ্টায় কলকাতায় বিষয়সম্পত্তি করেছিলেন, তাতে তাঁকে কর্মযোগী পুরুষ বলেই মনে হয়। রজনীকে সম্পত্তি দিতে তাঁর অনিচ্ছা। তাই তিনি পুত্রের সঙ্গে রজনীর বিয়ে দিতে উৎসুক।

রামানন্দ স্বামী (চন্দ্রঃ ২/৩)। বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন উপন্যাসে যে সমস্ত সন্ন্যাসী বা সিদ্ধপুরুষ আছেন, "চন্দ্রশেখর" উপন্যাসের রামানন্দ স্বামী তাঁদের মধ্যে অন্যতম। "রামানন্দ স্বামী সিদ্ধপুরুষ। তিনি অদ্বিতীয় জ্ঞানী বটে। প্রবাদ ছিল যে, ভারতবর্ষের লুপ্ত দর্শন বিজ্ঞান সকলই তিনি জানিতেন।" চন্দ্রশেখরের গুরু হিসাবে তিনি চন্দ্রশেখরকে অনেক তত্ত্বজ্ঞান দান করেছেন। এর কি কোন প্রয়োজন ছিল? হয়তো শৈবলিনীহারা চন্দ্রশেখরকে সান্ত্বনাদান বা পথপ্রদর্শনের জন্য বঙ্কিম রামানন্দ স্বামীর এই দীর্ঘ বক্তৃতার অবতারণা করেছেন।

দলনী ও শৈবলিনীর সাহায্যের জন্য বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপে রামানন্দ স্বামীর হস্তক্ষেপ আছে। তবে শৈবলিনীর চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজনেই রামানন্দকে বিশেষভাবে আনা হয়েছে

বলে মনে হয়। রামানন্দ শৈবলিনীকে চিত্তশুদ্ধির জন্য দ্বাদশ বছর ব্রতপালনের নির্দেশ দিয়েছেন। এ পর্যন্ত যুক্তিশীল মন গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু তারপর রামানন্দ যখন চন্দ্রশেখরের কাছে শৈবলিনীর মনের কথা প্রকাশের জন্য 'যোগবল' দান করেছেন, তখন চরিত্রটি অলৌকিকতার স্তর স্পর্শ করেছে। অবশ্য, অনেকে এই যোগবলের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু উপন্যাসের দিক থেকে এ-সবের খুব বেশী প্রয়োজন ছিল না, যতটা ছিল নীতিবাদী বঙ্কিমচন্দ্রের। তবে চন্দ্রশেখর-শৈবলিনীর একত্র বসবাসের নির্দেশ দান ক'রে রামানন্দ সহজ মানুষের মতোই ব্যবহার করেছেন।

রামানন্দ যে সর্বজ্ঞ নন, তাঁরও যে মানব-জীবন সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা আছে, তা বঙ্কিম প্রকাশ করেছেন—"রামানন্দ স্বামী মনে মনে ভাবিলেন, "আমি এতকাল সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলাম, সর্ব্বপ্রকার মনুষ্যের সহিত আলাপ করিলাম, কিন্তু সকলই বৃথা! এই বালিকার মনের কথা বুঝিতে পারিলাম না! এ সমুদ্রের কি তল নাই?" (৬/১) এর দ্বারা এই চরিত্রটি কিছুটা রক্তমাংসের মানুষ হয়ে উঠেছে।

সবশেষে প্রতাপের নিঃস্বার্থ মহৎ আত্মত্যাগের জন্য এই মহাপুরুষের শ্রদ্ধাবনত চিত্তের বাণী রামানন্দ স্বামীর চরিত্রকে উজ্জ্বল ক'রে তুলেছে।

রাসবিহারী দে (কৃঃ উঃ ২/৬)। নিশাকর দাস প্রসাদপুরে গিয়ে গোবিন্দলালের নিকট এই ছদ্মনাম প্রয়োগ করেন।

রুক্মিণীকুমার রায় (রাধাঃ ১ম পরিঃ)। রাধারাণীর কাছ থেকে রথের মেলায় ফুল কিনে ও অন্যান্যভাবে সাহায্য করেছিলেন রুক্মিণীকুমার রায়। এঁর প্রকৃত নাম রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়। ইনি দয়ালু সন্দেহ নাই, কিন্তু রাধারাণীর প্রতি দয়া কেবলমাত্র দুঃখীর প্রতি কৃপা নয়, অনুরাগের রাগেও রঞ্জিত। অন্ধকারের কণ্ঠস্বর ও স্পর্শ কত সুন্দর হয় জানি না, কিন্তু রুক্মিণীকুমারের কাছে সেই স্মৃতি যে অনির্বাণ ছিল, তাতে তাঁর একাগ্রতার পরিচয়ে আমরা মুগ্ধ হই। যুবতী রাধারাণীর সঙ্গে কথোপকথনে তাঁর সুরুচি, ভদ্রতাবোধ ও মার্জিত মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি রাধারাণীর যোগ্য স্বামী।

রূপসী (চন্দ্রঃ ২/৪)। সুন্দরীর ভগিনী এবং প্রতাপের স্ত্রী রূপসী "চন্দ্রশেখর" উপন্যাসের উপেক্ষিতা চরিত্র। এই চরিত্রটি আরও বিস্তারিত হতে পারত, কিন্তু কাহিনীর জটিলতা আরও বৃদ্ধি পাবার আশঙ্কায় বঙ্কিম তাকে তত গুরুত্ব দেননি। সুন্দরীর সঙ্গে শৈবলিনী সম্বন্ধে কথোপকথনের সামান্য পরিস্থিতিতে তার উপস্থিতি। সে দিদিকে বলেছে—"দিদি, তুই বড় কুঁদুলী।" ফলে, এর বিপরীত চরিত্র হিসাবে—সহজ সরল, গ্রাম্য, পতিপরায়ণ স্ত্রীরূপেই রূপসীর ছবি আমাদের কল্পনা ক'রে নিতে হয়।

রূপো (কৃ: উ: ২/৬)। প্রসাদপুরে গোবিন্দলালের ভৃত্য। অর্থলোভী।

রেজা খাঁ (আনন্দ: ১/১)। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কালে রাজস্ব আদায়ের কর্তা। তিনি দুর্ভিক্ষের বছরেও শতকরা দশ টাকা রাজস্ব বৃদ্ধি করেন। হান্টারের গ্রন্থে তাঁর রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে নিম্নরূপ উল্লেখ দেখা যায় :—

"It was common at that period to make temporary remissions and advances wherever a harvest proved deficient ; but during 1769-70, although such indulgences were constantly proposed, they were not, except in a very few isolated instances, granted. ......In April a scanty spring harvest was gathered in ; and the council, acting upon the advice of its *Mussulman Minister of Finance*, added ten percent to the land-tax for the ensuing year."

Hunter : *The Annals of Rural Bengal*, Vol. I, Chap. II, P. 23

এই মুসলমান রাজস্ব-আদায়কারী মন্ত্রীই হলেন রেজা খাঁ।

রোহিণী (কৃ: উ: ১/৩)। "কৃষ্ণকান্তের উইলে" কেন্দ্রীয় তথা নায়িকা চরিত্র রোহিণী। রোহিণীই রাহুর মতো এসে গোবিন্দলাল-ভ্রমরের জীবনের সমস্ত সুখ গ্রাস করেছে। রোহিণীই কৃষ্ণকান্তের উইল চুরি করতে গিয়ে কাহিনীর জটিলতা বৃদ্ধি করেছে, বা কাহিনীর সূত্রপাত ঘটিয়েছে।

রোহিণী বিধবা। এইটাই তার অপরাধ। তার রূপ, তার যৌবন সমস্তই বুঝি ব্যর্থ হয়ে যায় ব্রহ্মানন্দের রন্ধনশালায়। রোহিণীর তাই সুখ-শান্তির সংসার ও সমাজের প্রতি বিদ্বেষ থাকা স্বাভাবিক।

রোহিণীকে প্রথম লোভ দেখায় হরলাল অর্থের লোভে সে ভোলেনি, হরলালের বিধবা বিবাহের প্রতিজ্ঞা রোহিণীকে আশান্বিত ক'রে তুলেছিল। রোহিণীর উইল-চুরিও সেই আশার বলে। কিন্তু সেই আশায় আঘাত হেনে হরলাল রোহিণীর সুপ্ত বহ্নিজ্বালাকে তীব্রতর করেছে।

রোহিণীর যৌবন সর্বদাই প্রস্ফুটিত ফুলের মতো, ভ্রমরের আশায় উন্মুখ। বারুণী পুষ্করিণীতে তাই সুপুরুষ গোবিন্দলালকে দেখে তার মনে রূপোন্মাদনা জাগাই স্বাভাবিক। যেহেতু রোহিণী নারী, তাই ভালবাসার পাত্রের সঙ্গ কামনাও মনের মধ্যে জেগে ওঠে। জাল উইল বদলাতে যাওয়ার পিছনে গোবিন্দলালের প্রতি প্রেমেরই এই রূপ লক্ষ্য করি। কিন্তু এই সময় রোহিণী ধরা পড়ায়, ঘটনার গতি দ্রুত মোড় নিয়েছে। গোবিন্দলালের পরোপকারী মনে নিজের প্রেমের জাল বিস্তার করার বহু চেষ্টা করেছে রোহিণী।

রোহিণী ছলনাময়ী নারী। কিন্তু সেই ছলনার জন্য তাকে নীচবৃত্তির স্ত্রীলোকের পর্যায়ে ফেলা যায় না। বিড়ম্বিত জীবনের অভিশাপ, স্বাভাবিক সুখভোগের প্রতি সমাজের বিধিনিষেধ রোহিণীকে ছল-চাতুরীর সাহায্য নিতে বাধ্য করেছে।

তবে রোহিণীর প্রেম, যথার্থ প্রেম হিসাবে কতখানি গ্রাহ্য হতে পারে, সে-বিষয়ে চিন্তা করা দরকার। বারুণী পুষ্করিণীতে রোহিণী যখন ডুবে মরতে গিয়েছিল, তখনো তার প্রেমে সন্দেহ করবার অবকাশ জাগেনি। কিন্তু গ্রামের লোকের কুৎসা-রটনায় যখন সে ভ্রমরকে দায়ী করেছে এবং তার সামনে এসে গোবিন্দলালের দেওয়া বলে গিল্‌টি-করা গয়না দেখিয়েছে, তখনি আর তার প্রেমের মাহাত্ম্যে বিশ্বাস করা যায় না।

গোবিন্দলালের সঙ্গে রোহিণীর প্রসাদপুরে মিলন কেমনভাবে হল, বঙ্কিম তা বর্ণনা করেননি। কিন্তু প্রসাদপুরের যে জীবন তা ভোগবিলাসে পূর্ণ জীবন। লোকালয় থেকে দূরে শান্তির নীড় নয়। রোহিণী আবার নিশাকরের রূপ দেখে যেভাবে আকৃষ্ট হয়েছে, তাতে ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিক মনে হলেও, রোহিণী চরিত্রের গতি তখন যেদিকে চলেছিল সেদিক থেকে এরূপ সম্ভাবনা ছিল যথেষ্ট। রোহিণীর ভোগাকাঙ্ক্ষা তখন প্রবল। তাই গোবিন্দলালের হাতে সে মরতে চায় না। "রোহিণী কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, "মারিও না! মারিও না! আমার নবীন বয়স, নূতন সুখ। আমি আর তোমায় দেখা দিব না, আর তোমার পথে আসিব না। এখনই যাইতেছি। আমায় মারিও না!" (২/৯)

রোহিণীর মৃত্যু-ঘটনাকে উপলক্ষ্য ক'রে অনেকেই বঙ্কিমচন্দ্রকে হত্যাকারীর দায়ে অভিযুক্ত করেছেন। তাঁদের মধ্যে প্রধান শরৎচন্দ্র। শরৎচন্দ্রের মতে, বঙ্কিম নীতির মুখরক্ষা করতে গিয়ে রোহিণীর প্রতি অবিচার করেছেন, উপন্যাসের দিক থেকে রোহিণীর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ছিল না। আজ পর্যন্ত অনেক আলোচনা হয়েছে এই বিষয় নিয়ে। তাই বিস্তারিত আলোচনার মধ্যে না গিয়ে বলা চলে—বঙ্কিম রোহিণীর মৃত্যু হঠাৎ ঘটাননি, প্রথমাবধিই রোহিণী এবং গোবিন্দলালকে এমনভাবে চিত্রিত করেছেন, যাতে ক'রে এ ছাড়া অন্য কোন পরিণাম ভাবা যেত না। ভাবা যায় কি—রোহিণী গোবিন্দলালকে বিবাহ ক'রে সুখে সংসার-জীবন যাপন করছে, ভাবা যেত কি—রোহিণী সন্ন্যাসিনী হয়ে গেছে আর গোবিন্দলাল আবার গৃহে প্রত্যাগমন করেছে!

রোহিণীর জীবনের আরো কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। সে স্নেহশীলা, কর্তব্য-পরায়ণা। পিতৃব্য ব্রহ্মানন্দের বিপদের ভয়ে সে উইলের ব্যাপারটা প্রকাশ্যে জানাতে পারেনি। প্রসাদপুর থেকে সে পিতৃব্যকে অর্থসাহায্যও করেছে। রোহিণীর সাহসও অসীম এবং অসাধারণ বুদ্ধিমত্তারও সে পরিচয় দিয়েছে।

রোহিণীর অনেক গুণই ছিল। কিন্তু সমাজবিধিকে অমান্য ক'রে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির যে আয়োজন রোহিণী করেছিল, তার বিষময় পরিণামস্বরূপে তাকে মৃত্যুবরণ করতে হল।

লচমণি (দুর্গেঃ ১/১০)। বীরেন্দ্রসিংহের অন্তঃপুরের একজন দাসী। তার কাজ বোধ হয় বীরেন্দ্রসিংহের পদসেবা করা।

লরেন্স ফস্টর (চন্দ্রঃ ১/২)। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে লরেন্স ফস্টর খল চরিত্ররূপে অঙ্কিত হয়েছে। বঙ্কিমের কল্পনা বাস্তবানুগ ছিল। শচীশচন্দ্র বঙ্কিমের জীবনীতে যে সব ইংরেজের আলোচনা করেছেন, তার মধ্যে কুখ্যাত মরেল সাহেবকে ফস্টরের কাঠামো বলে অনুমান করলে ভুল হয় না।

"বেদগ্রামের অতি নিকটে পুরন্দরপুর নামক গ্রামে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রেশমের একটি ক্ষুদ্র কুঠি ছিল। লরেন্স ফষ্টর তথাকার ফ্যাকৃটর বা কুঠিয়াল।" (১/৩)।

শৈবলিনীকে অপহরণকালে ফস্টরের দুর্বৃত্তসুলভ মনোভাব ও সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তারপর থেকে বঙ্কিমচন্দ্র ফস্টরকে হীনবল ক'রে কাপুরুষরূপে অঙ্কিত করেছেন। রামচরণের গুলিতে সে আহত হয়েছে। দীর্ঘকাল চিকিৎসায় সে সুস্থ হলেও, তার মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটে। তার চাকুরিও যায়। ক্রমে সে ইংরেজের শত্রুতা করার জন্য নবাব-সৈন্যদলে যোগ দিতে আসে। কিন্তু তার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ হওয়ায় নবাবের রোষদৃষ্টিতে পড়ে। নবাবের শাস্তিদানের কথা শুনে সে ভীরুর মতো আতঙ্কিত হয়। তার চরিত্রে ইংরেজের কোন দৃঢ়তাই নেই। উপন্যাসের শেষদিকে যুদ্ধের কোলাহলে ফস্টর যেমন উপন্যাস থেকে হারিয়ে গেছে, তেমনি উপন্যাসের প্রথমদিকে ফস্টর পাঠকের মনে দাগ কেটে বসলেও, শেষ পর্যন্ত তেমন গুরুত্ব আরোপ করতে পারেনি।

ললিত লবঙ্গলতা (রজনী ১/২)। লবঙ্গলতার বাইরে বিষ, কিন্তু হৃদয়ে অফুরন্ত অমৃত সঞ্চিত। সে মুখরা, কিন্তু হৃদয়হীনা নয়। তাই সে রজনীকে 'কানী' বলে যেমন গালাগাল দেয়, তেমনি ডবল পয়সা দেবার বদলে টাকা দিয়ে সাহায্য করে।

লবঙ্গলতার মধ্যে কৌতুকপ্রবণতা একটু অধিক। তাই প্রথম যৌবনে প্রেমমুগ্ধ অমরনাথকে কৌতুক ক'রে চরম শাস্তি দিয়েছিল পিঠে 'চোর' লিখে দিয়ে। কৌতুক ক'রে তার বৃদ্ধ স্বামীকে জ্বালাতন করতে বাধে না। স্বামীর চুলে কলপ দিয়ে, নাক ডাকলে ছ'জোড়া নুপুরপায়ে ঘুম ভাঙিয়ে তাকে নাস্তানাবুদ ক'রে তোলাই তার স্বভাব, তার আনন্দ।

কিন্তু স্বামীর প্রতি তার কর্তব্যনিষ্ঠার অন্ত নেই। যেহেতু ইহজন্মের মতো স্বামীর সঙ্গে তার গাঁটছড়া বাঁধা হয়েছে, সেজন্য পরপুরুষে তার তীব্র অনাসক্তি। এমনকি

অমরনাথের বেদনায় তার মন যখন আবেগে তার পায়ে লুটিয়ে পড়তে চায়, তখনই সে তীব্র কশাঘাতে নিজেকে সচেতন করেছে—সে একজনের বিবাহিতা স্ত্রী। কিন্তু তবুও সে অমরনাথকে ভুলতে পারেনি।

লবঙ্গলতা মিত্রপরিবারের গৃহিণী। তাই সম্পত্তি নষ্ট হবার আশঙ্কায় শঙ্কিত। সেই সম্পত্তি বাঁচাবার চেষ্টা করেছে পুত্র শচীন্দ্রের সঙ্গে রজনীর বিবাহ দিয়ে। এর জন্য তার রজনীর গৃহে যেতেও বাধেনি।

লবঙ্গলতা রজনীর সঙ্গে অমরনাথের বিবাহ বোধ হয় সহ্য করতে পারত না। তাই অমরনাথের পূর্বকথা বলে দেবে বলে তাকে ভয় দেখিয়েছে। কিন্তু অমরনাথ যখন নিজেই রজনীকে সে-কথা বলবে বলেছে, তখন সে মুগ্ধ হয়েছে। অমরনাথ যখন কলকাতা ত্যাগ করার সংকল্প করেছে, তখন লবঙ্গলতা তাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেছে।

উপন্যাসমধ্যে রজনীর প্রেমিকসত্তা প্রচ্ছন্ন। প্রধানতঃ সে বাঙালী ঘরের বধূ ও গৃহিণী। সর্বোপরি সে মাতা। নিজ পুত্র না থাকলেও, বয়স্ক সপত্নীপুত্র শচীন্দ্রের প্রতি তার স্নেহের অন্ত নাই। এই মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েই লবঙ্গলতা দৃঢ়হস্তে অমরনাথকে প্রত্যাখ্যান করতে পেরেছে।

লায়ল (রজনী ২/৪)। লায়ল (Lyell) ছিলেন ভূতত্ত্ববিদ্। তিনি ডারউইনের সমসাময়িক। তিনি ভূ-পৃষ্ঠের অনেক লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার করেন।

লিটন (রজনীর বিজ্ঞাপন)। এঁর প্রকৃত নাম এড্ওয়ার্ড বুলওয়ার লর্ড লিটন জন্ম ১৮০৩ খ্রীঃ। ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, কবি এবং রাজনীতিজ্ঞ হিসাবে খ্যাত। এঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ষাটেরও বেশী। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু হয়। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর "রজনী" উপন্যাসটি এঁর 'লাস্ট ডেজ অব পম্পেই' নামক গ্রন্থের প্রেরণা অনুসারে রচনা করেন

লুৎফ-উন্নিসা (কপাঃ ২/১)। দ্রঃ মতিবিবি।

লেফ্‌টেনাণ্ট্ ব্রেনান্ (দেবীঃ ৩/১)। ইনি হরবল্লভের সহায়তায় দেবী চৌধুরাণীকে ধরতে এসেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ ইংরেজ চরিত্র বীরত্বে ও সাহসিকতায় অসাধারণ। ইনিও দেবীর সামনে যেমন ভয় পান না, তেমনি দেবীর কাছ থেকে বিদায়কালে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পথখরচাও গ্রহণ করেননি।

শকুন্তলা (দেবীঃ ১/১৫)। কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের কথা বলা হয়েছে।

শচীকান্ত (কৃঃ উঃ ২/৫)। গোবিন্দলালের ভাগিনেয়। সম্ভবতঃ শৈলবতীর পুত্র। সে গোবিন্দলালের শুষ্ক উদ্যান সজীব করেছিল এবং ভ্রমরের স্বর্ণময়ী প্রতিমা নির্মাণ

করেছিল। গোবিন্দলালের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে ও তাঁর সম্পত্তি ফিরিয়ে দেবার প্রস্তাব ক'রে শচীকান্ত মহত্ত্ব দেখিয়েছে।

শচীন্দ্রনাথ (রজনী ১/২)। রজনীর প্রেমিক হিসাবে শচীন্দ্রনাথের গুরুত্ব অধিক। কিন্তু চরিত্র হিসাবে উপন্যাসমধ্যে সে তেমন গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করতে পারেনি। শচীন্দ্রের বিদ্যা-বুদ্ধি-রূপ-ঐশ্বর্য সবই আছে। সে সাধারণ মানুষের মনোবৃত্তি নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছে। রজনীকে তার ভালো লাগতে পারে, কিন্তু ভালবাসার কথা সে চিন্তাই করেনি ; কারণ, সে কানা। তাই রজনীর প্রতি শচীন্দ্রের একটা সহানুভূতি দেখা যায়। রজনীর বিবাহ দেবার চেষ্টাও এই সহানুভূতিরই প্রকাশ।

শচীন্দ্রনাথের মনে সন্ন্যাসীর প্রভাবের দ্বারা যেভাবে রজনীর প্রতি প্রেমের সঞ্চার করা হয়েছে, তাতে এরূপ প্রেমের আন্তরিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। তবে বঙ্কিম প্রথমাবধি শচীন্দ্রের মনে রজনীর প্রতি অনুরাগ সঞ্চারিত ক'রে দিয়েছিলেন। শচীন্দ্র যেই জানতে পারল রজনীই তাকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসে, তখন তার মনে রজনীর প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

শচীন্দ্রের আর একটি গুণ—সে নির্লোভ। রজনীর সম্পত্তি ফিরিয়ে দিতে তাই তার আপত্তি ছিল না। শচীন্দ্রনাথের কৃতজ্ঞতাবোধও কম নাই। অমরনাথের ঋণ সে চিরদিন মনে রেখেছে।

শচীসুত শ্রেষ্ঠী (যুগঃ ১ম পরিঃ)। পুরন্দরের পিতা।

শশিশেখর ভট্টাচার্য (দুর্গেঃ ২/৬)। অভিরাম স্বামীর পূর্বনাম। (দ্রঃ অভিরাম স্বামী।)

শান্তশীল (মৃণাঃ ২/৭)। শান্তশীল নবদ্বীপ রাজদরবারে চৌরোদ্ধরণিকের কাজ করে। কিন্তু আসলে সে পশুপতির সাহায্যকারী গুপ্তচর। পশুপতির সে ডানহাত-স্বরূপ। কাজের উপযুক্ত বুদ্ধি সে ধরে। হেমচন্দ্রের মতো বীরকেও সে কৌশলে বন্দী করে। পশুপতির মধ্যে তবু ধর্ম ও দেশপ্রেম ছিল, কিন্তু শান্তশীল নিতান্তই স্বার্থপর চরিত্র। তাই—"শান্তশীল যখন দেখিল যে, হিন্দুর আর রাজ্য পাইবার সম্ভাবনা নাই, তখন সে আপন চতুরতা ও কর্ম্মদক্ষতা দেখাইয়া যবনদিগের প্রিয়পাত্র হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। হিন্দুদিগের প্রতি অত্যাচার ও বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা শীঘ্রই সে মনস্কাম সিদ্ধ করিয়া অভীষ্ট রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইল।" (মৃণাঃ পরিশিষ্ট)

শান্তি (আনন্দঃ ১/১৬)। "শান্তির অল্প বয়সে, অতি শৈশবে মাতৃবিয়োগ হইয়াছিল। যে সকল উপাদানে শান্তির চরিত্র গঠিত, ইহা তাহার মধ্যে একটি প্রধান।"

শান্তি ছেলেবেলায় পিতার কাছে মানুষ হয়েছে এবং পিতার টোলের ছাত্রদের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলেছে। এমনকি পুরুষদের মতো সে কাপড় পরত। তারপর শান্তির পিতার মৃত্যুর পর, জীবানন্দ তাকে অনুগ্রহপূর্বক বিবাহ ক'রে বাড়ীতে নিয়ে এল। কিন্তু বিবাহের পরও শান্তির পুরুষালি ভাব গেল না। তখন তার ওপর সুরু হল শ্বশুর-শাশুড়ীর নির্যাতন। তার ফলে শান্তি একদিন গৃহত্যাগ করল। সন্ন্যাসীদের সঙ্গে দীর্ঘদিন ঘুরে বেড়িয়ে, বাইরে বিপদের আশঙ্কা দেখে আবার শান্তি শ্বশুরবাড়ীতে প্রত্যাগমন করল। কিন্তু শাশুড়ী তাকে স্থান দিল না। তবে জীবানন্দ শান্তিকে গ্রহণ করল। সেই প্রথম শান্তি অনুভব করল যে, তার "বুক মেয়েমানুষের বুক—বড় নরম জিনিষ।"

এটিকে শান্তি চরিত্রের ভূমিকা বলা যেতে পারে। উপন্যাসটি 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশের সময় বা প্রথম কয়েকটি সংস্করণে এ কৈফিয়ৎ ছিল না। পঞ্চম সংস্করণে বঙ্কিম এটি নূতনভাবে সংযোজিত করেন। এ সম্বন্ধে বঙ্কিম 'পঞ্চমবারের বিজ্ঞাপনে' লেখেন—"তৎ-সম্বন্ধে (শান্তির সম্বন্ধে) যে কথাটা অনুভবে বুঝিবার ভার পাঠকের উপর ছিল, তাহা এবার একটা নূতন পরিচ্ছেদে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দেওয়া গেল।" .

বলা বাহুল্য, উপন্যাসমধ্যে শান্তির যে পুরুষালি কার্যকলাপ দেখানো হয়েছে, তা সাধারণ বাঙালী বধূর চরিত্রে দুর্লভ। তাই বঙ্কিম এই পরিচ্ছেদটি সংযোজিত ক'রে শান্তির চরিত্রবৈশিষ্ট্যটিকে বিশ্বাসযোগ্য ক'রে তুলেছেন।

শান্তির অশ্বারোহণ, শান্তির যুদ্ধক্ষেত্রের আচরণ, তার নবীনানন্দরূপে সন্তানসেনাগণের মধ্যে বিচরণ ইত্যাদি পুরুষোচিত ভাব আছে। তবে প্রথমদিকে শান্তির গাছ থেকে লাফিয়ে পড়া প্রভৃতি ঘটনাকে বঙ্কিম পরবর্তী সংস্করণে বর্জন ক'রে শান্তির স্ত্রী অভিধাকে অনেক পরিমাণে বজায় রেখেছেন।

শান্তির সঙ্গে জীবানন্দের সম্পর্ককে রহস্যময় বলে মনে হতে পারে। প্রথমদিকে যখন জীবানন্দের সঙ্গে শান্তির সাক্ষাতের পূর্বে নিমাই তাকে সাজাতে বসল, তখন তাকে সাধারণ দুঃখী বাঙালী বধূরূপেই দেখি। স্বামীপরিত্যক্তা শান্তি কিন্তু নিমাইয়ের সঙ্গে সহজ রঙ্গরসে মত্ত হয়েছে। তারপর আস্তে আস্তে তার দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া গেল। সে কিছুতেই ঢাকাই শাড়ি পরতে রাজী হল না। ছেঁড়া কাপড় পরেই জীবানন্দের সামনে গেল। বোধ হয়, স্বামীর অবহেলায় অভিমানে সে একাজ করেছিল। কিন্তু যখন জীবানন্দের মতিভ্রম দেখতে পেল, তখনি সে নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে। কঠোরহস্তে নিজের হৃদয়দৌর্বল্য দমন ক'রে স্বামীকে কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত করেছে।

এমনি সর্বত্রই দেখি শান্তি চরিত্রের দুটি দিক। মনে তার স্বামীর প্রতি প্রগাঢ় আসক্তি, সংসার করবার সুখস্বপ্ন, কিন্তু বাইরে তার প্রচণ্ড দৃঢ়তা, কর্তব্যকর্মে দারুণ নিষ্ঠা। এই কোমলে-কঠোরে শান্তি চরিত্র এত শান্তিরূপিণী।

শান্তি সত্যানন্দকে জানিয়েছে যে, সে কেন সন্তানধর্মে দীক্ষা নিয়েছে।—"শান্তি। আমি আপনার দক্ষিণ হস্তে (জীবানন্দ) বল বাড়াইতে আসিয়াছি। আমি ব্রহ্মচারিণী, প্রভুর কাছে ব্রহ্মচারিণীই থাকিব। আমি কেবল ধর্ম্মাচরণের জন্য আসিয়াছি; স্বামীসন্দর্শনের জন্য নয়। বিরহ-যন্ত্রণায় আমি কাতরা নই। স্বামী যে ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, আমি তাহার ভাগিনী কেন হইব না? তাই আসিয়াছি।" (২/৭)

কিন্তু আবার শান্তিকে সত্যানন্দ যখন জীবানন্দকে বাঁচাবার কথা বললেন, তখন—"শান্তি বলিল, "আমার স্বামীর ধর্ম্ম আমার স্বামীর হাতে; আমি তাঁহাকে ধর্ম্ম হইতে বিরত করিবার কে? ইহলোকে স্ত্রীর পতি দেবতা, কিন্তু পরলোকে সবারই ধর্ম্ম দেবতা—আমার কাছে আমার পতি বড়, তার অপেক্ষা আমার ধর্ম্ম বড়, তার অপেক্ষা আমার কাছে আমার স্বামীর ধর্ম্ম বড়। আমার ধর্ম্মে আমার যে দিন ইচ্ছা জলাঞ্জলি দিতে পারি, আমার স্বামীর ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিব? মহারাজ! তোমার কথায় আমার স্বামী মরিতে হয় মরিবে, আমি বারণ করিব না।" (৩/৭)

পর পর উদ্ধৃত উক্তি দুটি পরস্পর-বিরোধী বলে মনে হতে পারে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, শান্তির এই উক্তি বৃহত্তর ধর্মবোধের দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ। শান্তি শিখেছে, বৃহত্তর স্বার্থের জন্য নিজের সংকীর্ণ স্বার্থকে কেমন ক'রে বিসর্জন দিতে হয়। স্বামীর ভুল সে দেখিয়ে দেয়, কিন্তু স্বামীর স্বাধীন চিন্তাকে প্রভাবিত করে না।

শান্তি এবং জীবানন্দ পাশাপাশি থাকলেও, তারা কখনও হৃদয়ে কোন দৌর্বল্য দেখায়নি। কিন্তু জীবানন্দের মৃত্যুর পর শান্তি যখন স্বামীর শবদেহ খুঁজে বেড়াচ্ছিল, তখন বঙ্কিমের সংহত বর্ণনার ভেতর থেকেও এক নারীহৃদয়ের হাহাকার শোনা যায়।

জীবানন্দের পুনর্জীবনপ্রাপ্তির পর শান্তি আর গৃহধর্মে ফিরে যেতে চায়নি। সে হিমালয়ের উপরে কুটীর প্রস্তুত ক'রে দেবতার আরাধনায় দিন কাটাবার সংকল্প গ্রহণ করেছে। এর কি কোন প্রয়োজন ছিল? আসলে, দেশের মঙ্গলকার্যে যারা একবার জীবন উৎসর্গ করেছে, তাদের পুনরায় সংসারের গণ্ডীতে টেনে আনতে বঙ্কিম চাননি। মহেন্দ্র-কল্যাণীর বিপরীতে বঙ্কিম এঁকেছেন শান্তি-জীবানন্দকে। উভয় দম্পতিই স্বামী-স্ত্রীর আদর্শ। এক দম্পতি সংসারের মধ্যে থেকে দেশের কার্যে আত্মনিয়োগ করেছে, অন্য দম্পতি দেশের কাজের জন্য সংসার-জীবনকে তুচ্ছ করেছে। স্ত্রী-ই স্বামীর পূর্ণ শক্তি। উভয়ের সমন্বয়সাধনেই কর্মজীবনের সফলতা।

এই শান্তিকেই আমরা আবার অন্য রূপে দেবী চৌধুরাণীর মধ্যে দেখি।

শাহ আলম (রাজঃ ৮/৮)। উপন্যাসে নামোল্লেখমাত্র আছে।

শাহবাজ খাঁ (দুর্গেঃ ১/৩)। ইনি পাঠান-অধিকৃত বঙ্গদেশ উদ্ধার করতে এসেছিলেন বলে উপন্যাসে উল্লিখিত হয়েছেন।

শাহ সাহেব (সীতাঃ ১/১)। দ্রঃ একজন মুসলমান ফকির।

শ্যামচাঁদ (সীতাঃ ৩/৯)। দ্রঃ রামচাঁদ।

শ্যামাসুন্দরী (কপাঃ ২/৬)। "নবকুমার পিতৃহীন, তাঁহার বিধবা মাতা গৃহে ছিলেন, আর দুই ভগিনী ছিল, জ্যেষ্ঠা বিধবা ; তাহার সহিত পাঠকমহাশয়ের পরিচয় হইবে না। দ্বিতীয়া শ্যামাসুন্দরী সধবা হইয়াও বিধবা ; কেন না, তিনি কুলীনপত্নী। তিনি দুই একবার আমাদের দেখা দিবেন।"

শ্যামাসুন্দরী সাধারণ বাঙালী ঘরের পরিহাসকুশলা রমণী। তার দুঃখ স্বামী তাকে ভালবাসে না। কিন্তু কপালকুণ্ডলাকে সে ভালবাসে, তার সুখ চায়, দাদার মনোরঞ্জনের জন্য সে বৌদির অযত্নরূপরাশিকে সযত্নে মার্জিত করতে চায়।

শ্যামাসুন্দরী এবং কপালকুণ্ডলার মধুর সম্পর্কের মধ্যে সেকালের ননদ-ভাজের ছবিটি ফুটে উঠেছে। কিন্তু উপন্যাসে শ্যামাসুন্দরীর উপস্থিতির অন্যতর উদ্দেশ্য আছে। শ্যামাসুন্দরী স্বামীপরিত্যক্তা হইলেও, স্বামীর প্রতি তার আকর্ষণ অত্যন্ত তীব্র। তাই সে কপালকুণ্ডলার মনোভাব বুঝতে পারে না। কপালকুণ্ডলা ও শ্যামাসুন্দরীর কথোপকথনে তাদের স্বামী সম্পর্কিত মনোবৃত্তির পার্থক্যটি ধরা পড়েছে।

শেষ পর্যন্ত শ্যামাসুন্দরীর জন্যই কপালকুণ্ডলার সর্বনাশের পথ প্রস্তুত হল। শ্যামাসুন্দরীর স্বামীকে বশ করার জন্য মধ্যরাত্রে যে ঔষধ দরকার, কপালকুণ্ডলা তা এনে দিতে সম্মত হল। এর পরিণাম সম্বন্ধে সংসারবুদ্ধিসম্পন্না শ্যামা যে সচেতন ছিল, তা তার সাবধানবাণী থেকে বোঝা যায়। কিন্তু কপালকুণ্ডলার জেদের মুখে তার যুক্তি ভেসে গেল।

অল্প অবসরে শ্যামাসুন্দরী চরিত্রটি স্নিগ্ধ স্পর্শ বহন ক'রে এনেছে।

শ্রী (সীতাঃ ১/১)। 'আনন্দমঠে'র শান্তি, 'দেবী চৌধুরাণী'র প্রফুল্লর ক্রম-পরিণতিরূপে শ্রী সহজেই আমাদের মনযোগ আকর্ষণ করে। কিন্তু এই শ্রী পূর্বোক্ত দুটি উপন্যাসের উল্লিখিত নারী চরিত্র অপেক্ষা অনেকাংশে স্বতন্ত্র। শান্তি এবং প্রফুল্লর মতো শ্রীর জীবনেরও প্রধান বিষয় হল স্বামীপ্রেম। কিন্তু শান্তির ক্ষেত্রে যেখানে স্বামীর ব্রতের প্রতি আনুগত্য বৈরাগ্যের মাঝেও সুখের সন্ধান দিয়েছিল, প্রফুল্লর নিষ্কামসাধনা যেখানে স্বামীগৃহে এসে তৃপ্তিলাভ করেছিল, সেখানে শ্রীর

স্বামীপ্রেম বিপরীতমুখী স্রোতে প্রবাহিত হয়ে সীতারামের জীবনের ট্র্যাজেডিকে তীব্রতর করেছে।

অবশ্য, বঙ্কিমচন্দ্র স্বামীর কাছ থেকে শ্রীর পলায়নী মনোবৃত্তির পিছনে একটি দৈব ঘটনাকে কাজে লাগিয়েছেন। গঙ্গারামের প্রাণরক্ষাকল্পে শ্রী সীতারামকে নিঃসংকোচে অনুরোধ করেছে। তখনো স্বামীর প্রতি তার বিরাগ অপেক্ষা একটা অভিমানের ভাবই বর্তমান ছিল। গঙ্গারামের পলায়নের পর সীতারাম যখন শ্রীকে নিরাপদে শ্যামপুরে পৌঁছে দিতে চেয়েছে, তখন শ্রী অভিমানের বশেই বলেছে—"এত কাল তোমা বিনা যদি আমার কাটিয়াছে, তবে আজিও কাটিবে।" (১/৬) কিন্তু যখনি শ্রী সীতারামের কাছে শুনল যে, তার কোষ্ঠী গণনা ক'রে জানা গেছে সে প্রিয়জনের মৃত্যুর কারণ হবে এবং যেহেতু স্ত্রীর কাছে স্বামীই প্রিয়জন, তখনই অন্ধকারের মধ্যে পলায়ন করেছে। স্বামীর প্রতি ভালবাসাই শ্রীর পলায়নের কারণ।

সন্ন্যাসিনী জয়ন্তীর সান্নিধ্যে এসে শ্রী বাহ্যিক সন্ন্যাসীবেশ গ্রহণ করলেও, অনেকদিন পর্যন্ত স্বামীকেই প্রাণের ঠাকুর ক'রে রেখেছিল। জয়ন্তীর সঙ্গে কথোপকথনে স্বামীর প্রতি শ্রীর ভক্তিই প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে দেখা গেল, শ্রীর হৃদয়ে ধর্মভাব জেগে উঠেছে। সীতারামের স্থান অনেকটা দখল ক'রে নিয়েছেন ঈশ্বর। এই পরিবর্তনের ইতিহাস বঙ্কিম দেননি, তার ফলেই অনেকে অভিযোগ করেন শেষ বয়সে বঙ্কিমের ধর্মচেতনা উপন্যাসের চরিত্রের মধ্যে প্রবেশ ক'রে তার সাহিত্যমূল্য ক্ষুণ্ণ করেছে।

যে স্বামীর প্রাণহত্যার ভয়ে শ্রী পালিয়ে বেড়াচ্ছিল, সেই শ্রী-ই আবার পরবর্তী কালে ধর্মভাবে ভাবিত হয়ে যুক্তি দিয়েছে—"মারিবার কর্তা একজন—যে মরিবে, তিনি তাহাকে মারিয়া রাখিয়াছেন। সকলেই মরে। আমার হাতে হউক, পরের হাতে হউক, তিনি একদিন মৃত্যুকে পাইবেন।" (২/৮)

এই মনোভাব বজায় রেখেও শ্রী যদি সীতারামের, তথা রাজ্যের কল্যাণের জন্য, সীতারামের প্রতি কৃপা বর্ষণ করত, তাহলে অনেকটা সামঞ্জস্য থাকত। কিন্তু শ্রী তখন নিষ্কামধর্মের শুষ্ক তত্ত্বমাত্রে পরিণত হয়েছে। আবার, সীতারামের সামনে রূপের ডালি সাজিয়ে রেখে সীতারামের তৃষ্ণা আরো বাড়িয়ে তুলেছে। এর জন্য দায়ী তার অনভিজ্ঞতা—সংসার-অনভিজ্ঞতা এবং সন্ন্যাস-অনভিজ্ঞতা। এই শ্রী-ই আবার সীতারামের সর্বনাশের শেষ সময়ে ফিরে এসেছে স্ত্রীর অধিকার নিয়ে।

শ্রীর চরিত্রের এই যে পরিবর্তনের স্রোত, বঙ্কিম তাকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে উপস্থিত করতে পারেননি। তার ফলে শ্রী চরিত্র যতটা আরোপিত বলে মনে হয়, ততটা স্বাভাবিক হয়নি।

শ্রীর চরিত্রের একদিকে স্বামীপ্রেম, অন্যদিকে ভ্রাতৃপ্রেম। গঙ্গারামকে রক্ষা করার জন্য সে বারবার চেষ্টা করেছে। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েও গঙ্গারাম বেঁচে গেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই শ্রী-ই গঙ্গারামের মৃত্যুর কারণ হয়েছে।

শ্রীকে দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বোধ হয় বলতে চেয়েছিলেন, সংসারধর্ম থেকে কিংবা স্বামীর পথ থেকে স্ত্রী যদি বিচ্ছিন্ন পথে চলতে থাকে, তাহলে সংসারে শ্রীর অভাব দেখা দেয়।

শ্রীনাথ (চন্দ্রঃ ২/৪)। শ্রীনাথ সুন্দরীর স্বামী। "শ্রীনাথ, প্রকৃত ঘরজামাই না হইয়াও কখন কখন শ্বশুরবাড়ী আসিয়া থাকিতেন।" শৈবলিনীর অপহরণকালেও তিনি শ্বশুরবাড়ীতে ছিলেন এবং শৈবলিনীকে উদ্ধারের জন্য সুন্দরীর সঙ্গে নৌকা পর্যন্ত গিয়েছিলেন। গৃহস্থ বধূ সুন্দরীর বাইরে বেরোন সম্বন্ধে পাঠকের সন্দেহ না জাগাবার জন্যই বঙ্কিম শ্রীনাথকে সর্বদা সুন্দরীর সঙ্গে সঙ্গে রেখেছেন।

শ্রীমতী (বিষঃ ৬ষ্ঠ পরিঃ)। "শিশুকালে শ্রীমতী নামে এক বিধবা কায়স্থকন্যা দাসীভাবে তাঁহার (সূর্য্যমুখীর পিতার) গৃহে থাকিয়া সূর্য্যমুখীকে লালন-পালন করিত। শ্রীমতীর একটি শিশুসন্তান ছিল, তাহারই নাম তারাচরণ।" (৬ষ্ঠ পরিঃ) "শ্রীমতী বিশেষ রূপবতী ছিল, সুতরাং অচিরাৎ বিপদে পতিত হইল। গ্রামস্থ একজন দুশ্চরিত্র ধনী ব্যক্তির চক্ষে পড়িয়া সে সূর্য্যমুখীর পিতার গৃহ ত্যাগ করিয়া গেল। কোথায় গেল, তাহা কেহ বিশেষ জানিতে পারিল না। কিন্তু শ্রীমতী আর ফিরিয়া আসিল না।" (৬ষ্ঠ পরিঃ)

শ্রীশচন্দ্র মিত্র (বিষঃ ৫ম পরিঃ)। কমলমণির স্বামী। "শ্রীশ বাবু প্রগুর ফেয়ারলির বাড়ীর মুৎসুদ্দি। হৌস বড় ভারি—শ্রীশচন্দ্র বড় ধনবান্।" শ্রীশচন্দ্রও কমলমণির মতো সদাহাস্যময়—তা নাহলে স্ত্রীর চাপল্য শোভা পাবে কেন? শ্রীশচন্দ্র কমলমণিকে বড় ভালবাসে। তাই লোকে তাকে স্ত্রৈণ বলে। কিন্তু তাতে তার বড় ক্ষোভ নেই।

কমলমণির পরামর্শদাতা হিসাবে শ্রীশচন্দ্রের উপস্থিতি। নগেন্দ্রকে শ্রীশচন্দ্র বড় ভালবাসতেন। সূর্যমুখীর খবরদানকালে নগেন্দ্রের উন্মত্ততা দেখে তিনি তাকে যথাসম্ভব সান্ত্বনা দান করেছেন।

শের আফগান (কপাঃ ৩/১)। ঐতিহাসিক চরিত্র। কিন্তু এ উপন্যাসে উল্লেখমাত্র আছে। তিনি মেহের-উন্নিসার স্বামী। এখানে "শের আফগান বঙ্গদেশের সুবাদারের অধীনে বর্দ্ধমানের কর্ম্মাধ্যক্ষ।"

শৈবলিনী (চন্দ্রঃ উপক্রমণিকা ১)। "চন্দ্রশেখর" উপন্যাসে ভাগীরথী যেমন আগাগোড়া কল-কলতানে প্রবাহিত হয়েছে, শৈবলিনীও তেমনি সেই স্রোতস্বিনীকে

ভাসমান পদ্মের মতোই হাসিকান্নার লীলাচাপল্যে এই উপন্যাসের প্রাণরূপে অধিষ্ঠিতা। এ উপন্যাসের নায়িকা শৈবলিনী।

বাল্যপ্রণয়ে অভিশাপ আছে কিনা—এ প্রশ্ন বঙ্কিমের মনকে আলোড়িত করেছিল, আর তারই দ্বন্দ্বসংকুল পরিচয় শৈবলিনী চরিত্র। একদিকে বঙ্কিম-মানসের রোম্যান্টিক সৌন্দর্যকামনা শৈবলিনীকে প্রতাপের কৈশোর প্রেমিকারূপে অঙ্কন করেছে, অপরদিকে আদর্শবাদী বঙ্কিম-মন সমাজের অমঙ্গল-কামনায় নির্দয়ভাবে শৈবলিনীকে সাজা দিয়েছে। লেখকের এই মানসদ্বন্দ্বের যূপকাষ্ঠে শৈবলিনী বিধ্বস্ত।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রতাপ ও শৈবলিনীর বাল্যপ্রণয়ের যে চিত্র এঁকেছেন, তাতে শৈবলিনী যথেষ্ট মধুর হয়ে উঠেছে। কিন্তু সেই বাল্যপ্রণয়ের মধ্যেই বঙ্কিম শৈবলিনীর ট্র্যাজেডির অঙ্কুর নিহিত রেখেছেন। প্রতাপ শৈবলিনীকে বিয়ে করতে পারবে না জেনেও ভালবেসেছিল, কিন্তু শৈবলিনীর আশা ছিল প্রতাপকে বিয়ে করার। অর্থাৎ, একজনের প্রেম—ঐহিক বাসনা-মুক্ত, তা প্রেমের আত্মদানেই নিঃশেষিত, ভোগাসক্তিহীন; অন্যজনের প্রেম—মাটির পৃথিবীতে ঘর বেঁধে সুখভোগের আকাঙ্ক্ষায় নিয়োজিত। তাই প্রতাপ মরার জন্য অসঙ্কোচে ডুবে যেতে পারল, শৈবলিনী পারল না। গঙ্গাবক্ষে প্রতাপের সঙ্গে ডুবতে না পারার পাপেই শৈবলিনীকে জীবনব্যাপী হাবুডুবু খেতে হয়েছে।

চন্দ্রশেখরকে বিবাহের ব্যাপারটা বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনী চরিত্রে নিতান্ত সাধারণভাবেই সংস্থাপিত করেছেন। বরং চন্দ্রশেখরকে মাঝে মাঝে শৈবলিনীর প্রতি অবহেলা করার জন্য আত্মদংশন করতে দেখা গেছে, কিন্তু শৈবলিনী এ সম্বন্ধে নির্বিকার। বরং ভীমা পুষ্করিণী-তীরে সুন্দরীর সঙ্গে রসিকতা ও লরেন্স ফস্টরের সঙ্গে কথোপকথন থেকে মনে হয়, শৈবলিনী চন্দ্রশেখরের সঙ্গে গৃহজীবন আর দশটা বাঙালী মেয়ের মতোই কাটিয়ে দিতে চায়। কিন্তু লরেন্স ফস্টরের অপহরণ শৈবলিনীর জীবনের গতি পরিবর্তিত ক'রে দিল। শৈবলিনীর হৃদয়ে যে প্রতাপ এতদিন সুষুপ্ত ছিল, সেই প্রতাপকে পাবার আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল। কিন্তু এই আকাঙ্ক্ষা যে কত বেশী অবাস্তব, কত বেশী প্রলয়ঙ্করী স্ত্রীবুদ্ধিসুলভ, তা সে পরে বুঝতে পেরেছে।

শৈবলিনীর ভাগ্যবিপর্যয়ে এই বহিরঙ্গ আলোড়ন ইন্ধন জুগিয়েছে ঠিকই, কিন্তু তার অন্তরের পাপপ্রবৃত্তিও তার ট্র্যাজেডিকে গভীরতর করেছে। শৈবলিনী চরিত্র বিদ্যুৎ বা অগ্নির সঙ্গেই তুলনীয়। উপস্থিতবুদ্ধিসম্পন্না, ভয়-লেশহীনা এই নারী স্বামীগৃহ থেকে অপহরণের পরই আগুন জ্বালিয়েছে। দ্রুত ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে শৈবলিনী চরিত্র জটিল হয়ে উঠেছে। প্রতাপের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য শৈবলিনী নবাবের মুখোমুখি হয়েছে, ছিপ নিয়ে ভাগীরথীতে উজান বেয়েছে, শেষ পর্যন্ত দয়িতের সঙ্গে সন্তরণ-অনুষ্ঠানে

অংশগ্রহণ করেছে। 'চন্দ্রশেখরে'র পূর্ববর্তী উপন্যাসে এরকম সক্রিয় নায়িকা আর বঙ্কিম আঁকেননি। পরবর্তী কালে দেবী চৌধুরাণীতে এর চূড়ান্ত রূপ দেখা যায়। সীতা-রামের শ্রীও যথেষ্ট সক্রিয়।

শৈবলিনী চরিত্রের স্রোত বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয়েছে তৃতীয় খণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সমস্ত কল্পনা-শক্তি নিয়োজিত করেছেন এই পরিচ্ছেদ-বর্ণনায়। এমন সংহত বর্ণনা ও কথোপকথনের মধ্যে এমন অনাবিল সৌন্দর্য শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের কৃতিত্বের পরিচায়ক। এখানেও বাল্যকালের মতো—সেই নদী, সেই সন্তরণ, সেই প্রতাপ-শৈবলিনী, সেই একই কাল—("বৎসরে কি কালের মাপ।)" কিন্তু শৈবলিনীর মন আজ পরিবর্তিত হতে চলেছে।

"এ সংসারে আমার মত দুঃখী কে আছে, প্রতাপ?

প্র। আমি!

শৈ। তোমার ঐশ্বর্য্য আছে—বল আছে—কীর্ত্তি আছে—বন্ধু আছে—ভরসা আছে—রূপসী আছে—আমার কি আছে প্রতাপ?

প্র। কিছু না—আইস তবে দুইজনে ডুবি।

শৈবলিনী কিছুক্ষণ চিন্তা করিল। চিন্তার ফলে, তাহার জীবন-নদীতে প্রথম বিপরীত তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত হইল। "আমি মরি তাহাতে ক্ষতি কি? কিন্তু আমার জন্য প্রতাপ মরিবে কেন? প্রকাশ্যে বলিল, "তীরে চল।"

প্রতাপ অবলম্বন ত্যাগ করিয়া ডুবিল।

তখনও প্রতাপের হাতে শৈবলিনীর হাত ছিল। শৈবলিনী টানিল। প্রতাপ উঠিল। শৈ। আমি শপথ করিব। কিন্তু তুমি একবার ভাবিয়া দেখ। আমার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইতেছে। আমি তোমাকে চাই না। তোমার চিন্তা কেন ছাড়িব?

প্রতাপ হাত ছাড়িল। শৈবলিনী আবার ধরিল। তখন অতি গম্ভীর, স্পষ্টশ্রুত, অথচ বাষ্পবিকৃত স্বরে শৈবলিনী কথা কহিতে লাগিল—বলিল, "প্রতাপ হাত চাপিয়া ধর। প্রতাপ, শুন, তোমায় স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি—তোমার মরণ বাঁচন শুভাশুভ আমার দায়। শুন, তোমার শপথ। আজি হইতে তোমাকে ভুলিব। আজি হইতে আমার সর্ব্বসুখে জলাঞ্জলি। আজি হইতে আমি মনকে দমন করিব। আজি হইতে শৈবলিনী মরিল।" (৩/৬)

"চন্দ্রশেখর" উপন্যাসের এখানেই সমাপ্তি হ'লে উপন্যাসটির উৎকর্ষ আরও বৃদ্ধি পেত। শৈবলিনী চরিত্রের এখানেই পরিণতি। তার ট্র্যাজেডি-ও এখানেই গভীরতর হয়ে উঠেছে।

কিন্তু নীতিবিদ্ বঙ্কিমচন্দ্রের কলম থামল না। শৈবলিনীর পাপের প্রায়শ্চিত্তের তিনি নিদারুণ বিধান দিলেন—নরকের স্বপ্নদর্শনে এবং মস্তিষ্ক বিকৃতির দ্বারা। শুধু তাই নয়—প্রকারান্তরে প্রতাপের মৃত্যুর জন্য বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনীকেই দায়ী করেছেন। তারপর চন্দ্রশেখরের সঙ্গে শৈবলিনীকে গৃহে পাঠিয়ে দিয়ে পাঠক-চক্ষে শৈবলিনী চরিত্রকে হেয় ক'রে দিয়েছেন। আসল কথা, শেষের দিকে প্রতাপের প্রেমের মহত্ত্ব বঙ্কিমের দৃষ্টি আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছিল। শৈবলিনী চরিত্রের সর্বাপেক্ষা বড় শাস্তি হয়েছে—লেখকের এই উপেক্ষা।

শৈলবতী (কৃ: উ: ১/১)। কৃষ্ণকান্ত রায়ের কন্যা। উপন্যাসে কেবলমাত্র নাম উল্লেখিত হয়েছে।

সখী (কৃ: উ: ১/৯)। কৃষ্ণকান্তের গৃহের "একজন যুবতী চাকরাণী।"

সত্যানন্দ ঠাকুর (আনন্দ: ১/১১)। "আনন্দমঠ"-এর সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রাণস্বরূপ হয়েও সত্যানন্দ 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে অনেকটা যেন দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। গতি তাঁর সর্বত্র, প্রত্যেক সন্ন্যাসীর গতিবিধি তাঁর নখদর্পণে, লোকচরিত্র সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান অসীম এবং পাণ্ডিত্যে তিনি অসাধারণ। একাধারে এই সমস্ত গুণের বিকাশে তাঁর চরিত্রটি অলৌকিক মর্যাদা লাভ করেছে।

শ্বেতশ্মশ্রুমণ্ডিত সত্যানন্দের সৌম্যমূর্তি প্রাচীন আর্য ঋষিদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সন্তানসেনা সকলেই তাঁকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করে। সত্যানন্দ হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য বল সঞ্চয় করলেও, কখন তাঁকে বল প্রয়োগ করতে দেখি না। অথচ এই সত্যানন্দই ইস্পাতের ধনুকে গুণ দিতে সমর্থযুক্ত।

শান্তি ও কল্যাণীর প্রতি মমত্বপূর্ণ ব্যবহার সত্যানন্দের নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধার পরিচায়ক। সত্যানন্দ গোপনে যেভাবে ভবানন্দের বৃত্তান্ত সংগ্রহ করেছেন এবং ধীরানন্দকে দিয়ে তার পরীক্ষা নিয়েছেন, তাতে তাঁকে যথার্থ দল-নায়ক বলা যেতে পারে। তবে তাঁর আচরণের মধ্যে কিছু রহস্যময়তা সঞ্চারিত করা হয়েছে। মহেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর কারাগারে অবস্থান ও মুক্তি তাদের মধ্যে অন্যতম। এর দ্বারা সত্যানন্দকে আমরা ঠিক মানব-চরিত্র বলে মনে করতে পারি না।

সত্যানন্দ নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক। তাই জীবানন্দ সত্যানন্দকে সিংহাসনে আরোহণ করার কথা বললে—"সত্যানন্দ তাঁহার জীবনে এই প্রথম কোপ প্রকাশ করিলেন। বলিলেন—"ছি! আমায় কি শূন্য কুম্ভ মনে কর? আমরা কেহ রাজা নহি—আমরা সন্ন্যাসী। এখন দেশের রাজা বৈকুণ্ঠনাথ স্বয়ং। নগর অধিকার হইলে, যাহার শিরে

তোমাদিগের ইচ্ছা হয়, রাজমুকুট পরাইও, কিন্তু ইহা নিশ্চিত জানিও যে, আমি এই ব্রহ্মচর্য্য ভিন্ন আর কোন আশ্রমই স্বীকার করিব না।" (৩/১২)

কিন্তু সত্যানন্দের পথ যে ভ্রান্ত, এ-কথা চিকিৎসক, যিনি সত্যানন্দের প্রেরণা, এসে বলেছেন। শেষ পর্যন্ত সত্যানন্দ মহাপুরুষের হাত ধরে ধর্মক্ষেত্র থেকে প্রস্থান করেছেন।

সত্যানন্দ idea বা ভাবমাত্র। সে idea দেশভক্তির, সে idea কর্মনিষ্ঠার। তাই—"জ্ঞান আসিয়া ভক্তিকে ধরিয়াছে—ধর্ম্ম আসিয়া কর্ম্মকে ধরিয়াছে; বিসর্জ্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে ধরিয়াছে; কল্যাণী আসিয়া শান্তিকে ধরিয়াছে। এই সত্যানন্দ শান্তি; এই মহাপুরুষ কল্যাণী। সত্যানন্দ প্রতিষ্ঠা, মহাপুরুষ বিসর্জ্জন।" (৪/৮)

সতীশচন্দ্র (বিষঃ ১৩শ পরিঃ)। শ্রীশচন্দ্র ও কমলমণির পুত্র সতীশচন্দ্র তাদের আনন্দধামের যোগসূত্র। এই ছোট্ট ছেলেটিকে কেন্দ্র ক'রে বঙ্কিম যে বাৎসল্যরসের স্ফুরণ ঘটিয়েছেন, তা সমগ্র বঙ্কিম-সাহিত্যে বিরল।

সন্ন্যাসী (রজনী ৩/৬)। "রজনী" উপন্যাসের সন্ন্যাসী যেমন অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন, তেমনি পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি নলচালা-হাতচালা ইত্যাদি তুকতাকের পিছনে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের অবতারণা করেন। তিনি শচীন্দ্রের মনে রজনীর ধ্যান অনুপ্রবেশ করান। তাঁর সর্বাপেক্ষা অলৌকিক কীর্তি রজনীর অন্ধত্ব-মোচন।

সর্বধন বণিক (মৃণাঃ ১/৪)। মৃণালিনী যখন লক্ষ্মণাবতী নগরীতে হৃষীকেশের বাড়ীতে ছিল, তখন 'লক্ষ্মণাবতী নগরীর প্রদেশান্তরে সর্ব্বধন বণিকের বাটীতে হেমচন্দ্র অবস্থিতি করিতেছিলেন।'

সমরু (চন্দ্রঃ ৬/৪)। "ডাইস্ সম্বর নামে একজন সুইস্ বা জার্ম্মান মীরকাশেমের সেনাদল মধ্যে সৈনিক কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। এই ব্যক্তি সমরু নামে বিখ্যাত হইয়াছিল।" উদয়নালার শিবিরে এই সমরুর কাছে ফস্টর গিয়েই নবাবের হাতে ধৃত হয়েছিল।

এটি ঐতিহাসিক চরিত্র। এঁর প্রকৃত নাম ওয়াল্টার রাইন্হারড্ (Walter Reinhard)। ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে এঁর জন্ম হয়। কথিত আছে, তিনি একজন জার্মান কসাইয়ের পুত্র। এক ফরাসী জাহাজে নাবিকরূপে ভারতে এসে তিনি ফরাসী সৈন্য-বিভাগে কাজ গ্রহণ করেন। তখন তাঁর নাম হয় সম্নর (Sumner) বা সমরস্ (Somers)। ইনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি, অযোধ্যার নবাব, সিরাজদ্দৌলা, মীরকাশেম প্রভৃতি বহুজনের অধীনে কাজ করেন। অনেকে বলেন, ইনি অশিক্ষিত ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক ছিলেন। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মে আগ্রায় তাঁর মৃত্যু হয়।

সরফরাজ (আনন্দঃ ১/১)। "আনন্দমঠে"র ঘটনাকালে রাজস্ব-আদায়ের কর্তা রেজা খাঁর সরফরাজ হবার কথা বলা হয়েছে।

সরফরাজ খাঁ বাংলার একজন নবাব। তিনি মুর্শিদকুলি খাঁর দৌহিত্র। মুর্শিদকুলি খাঁ তাঁকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। কিন্তু সরফরাজের পিতা সুজাউদ্দিন নিজে সুবাদারি গ্রহণ ক'রে পুত্রকে দেওয়ান করেন। ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সুজাউদ্দিনের মৃত্যুর পর সরফরাজ মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন অলস, অকর্মণ্য ও দুশ্চরিত্র। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে নবাব আলিবর্দির সঙ্গে যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও নিহত হন।

স্বরূপচন্দ্ জগৎশেঠ (চন্দ্র: ২/৬)। দ্রঃ জগৎশেঠ।

সাগরবৌ (দেবী: ১/৩)। ব্রজেশ্বরের তৃতীয়া পত্নী সাগরবৌয়ের হৃদয় সাগরের মতোই বিস্তৃত। কোন মালিন্যই তাতে স্থান পায় নাই। হাসির উচ্ছল ধারায় স্বভাবতঃই সে সকলকে মাতিয়ে তোলে। সাগর বড়লোকের মেয়ে। বয়সেও বালিকা। কিন্তু স্বামীগৃহে তার কোন নির্দিষ্ট স্থান না থাকার জন্য তার হৃদয়ে বেদনার অন্ত নেই। একটি কথায় সাগর তার মনের বেদনাকে প্রকাশ করেছে—"আমার অদৃষ্ট মাটির ঝাঁবের মত—তাকে তোলা থাক্‌ব, দেবতার ভোগে কখনও লাগিব না।"

সাগর সহানুভূতিশীলা ও পরদুঃখকাতরা। নিজের বঞ্চনার বেদনা দিয়ে সে বুঝেছে প্রফুল্লর না-পাওয়ার বেদনা কতখানি। তাই সে স্বামীর সঙ্গে প্রফুল্লর রাত্রিবাসের ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছে।

সাগর পরিহাসপ্রিয়া। তাই নয়ানবৌকে ক্ষেপাতে সে খুব ভালবাসে। ব্রহ্ম-ঠাকুরাণীর কাছেও তার আবদারের অন্ত নেই।

সাগর শুধু চপলাই নয়, সে তেজেও পরিপূর্ণা। ব্রজেশ্বর সাগরের পিতার কাছে অর্থ না পেয়ে রাগ প্রকাশ করলে, সাগর স্বামীকে অনুরোধ করেছে আর একদিন থাকবার। কিন্তু ব্রজেশ্বরের পদাঘাতে—"কুপিত ফণিনীর ন্যায় দাঁড়াইয়া উঠিল। বলিল, "কি? আমায় লাথি মারিলে?" তারপর সাগরের প্রতিজ্ঞা ও দেবীর সহায়তায় ব্রজেশ্বরের পা টেপানোতে তার পরিসমাপ্তি। কিন্তু স্বামীকে সাগর যথার্থ ভক্তি করে ও ভালবাসে। তাই স্বামীকে দিয়ে পা টেপানোর পর সে অনুশোচনায় দগ্ধ।—"মুখে ঢাকা দিয়া সাগর কাঁদিল—সেই মুখরা সাগর টিপিয়া টিপিয়া, কাঁপিয়া কাঁপিয়া, চুপি চুপি ভারি কান্না কাঁদিল।"

উপন্যাসে সাগর যতখানি দিয়েছে, ততখানি পায়নি।

সাগরের বাবা (দেবী: ২/৩)। ভদ্রলোকের বাস্তববুদ্ধি অত্যন্ত প্রবল। তাই তিনি কন্যার জন্য সঞ্চিত অর্থ জামাইকে দিতে রাজী আছেন, কিন্তু ব্রজেশ্বরের পিতাকে নয়। তিনি টাকাই চেনেন, মেয়ের সুখ নয়। তাই তিনি জামাইকে "রুক্ষভাবে

বলিলেন, "তোমার বাপ বাঁচিলে আমার মেয়ের কি? আমার মেয়ের টাকা থাকিলে দুঃখ ঘুচিবে—শ্বশুর বাঁচিলে দুঃখ ঘুচিবে না।"

সাগরের মা (দেবীঃ ২/৩)। সাগরের মা জামাইয়ের রাগ কমাবার চেষ্টা করেছিলেন।

সার ওয়ালটার রালে (দেবীঃ ১/৯)। দ্রঃ ওয়ালটার রালে।

সীতারাম (সীতাঃ ১/২)। বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ উপন্যাস "সীতারাম"-এর নায়ক রাজা সীতারাম রায় একটি ঐতিহাসিক চরিত্র। যশোহর জেলার অন্তর্গত মহম্মদ-পুরে এঁর বাস ছিল। ক্রমে ইনি শক্তিবৃদ্ধি ক'রে 'রাজা' উপাধি গ্রহণ করেন। তৎকালীন বাংলার সুবাদার মুর্শিদকুলি খাঁ কয়েকবার সৈন্য প্রেরণ ক'রে তাঁকে দমন করতে অসমর্থ হন। ক্রমে তিনি বিলাসী হয়ে উঠেন এবং তাঁর রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সেই সুযোগে নবাব সৈন্যের আক্রমণে তিনি পরাজিত হন। কারও মতে, মুর্শিদাবাদে নিয়ে গিয়ে তাঁকে শূলে দেওয়া হয়, আবার কারও মতে, তিনি বিষপানে আত্মহত্যা করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু এই চরিত্রের ঐতিহাসিকতার প্রতি বেশী মনযোগ দেননি। তাই তিনি বলেছেন,—"যাঁহারা সীতারামের প্রকৃত ইতিহাস জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা West Land সাহেবের কৃত যশোহরের বৃত্তান্ত এবং Stewart সাহেবের কৃত বাঙ্গালার ইতিহাস পাঠ" করেন।

কিন্তু ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার দেখিয়েছেন (বঙ্কিম গ্রন্থাবলী—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ), বঙ্কিমচন্দ্র সামান্য কিংবদন্তী ও ইতিহাসমূলক কাহিনী অবলম্বনে যে সীতারামের চরিত্র অঙ্কন করেছেন, তা অনেকাংশেই ইতিহাস-সম্মত। বিশেষভাবে, মহম্মদপুর ও ভূষণার সঙ্গে সীতারামের সংযোগ, সীতারামের শক্তিমত্তা, তাঁর তিন বিবাহ ও ব্যক্তিগত দোষের ফলে তাঁর পতন—ইতিহাসানুগ ঘটনা।

কিন্তু ঐতিহাসিক চরিত্র সীতারাম অপেক্ষা মানব-চরিত্র সীতারামকেই বঙ্কিম সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় ক'রে তুলেছেন। এক দৃঢ়নিষ্ঠ কর্মীপুরুষের জীবন-ট্র্যাজেডি-ই চিত্রিত হয়েছে এই চরিত্রে।

বীরপুরুষোচিত সমস্ত গুণই সীতারামের মধ্যে বিদ্যমান। উপন্যাসের প্রথমেই দেখি গঙ্গারামের উদ্ধারকল্পে তাঁর দৃঢ়নিষ্ঠতা। এই পরোপকার বৃত্তির পিছনে তাঁর পরিত্যক্তা স্ত্রী শ্রীর অনুরোধ যত না প্রেরণা জুগিয়েছে, তার চেয়ে বেশী প্রেরণা পেয়েছেন তিনি তাঁর নিজের মধ্যে। তিনি বুঝেছেন—শরণাগতকে রক্ষা করাই প্রকৃত মানুষের ধর্ম। তাই গঙ্গারামের প্রাণের বিনিময়ে তিনি নিজের প্রাণ পর্যন্ত দিতে রাজী হয়েছিলেন।

গঙ্গারামের পলায়নে কতটা সীতারামের কৌশল কার্যকরী হয়েছে, আর কতটা ঘটনা-বিপর্যয়ে তা সম্ভব হয়েছে, বঙ্কিম তার স্পষ্ট মীমাংসা করেননি।

শেষজীবনে বঙ্কিমের প্রবল হিন্দুপ্রীতি সীতারামের মধ্যে আরোপিত হয়েছে।— "হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে ?"

সীতারাম পিতৃ-আদেশে প্রধানা স্ত্রী শ্রীকে ত্যাগ করেন। কিন্তু এখানে ব্রজেশ্বরের মতো তাঁর অন্ধ পিতৃভক্তি প্রকাশ পায়নি। তাই তিনি বলেছেন—"পিতার আজ্ঞা সকল সময়েই পালনীয়—তিনি যখন আছেন, তখনও পালনীয়—তিনি যখন স্বর্গে, তখনও পালনীয়। কিন্তু পিতা যদি অধর্ম্ম করিতে বলেন, তবে তাহা কি পালনীয় ? পিতা-মাতা বা গুরুর আজ্ঞাতেও অধর্ম্ম করা যায় না—কেন না, যিনি পিতামাতার পিতা-মাতা এবং গুরুর গুরু, অধর্ম্ম করিলে তাঁহার বিধি লঙ্ঘন করা হয়। বিনাপরাধে স্ত্রী ত্যাগ ঘোরতর অধর্ম্ম—অতএব আমি পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিয়া অধর্ম্ম করিতেছি—শীঘ্রই আমি তোমাকে একথা জানাইতাম, কিন্তু—" (১/৭)

এই 'কিন্তু'র উত্তর বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছেন এইভাবে—"স্বীকার করি, তবু শ্রীকে মনে করা সীতারামের উচিত ছিল। কিন্তু এমন অনেক উচিত কাজ আছে যে, কাহারও মনে হয় না। মনে হইবার একটা কারণ না ঘটিলে, মনে হয় না। যাহার নিত্য টাকা আসে, সে কবে কোথায় সিকিটা আধুলিটা হারাইয়াছে, তার তা বড় মনে পড়ে না। যার এক দিকে নন্দা, আর এক দিকে রমা, তার কোথাকার শ্রীকে কেন মনে পড়িবে ?" (১/৮)

প্রথম দর্শনেই শ্রীর প্রতি সীতারামের রূপমোহ জন্মায়। তাই শ্রীকে প্রথম দর্শন ক'রেই সীতারামের বিস্ময়োক্তি—"তুমি শ্রী! এত সুন্দরী!" এই আকর্ষণ কেন ? ব্রজেশ্বরের ক্ষেত্রে নয়ানবৌ ছিল কুরূপা, আর সাগর ছিল বালিকা—কৃত গৃহিণী কেউ ছিল না। তাই তার প্রফুল্লর প্রতি এত আসক্তি। কিন্তু সীতারামের রমার সৌন্দর্যও কম নয়, নন্দাও সুগৃহিণী। তাহলে শ্রীতে আবার নূতন কি পাবার আকাঙ্ক্ষায় সীতারাম ছুটেছেন! নূতনের প্রতি আকর্ষণ, অধরাকে ধরবার চেষ্টাই সীতারামের কামনাকে বাড়িয়ে তুলেছে।—"যাহাকে ইহজগতে খুঁজিয়া পাইলাম না, ইহজীবনে সেই প্রিয়।"

প্রথম দর্শনের পর শ্রীকে না পেয়ে সীতারাম কিঞ্চিৎ বিহ্বল হয়ে পড়লেও, "শেষে সীতারাম স্থির করিলেন যে, আর শ্রীকে মনে স্থান দিবেন না। রাজ্যস্থাপনেই চিত্তনিবেশ করিবেন। তিনি এ পর্য্যন্ত প্রকৃত রাজা হয়েন নাই; কেন না দিল্লীর সম্রাট্ তাঁহাকে সনন্দ দেন নাই। তাঁর সনন্দ পাইবার অভিলাষ হইল। সেই অভিপ্রায়ে তিনি অচিরে দিল্লী যাত্রা করিবেন, ইহা স্থির করিলেন।" (২/১)

সীতারামের এই অনুপস্থিতিতে গঙ্গারামের ষড়যন্ত্র ইত্যাদি ঘটনা ঘটেছে। শেষ মুহূর্তে সীতারাম এসে রাজ্য রক্ষা করলেন, কিন্তু নিজেকে রক্ষা করতে পারলেন না। সন্ন্যাসিনী শ্রীকে কাছে পেয়ে, অথচ নিজের ক'রে না পেয়ে, তাঁর কল্যাণী রাজশক্তি এক ভয়ঙ্করী সর্বনাশী শক্তিতে পরিণত হল।

"এ শ্রী ত সীতারামের শ্রী নয়" "সীতারাম তাহা বুঝিয়াও বুঝিলেন না।" মনে হয়, তিনি ইচ্ছাকৃতভাবেই নিজের সর্বনাশ ডেকে আনছেন। ক্রুদ্ধ সাপ যেমন শত্রুকে না পেয়ে দোদুল্যমান গাছের ছায়াতেই বারবার ছোবল মারতে থাকে, সীতারামের রাগ তেমনি বর্ষিত হ'তে লাগল রাজ্যের কর্মচারীদের ওপব। সীতারাম শেষ ছোবল মারলেন, তথা ট্র্যাজিক পরিণতির চরম সীমায় গিয়ে পৌছলেন, সন্ন্যাসিনী জয়ন্তীকে বিবস্ত্রা ক'রে বেত্রাঘাত করবার সময়ে।

রমার নীরব আত্মদান সীতারামেব হৃদয়ে খানিকটা অনুশোচনা জাগালো, কারণ, তিনি সেদিন 'চিত্তবিশ্রামে' গেলেন না। কিন্তু তাতেও তাঁব পবিবর্তন হল না। তখনো শ্রীর আশা আছে। কিন্তু শ্রীহীন অবস্থায় ভানুমতী নামে সামান্য এক নারীর—"ধর্ম্ম আছে" এই কথাটি সীতারামেব চবিত্রের পরিবর্তন ঘটাল—এটা একান্তই অসম্ভব ব'লে মনে হয়। তাহলে এই ব্যাখ্যাই দিতে হয়—সীতারাম তখন সমস্ত শক্তি হারিয়ে প্রায়শ্চিত্তের পথে ফেরার জন্যই উন্মুখ হয়েছিলেন।

বঙ্কিম ইতিহাস ও কিংবদন্তীর দ্বিধায় সীতাবামের পবিণতি স্পষ্ট ক'রে চিত্রিত করতে সাহস করেননি বটে, কিন্তু এতবড় একজন শক্তিশালী পুরুষের সমস্ত শক্তির নিঃশেষিত রূপ, পাঠক-হৃদয়ে তাঁর পরিণতির বেদনাদায়ক ছাপই রেখে গেছে।

সীতারাম চরিত্রটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের "রাজারানী" নাটকের বিক্রমদেবের মনোবৃত্তির একটা সাদৃশ্য চোখে পড়ে। উভয়েই প্রচণ্ড শক্তিমান পুরুষ, কিন্তু সেই শক্তি প্রেমের প্রচণ্ডতায় বিকৃতি লাভ করেছে।—"এর মধ্যে এই কথাটাই প্রকাশ পাবার জন্যে স্বত উন্মত হয়েছে যে, সংসারের জমি থেকে প্রেমকে উৎপাটিত করে আনলে সে আপনার রস আপনি জোগাতে পাবে না, তার মধ্যে বিকৃতি ঘটতে থাকে।" (রাজারানীর ভূমিকা—রবীন্দ্র রচনাবলী)

সুকুমারী (আনন্দঃ ১/১২)। মহেন্দ্র-কল্যাণীর কন্যা সুকুমারী নিতান্ত শিশুমাত্র। তাই উপন্যাসে সে বিষপান ক'রে, নিমাইয়ের মাতৃস্নেহ কেড়ে নিয়ে—ঘটনার সৃষ্টি করলেও চরিত্র হ'য়ে উঠতে পারেনি।

সুন্দরী (চন্দ্রঃ ১/২)। "সুন্দরী চন্দ্রশেখরের প্রতিবাসিনীর কন্যা, সম্বন্ধে তাঁহার ভগিনী, শৈবলিনীর সখী।" আবার, সুন্দরীর বোন রূপসীর স্বামী প্রতাপ। সুতরাং

সম্বন্ধের দিক থেকে 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে এ চরিত্রের উপস্থিতি অনিবার্য। তাছাড়া, সুন্দরীকে দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র আরও অনেক কাজ করিয়েছেন।

সুন্দরী সহজ-সরল গ্রাম্যবধূ। শৈবলিনীর সঙ্গে তার হাস্য-পরিহাস ও আন্তরিকতা বাঙালী গ্রাম্য মেয়েদের কথাই মনে পড়িয়ে দেয়। ভীমা পুষ্করিণীতে লরেন্স ফস্টরকে দেখে সুন্দরীর ভীতি ও পলায়ন—গ্রাম্য মেয়ের ইংরেজ ভীতিকেই প্রকাশ করেছে।

কিন্তু এই সুন্দরীই আবার প্রয়োজনে দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে। নাপিতানীর বেশে শৈবলিনীকে উদ্ধারের চেষ্টা তার সাহস, বুদ্ধি ও কুশলী মনের পরিচয় দেয়। শৈবলিনীকে সে যথার্থ ভালবাসে বলেই এরূপ কার্যে সাহস পেয়েছে। তাছাড়া, সে চন্দ্রশেখরকেও যথার্থ ভালবাসে। তাই সে চন্দ্রশেখরের মতো স্বামীকে ত্যাগ ক'রে শৈবলিনীর গৃহে প্রত্যাগমনের অসম্মতির কথা শুনে তাকে ধিক্কার দিয়েছে। সাধারণ বাঙালীবধূর মতোই স্বামীই তাদের একমাত্র দেবতা। তাই শৈবলিনী-উদ্ধারকালে স্বামীর সময়ে আহার না হওয়ায় উদ্বেগবোধ করেছে।

কিন্তু সুন্দরীর উভয়সংকট। তার সংস্কার শৈবলিনীর প্রতি ঘৃণা জাগিয়েছে, কিন্তু তার ভালবাসা শেষ পর্যন্ত শৈবলিনী-উদ্ধারের উপায় হিসাবে প্রতাপের কাছে পর্যন্ত তাকে টেনে নিয়ে গেছে। শৈবলিনীর প্রতি ভালবাসার বশেই সুন্দরী তার মৃত্যু-কামনা করেছে।

কাহিনীর অল্প অবসরে সুন্দরী চরিত্রটি সরলতায়, আন্তরিকতায়, ভালবাসায় ও সাহসিকতায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

সুভাষিণী (ইন্দিরা ৬ষ্ঠ পরিঃ)। "ইন্দিরা" উপন্যাসের সুভাষিণী, 'বিষবৃক্ষে'র কমলমণির দ্বিতীয় সংস্করণ। সুভাষিণীও পতিগতপ্রাণা, স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে সব কাজ করে। তার একটি কন্যা ও একটি পুত্র। পুত্রটি অস্ফুট কথায় মাতার ও অন্যান্যদের কাছ থেকে আদর কেড়ে নেয়। সুভাষিণীও প্রাণোচ্ছল। ইন্দিরার প্রতি তার ভালবাসা নিবিড়। ইন্দিরাকে সে যেভাবে চাকরি দিয়েছে, তাতে তার বুদ্ধির প্রশংসা করতে হয়। কমলমণি অবশ্য সুভাষিণীর মতো গৃহিণীপনায় দক্ষ ছিল না।

সুভাষিণীর চেষ্টাতেই ইন্দিরার সঙ্গে তার স্বামীর সাক্ষাৎ হয়। সুভাষিণীর হৃদয় অত্যন্ত মহৎ। তাই নিজের অলঙ্কার সে ইন্দিরাকে পরিয়ে আনন্দলাভ করতে চায়।

সুভাষিণী সুহাসিনীও বটে।

সুভাষিণীর ছেলে (ইন্দিরা ৮ম পরিঃ)। 'বিষবৃক্ষে'র শচীশচন্দ্রের প্রতিরূপ।

সুভাষিণীর শাশুড়ী (ইন্দিরা ৭ম পরিঃ)। চরিত্রটি খুবই উপভোগ্য। তাঁর রঙটা কালি-ভরা বোতলের মতো হলেও, মনটা ততটা কালি-ভরা নয়। তাঁকে

বোকা বানানো খুবই সোজা। দু'একটি পাকাচুল বেছেই ইন্দিয়া তাঁর মন জয় ক'রে নিয়েছিল। তিনি বিশ্বাস করতে চান না যে, তাঁর যৌবন গিয়েছে। তাছাড়া, কর্তার সামনেও কোন যুবতী মেয়েকে যেতে দেন না। পুত্রের প্রতি তাঁর স্নেহ অধিক। আর পাঁচটা সাধারণ গিন্নীর মতোই তাঁর চরিত্র।

সুরেন্দ্র (বিষঃ ২০শ পরিঃ)। দেবেন্দ্রের মাতুলপুত্র। ইনি সচ্চরিত্র। কিন্তু দেবেন্দ্রকে অত্যধিক ভালবাসতেন। তাই দেবেন্দ্রকে সৎপথে আনার বহু চেষ্টা করেছিলেন। অবশেষে হতাশ হয়ে দেবেন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেন।

সূর্যমুখী (বিষঃ ১ম পরিঃ)। সূর্যমুখী সূর্যের দিকে তাকিয়ে তাকিয়েই জীবন কাটিয়ে দেয়—তাতেই তার আনন্দ। "বিষবৃক্ষ" উপন্যাসের নায়িকা সূর্যমুখীর সূর্য—নগেন্দ্রনাথ। নগেন্দ্রনাথকে কেন্দ্র ক'রেই তার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ। কিন্তু স্বামীর প্রতি এই আত্যন্তিক আসক্তি তাকে ব্যক্তিত্বহীন নারীমাত্রে পর্যবসিত করেনি। বস্তুতঃ, বঙ্কিম-উপন্যাসে সূর্যমুখীর মতো প্রখর ব্যক্তিত্বশালিনী নারী খুব কমই আছে।

অনেকে বলে থাকেন, সূর্যমুখী হল বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয়া পত্নীর প্রতিচ্ছবি। এই ধারণা প্রতিষ্ঠা করবার মতো প্রমাণ বর্তমানে আর অবশিষ্ট নেই। তবে সূর্যমুখীর চরিত্র-পরিকল্পনার পিছনে লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের প্রভাবকে অস্বীকার করবার কোন কারণ নেই।

সূর্যমুখী সম্পন্ন বাঙালী ঘরের বধূ। উপন্যাসমধ্যে যখন তিনি আবির্ভূতা হয়েছেন, তখন তাঁর যৌবন চাপল্যের সীমা অতিক্রম ক'রে স্থৈর্যে এসে উপনীত হয়েছে। তাছাড়া, এতবড় এক জমিদারবাড়ীর গৃহিণী হিসাবে স্বভাবতঃই তাঁকে গাম্ভীর্য বজায় রাখতে হয়েছে। সূর্যমুখী লেখাপড়াও শিখেছিলেন। এই সমস্ত কারণে সূর্যমুখীর ব্যক্তিত্ব প্রখর হয়ে উঠেছে। কিন্তু উপযুক্ত স্থানে যে তাঁর স্বভাবগাম্ভীর্য শিথিল হয়, তার প্রমাণ পাই কমলমণির সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের মধ্যে।

সূর্যমুখী নগেন্দ্রের কাছ থেকে পত্রে কুন্দের কথা জানতে পেরে স্বামীকে রসিকতা ক'রে লিখেছেন—"একটি বালিকা কুড়াইয়া পাইয়া কি আমাকে ভুলিলে? অনেক জিনিসের কাঁচারই আদর। নারিকেলের ডাবই শীতল। এ অধম স্ত্রীজাতিও বুঝি কেবল কাঁচামিঠে? নহিলে বালিকাটি পাইয়া আমায় ভুলিলে কেন?" "যদি কুন্দকে স্বয়ং বিবাহ করিবার অভিপ্রায় করিয়া থাক, তবে বল, আমি বরণডালা সাজাইতে বসি।" (৫ম পরিঃ) ভাগ্যলক্ষ্মী তখন অদৃশ্যে হাসছিলেন। এই রসিকতাই শেষ পর্যন্ত সত্যে পরিণত হ'ল।

তারাচরণের সঙ্গে বিবাহদান, দেবেন্দ্রের হাত থেকে কুন্দকে রক্ষা এবং বিধবাকে নিজগৃহে রক্ষা করার মধ্যে সূর্যমুখীর দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

কিন্তু সূর্যমুখী অন্তরে বুঝতে পেরেছেন, তাঁর কপাল ভেঙেছে। স্বামীর প্রতিটি আচরণের প্রতি তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুঝিয়ে দিয়েছে, নগেন্দ্রের কোথায় অভাব। সে-কথা তিনি কমলমণিকে চিঠিতে জানিয়েছেন। কিন্তু স্বামীর প্রতি তাঁর এতটুকু অনুযোগ নেই। তিনি সমস্ত দোষ নিজের ঘাড়ে নিয়েছেন।

সূর্যমুখী যদি সাধারণ স্ত্রীলোক হতেন, তাহলে এত চিন্তার কারণ ছিল না। নগেন্দ্রনাথও সহজে কুন্দকে বিয়ে ক'রে দুই স্ত্রী নিয়ে সংসার করতে পারতেন।

সূর্যমুখীর সর্বাপেক্ষা আঘাত লাগল সেদিন, যেদিন নগেন্দ্র কুন্দের গৃহত্যাগের জন্য দায়ী করলেন সূর্যমুখীকে। সূর্যমুখী সচেষ্ট হলেন কুন্দের সঙ্গে স্বামীর বিবাহ দিতে। সূর্যমুখীর প্রেম এত গভীর যে, বিয়ের পর স্বামীর সুখ কতটুকু হয় সেটা দেখে যাবার সাধও তিনি মেটাতে চান।

তারপর পথে পথে সূর্যমুখীকে যেভাবে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে, তাতে তাঁর দুর্ভোগের চূড়ান্ত হয়েছে। বিষবৃক্ষের ফল, সূর্যমুখীকে এই বিচ্ছেদের জ্বালা সহ্য ক'রে, ভোগ করতে হয়েছে। তবে সূর্যমুখীর দোষ খুবই অল্প। তাই শেষ পর্যন্ত স্বামীর সঙ্গে তাঁর মিলন ঘটেছে।

সের (Xerxes) (রাজঃ ৫/৬)। পারস্য-সম্রাট। খ্রীষ্টপূর্ব ৪৮১ অব্দে গ্রীসের বিরুদ্ধে বিপুলসংখ্যক সৈন্য নিয়ে অভিযান করেন। ঐতিহাসিকদের মতে, সৈন্যসংখ্যা ছিল নাকি ২৫ লক্ষের উপর। রাজসিংহের ক্ষুদ্র রাজ্যের উপর ভারত-সম্রাট ঔরঙ্গজেবের আক্রমণ উপলক্ষ্যে সেরের কথা বলা হয়েছে।

সেলিম (কপাঃ ৩/১)। আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীরের যুবরাজ থাকাকালীন নাম সেলিম। "কপালকুণ্ডলা" উপন্যাসে সংক্ষেপে ঐতিহাসিক সেলিমের রাজ্যপ্রাপ্তির কথা আছে। মেহের-উন্নিসার প্রতি জাহাঙ্গীরের প্রেমও ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু লুৎফ-উন্নিসার প্রতি জাহাঙ্গীরের প্রেমের ব্যাপারটা বঙ্কিমের সম্পূর্ণ কাল্পনিক সংযোজন। এই উপন্যাসে সেলিমকে বহু নারীতে আসক্ত চরিত্ররূপে অঙ্কিত করা হয়েছে।

সৈদ খাঁ (দুর্গেঃ ১/৩)। মানসিংহ বাংলা ও বিহারের শাসনকর্তারূপে এসে সৈদ খাঁকে বঙ্গদেশে প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করেন।

সৈয়দ আমির হোসেন (চন্দ্রঃ ৬/৩)। ঁয়নালার শিবিরে ইনি কুল্‌সমকে নবাবের কাছে আনার সাহায্য করেছিলেন।

সৈয়দ হাসান আলি (রাজঃ ৩/৮)। রূপনগরের রাজকন্যাকে আনতে যাবার

সময় তিনি ছিলেন মোগল সেনাপতি। যেভাবে তিনি দরিয়ার নাচে ভুলে তাকে নিজ অশ্বারোহী সেনামধ্যে গ্রহণ করেছিলেন, তাতে তাঁকে স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন বলতে বাধা নেই।

সোনা (কৃ: উ: ২/৬)। প্রসাদপুরে গোবিন্দলালের ভৃত্য। অর্থলোভী।

সোপেনহয়র (রজনী ৩/৩)। জার্মানির দুঃখবাদী দার্শনিক Arthur Schopenhauer (১৭৮৮ খ্রী:—১৮৬০ খ্রী:)। ভারতবর্ষের উপনিষদ্ ও বুদ্ধদেবের ধর্ম তাঁর দর্শনতত্ত্বকে অনুপ্রেরণা দান করে। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "The World as Will and Idea."

হক্‌সলী (রজনী ২/৪)। ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক। তাঁর পুরা নাম—Thomas Henry Huxley (১৮২৫—১৮৯৫ খ্রী:)। তিনি ডারউইনের বিবর্তনবাদের (Laws of Evolution) প্রধান সমর্থক। কোম্‌তের মতবাদেরও তিনি সমর্থক ছিলেন। তবে ঈশ্বরে তিনি একেবারে অবিশ্বাস করেননি। তাঁর মতে, এই বিশ্ব-জগতের নিয়ন্ত্রারূপে একটি অজ্ঞেয় শক্তি নিশ্চয়ই আছে।

হরদেব ঘোষাল (বিষ: ৫ম পরি:)। নগেন্দ্রের বন্ধু। তিনি বিদেশে থাকেন। উপন্যাসে এ চরিত্রটির উপস্থিতি নেই। এঁর সঙ্গে কেবল নগেন্দ্রের পত্র-বিনিময় হয়েছে। এই পত্রের দ্বারা নগেন্দ্রের মনের খবর পাওয়া যায়। হরদেব ঘোষালের পত্র থেকে বুঝা যায়, তিনি বিজ্ঞ এবং লোকচরিত্রে অভিজ্ঞ। নগেন্দ্রের প্রতি তাঁর ভালবাসাও প্রবল।

হরনাথ বসু (রজনী ১/৪)। রামসদয়বাবুর বাড়ীর সরকার। এঁরই ছেলের সঙ্গে প্রথমে রজনীর বিয়ের কথা হয়।

হরবল্লভ (দেবী: ১/২)। ব্রজেশ্বরের পিতা হরবল্লভকে চিনতে কোন অসুবিধা হয় না। এই অর্থপিশাচ, স্বার্থান্ধ, হীনমন্য চরিত্রটি আমাদের আশেপাশে একেবারে দুর্লভ নয়। বঙ্কিমচন্দ্রও নাকি তাঁর পরিচিত কোন ব্যক্তির চরিত্র হরবল্লভে অনু-প্রবেশ করিয়েছেন বলে শোনা যায়।

হরবল্লভ হৃদয়হীন। লোকের কথায় প্রফুল্ল ও তার বিধবা মাকে বাগ্দী অপবাদ দিতে তাঁর বাধে না। তবে এটুকু সুখের বিষয় যে—'প্রফুল্ল কাঙ্গালের মেয়ে বলিয়া যে হরবল্লভবাবু তাঁহাকে ঘৃণা করিতেন তাহা নহে।'

হরবল্লভ টাকার লোভেই সাগরের সঙ্গে ব্রজেশ্বরের বিয়ে দিয়েছিলেন। আবার, টাকার প্রয়োজনেই নীতিজ্ঞান বিসর্জন দিয়ে তিনি দেবী চৌধুরাণীর অর্থ গ্রহণ করেছিলেন। সেই অর্থ ফেরৎ যাতে না দিতে হয়, তার জন্য যখন তিনি সাহেবের কাছে গোয়েন্দাগিরি করতে গেলেন, তখনও পারিতোষিকের আশা ছাড়েননি। প্রফুল্লর সঙ্গে

ব্রজেশ্বরের পুনর্বিবাহে হরবল্লভ পুত্রকে নির্দেশ দান করেন—"তা তোমায় আর বলিব কি, তুমি ছেলেমানুষ নও—কুল, শীল, জাতি, মর্য্যাদা, সব আপনি দেখে শুনে বিবাহ করবে। (পরে একটু আওয়াজ খাটো করিয়া বলিতে লাগিলেন) আর আমাদের যেটা ন্যায্য পাওনা গণ্ডা, তাও ত জান ?" (৩/১০)

হরবল্লভ বাইরে আস্ফালন করলেও, আসলে তিনি অত্যন্ত কাপুরুষ। দেবীকে ধরিয়ে দেবার সময় তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে অবস্থান করেছিলেন। প্রাণের মায়া তাঁর অত্যন্ত বেশী। তাই নৌকাডুবির ভয়ে নৌকাতেও উঠতে চাননি। ভাগ্যক্রমে দেবীর নৌকায় উঠে তাঁর বিপদের অন্ত নেই। শূলে যাবার কথা শুনে "হরবল্লভ ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল।"

হরবল্লভের সহস্র দোষের মধ্যে একমাত্র গুণ ও দুর্বলতা—পুত্রস্নেহ। ব্রজেশ্বরের উপর তিনি কড়া শাসন চালালেও, তার প্রতি স্নেহ তাঁর অসীম। প্রফুল্লর মৃত্যুশোকে মৃতপ্রায় পুত্রের কাছে "হরবল্লভ প্রতিজ্ঞা করিলেন, "এবার দেবতা ব্রজেশ্বরকে বাঁচাইলে, আর আমি তার মন না বুঝিয়া কোন কাজ করিব না।" নিশি হরবল্লভের এই দুর্বল স্থানটুকুর সন্ধান জানে। তাই সে বলেছে—"ব্রজেশ্বরের মাথায় হাত দিয়া দিব্য করিতে পার ? হরবল্লভ গর্জ্জিয়া উঠিল। বলিল, "তোমাদের যা ইচ্ছা, তাহা কর। আমি তা পারিব না।" (৩/৮) কাপুরুষ হরবল্লভের এই সাহসের উৎস পুত্রের প্রতি স্নেহ। ব্রজেশ্বরের নববিবাহিতা স্ত্রী প্রফুল্ল—এ-কথা জেনে হরবল্লভ আর একবার স্বমূর্তি ধারণ করবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু গিন্নী পুত্রের দোহাই দিয়ে কর্তাকে শান্ত করলেন।

প্রফুল্লর গুণে অবশেষে এই হরবল্লভও বশীভূত হয়েছিলেন, এটা অত্যন্ত সুখের বিষয়।

হরমোহন দত্ত (ইন্দিরা ১ম পরিঃ)। ইন্দিরার বড়মানুষ পিতা। গরীব স্বামীর কাছে কন্যাকে না পাঠানোতে তাঁর অর্থের অহঙ্কারই প্রকাশিত হয়েছে। আবার, ইন্দিরার শ্বশুরের অবস্থা ফিরলে তিনি যেভাবে ব্যঙ্গ করেন, তাতেও তাঁর চরিত্রের খারাপ দিকটিই প্রকাশিত।

হরমণি (বিষঃ ৩৪ পরিঃ)। হরমণি ব্রহ্মচারীর শিষ্যা। এঁর গৃহেই সূর্যমুখীকে উদ্ধার ক'রে এনে ব্রহ্মচারী রেখেছিলেন। চরিত্রটির বিশেষ পরিচয় নেই। তবে হরমণির পরোপকার-প্রবৃত্তি ও সহৃদয়তা, সূর্যমুখীর সেবা পাঠককে মুগ্ধ করে। হরমণির নিজের গৃহে পুড়ে মরার ঘটনাটি নগেন্দ্রকে বিভ্রান্ত করেছিল।

হরমণি ঠাকুরাণী (কৃঃ উঃ ১/২১)। জমিদারবাড়ীর একজন পাচিকা।

হরলাল (কৃঃ উঃ ১/১)। হরলালকে "কৃষ্ণকান্তের উইল"-এর খলচরিত্র বলে

অভিহিত করা যেতে পারে। তার মনটা কুটীল। তাই পিতার স্বাস্থ্য উইলে সে সন্তুষ্ট হয় না। পিতাকে সে কুপরামর্শ দিয়ে উইল বদল করতে চায়।

হরলাল বাল্যকাল থেকেই দুর্দান্ত ও দুর্বিনীত। বাল্যকালে সে নাকি গুরুমশায়ের গোঁফ পুড়িয়ে দিয়েছিল। পিতার সঙ্গে তর্ক করতেও সে দ্বিধা করে না। অবশেষে তাকে গৃহত্যাগ করতে হয়। তখন সে পিতাকে বিধবাবিবাহ করবার ভয় দেখায়। কিন্তু তাতেও সফল না হয়ে উইল জাল করবার চেষ্টা করে। উইল জালের পদ্ধতি, হাতসাফাই এবং দুষ্টবুদ্ধিতে সে পটু। ব্রহ্মানন্দের কাছে কাজ আদায় করতে ব্যর্থ হয়ে, সে রোহিণীকে অর্থ প্রলোভন দেখিয়ে উইল জালের কাজে নিযুক্ত করেছে। কিন্তু তাতেও সফল না হয়ে, রোহিণীকে নিয়ে ঘর বাঁধবার আশ্বাস দিয়েছে। একজন নারীর সর্বনাশ করতেও তার বাধে না। কার্যসিদ্ধির পর রোহিণীকে বিবাহ করতে সে যেভাবে অস্বীকার করেছে, তাতে তার চরিত্রটি আরও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। উইল জালের প্রাথমিক প্রয়োজনে উপন্যাসমধ্যে হরলালের উপস্থিতি। তারপর তার আর খোঁজ পাওয়া যায় না। এটাকে ত্রুটিই বলতে হবে। উপন্যাসের শেষে যখন দেখি, অন্য একজন এসে কৃষ্ণকান্তের সম্পত্তি ভোগ করছে, তখন পাঠক স্বভাবতঃই অনুসন্ধান করতে চান—হরলাল, তার স্ত্রী ও শিশুপুত্র কোথায় গেল?

হরি (কৃঃ উঃ ১/৪)। কৃষ্ণকান্তের খানসামা। রাত্রে 'তাঁহার প্রহরী স্বরূপ শয়ন করিত।'

হরিদাসী বৈষ্ণবী (বিষঃ ৯ম পরিঃ)। এই ছদ্মনামে স্ত্রীলোক সেজে দেবেন্দ্র নগেন্দ্রের অন্দরমহলে কুন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য যাতায়াত করতো।

হরেকৃষ্ণ দাস (রজনী ২/২)। রজনীর পিতা। গৃহিণীর মৃত্যু হওয়ায় এবং নিজেও রুগ্ন থাকায়, সে তার শ্যালিপতিকে কন্যাটি প্রতিপালন করতে দেয়। কিন্তু— "তাহার কন্যাটির কতকগুলি স্বর্ণালঙ্কার ছিল। লোভবশতঃ তাহা সে শ্যালিপতিকে দেয় নাই।"

হলায়ুধ (মৃণাঃ ২/১)। খ্যাতনামা পণ্ডিত। ইনি লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রী ছিলেন বলে কথিত আছে। ইনি 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। 'মৃণালিনী'র রাজসভাতে এঁর উপস্থিতি আছে।

হস্টিন্ (দেবীঃ ১/১২)। ভারতের ইংরাজ গভর্নর জেনারেল Warren Hasting-এর কথা বলা হয়েছে। ইনি ভারতবর্ষে ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ছিলেন। কোম্পানির শাসন দৃঢ়তর করবার জন্য ইনি ভারতে অনেক কুকার্য করেছিলেন। তার জন্য ইংলণ্ডে তাঁর দীর্ঘ ৭ বছর ধরে বিচার চলেছিল।

হারাণী (ইন্দিরা ৭ম পরিঃ)। সুভাষিণীর বাড়ীর ঝি। "ইন্দিরা" উপন্যাসে এই ঝিটি বিশিষ্টতামণ্ডিত হয়েছে। তারও ইন্দিরার মতো হাসির রোগ। কিন্তু সাধারণ ঝি-র মতো তার স্বভাবচরিত্র খারাপ নয়। তাই ইন্দিরা যখন তাকে উপেন্দ্রবাবুর সঙ্গে অভিসারের কাজে সহায়তা করতে আহ্বান জানিয়েছিল, তখন সে দারুণ ঘৃণাভরে তা প্রত্যাখ্যান করেছিল। এমনকি টাকাও ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। তবে সে সুভাষিণীকে ভালবাসত। তাই সুভাষিণীর কথা শুনলো। সে জানত, সুভাষিণী অন্যায় কিছু বলবে না। অবশ্য, সে ইন্দিরাকেও ভালবাসত। ইন্দিরার স্বামীর সঙ্গে মিলনের খবর পেয়ে সে-ও খুব আনন্দিত হয়েছে।

হিরণ্ময়ী (যুগঃ ১ম পরিঃ)। "যুগলাঙ্গুরীয়" আখ্যানের নায়িকা হিরণ্ময়ী প্রেমের মহিমায় সমুজ্জ্বল। তিনি প্রাপ্তযৌবনা। বাল্যসখা পুরন্দরকে তিনি ভালবাসেন। কিন্তু সেই প্রেম সংযত। তাই পিতার নিষেধকে বহন ক'রে হিরণ্ময়ী পুরন্দরকে বিদায় দিয়েছেন। কিন্তু পুরন্দরের স্মৃতি তিনি চিরদিন বহন করেছেন। তবে পুরন্দরের সঙ্গে বিবাহ না হওয়ায় হিরণ্ময়ীর মনকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে—একটি ছিন্ন চিঠির অংশ দেখিয়ে, যাতে তাঁদের বিবাহের অশুভ ইঙ্গিত আছে। হিরণ্ময়ী যে পিতৃ-আজ্ঞা অমান্য করেননি, তার প্রমাণ বহু স্থানে আছে। পিতার আদেশেই তিনি চোখ-বাঁধা অবস্থায় বিবাহ করেছেন। পিতার মৃত্যুর পর হিরণ্ময়ী যেভাবে পিতৃঋণ শোধ করেছেন, তাতে তাঁর মহৎ হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। দুঃখের সময়েও অন্যের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণ না করা তাঁর আভিজাত্যের পরিচায়ক।

হিরণ্ময়ী যখন জানলেন, রাজা মদনদেব তাঁর স্বামী, তখন তিনি দুঃখিতই হলেন। কিন্তু পিতৃদেবের দেওয়া বিবাহকে অমান্য করতে পারলেন না। অবশেষে মনের মধ্যে যখন পুরন্দর ছাড়া আর কারো স্মৃতি খুঁজে পেলেন না, তখন বিদ্রোহ করলেন। হিরণ্ময়ীর প্রেমের পরীক্ষা এখানেই। তাঁর প্রেমের কাছে রাজমহিষীর আসনও তুচ্ছ। এর পুরস্কার তিনি পেলেন প্রেমিক এবং স্বামী পুরন্দরের সঙ্গে মিলনে।

হীরা (বিষঃ ৭ম পরিঃ)। ভারতচন্দ্রের হীরামালিনী একটি বিখ্যাত চরিত্র। বঙ্কিমের হীরাও কম যায় না। হীরামালিনীর মতো সে-ও দেবেন্দ্রের কাছ থেকে কুন্দের প্রতি প্রেম-নিবেদনে দূতী হবার কাজ পেয়েছিল। কিন্তু সেটাই হল তার কাল। সে নিজে ভালবেসে ফেলল দেবেন্দ্রকে।

হীরা দাসী কিন্তু ভদ্রঘরের মেয়ে। সে বাল্যবিধবা। সে গরীব। তার এই ভাগ্য-বিড়ম্বনা তার চরিত্রটিকে স্বভাবকুটীল ক'রে তুলেছে। সূর্যমুখীর কর্তৃত্বে সে ঈর্ষ্যা প্রকাশ করে। সূর্যমুখীকে সে জব্দ করতে চায়। তার উপায় হিসাবে সে সরলা কুন্দকে

ব্যবহার করে। কুন্দকে গোপনে লুকিয়ে রেখে, চতুরতার সঙ্গে নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর বিরোধ বাধায়। হীরার আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল—কুন্দ দত্তবাড়ীর গৃহিণী হলে বোকা কুন্দকে হাত ক'রে তার বেশ কিছু উপায় হবে।

হীরা বোকামি ক'রে বসলো দেবেন্দ্রকে প্রাণ সমর্পণ ক'রে। দেবেন্দ্রের কাছ থেকে কুন্দকে সরাবার জন্যও নগেন্দ্র-কুন্দের মিলন ঘটানো তার পক্ষে দরকার হয়ে পড়েছিল।

দেবেন্দ্রের প্রতি হীরার ভালবাসার তীব্রতার দ্বারা হীরা চরিত্রের মালিন্য কিছুটা ধুয়ে গেছে। দেবেন্দ্রের পাপবাসনার সঙ্গিনী না হয়ে সে দেবেন্দ্রের সহধর্মিণী হ'তে চেয়েছিল।

কুন্দকে বিষ দিয়ে হত্যা করার পিছনে হীরার কি উদ্দেশ্য ছিল, তা সে নিজে দেবেন্দ্রের মৃত্যুশয্যায় ব্যক্ত করেছে—"যে দিন তুমি আমাকে উৎসৃষ্ট করিয়া লাথি মারিয়া তাড়াইলে, সেই দিন হইতে আমি পাগল হইয়াছি। আমি আপনি বিষ খাইতে গিয়াছিলাম—একটা আহ্লাদের কথা মনে পড়িল—সে বিষ আপনি না খাইয়া তোমাকে কি তোমার কুন্দকে খাওয়াইব। সেই ভরসায় কয় দিন কোন মতে আমার পীড়া লুকাইয়া রাখিলাম—আমার এ রোগ কখন আসে, কখন যায়। যখন আমি উন্মত্ত হইতাম, তখন ঘরে পড়িয়া থাকিতাম, যখন ভাল থাকিতাম, তখন কাজকর্ম্ম করিতাম। শেষে তোমার কুন্দকে বিষ খাওয়াইয়া মনের দুঃখ মিটাইলাম; তাহার মৃত্যু দেখিয়া অবধি আমার রোগ বাড়িল। আর লুকাইতে পারিব না—দেখিয়া দেশত্যাগ করিয়া গেলাম। আর আমার অন্ন হইল না—পাগলকে কে অন্ন দিবে? সেই অবধি ভিক্ষা করি—যখন ভাল থাকি, ভিক্ষা করি; যখন রোগ চাপে, তখন গাছতলায় পড়িয়া থাকি। এখন তোমার মরণ নিকট শুনিয়া একবার আহ্লাদ করিয়া তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। আশীর্ব্বাদ করি, নরকেও যেন তোমার স্থান না হয়।" (৫০ পরিঃ)

হীরা চরিত্র যেমনি ঘৃণ্য, তার শাস্তিও তেমনি ভয়ানক। বঙ্কিম যে বিচারক, তা তিনি ভোলেননি।

হীরার আয়ি (বিষঃ ১৯ পরিঃ)। হীরার পালিকা এই বৃদ্ধাকে দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র হাস্যরসের অবতারণা করেছেন। স্বল্প অবসরে চরিত্রটি সার্থক হয়ে উঠেছে। হীরার 'ইষ্টিরস' রোগের জন্য যেভাবে আয়ি 'কেষ্টরসের' বিধান এনেছে, তাতে হাস্যরসের এক নতুন দিক উন্মোচিত হয়েছে।

হীরালাল (রজনী ১/৫)। "রজনী" উপন্যাসের অল্প অবসরে হীরালালের 'ভিলেন' চরিত্রটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। বঙ্কিম হীরালালের যে পরিচয় দিয়েছেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল—সে মদ খায়, গাঁজা খায়। একটি খবরের কাগজ ক'রে জাঁকিয়ে

বসলো, কিন্তু অশ্লীলতাদোষে পুলিশের হাতে পড়ল। অবশেষে নাটক লিখতে বসলো। কিন্তু তাতেও না চলায়, শেষ পর্যন্ত "হীরালাল চাঁপাদিদির আঁচল ধরিয়া বসিয়া রহিল।"

রজনীর অন্ধত্বের সুযোগ নিয়ে হীরালালের কুপ্রস্তাব ও নদীর মধ্যে এক নির্জন দ্বীপে ত্যাগ ক'রে যাওয়া জঘন্যতম মনোবৃত্তির পরিচায়ক।

বঙ্কিম-জীবনীকার শচীশচন্দ্রের মতে, "রজনী"র হীরালাল চরিত্র তৎকালীন এক সংবাদপত্র-সম্পাদকের ছায়ানুসরণে রচিত। কিন্তু বঙ্কিম কালীপ্রসন্ন ঘোষকে পত্র দ্বারা জানান, ব্যক্তিবিশেষ কোন সম্পাদককে তিনি আক্রমণ করেননি। সেই সময়কার বহু সম্পাদকের সাধারণ চরিত্রবৈশিষ্ট্যই এতে প্রকাশিত হয়েছে।

হৃষীকেশ (মৃণাঃ ১/২)। হৃষীকেশ মাধবাচার্যের এক শিষ্য। এঁর গৃহেই মাধবাচার্য মৃণালিনীকে রেখে এসেছিলেন। হৃষীকেশ সাধারণ মানুষ। নিজপুত্রের দোষ তিনি দেখেন না। তাই মৃণালিনীকে তিনি কুলটা অপবাদ দিয়ে গৃহ থেকে বিতাড়িত করেছেন।

হে (**কাপ্তেন**) (আনন্দঃ ৩/১০)। কাপ্তেন টমাসের সহযোগী একজন ইংরেজ সৈনিক।

হে (চন্দ্রঃ ৩/৩)। ইংরেজ। অমিয়ট চলে গেলে নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য নাকি হে-কে রেখে যায়—গুরগণ এ-কথা নবাবকে বলেছেন।

হেমচন্দ্র (মৃণাঃ ১/১)। হেমচন্দ্র চরিত্রটিকে দেশপ্রেমে, বীরত্বে ও প্রেমের প্রকাশে আদর্শ চরিত্ররূপে উপস্থাপন করা হয়েছিল সত্য, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমস্ত গুণগুলিই অসঙ্গত হয়ে উঠেছে।

হেমচন্দ্র হৃত পিতৃরাজ্য উদ্ধার কামনায় বক্তিয়ার খিলিজির সঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়েছেন। কিন্তু তাই বলে তিনি অন্যায়ভাবে সুযোগ বুঝে বক্তিয়ার খিলজিকে মারতে চাননি। তাই তিনি বলেছেন—"আমি কি চোরের মত বিনা যুদ্ধে শত্রু মারিব? আমি মগধবিজেতাকে যুদ্ধে জয় করিয়া পিতার রাজ্য উদ্ধার করিব। নহিলে আমার মগধ-রাজপুত্র নামে কলঙ্ক।"

কিন্তু হেমচন্দ্রের সমস্ত বীরত্ব আস্ফালনে পরিণত হয়েছে তাঁর ছেলেমানুষীসুলভ আচরণে। মাধবাচার্য কর্তৃক যেভাবে হেমচন্দ্রকে বারবার যুদ্ধে উৎসাহদান করা হয়েছে, তাতে মনে হয় না যে, শত্রু-আক্রমণে তাঁর যথেষ্ট উৎসাহ আছে। তাছাড়া, নবদ্বীপে গিয়েও তিনি যথার্থ সংগঠকের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেননি। যেভাবে শান্তশীলের কাছে তিনি বন্দী হয়েছেন, যেভাবে একাকী শত্রু-সেনামধ্যে গিয়ে পড়েছেন, তাতে তাঁর বুদ্ধিরও প্রশংসা করা যায় না।

হেমচন্দ্র একাকী তিনজন যবনসেনার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে একবার বীরত্ব প্রকাশ করেছেন। নবদ্বীপে যবন অত্যাচারকালেও তাঁর বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তারপর তিনি সেবাকার্যে ব্রতী হন।

মৃণালিনীর প্রতি হেমচন্দ্রের ভালবাসার স্বরূপ নির্ণয় করাও দুরূহ। যে মৃণালিনীকে দর্শনের জন্য তিনি পাগল, সেই মৃণালিনীর কুৎসা তিনি অনায়াসে বিশ্বাস করেন, এমনকি মৃণালিনীর সবকথা শুনতেও তিনি নারাজ।

মনোরমার প্রতি ব্যবহারে হেমচন্দ্রের মনে সুকোমল ভ্রাতৃভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু গিরিজায়ার প্রতি ব্যবহারে হেমচন্দ্রের সকল গুণ ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। গিরিজায়াকে হেমচন্দ্র বেত্রাঘাত করতে গেলে গিরিজায়া বলেছে—"বীর পুরুষ বটে! এই রকম বীরত্ব প্রকাশ করিতে বুঝি নদীয়ায় এসেছ? কিন্তু প্রয়োজন ছিল না—এ বীরত্ব মগধে বসিয়াও দেখাইতে পারিতে। মুসলমানের জুতা বহিতে, আর গরিবদুঃখীর মেয়ে দেখিলে বেত মারিতে।" "তুমি মৃণালিনীকে বিবাহ করিবে? মৃণালিনী দূরে থাক, তুমি আমারও যোগ্য নও।"

বাস্তবিক, বঙ্কিমচন্দ্র হেমচন্দ্রকে এমনিই হেয় ক'রে ফেলেছেন।

হেমা (ইন্দিরা ৯ম পরিঃ)। সুভাষিণীর পাঁচ বছরের মেয়ে। "মেয়েটি বড় শ্লোক বলিতে ভালবাসিত।"

হৈমবতী (বিষঃ ১০ম পরিঃ)। দেবেন্দ্রের স্ত্রী। "হৈমবতীর অনেক গুণ—সে কুরূপা, মুখরা, অপ্রিয়বাদিনী, আত্মপরায়ণা।" এর জ্বালাতেই দেবেন্দ্র চরিত্রহীন হয়েছিল।

হৈমবতী (মৃণাঃ ২/৬)। মনোরমার প্রথমজীবনে নাম ছিল হৈমবতী। (দ্রঃ মনোরমা।)

হোসেন শাহা (দুর্গেঃ ১/৫)। 'বাঙ্গালার পাঠান সম্রাট্‌দিগের শিরোভূষণ হোসেন শাহা'র নাম "দুর্গেশনন্দিনী" উপন্যাসে উল্লিখিত হয়েছে। বঙ্কিম বলেছেন—তাঁরই সেনাপতি ইস্‌মাইল গাজি গড়-মান্দারণ দুর্গ নির্মাণ করেন।

বঙ্কিম-উপন্যাসের দুরূহ শব্দ, ভৌগোলিক স্থান ও বিবিধ বিষয়

অধোভাগ-মণ্ডনকারী (কপাঃ ১/৩)। নিম্নভাগ পরিবেষ্টিত।

অনুযায়িনী (কপাঃ ১/৩)। সমতল।

অষ্ট নায়িকা (দেবীঃ ২/৬)। অষ্টনায়িকা বলতে নারীর এই আটটি রূপকে বোঝানো হয়ে থাকে—মঙ্গলা, বিজয়া, ভদ্রা, জয়ন্তী, অপরাজিতা, নন্দিনী, নারসিংহী, কৌমারী। কিন্তু দুর্গার অষ্টশক্তিকেও অষ্টচণ্ডী বা অষ্টনায়িকা রূপ বলা হয়ে থাকে। সেগুলি এই—উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, অতিচণ্ডা, চামুণ্ডা, চণ্ডা, চণ্ডবতী। কোথাও কোথাও চণ্ডীর অষ্টমূর্তির এই নামগুলি পাওয়া যায়—মঙ্গলা, বিমলা, সর্বমঙ্গলা, কালী, রাত্রিকালিকা, বিকটা, কামাখ্যা, ভবানী।

আজিমাবাদ (চন্দ্রঃ ২/১)। বর্তমান পাটনার প্রাচীন নাম।

আম খাস (রাজঃ ৬/৩)। দিল্লীর বাদশাদের দু'রকম দরবার ছিল—আম-দরবার ও খাসদরবার। আমদরবারে সাধারণ লোকরা রাজার কাছে অভাব-অভিযোগ পেশ করতো এবং খাসদরবারে বিশেষ বিশেষ সম্মানীয় ব্যক্তিদের আগমন হত। এই দুই দরবারকেই এখানে আম খাস বলা হয়েছে।

আমোদর নদী (দুর্গেঃ ১/৫)। পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলা থেকে উৎপন্ন হয়ে এই ছোট নদীটি হুগলী জেলায় মুণ্ডেশ্বরী নদীতে এসে পড়েছে। এই নদীর তীরেই এককালে গড-মান্দারণ দুর্গ অবস্থিত ছিল। কামারপুকুরের সন্নিকটে নদীটি গড়-মান্দারণের ভগ্নাবশেষের পাশ দিয়ে এমনভাবে বয়ে গেছে, যেন গড়টিকে ঘিরে রেখেছে।

আর এক চিত্রে শ্রীরাম জানকী লইয়া (বিষঃ ৪৪ পরিঃ)। কালিদাসের 'রঘুবংশ' থেকে এই চিত্রের অনেকাংশ গ্রহণ করা হয়েছে।

আরণ্যক (চন্দ্রঃ ১/৫)। "বেদের ব্রাহ্মণভাগের এক অংশ।...অরণ্যে পাঠ্য গ্রন্থ আরণ্যক।...আরণ্যক রূপকবহুল রহস্যবিদ্যা।...আরণ্যকের উক্তির মধ্যে বিভিন্ন উপনিষদের 'মহাবাক্য'গুলির বীজ পাওয়া যায়।" (ভারতকোষ—১ম খণ্ড)

আহেল বিলায়াত (রাজঃ ২/১)। ফারসী শব্দ। অর্থ—আসল বিদেশী।

আঁধি (দেবীঃ ১/৩)। ধূলার ঝড়কে 'আঁধি' বলে। কিন্তু এখানে হরবল্লভ স্ত্রীর উদ্দেশ্যে ভেবেছে—'ঘুম ভাঙ্গাইবার আঁধি তুমি নিজে'। এখানে আঁধি কথাটি আধার, উৎস বা মূল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আঞ্চলিক শব্দ।

ইপিকা (রজনী ১/২)। একটি হোমিওপ্যাথি ওষুধ (Ipecac)। দক্ষিণ আমেরিকার একপ্রকার ঔষধির মূলের নির্যাস।

ইয়াদদাস্ত (রজনী ৩/৪)। অর্থ—স্মরণচিহ্ন বা স্মারকলিপি। বিদেশী সম্ভবতঃ ফারসী শব্দ।

ঈশ্বরসিদ্ধেঃ প্রমাণাভাবাৎ (দেবীঃ ৩/২)। অর্থ—কোন প্রমাণ নেই বলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। এটি সাংখ্যদর্শনের কথা।

উৎকল (দুর্গেঃ ১/৩)। বর্তমান উড়িষ্যার প্রাচীন নাম। "এক সময়ে কশাই (কপিশা) ও বৈতরণী নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ (অর্থাৎ আধুনিক বালেশ্বর জেলা ও মেদিনীপুরের কিয়দংশ) 'উৎকল' নামে খ্যাত ছিল এবং বৈতরণী হইতে গোদাবরী (পরে কৃষ্ণা হইতে মহানদী) পর্য্যন্ত বিস্তৃত দেশকে কলিঙ্গ বলা হইত।" (ভারতকোষ)

"দুর্গেশনন্দিনী" উপন্যাসে আফগান-অধিকৃত উৎকল থেকে আকবরের সেনাদল কর্তৃক আফগানদের বিতাড়নের সময়ের কথা বলা হয়েছে।

উদয়গিরি (সীতাঃ ১/১৩)। উড়িষ্যার রাজধানী ভুবনেশ্বরের ৪ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত বালিপাথরের পাশাপাশি দুটি পাহাড় আছে—একটির নাম উদয়গিরি, অন্যটির নাম খণ্ডগিরি বা অস্তগিরি। উদয়গিরির উচ্চতা ১২৩ ফুট ও খণ্ডগিরির উচ্চতা ১১০ ফুট। দুটি পাহাড়েই জৈন সাধুদের প্রাচীন গুহা ও মন্দির আছে।

উপনিষদ্ (চন্দ্রঃ ১/৫)। বেদের অন্তিম অংশ। এর সংখ্যা অনেক। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইয়ের নির্ণয়সাগর প্রেস থেকে ১২০টি উপনিষদের এক সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। "উপনিষদ্ শব্দটির অর্থব্যাখ্যা লইয়াও মতভেদ দেখা যায়। অনেকে বলেন, গুরুর সমীপে (উপ-) আসিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে উপবেশন করিয়া (নি- √সদ্) জিজ্ঞাসু বিদ্যার্থী যে ব্রহ্মবিদ্যা গ্রহণ করিতেন, তাহাই উপনিষদ্। আবার কাহারও মতে, ব্রহ্মবিদ্যার নিকট (উপ-) উপস্থিত হইয়া নিশ্চয়ের সহিত (নি-) ইহার অনুশীলন করিলে অবিদ্যাদি সংসারবন্ধন বিনাশপ্রাপ্ত হয় (√সদ্), তাই ইহা উপনিষদ্।" (ভারতকোষ—১ম)

একখানি চিত্র কুমারসম্ভব হইতে নীত (বিষঃ পরিঃ ৪৪)। কালিদাসের "কুমারসম্ভব"-এর তৃতীয় সর্গের তিনটি শ্লোকের চিত্র বঙ্কিম এখানে উপস্থাপিত করেছেন। মূল শ্লোকগুলি এই—

"লতাগৃহদ্বারগতোঽথনন্দী বামপ্রকোষ্ঠার্পিত হেমবেত্রঃ।
মুখার্পিতৈকাঙ্গুলী সংগয়ৈব মাচাপলায়েতি গণান্ ব্যনৈষীৎ।

নিষ্কম্পবৃক্ষং নিভৃত দ্বিরেফং মূকাণ্ডজম্ শান্তমৃগপ্রচারম্
তচ্ছাসনাৎ কাননমেব সর্ব্বং চিত্রার্পিতারম্ভ ইবা ততস্থে।
উমাপিনীলালকমধ্যশোভিবিস্রংসয়ন্তী নবকর্ণিকারং
চকার কর্ণচ্যুতপল্লবেন মূর্দ্ধা প্রণামাং বৃষভধ্বজায়।"

এ কালের জটিলা কুটিলাদিগকে (রজনী ১/১)। সংকীর্ণমনা পাঠিকাদের লক্ষ্য ক'রে এই মন্তব্য করা হয়েছে। জটিলা ও কুটিলা শ্রীরাধার শাশুড়ী ও ননদ। অর্থাৎ, রাধার লৌকিক স্বামী আয়ান ঘোষের মাতা ও ভগ্নী। এঁরা কৃষ্ণের প্রতি রাধার মেলামেশা দেখে রাধাকে অসতী বলে অপবাদ দেন। ছদ্মবেশী কৃষ্ণ অবশেষে এঁদের জব্দ করেন।

এলচি (রাজঃ ৬/৩)। রাজদূত।

ওয়েস্টমিনিস্টার হল (দেবীঃ ১/৮)। লণ্ডনের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ প্রাসাদ। এখানে ইংলণ্ডের রাজা প্রথম চার্লসের বিচার হয়। এখানে ভারত-শাসক ওয়ারেন হেস্টিংসকে অভিযুক্ত ক'রে দীর্ঘ সাত বছর ধরে বিচার চলে।

ঔস্তরলিজ (রাজঃ ৭/৩)। ঔস্তরলিজের যুদ্ধে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়ার মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করেন।

কড় (দেবীঃ ২/১০)। গালা-নির্মিত একপ্রকার চুড়ি। এয়তির চিহ্ন হিসাবে আগেকার দিনে অধিকাংশ নারীই কড় ব্যবহার করতো।

কণ্ডুয্যি (দেবীঃ ১/১৩)। সংস্কৃত 'কদর্য্য' শব্দের বিকৃত উচ্চারণ।

কবিলা (রাজঃ ৬/৫)। স্ত্রী। আরবী শব্দ।

কলধৌতপ্রবাহবৎ (কপাঃ ১/১)। 'কলধৌত' অর্থ রূপা হয়, আবার সোনাও হয়। তাই এখানে নদীর জলরাশিকে গলিত রৌপ্য অথবা স্বর্ণপ্রবাহের মতো বর্ণনা করা হয়েছে। শীতকালে নদীর জল সাধারণতঃ স্বচ্ছ বা সাদা থাকে। তাই এখানে গলিত রৌপ্যপ্রবাহের ন্যায় অর্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত।

কল্পসূত্র (চন্দ্রঃ ১/৫)। এই গ্রন্থে বৈদিক কর্মানুষ্ঠানের সূত্র আছে। বৈদিক যজ্ঞকর্ম যখন জটিল হয়ে পড়ে, তখন এই ব্যবস্থাগুলিকে ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থ থেকে সংক্ষিপ্ত ক'রে একত্রে প্রকাশ করা হয়।

কলিন্স-কৃত "Woman in White" (রজনী/বিজ্ঞাপন)। কলিন্সের এই গ্রন্থটি একটি ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস।

কাইসরকে-বিথীনিয়ার রানী বলিত (রজনী ২ ২)। রোমান সম্রাট জুলিয়াস্ সীজারকে কাইসর বলা হয়েছে। ঐতিহাসিকরা বলেন, সীজার অসাধারণ বীর ও

রণকুশলী হলেও নাকি নারীস্বভাবা (effeminate) ছিলেন। তিনি বিথীনিয়া রাজ্যের অধিপতি তৃতীয় নিকমিডেসের প্রতি নাকি নারী প্রণয়ীর মতোই অনুরক্ত ছিলেন। তাই তাঁকে এরূপ অপবাদ দেওয়া হয়।

কার্বা (বিষ: ৯ম পরি:)। ফার্সী—কারবা শব্দ থেকে এসেছে। অর্থ—রৌপ্যাদি-নির্মিত সুগন্ধী গোলাপজল রাখার পাত্র।

কামদার (রাজ: ২/৩ ; দেবী: ২/৬)। সূক্ষ্ম সূচীকার্য-মণ্ডিত।

কারপরদাজ (দেবী: ২/৪)। আজ্ঞাবাহী ভৃত্য। ফারসী শব্দ।

কালাদীঘি (ইন্দিরা ২য় পরি:)। এই দীঘির ধারে ইন্দিরা অপহৃত হয়েছিল। ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্র' গ্রন্থে বলেছেন—যশোহরে 'ঝিঁকারগাছার নিকটবর্তী ডাকাতিয়া দীঘি'-ই এই কালাদীঘি।

কালীমন্দির (কপা: ১/৮)। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে বর্ণিত কালীমন্দির সম্বন্ধে শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু তাঁর "বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিচিহ্ন (কপালকুণ্ডলার পরিকল্পনাক্ষেত্রে)" নামক গ্রন্থে বলেছেন—"কপালকুণ্ডলার কালীমূর্ত্তিকেও বঙ্কিমচন্দ্র ··সত্য ও কল্পনায় মিশাইয়া গড়িয়াছেন। তাঁহার লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, ঐ মানবাকার পরিমিতা করাল কালীমূর্ত্তি এক সুউচ্চ চূড়াবিশিষ্ট দেবালয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ছিলেন এবং ঐ দেবালয়ের নিকটেই ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাচীরবেষ্টিত একটী গৃহে দেবতার সেবক—অধিকারী ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। এক্ষণে দরিয়াপুর গ্রামে বা তন্নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে ঐরূপ মূর্ত্তিবিশিষ্ট কোন প্রাচীন সুউচ্চ দেবালয় নাই বা যে সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র এই স্থানে আসিয়াছিলেন, তখনও ছিল না·। তবে বঙ্কিমচন্দ্র কপালকুণ্ডলায় যে 'আড়াইশত বৎসর পূর্ব্বের' কথা বলিয়াছেন, সে সময় ছিল কিনা বলিতে পারা যায় না। কিন্তু বর্ত্তমানে তাহার কোন নিদর্শন নাই বা সে সম্বন্ধে কোন জনপ্রবাদও প্রচলিত নাই।······

"দরিয়াপুরে এক্ষণে যে অত্যুচ্চ প্রাচীন দেবালয়টী দৃষ্ট হয়, উহা কালীমন্দির নহে—শিবের মন্দির।···পক্ষান্তরে দরিয়াপুর হইতে ৬/৭ মাইল পশ্চিমে কাঁথি সহরের পূর্ব্বপ্রান্তে নির্জ্জন বালিয়াড়ির মধ্যে একটী কালীমন্দির আছে। মন্দির মধ্যে এক্ষণে আধুনিক যুগের শিল্পীর হস্তনির্ম্মিত নাতিদীর্ঘ এক পাষাণময়ী কালীমূর্ত্তি আছেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যখন এ প্রদেশে আসিয়াছিলেন, এখন ঐ স্থানে মানবাকার পরিমিতা এক মৃন্ময়ী করালকালী-মূর্ত্তি সংস্থাপিত ছিলেন। কপালকুণ্ডলা প্রকাশিত হইবার পর হইতে সাধারণে ঐ দেবালয়কেই কপালকুণ্ডলার কালীমন্দির বলিয়া জল্পনা কল্পনা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু কপালকুণ্ডলার উল্লিখিত· বিবরণের সহিত ঐ স্থানের ও মন্দিরের সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয় না।

"কপালকুণ্ডলার কালীমন্দিরটী প্রাচীন ও সুউচ্চ চূড়াবিশিষ্ট ছিল—অনেক দূর হইতে দেখা যাইত। কিন্তু, শেষোক্ত দেবালয়টী আধুনিক কালে নির্ম্মিত, এবং সুউচ্চ চূড়া-বিশিষ্টও নহে ; এই দেবালয়টী দরজা জানালা বিশিষ্ট একখানি ছোট পাকাঘর মাত্র। অধিকন্তু দেখা যায়, কপালকুণ্ডলায় লিখিত বিবরণ মতে দেবালয় সন্নিকটস্থ অধিকারীর গৃহ হইতে মেদিনীপুরের পথ যতটা দূরবর্ত্তী হওয়া সম্ভব—এই দেবালয়টী হইতে তদপেক্ষা অনেক কম।" (৬৮ পৃ.)

কিঙ্খাব (চন্দ্রঃ ১/১)। ফুল-কাটা ও জরি-দেওয়া রেশমী বস্ত্র।

কুজ্ঝটিকা (কপাঃ ১/১)। "কপালকুণ্ডলা" উপন্যাসের প্রথমেই যে ঘোরতর কুজ্ঝটিকার বর্ণনা আছে, 'বঙ্কিম-জীবনী'-রচয়িতা শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতে তা বঙ্কিমের বাল্যজীবনের এক বাস্তব অভিজ্ঞতাপ্রসূত বর্ণনা। নৈহাটি থেকে হুগলী কলেজে নৌকাপথে যাত্রার সময় একদিন সকালে তিনি এরূপ ভয়ানক কুয়াশার মধ্যে পড়েন।

কুঠির কারকুন (চন্দ্রঃ ১/৩)। কুঠির তত্ত্বাবধায়ক।

কুর্ণিশ (সাঙ্গঃ ৬/৩)। মুসলমানদের প্রতি অভিবাদন জানাবার ভঙ্গী। অর্ধাবনত অবস্থায় কপালে হাত ঠেকানোর বিশেষ ভঙ্গীকে কুর্ণিশ বলে।

কুতবমিনার (রাজঃ ২/১)। দিল্লীর একটি দ্রষ্টব্য বস্তু। এটি একটি উঁচু স্তম্ভ। বর্তমানে ভগ্নাবস্থায় এর উচ্চতা ২৪০ ফুট, ব্যাস ৫০ ফুট। ভারতবর্ষের প্রথম মুসলমান সম্রাট কুতুবুদ্দিন আইবেকের সময় এর নির্মাণ আরম্ভ হয় এবং আলতমসের সময় শেষ হয়।

কুমার (দেবীঃ ১/১৫)। কুমারসম্ভব কাব্য—কালিদাস-রচিত। হর-পার্বতীর মিলন ও গণেশের জন্ম এই কাব্যের বিষয়-বস্তু।

কৃতাভিসারা (দেবীঃ ১/৮)। যে নায়িকা সাজসজ্জা ক'রে নায়কের সঙ্গে গোপন-মিলনে বার হয়, তাকে বলে কৃতাভিসারা।

কেনারায় পড়্ (কপাঃ ১/১)। কিনারায় পড়, অর্থাৎ তীরে যাক।

কেসমৎ (রাজঃ ২/১)। কিসমৎ বা অদৃষ্ট।

কৈলাস (দেবীঃ ২/৬)। মানস সরোবরের উত্তর-পশ্চিমদিকে অবস্থিত হিমালয়ের চূড়া। হর-পার্বতীর আবাসস্থল বলে খ্যাত।

খদ্যোৎমালা পরিমণ্ডিত (বিষঃ ১ম পরিঃ)। জোনাকির দ্বারা বেষ্টিত।

খরস্রোতা (সীতাঃ ১/১২)। একটি নদীর নাম।

খোজা (দেবীঃ ১/৯ ; রাজঃ ২/২)। নপুংসক। এরা বেগমদের মহলে পাহারা দেবার জন্য নিযুক্ত হত।

গঙ্গাসাগর (কপাঃ ১/১)। গঙ্গানদী যেখানে বঙ্গোপসাগরে এসে মিলিত হয়েছে, সেই সঙ্গমস্থলের একটি দ্বীপে প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তিতে এক বিরাট মেলা হয়। বহু প্রাচীন কালের এই মেলাটি গঙ্গাসাগরেব মেলা নামে খ্যাত। কথিত আছে, ভগীরথের আনীত গঙ্গা এই স্থানে পতিত হয়ে সগররাজার ষাট হাজার পুত্রকে মুক্তি দেয়। এখানেই নাকি কপিলমুনির আশ্রম। তাই যুগে যুগে এখ'নে বহু পুণ্যার্থীর আগমন ঘটে।

গড়মান্দারণ (দুর্গেঃ ১/৫)। বঙ্কিমচন্দ্রের "দুর্গেশনন্দিনী" উপন্যাসে এই গড়-মান্দারণ একটি বৈশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে আছে। গড-মান্দারণের কাহিনী অনেকাংশে কাল্পনিক হতে পারে, তবে এ স্থানের অস্তিত্ব একেবারে অলীক নয়। এখনো এই গড়-মান্দারণ স্থান আছে। পরমপুরুষ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মস্থান কামারপুকুরের অদূরেই গড-মান্দাবণ অবস্থিত। এখানে আসতে হলে হাওড়া স্টেশন থেকে ইলেক্ট্রিক ট্রেনে প্রথমে তারকেশ্বর যেতে হবে। তারপর বাসে ক'রে আরামবাগ। আরামবাগ থেকে বাসে ক'রে কামারপুকুরে পৌছুবার আগে কামাবপুকুর চটীতে নামতে হবে। কামারপুকুর চটী থেকে বামদিকের পাকা রাস্তা ধরে কিছুটা গেলেই মাঠের মধ্যে দেখা যাবে গড়ের উঁচু মাটির ঢিপি। স্থানটি বর্তমানে বনজঙ্গলে আকীর্ণ হয়ে আছে। গড়ের পাশ দিয়ে আমোদর নদী চলে গেছে এঁকেবেঁকে। গডের অদূরেই রয়েছে মান্দারণ গ্রাম। গ্রামটি মুসলমানপ্রধান এবং অধিকাংশই দরিদ্রশ্রেণীর লোকের বাস। গড়ের মধ্যে ইতস্ততঃ কিছু ইট-পাথর ছড়ানো থাকলেও, কোন প্রাসাদের চিহ্ন বর্তমান নেই। একটি কবরখানা বা সমাধি আছে। লোকে বলে, এ সমাধি বড় খাঁ গাজীর। অদূরে মান্দারণ গ্রামে আর একটি সমাধি আছে। লোকে বলে, সেটা ছোট খাঁ গাজীর। এঁরা যে কে ছিলেন, তার কোন হদিশ পাওযা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের মধ্যে গড়-মান্দারণের এরূপ বর্ণনা দিয়েছেন।—"যে পথে বিষ্ণুপুর প্রদেশ হইতে জগৎসিংহ জাহানাবাদে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, সেই পথের চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। তাহার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে মান্দারণ গ্রাম। মান্দারণ এক্ষণে ক্ষুদ্র গ্রাম, কিন্তু তৎকালে ইহা সৌষ্ঠবশালী নগর ছিল। যে রমণীদিগের সহিত জগৎসিংহের মন্দির-মধ্যে সাক্ষাৎ হয়, তাঁহারা মন্দির হইতে যাত্রা করিয়া এই গ্রামাভিমুখে গমন করেন।

গড় মান্দারণে কয়েকটি প্রাচীন দুর্গ ছিল, এই জন্যই তাহার নাম গড় মান্দারণ হইয়া থাকিবে। নগরমধ্যে আমোদর নদী প্রবাহিত; এক স্থানে নদীর গতি এতাদৃশ বক্রতা প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, তদ্দারা পার্শ্বস্থ এক খণ্ড ত্রিকোণ ভূমির দুই দিক্ বেষ্টিত হইয়াছিল; তৃতীয় দিকে মানবহস্তনিখাত এক গড় ছিল; এই ত্রিকোণ ভূমিখণ্ডের অগ্রদেশে

যথায় নদীর বক্রগতি আরম্ভ হইয়াছে, তথায় এক বৃহৎ দুর্গ জল হইতে আকাশপথে উত্থান করিয়া বিরাজমান ছিল। অট্টালিকা আমূলশিরঃপর্য্যন্ত কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত; দুই দিকে প্রবল নদীপ্রবাহ দুর্গমূল প্রহত করিত। অদ্যাপি পর্য্যটক গড় মান্দারণ গ্রামে এই আয়াসলঙ্ঘ্য দুর্গের বিশাল স্তূপ দেখিতে পাইবেন; দুর্গের নিম্নভাগমাত্র এক্ষণে বর্ত্তমান আছে, অট্টালিকা কালের করাল স্পর্শে ধূলিরাশি হইয়া গিয়াছে, তদুপরি, তিন্তিড়ী, মাধবী প্রভৃতি বৃক্ষ ও লতাসকল কাননাকারে বহুতর ভুজঙ্গ ভল্লুকাদি হিংস্র পশুগণকে আশ্রয় দিতেছে। নদীপারে অপর কয়েকটা দুর্গ ছিল।

বাঙ্গালার পাঠান সম্রাট্‌দিগের শিরোভূষণ হোসেন শাহার বিখ্যাত সেনাপতি ইস্‌মাইল গাজি এই দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু কালক্রমে জয়ধবসিংহ নামে একজন হিন্দু সৈনিক ইহা জায়গীর পান। এক্ষণে বীরেন্দ্র-সিংহনামা জযধরসিংহেব একজন উত্তরপুরুষ এখানে বসতি করিতেন।" (দুর্গেঃ ১/৫)

গড়া (দেবীঃ ২/১০)। মোটা কাপড়।

গম্বুজ (রাজঃ ২/১)। মস্‌জিদের উপর গোলাকৃতি চূড়া।

গুলেস্তাঁ (চন্দ্রঃ ১/১)। প্রাচীন পারস্যের বিখ্যাত লেখক সাদিব বিখ্যাত গ্রন্থ গুলেস্তাঁ।

গোসা (দুর্গেঃ ১/২০)। অর্থ—ক্রোধ। আরবী শব্দ।

গৌরী সমঝে……মনমে (রাজঃ ১/৩)। এই হিন্দী কবিতাটির অর্থ—গৌরী যেমন ভস্ম-মাখা মহাদেবের, রাধিকা যেমন কৃষ্ণের এবং শচী ইন্দ্রের মর্ম বোঝেন, তেমনি বীরনারী বীরের মর্যাদা বোঝেন। মহাদেবের জটায গঙ্গা গজন করে, বাসুকীর ফণার উপর পৃথিবী অবস্থিত এবং বাতাস আগুনের সখা হয়। তেমনি প্রকৃত বীরের ভজনা হয় যুবতীর হৃদয়ে।

চঞ্চলকুমারীর হৃদয়ে রাজসিংহের বীররূপ ধ্যানের উপক্রমণিকা হিসাবে এই কবিতা কৌতুকচ্ছলে ব্যবহৃত হয়েছে।

গোষ্ঠ (বিষঃ ৯ম পরিঃ)। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে রাখালবালকরূপে যখন গরু চরাতেন, তখনকার বাৎসল্যরসের যে সঙ্গীত তাই গোষ্ঠ বা গোষ্ঠলীলা নামে পরিচিত।

চক (বিষঃ ৭ম পরিঃ)। চার-কোণা জমি। যে বাড়ীর মধ্যে চার-কোণা উঠান থাকে, তাকে চক্‌মিলান বাড়ী বলা হয়।

চতুর্থীর শ্রাদ্ধ (দেবীঃ ১/৭)। মেয়েদের বিবাহ হয়ে যাবার পর বাপের বাড়ীর কেউ মারা গেলে তিনদিন অশৌচ পালন করে, চতুর্থ দিনে শ্রাদ্ধাদি কার্য করতে হয়। প্রফুল্লকেও তার মাতৃশ্রাদ্ধ চতুর্থীতে সম্পন্ন করতে হয়েছিল।

চেলড়া (দেবীঃ ১/৫)। ছেলেমানুষ অর্থে এই দেশীয় শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

ছিপ (দেবীঃ ২/৪)। লম্বা ধরনের দ্রুতগতিসম্পন্ন একপ্রকার নৌকা।

জাবেস্তা (রজনী ৩/৪)। অনুমোদিত নকল, Certified Copy.

জাহানাবাদ (দুর্গেঃ ১/৫)। বর্তমান আরামবাগ। এ সম্বন্ধে 'ভারতকোষে' (১ম খণ্ড) আছে—"হুগলী জেলার একটি মহকুমা ও মহকুমা শহর। দ্বারকেশ্বর নদীর তীরবর্তী এই শহর এবং সমগ্র মহকুমাটির পরিবেশ বিশেষভাবে গ্রামীণ। শহরটি ওল্ড্ বেনারস, ওল্ড্ নাগপুর, আরামবাগ-বর্দ্ধমান ইত্যাদি রাস্তার উপরেই এবং নিয়মিত বাস-সার্ভিস দ্বারা সংযুক্ত। শহরটির পূর্ব্বনাম জাহানাবাদ। ১৯০০ সালে একটি বাগানের নাম অনুসারে শহরটির নাম পরিবর্ত্তিত হয়। শহরটি পুরাতন বর্দ্ধমান-মেদিনীপুর বাদশাহী সড়কের ধারে অবস্থিত। ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে মানসিংহ উড়িষ্যা আক্রমণের উদ্দেশ্যে এই পর্য্যন্ত আসিয়া বর্ষাকাল শেষ হওয়া পর্য্যন্ত এইখানে ঘাঁটি স্থাপন করেন। এই মহকুমার রাধানগরে রাজা রামমোহন রায়ের আদি বাটী ও জন্মস্থান। আরামবাগ শহরের ১৩ কিলোমিটার (৮ মাইল) পশ্চিমে গড় মান্দারণের ধ্বংসাবশেষ আছে।"

জুম্মা মসজিদ (রাজঃ ২/১)। দিল্লীর এই মসজিদটি ভারতবর্ষের বৃহত্তম উপাসনালয়। মসজিদটির অধিকাংশই লালপাথরে নির্মিত। কেবল গম্বুজগুলি শ্বেত-পাথরের। সম্রাট শাজাহান সাত বছর ধরে প্রচুর অর্থব্যয়ে এটি নির্মাণ করান। বাদশাহ আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে প্রতি শুক্রবার এখানে নমাজ পড়তে আসতেন।

জেজিয়া (রাজঃ ৫/৬)। একপ্রকার কর বা শুল্কের নাম। মুসলমান রাজত্বে এই কর হিন্দুদের দিতে হত। আকবর এই কর তুলে দিলেও, ঔরঙ্গজেব ১৬৭১ খ্রীষ্টাব্দে তা পুনঃপ্রবর্তিত করেন।

টেকের মাথায় (দেবীঃ ২/৩)। নদীর বাঁকের কাছে।

তণ্ডা নগর (দুর্গেঃ ১/৩)। "বঙ্গদেশের তাৎকালিক রাজধানী।" গৌড়ের সন্নিকটে মালদহের এগারো মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। গঙ্গানদী গৌড় থেকে সরে আসায়, শের শাহ গৌড় থেকে তাঁর রাজধানী তণ্ডায় স্থানান্তরিত করেন। ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে শাজাহানের পুত্র সুজা এই নগরীকে সংস্কারের শেষ চেষ্টা করেন।

তণ্ডুলাদি (কপাঃ ১/২)। চাউল ও অন্যান্য রান্নার জিনিসপত্র।

তাকে শিয়ালে খাইয়াছে (কপাঃ ১/২)। এখানে 'শিয়াল' বলতে বাঘকে বোঝাচ্ছে। সংস্কারাবদ্ধ সাধারণ মানুষ বাঘকে বাঘ বলতেও ভয় পায়, তাই শিয়াল বলে তার ভীতিভাব দূর করছে।

তাজমহল (রাজঃ ১/১)। সম্রাট শাজাহানের স্ত্রী মমতাজের সমাধি-সৌধ তাজমহল এক অপূর্ব স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন। এখানে শাজাহান-ও সমাধিস্থ হন। এটি বর্তমান আগ্রা নগরীতে অবস্থিত। এর নির্মাণকার্য ১৬৩১ খ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ হয়ে ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ১৭ বছর ধরে চলে। প্রতিদিন ২০,০০০ কারিগর নির্মাণকার্যে নিযুক্ত ছিল। শ্বেতপাথরই এর প্রধান উপাদান। তবে তোরণদ্বার লোহিতবর্ণ প্রস্তরে নির্মিত। উপরের গম্বুজসমেত এটি ২০০ ফুট উঁচু।

তাঞ্জাম (চন্দ্রঃ ১/১)। পাল্কির মতো মনুষ্য-বাহিত যান।

তুমি আমার দ্রৌপদী……অর্জুন (মৃণাঃ ১/৫)। মৃণালিনী ও ব্যোমকেশের এই কথোপকথনের মধ্যে একটি পৌরাণিক কাহিনীর ইঙ্গিত রয়েছে। কুরুকুলের জামাতা, দুঃশলার স্বামী জয়দ্রথ পাণ্ডবদের অনুপস্থিতিতে দ্রৌপদীকে হরণ করতে এলে ভীম ও অর্জুনের দ্বারা নিগৃহীত হন, তেমনি মৃণালিনীর হাতেও ব্যোমকেশ নিগৃহীত হল।

তোষাখানা (বিষঃ ৭ম পরিঃ)। ধনাগার বা রাজকোষ।

ত্রিস্রোতা নদী (দেবীঃ ২/৩)। ত্রিস্রোতা বা তিস্তা নদী। ভুটান সীমান্তের উত্তরে হিমালয় থেকে উৎপন্ন হয়ে বাংলা দেশে প্রবেশ করেছে। দৈর্ঘ্য ২০০ মাইল। এর তিনটি স্রোত—করতোয়া, আত্রাই, পুনর্ভবা।

থার্মপিলিতে Leonidas (রাজঃ ৭/১)। থার্মপিলির গিরিসঙ্কটে পারস্য সম্রাটের বিপুল সেনাবাহিনীকে লিওনিডাস বিপর্যস্ত করেন।

দণ্ড (কপাঃ ১/১)। ষষ্টি অর্থাৎ ৬০ পলে এক দণ্ড। প্রায় ২৪ মিনিটের মতো সময়ে এক দণ্ড হয়।

দরিয়ার পাঁচ পীর (কপাঃ ১/১)। দরিয়া অর্থাৎ সমুদ্র। পীর মুসলমানদের দেবতা। মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে, পাঁচজন পীর বা ফকির পৃথিবীর সমস্ত জলভাগ রক্ষা করে। এই পাঁচ পীরের নাম—বদর, আলি, কালু, গাজী, একদলি। নাবিকদের অধিকাংশই মুসলমান বলে তারা বিপদে-আপদে দরিয়ার পাঁচ পীরের শরণ নিত।

দশ অবতার (দেবীঃ ২/৬)। ভগবান যুগে যুগে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ ক'রে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। সেই বিভিন্ন রূপই অবতার নামে খ্যাত। দশ অবতার—(১) মৎস্য, (২) কূর্ম, (৩) বরাহ, (৪) নৃসিংহ, (৫) বামন, (৬) পরশুরাম, (৭) রামচন্দ্র, (৮) কৃষ্ণ, (৯) বুদ্ধ, (১০) কল্কি।

দশ মহাবিদ্যা (দেবীঃ ২/৬)। মহাদেব সতীকে দক্ষ-আহূত যজ্ঞে যেতে বারণ করলে, সতী স্বামীর সম্মতি আদায়ের জন্য দশটি মূর্তি ধরে ভয় দেখান। তারই নাম দশমহাবিদ্যা। সেগুলি হল—

কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যাধূমাবতী তথা
বগলা সিদ্ধবিদ্যাচ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।

দামাস্ক ছুরিয়া (দুর্গেঃ ১/১৮)। দামাস্কাসে নির্মিত ছুরি। দামাস্কাস্ সিরিয়ার রাজধানী। প্রাচীন নগরী। এককালে এখানকার ইস্পাতের নির্মিত ছুরি ও তরবারি বিখ্যাত ছিল।

দারুকেশ্বর (দুর্গেঃ ১/৩)। বাংলা দেশের একটি নদীর নাম। "দুর্গেশনন্দিনী" উপন্যাসে আছে. মানসিংহ এই নদীর তীরে শিবির স্থাপন করেছিলেন। স্টুয়ার্টের ইতিহাসেও এই নদীর বিকৃত নামটি উল্লিখিত আছে।—"... he (Raja Man Sing) directed Cantonments to be built for the army at Jehanabad, on the banks of the Dalkisor river, not many miles from the present Calcutta "—Stewart's *History of Bengal* (Edited by Fred. J. Mouat)

দাশুরায়ের পাঁচালী (বিষঃ ৯ম পরিঃ)। দাশুরায় বা দাশরথি রায় বাংলা দেশের বিখ্যাত পাঁচালী রচয়িতা ও গায়ক। বর্ধমান জেলার কাটোযার কাছে বাঁদমুড়া গ্রামে ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম হয। তিনি অল্প বাংলা ও ইংরাজী লেখাপড়া শেখেন। তারপর এক কবির দলে যোগদান করেন। পরবর্তী কালে তিনি নিজে পাঁচালী দল গড়েন। তাঁর পাঁচালী সেকালে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। পাঁচালী রচনার উৎকর্ষতায়, রুচিশীল মনোভাব ও বিভিন্ন পৌরাণিক বিষয়ের অবতারণায় তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয। তাঁর পাঁচালীর মধ্যে ৬০টি মুদ্রিত পালার সন্ধান পাওযা গেছে। (দ্রঃ দাশরথি রায়ের পাঁচালী—শ্রীহরিপদ চক্রবর্তী।)

দাশুরাযের একটি গানের নমুনা—

"যাব না করি মনে, মন কি মানে বাঁশী শুনে।
বাঁশীতে মন উদাসী, হই গো দাসী শ্রীচরণে ॥
মনে হয মানে বসি, হেরব না আর কালশশী,
কাল হল মোহন বাঁশী, না হেরিলে মরি প্রাণে ॥
পারিস কেহ সহচরি, রাখতে মোর মনকে ধরি,
কালাচাঁদ প্রেমডুরি, বেঁধে মনে বনে টানে ॥"

দিনাজপুর (দেবীঃ ১/৮)। অবিভক্ত বঙ্গের রাজসাহী বিভাগের একটি জেলা। বর্তমানে পশ্চিমদিনাজপুর অংশ পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সংযুক্ত।

দুরাদয়শ্চক্র……কলঙ্করেখা (কপাঃ ১/১)। "কপালকুণ্ডলা" উপন্যাসে নবকুমারের মুখে এই উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। এটি কালিদাসের 'রঘুবংশম্' কাব্যের ত্রয়োদশ সর্গের পঞ্চদশ শ্লোক। সীতাকে হরণ ক'রে রাবণ যখন পুষ্পক রথে চলেছিলেন, তখন রাবণ কর্তৃক সীতাকে প্রদত্ত সমুদ্রের বিবরণ এটি।—দূর থেকে চক্রের মতো তমাল ও তালীবন পরিবেষ্টিত নীলবর্ণ বেলাভূমি দেখা যাচ্ছে। আর সেখানে সমুদ্রের লবণাক্ত বারি কলঙ্করেখার মতো মনে হচ্ছে।

দেহি পদপল্লব মুদারং (বিষঃ ৫০ পরিঃ)। জয়দেবের "গীতগোবিন্দে"র শ্লোকাংশ।

দৌলতপুর ও দরিয়াপুর (কপাঃ ১/৩)। "কপালকুণ্ডলা" উপন্যাসে সমুদ্র-তীরবর্তী এই অঞ্চল দুটির উল্লেখ আছে। বর্তমানে দরিযাপুর কাঁথি শহরের সমুদ্র-উপকূলের একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। এই সম্বন্ধে শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু প্রণীত "বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিচিহ্ন (কপালকুণ্ডলার পরিকল্পনাক্ষেত্রে)" নামক গ্রন্থে আছে—

"দরিয়াপুর গ্রামে যে প্রাচীন শিবমন্দির আছে—তারই সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে লৌহদণ্ড-প্রোথিত নাতিউচ্চ প্রাচীর বেষ্টনীর মধ্যে স্তম্ভগাত্রে মর্ম্মর প্রস্তর ফলকে নিম্ন-লিখিত কথাগুলি খোদিত রহিয়াছে—

বঙ্কিমচন্দ্র স্মৃতিফলক। /"কপালকুণ্ডলা"র পরিকল্পনাক্ষেত্রে/এই দরিয়াপুর গ্রামে/কাঁথিবাসি-গণ কর্ত্তৃক স্থাপিত।/সন ১৩২৬ সাল।/

দরিয়াপুর গ্রাম কাঁথি থানার অন্তর্গত। হুগলী নদী যেখানে বঙ্গোপসাগরের সহিত মিলিত হইয়াছে, সেই সঙ্গমস্থলের অনতিদূরেই পশ্চিমপার্শ্বে দরিয়াপুর গ্রামটী অবস্থিত। ঐ নদীর ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহের বর্ণনা কবির গ্রন্থ হইতেই উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।—এখনও ঐ অবস্থার বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন হয় নাই। "যে স্থানে নৌকা আসিয়াছে, সে প্রকৃত মহাসমুদ্র নহে, নদীর মোহনা মাত্র, কিন্তু তথায় নদীর যেরূপ বিস্তার, সেরূপ বিস্তার আর কোথাও নাই। নদীর এককূল নৌকার অতি নিকটবর্ত্তী বটে,—এমন কি, পঞ্চাশৎ হস্তের মধ্যগত, কিন্তু অপর কূলের চিহ্ন দেখা যায় না। আর যে দিকেই দেখা যায় অনন্ত জলরাশি চঞ্চল রবিরশ্মিমালা-প্রদীপ্ত হইয়া গগনপ্রান্তে গগনসহিত মিশিয়াছে। নিকটস্থ জল, সচরাচর সকর্দ্দম নদীজলবর্ণ; কিন্তু দূরস্থ বারিরাশি নীলপ্রভ। আরোহীরা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করিলেন যে, তাঁহারা মহাসমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছেন; তবে সৌভাগ্য এই যে, উপকূল নিকটে, আশঙ্কার বিষয় নাই। সূর্য্যপ্রতি দৃষ্টি করিয়া দিক্ নিরূপিত করিলেন। সম্মুখে যে উপকূল দেখিতেছিলেন, সে সহজেই সমুদ্রের পশ্চিম তট বলিয়া সিদ্ধান্ত হইল। তটমধ্যে নৌকার অনতিদূরে এক নদীর মুখ মন্দগামী কলধৌতপ্রবাহবৎ

আসিয়া পড়িতেছিল। সঙ্গমস্থলে দক্ষিণ পার্শ্বে বৃহৎ সৈকতভূমিখণ্ডে নানাবিধ পক্ষিগণ অগণিত সংখ্যায় ক্রীড়া করিতেছিল। এই নদী এক্ষণে "রসুলপুরের নদী" নাম ধারণ করিয়াছে।" (কপাঃ ১/১)

"তীরোপরি আরোহণ করিয়া নবকুমার দেখিলেন যে, যত দূর দৃষ্টি চলে, তত দূর মধ্যে কোথাও বসতির লক্ষণ কিছুই নাই। কেবল বন মাত্র। কিন্তু সে বন, দীর্ঘ বৃক্ষাবলীশোভিত বা নিবিড় বন নহে ;—কেবল স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ মণ্ডলাকারে কোন কোন ভূমিখণ্ড ব্যাপিয়াছে।" (কপাঃ ১/২)

"যে স্থানে নবকুমারকে ত্যাগ করিয়া যাত্রীরা চলিযা যান, তাহার অনতিদূরে দৌলতপুর ও দরিয়াপুর নামে দুই ক্ষুদ্র গ্রাম এক্ষণে দৃষ্ট হয। পরন্তু যে সময়ের বর্ণনায় আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি, সে সময়ে তথায় মনুষ্যবসতির কোন চিহ্ন ছিল না ; অরণ্যময় মাত্র। কিন্তু বাঙ্গালা দেশের অন্যত্র ভূমি যেরূপ সচরাচর অনুদ্ঘাতিনী, এ প্রদেশে সেরূপ নহে। রসুলপুরের মুখ হইতে সুবর্ণরেখা পর্য্যন্ত অবাধে কয়েক যোজন পথ ব্যাপিত করিয়া এক বালুকাস্তূপশ্রেণী বিরাজিত আছে। আর কিছু উচ্চ হইলে বালুকাস্তূপ-শ্রেণীকে বালুকাময় ক্ষুদ্র পর্ব্বতশ্রেণী বলা যাইতে পারিত। এক্ষণে লোকে উহাকে বালিয়াড়ি বলে। ঐ সকল বালিয়াড়ির ধবল শিখরমালা মধ্যাহ্ন সূর্য্যকিরণে দূর হইতে অপূর্ব্ব প্রভাবিশিষ্ট দেখায়। উহার উপর উচ্চ বৃক্ষ জন্মে না। স্তূপতলে সামান্য ক্ষুদ্র বন জন্মিয়া থাকে, কিন্তু মধ্যদেশে বা শিরোভাগে প্রায়ই ছায়াশূন্য ধবলশোভা বিরাজ করিতে থাকে। অধোভাগমণ্ডনকারী বৃক্ষাদির মধ্যে, ঝাটী, ঝাউ এবং বনপুষ্পই অধিক।" (কপাঃ ১/৩)

"দরিয়াপুর হইতে এই বালিয়াড়ির উপর দিয়া পশ্চিমদিকে সোজাসুজি ছয় সাত মাইল পথ গমন করিলেই কাঁথি সহরে যাওয়া যায়। কাঁথি হইতে দরিয়াপুর যাইবার আরও একটী পথ আছে। কাঁথি হইতে ডিষ্ট্রীক্ট্ বোর্ডের যে কাঁচা রাস্তাটী রসুলপুর নদী পার হইয়া খাজুরী পর্য্যন্ত গিয়াছে, ঐ রাস্তার পঞ্চম মাইলের নিকট হইতে অন্য একটী কাঁচা রাস্তা দিযা ৩/৪ মাইল গমন করিলেও দরিয়াপুরে পৌছিতে পারা যায়। কাঁথি হইতে, দরিয়াপুর গ্রামের যে স্থানে স্মৃতি-স্তম্ভটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই স্থানে যাইতে হইলে, এক গরুর গাড়ী বা পাল্কী ভিন্ন অন্য কোন যানারোহণে যাইবার সুবিধা নাই।"

নজরের অনর্ঘতা (রাজঃ ৬/৩)। উপহারের স্বল্পতা। নবাবদের সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে উপযুক্ত উপহার দিতে হত, তার নাম নজর বা নজরানা।

নবনারী-কুঞ্জর (দেবীঃ ২/৬)। ন'টি নারীর মিলিত হস্তিরূপের ভঙ্গিমা।

বৃন্দাবনের গোপিনীরা শ্রীকৃষ্ণের মনোরঞ্জনের জন্য নানারূপ কৌশল করতো। তার মধ্যে হস্তীর ভঙ্গিমা একটি।

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ (বিষঃ ১৭ পরিঃ)। 'চণ্ডী'র মন্ত্রের অংশবিশেষ।

নাখোশ (রাজঃ ২/৭)। অসন্তোষ। পার্শী শব্দ।

ন্যায় (চন্দ্রঃ ১/৫ ; দেবীঃ ১/১৫)। মহামুনি গৌতম-প্রণীত ভারতীয় ষড়্‌দর্শনের অন্তর্গত একটি দর্শন। দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়নের পূর্বে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে হয়।

নিধুর টপ্পা (বিষঃ ৯ম পরিঃ)। রামনিধি গুপ্ত বা নিধিরাম গুপ্ত, নিধুবাবু নামে বাংলা সাহিত্যে খ্যাত। জন্ম—১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দ, মৃত্যু—১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দ। জন্মস্থান—হুগলি জেলার চাঁপতা গ্রাম। কর্মোপলক্ষে ইনি কলকাতায় আসেন। তাঁর রচিত টপ্পাগান বিখ্যাত। টপ্পা হিন্দী খেয়ালের অনুকরণে রচিত লঘু প্রণয়সঙ্গীত।

নিয়ামক নক্ষত্র (রাজঃ ২/২)। যে নক্ষত্র পথ দেখায়। আগেকার দিনে সমুদ্রযাত্রায় নাবিকরা স্থির নক্ষত্রগুলিকে দেখে যাত্রাপথ নির্ণয় করত।

নীলকর (দেবীঃ ৩/১)। এদেশে যে সব ইংরেজ নীলের চাষে অর্থোপার্জন করত, তাদের নীলকর বলা হত। এদের অত্যাচারে দেশের জনগণ বিব্রত হয়ে উঠেছিল। (দ্রঃ দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক।)

নীলগিরি (সীতাঃ ১/১১)। "বালেশ্বর জেলার উত্তরভাগস্থিত কতকগুলি পর্ব্বতকে নীলগিরি বলে। তাহাই কোন কোন স্থানে বৈতরণীতীর হইতে দেখা যায়।"

নৈষধ (দেবীঃ ১/১৫)। শ্রীহর্ষ-রচিত আখ্যায়িকা-কাব্য। নল-দময়ন্তীর উপাখ্যান নিয়ে রচিত।

পক্ষবিধুনন্‌ (বিষঃ ১ম পরিঃ)। পাখা ঝাড়া।

পর্তুগীস ও অন্যান্য নাবিক দস্যুদিগের ভয়ে (কপাঃ ./১)। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইউরোপ থেকে পর্তুগীস এবং ওলন্দাজ বণিকগণ এদেশে আসতে থাকে। যদিও তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্য করা, কিন্তু বিভিন্ন অত্যাচার ও লুটপাটে তারা অভ্যস্ত ছিল। এদেশের লোককে জোর ক'রে খ্রীষ্টান করা, দেশীয় লোক ধরে নিয়ে গিয়ে বিদেশের বাজারে ক্রীতদাসরূপে বিক্রি করা ছিল তাদের অন্যতম কর্ম। নদীতে নৌকাও তারা লুটপাট ক'রে নিত। এদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য তখনকার দিনে দলবেঁধে বহু নৌকা যাতায়াত করত।

পরিত্রাণায়……যুগে (দেবীঃ ৩/১৪)। গীতার উক্তি। অর্থ—সাধুগণের পরিত্রাণের জন্য, দুষ্কৃতিকারীদের বিনাশের জন্য ও ধর্ম-সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে আমি (শ্রীকৃষ্ণ) অবতীর্ণ হই।

প্রত্যাশাপল্লবৎ (বিষঃ ৪র্থ পরিঃ)। আশানুরূপ।

প্রতিবর্তন করা (কপাঃ ১/২)। ফিরে আসা।

প্রমা, মায়া, স্ফোট, অপৌরুষেয় (চন্দ্রঃ ১/২)। প্রমা—নিশ্চিত জ্ঞান। মায়া—অজ্ঞানতা বা অবিদ্যা। স্ফোট—পর পর উচ্চারিত বর্ণ দ্বারা অভিব্যক্ত শব্দ। অপৌরুষেয়—যা মানুষের কৃত নয়।

এগুলি ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের পরিভাষা।

পাঞ্জা (রাজঃ ৬/৩)। বিশেষ ব্যক্তির চিহ্নযুক্ত শীলমোহর বা হাতের ছাপ।

পাঞ্জাবের লড়াই (দেবীঃ ২/১০)। এখানে শিখযুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড হার্ডিঞ্জ পাঞ্জাবে প্রথম শিখযুদ্ধ পরিচালনা করেন। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ডালহৌসী দ্বিতীয় শিখযুদ্ধ পরিচালনা করেন।

পাটনা (দুর্গেঃ ১/৩)। বিহারের রাজধানী। শহরটি গঙ্গাতীরে অবস্থিত। ১০—১২ মাইল লম্বা। এখানে বিশ্ববিদ্যালয়, হাইকোর্ট প্রভৃতি আছে।

প্রাগুক্ত (কপাঃ ১/২)। প্রাক্+উক্ত। অর্থাৎ পূর্বে কথিত।

প্রায় দুইশত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে (কপাঃ ১/১)। বঙ্কিমচন্দ্র "কপালকুণ্ডলা" উপন্যাসের সুরুতেই উপন্যাসের ঘটনাকাল সম্বন্ধে এই মন্তব্য করেছেন। কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের প্রকাশকাল ১৮৬৬ বা ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ। এর প্রায় আড়াইশ' বছর পূর্বে বলতে বঙ্কিম আকবরের সময়কার কথা বোঝাতে চেয়েছেন। উপন্যাসে মতিবিবির কাহিনী আকবরের পুত্র সেলিমের সঙ্গে জড়িত। আকবরের রাজত্বকাল ১৫৫৬—১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দ। নিখুঁত গণনায় ২৬১ বছরের ব্যবধান আছে, তাই বঙ্কিম 'প্রায়' শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

প্লাতীয়ার Pausanias (রাজঃ ৭/১)। Pausanias স্পার্টার একজন সেনাপতি। ৪৮৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে প্লাতীয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে পারস্য-বাহিনীকে পরাজিত করেন।

পাঁওদলে (রাজঃ ৪/৩)। পদব্রজে।

পীনাল-কোড (দেবীঃ ৩/১)। ফৌজদারী মামলার আইন।

পুষিদা (রাজঃ ৩/১)। গোপন।

ফরাশ (চন্দ্রঃ ২/৭)। যে চাকর ঘর পরিষ্কার করা, বিছানা পাতা, বাতি জ্বালা ইত্যাদি কাজ করে।

বক্রাগ্রভাগ (বিষঃ ১০ম)। ঈষৎ বঙ্কিম অগ্রভাগ।

বরেন্দ্রভূমি (দেবীঃ ১/২)। প্রাচীন কালের বাংলা দেশের একটি বিভাগীয় নাম। তখন এর সীমা ছিল মহানন্দা নদীর পূর্বতীর থেকে করতোয়ার পশ্চিমতীর

পর্যন্ত। বর্তমান কালের রাজসাহী, রংপুর, পাবনা, বগুড়া, দিনাজপুর, মালদহ, জলপাইগুড়ি, মুর্শিদাবাদ ও ময়মনসিংহের কতক অংশ বরেন্দ্রভূমির মধ্যে পড়ে।

"দেবী চৌধুরাণী"র ঘটনাস্থল এই বরেন্দ্রভূমি বলেই বর্ণিত হয়েছে।

বর্তুলনি (রজনী ২/১)। সুগোল।

বস্ত্রহরণ (দেবীঃ ২/৬)। শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক গোপিনীদের বস্ত্রহরণও হতে পারে, আবার কৌরবসভায় দুঃশাসন কর্তৃক দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণও হতে পারে।

বহর (কপাঃ ১/১)। দলবদ্ধ নৌকার সারিকে বহর বলে। পূর্বকালে জল-দস্যুদের ভয়ে এরূপ সারি বেঁধে নৌকা চলাচল করত।

ব্যজনহস্তে (দেবীঃ ১/৫)। অর্থ—পাখা হাতে ক'রে।

ব্রহ্মসূত্র (চন্দ্রঃ ১/২)। বাদরায়নের গ্রন্থেব নাম ব্রহ্মসূত্র। ইনি উপনিষদের তাৎপর্য অবলম্বনে এই সূত্র-গ্রন্থটি রচনা করেন।

বাউটি (দেবীঃ ১/৩)। হাতে পরবার অলঙ্কার। সংস্কৃত 'রাহুত্রাণ' থেকে শব্দটা এসেছে।

বারদরিয়া (কপাঃ ১/১)। বহিঃসমুদ্র।

বালিগঞ্জ (রজনী ১/১)। এখানে রজনীদের একটি ফুলের বাগান ছিল। বঙ্কিম-সমকালের বালিগঞ্জ বর্তমানেব মতো পবিপূর্ণ শহর ছিল না। বঙ্কিম অবশ্য এই কলকাতা শহরের বালিগঞ্জের কথা বলেছেন।

বালিয়াড়ি (কপাঃ ১/৩)। বালির পাহাড়।

বিদ্যায় লীলাবতী (রজনী ৩/২)। লীলাবতী ছিলেন প্রাচীন ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ গণিত তত্ত্ববিদ্ ভাস্করাচার্যের কন্যা। তাঁরও পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল।

বিরহ (বিষঃ ৯ম পরিঃ)। কবিগানের অংশবিশেষ। বৈষ্ণব পদাবলীতেও বিরহ আছে। কৃষ্ণ রাধিকাকে ত্যাগ ক'রে চলে গেলে, রাধার হৃদয়ের যে বেদনা কবিগণ প্রকাশ কবেছেন, তাই বিবহ বা মাথুর নামে পরিচিত।

বিশালোরস্ক (দুর্গেঃ ১/১৮)। বিস্তীর্ণ বক্ষ।

বিষ্ণুপুর (দুর্গেঃ ১/১)। বাঁকুড়া জেলার মহকুমা ও শহর। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান। প্রাচীন ও মধ্য যুগে এই অঞ্চল মল্লভূম নামে খ্যাত ছিল এবং মল্লরাজাদের রাজধানী ছিল। মল্লরাজাদের আমলের অনেক প্রাচীন কীর্তির চিহ্ন আছে। মদন-মোহনদেবের মন্দির এবং দলমাদল কামান এখানকার দ্রষ্টব্য বিষয়।

বুরুজ (রাজঃ ২/১)। স্তূপের মতো বাড়ী। মাটির বা ইটপাথরের হয়। প্রাচীন কালে কেল্লা বা দুর্গ হিসাবেও ব্যবহৃত হত।

বৃন্দাবন (দেবী: ২/৬)। ব্রজগোপীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার ক্ষেত্র বলে বহু-কথিত। বর্তমানে এই স্থান উত্তর প্রদেশের মথুরা জেলার একটি শহর। মথুরা জংশন থেকে ৬ মাইল রেলপথ ও মোটরপথ। এখানে বহু বৈষ্ণব মন্দির আছে।

বেকনের ঘুষখোর অপবাদ (রজনী ২/৩)। ইউরোপীয় দর্শনে যুক্তিবাদের প্রবর্তক ফ্রান্সিস বেকনের (Francis Bacon—১৫৬১ খ্রীঃ—১৬২৬ খ্রীঃ) কথা বলা হয়েছে। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ— Advancement of Learning.

বেকন ছিলেন ইংলণ্ডের প্রধান বিচারপতি। ইংলণ্ডেশ্বরের কাছে অভিযোগ আসে যে, বেকন মামলাকারিগণের কাছে ঘুস নেন। বেকন এই অভিযোগ স্বীকার ক'রে নিলে তাঁকে পদচ্যুত করা হয়।

বেদান্ত (চন্দ্রঃ ১/৫ ; দেবী: ১/১৫)। বেদের অংশ। উপনিষদ্‌ভাগকে বেদান্ত বলে। এতে ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয় করা হয়েছে। মহাভারত-রচয়িতা বেদব্যাসের বেদান্তদর্শনের কথাও প্রচলিত আছে।

বেসাতি (দেবী: ১/১৩)। বাজারে ক্রয় ও বিক্রয়ের জন্য জিনিস।

বেহার (দুর্গেঃ ১/৩)। বর্তমান বিহার। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমে এই রাজ্য অবস্থিত। এই রাজ্যের আয়তন ৬৭,১১৩ বর্গমাইল। পাটনা বিহারের রাজধানী।

বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গল (দেবী: ২/১১)। বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে দেবী চৌধুরাণীর দরবার বসেছিল। এ সম্বন্ধে হাণ্টারের বর্ণনা—"In 1789 we have an account of a large band of bandits who had occupied the Baikunthpur forest, which lies in the apex of the District, right under the hills, whence they issued on their predatory excursions"

Hunter : *A Statistical Account of Bengal*, Vol. VII, P. 159.

বৈতরণী (সীতাঃ ১/১১)। বৈতরণী সম্বন্ধে হিন্দুদের একটি সংস্কার আছে। এটি নাকি যমদ্বারের এক নদী। দুর্গন্ধময় শোণিতের এই নদী পার হয়ে তবে স্বর্গে যেতে পারা যায়। জীবিতকালে গোদান করলে নাকি এই নদী সহজে পার হওয়া যায়।

বৈতরণী উড়িষ্যার একটি নদী। "এই নদীটি কেঁউঝাড় রাজ্যের পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া, যথাক্রমে কেঁউঝাড় ও ময়ূরভঞ্জ, কেঁউঝাড় ও কটক, এবং কটক ও বালেশ্বর জেলার মধ্যবর্ত্তী সীমাস্বরূপ প্রবাহিত। শেষোক্ত স্থানে ব্রাহ্মণী নদীর সহিত মিলিত হইয়া ধামড়া নাম ধারণপূর্ব্বক বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। বৈতরণী হিন্দুগণের একটি গণনীয় তীর্থ। এই তীর্থটি যযাতি-কেশরীরাজ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত যাজপুর হইতে প্রায় ১৪ মাইল দূরে অবস্থিত। কথিত আছে, এখানে ব্রহ্মা দশবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। যে

ঘাটে তিনি যজ্ঞ করেন, তাহা দশাশ্বমেধ ঘাট নামে প্রসিদ্ধ। পরে এই যজ্ঞকুণ্ড হইতে উত্থিত হইয়া বিষ্ণু বরাহমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক পৃথিবী উদ্ধার করেন। এই নিমিত্ত স্থানটি বরাহক্ষেত্র নামে অভিহিত। এখানে যে বরাহমন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে, গোদান প্রভৃতি বৈরতণীর সমস্ত কার্য্য সেই মন্দিরেই সম্পন্ন করিতে হয়। দানান্তে গোপুচ্ছ ধারণ করিয়া হিন্দুগণ স্বর্গ গমনের বিঘ্ন বিনাশ করেন। দশাশ্বমেধ ঘাটের বিপরীত দিকে মহাকালীর মন্দির দৃষ্ট হয়। তৎপার্শ্বে সপরিবারে যমরাজের মন্দির বিরাজিত। এই স্থানে সতীর নাভিদেশ পতিত হয়। এখানে যে দেবীমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়, তাঁহার নাম বিরজা। বিরজা-মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে ব্রহ্মকুণ্ড। ব্রহ্মকুণ্ডের উত্তরে কক্ষমধ্যে যে ইষ্টকনির্ম্মিত কূপ লক্ষিত হয়, সেই কূপটি নাভিগয়া নামে প্রখ্যাত। ব্রহ্মার যজ্ঞকালে গয়াসুরের নাভিদেশ এইখানে অবস্থান করে, সেইজন্য স্থানটি উক্ত নামে অভিহিত। কথিত আছে, এখানে পিতৃগণের প্রীত্যর্থে পিণ্ডদান করিলে, গয়ায় পিণ্ডদানের তুল্য ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।”

বোটে (দেবী: ২/৪)। বৈঠা। এর দ্বারা নৌকা বাওয়া হয়। সংস্কৃত—বহিত্র>বইষ্ঠ (-:::) >বইঠ বা বইঠা (বৈঠা)। এ থেকে চলিত কথায় ‘বোটে’ শব্দটি এসেছে।

ভট্টিকাব্য (দেবী: ১/১৫)। ভর্তৃহরি-প্রণীত ব্যাকরণ শিক্ষার উদ্দেশ্যে লিখিত কাব্য। “শ্রীধরস্বামীর পুত্র। ইহাকে প্রসব করিয়াই ইহার জননী পরলোক গমন করিলে শ্রীধরস্বামী সংসার পরিত্যাগ করেন। পরে বলভীর অধিপতি ধরসেন এই শিশুকে আনয়ন করিয়া প্রতিপালন ও শিক্ষাদান করেন। উত্তরকালে ইনি রাজপুত্র-গণের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন, এবং রাজকুমারগণের শিক্ষার্থে রামচরিত অবলম্বনে এক মহাকাব্য প্রণয়ন করেন। ইহা তাঁহারই নামানুসারে ভট্টিকাব্য নামে পরিচিত।” ভট্টি আনুমানিক খ্রী: ৭ম শতাব্দীর লোক।

ভার্য্যাভৎ´সিতজ´নচিত্তবিকার বিনাশিনী (বিষ: ১ম পরি:)। স্ত্রীলোকের ভৎ´সনাজনিত মনের দুঃখ দূর করে যা সেরূপ জিনিস।

ভিক্টর হ্যুগো……বোধ হয় (চন্দ্র: ৩/৮)। বিখ্যাত ফরাসী কবি, নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক। এঁর জীবনসীমা ১৮০২—৮৫ খ্রীষ্টাব্দ। ‘লা মিজারেবল’, ‘হাঞ্চবেক অব্ নটরডম্’, ‘টয়লর্স অব্ দি সী’ প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ। এখানে ‘টয়লর্স অব সী’-র ভয়ঙ্কর অক্টোপাসের (পুরুভুজ) স্বভাব বর্ণনা করা হয়েছে।

ভীমসিংহের পদ্মিনী রানীর উপাখ্যান (রাজ: ১/১)। চিতোরের রাণা ভীমসিংহের সুন্দরী পত্নী পদ্মিনীকে লাভ করার জন্য দিল্লীর সম্রাট আলাউদ্দিন চিতোর আক্রমণ করেন। কিন্তু পদ্মিনী আগুনে পুড়ে আত্মহত্যা করেন। এই কাহিনী

রাজস্থানের লৌকিক কাহিনী ও গাথার বিষয়। বাংলা সাহিত্যেও এই কাহিনী নিয়ে অনেক উপাখ্যান, কাব্য ও নাটক লেখা হয়েছে।

ভীমা (চন্দ্রঃ ১/২)। "চন্দ্রশেখর" উপন্যাসে ভীমা পুষ্করিণীতে অবগাহনকালেই প্রথম লরেন্স ফস্টরের সঙ্গে শৈবলিনীর সাক্ষাৎ হয়েছিল।

ভূষণা (সীতাঃ ১/১)। "পূর্ব্বকালে পূর্ব্ববাঙ্গালায় ভূষণা নামে এক নগরী ছিল। এখন উহার নাম 'ভূষ্‌না'—সীতারাম।

"ফরিদপুর জেলা ; সদর মহকুমাব থানা ও গ্রাম। কালুখালি জংশন-কাশিয়ানী রেলপথের বোয়ালমারী (৩১ মা) হইতে আধ মাইল দূরে ভূষণা অবস্থিত। ইহা প্রাচীন ও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান। বারভূঁইয়াদিগের অন্যতম মুকুন্দরাম এখানকার অধিপতি ছিলেন। সীতারাম রায়ের অভ্যুদয়ে ভূষণার বাণিজ্যকেন্দ্র ক্রমে মহম্মদপুরে (যশোহর) চলিয়া যায়, ফলে ভূষণার পতন সুরু হয়। প্রাকারবেষ্টিত প্রাচীন নগরীর জঙ্গলাকীর্ণ ভগ্নাবশেষ মধ্যে নানা শিল্পের পল্লীনাম এখনো শোনা যায়।"

ভেড়ীওয়ালা (দেবীঃ ২/৪)। যারা ছাগল-ভেড়া চরায়। ব্রজেশ্বর কাপুরুষ হিন্দুস্থানী-প্রহরীদের লক্ষ্য ক'রে একথা বলেছিল।

ময়ুরতক্ত (রাজঃ ১/১)। সম্রাট শাহজাহানের সিংহাসন ময়ুরতক্ত বা ময়ুর-সিংহাসন নামে খ্যাত। এর কারুকার্য যেমন অপূর্ব ছিল, তেমনি মূল্যও ছিল প্রচুর।

মহম্মদীয় জয়ধ্বজা (দুর্গেঃ ১/৩)। ইসলাম ধর্মের প্রচারের কথা বলা হয়েছে। হজরৎ মহম্মদ ইসলাম ধর্মের স্রষ্টা।

বংশমর্যাদায়……হইবে (রজনী ৩/২)। প্র, পরা, অপ্‌, সম্—চারিটি উপসর্গ। এগুলি দ্বারা উৎকৃষ্ট বোঝায়। বংশমর্যাদা সম্বন্ধে এখানে রসিকতা ক'রে কথাগুলি বলা হয়েছে।

মহিষাসুরের যুদ্ধ (দেবীঃ ২/৬)। শিবের বরে শক্তিলাভ ক'রে মহিষাসুর স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল অধিকার করেন। দেবতাগণের উপর তিনি অত্যাচার চালাতে থাকেন। তখন দেবতাগণ মহাশক্তির শরণাপন্ন হন। দেবতাগণের বিভিন্ন আয়ুধ নিয়ে শক্তি দশভুজারূপে মহিষাসুরকে বধ করেন। বর্তমানে দুর্গাপূজায় মহিষাসুর বধের মূর্ত্তিই অধিক ব্যবহৃত হয়।

মহোরগ (রাজঃ ৪/৩)। বড় সাপ।

মান্দারণ (দুর্গেঃ ১/১)। **দ্রঃ** গড়-মান্দারণ।

মারহাট্টা ডাকু (রাজঃ ২/৫)। এখানে শিবাজীর কথা বলা হয়েছে। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মহারাষ্ট্রের শিবাজী ইতস্ততঃ আক্রমণ ক'রে সম্রাটকে বিব্রত ক'রে তোলেন।

মিনার (রাজ: ২/১)। প্রাসাদের শীর্ষদেশকে মিনার বলা হয়েছে।

মুৎসুদ্দি (বিষ: ৫ম পরি:)। আরবী শব্দ। কোন কার্যের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বুঝায়।

মুরদ (দেবী: ২/৩)। মূর্তি। শক্তিও হয়।

মূর্খস্য লাঠৌষধম (দেবী: ৩/১)। মূর্খের লাঠিই একমাত্র ঔষধ।

মেদিনীপুর (দুর্গে: ১/৩)। পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলা। এর আয়তন ৫ হাজার ২ শত ৫৩ বর্গমাইল। এই জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমভাগে বিস্তীর্ণ শালের জঙ্গল আছে। মেদিনীপুর এই জেলার সদর শহর। কাঁসাই নদীর তীরে শহরটি অবস্থিত।

মেহেরবানি (রাজ: ৬/৩)। অনুগ্রহ। পার্শী শব্দ।

যোগশাস্ত্র (দেবী: ১/১৫)। এখানে পাতঞ্জলির যোগশাস্ত্র "পাতঞ্জল দর্শন"-এর কথা বলা হয়েছে। যোগশিক্ষায় চিত্তবৃত্তি দমিত হয়। আনু: খ্রী: পূ: ১৫০ অব্দে ইনি বিদ্যমান ছিলেন।

রঙ্গপুর (দেবী: ১/৮)। পূর্বপাকিস্তানের রাজসাহী বিভাগের জেলা। আয়তন ৩,৬০৬ বর্গমাইল। এই জেলার ৪টি মহকুমা—রঙ্গপুর, গাইবাঁধা, কুড়িগ্রাম ও নীলফামারি। রঙ্গপুর শহর ঢাকা থেকে ২১২ মাইল ও কলকাতা থেকে ২৫৭ মাইল। 'দেবী চৌধুরাণী'র পটভূমিতে এই রঙ্গপুরের উল্লেখ রয়েছে।

রঘু (দেবী: ১/১৫)। রঘুবংশ, মহাকবি কালিদাস-রচিত কাব্য। রামচন্দ্র ও তাঁর বংশাবলীর কাহিনী এই কাব্যের বিষয়বস্তু।

রসুলপুরের নদী (কপা: ১/১)। নবকুমারদের নৌকা এই নদীর মোহনায় প্রবেশ ক'রে রক্ষা পেয়েছিল। এই নদী এককালে বৃহৎ ছিল, কিন্তু বর্তমানে সংকীর্ণ।

রূপনগর (রাজ: ১/১)। "রাজস্থানের পার্ব্বত্য প্রদেশে রূপনগর নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল।" বঙ্কিমচন্দ্রের এই রাজ্য আসলে একটি নগরের নাম। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের তথ্যে জানা যায়, এই রাজ্যের আসল নাম কৃষ্ণগড় বা কিষণগড়। রূপনগর নামে নগরটি এই কিষণগড়ের উত্তরে অবস্থিত।

রূপোস হইল (রজনী ১/৫)। আত্মগোপন ক'রে রইল বা ফেরার হল।

রেটিনাস্থিত প্রতিবিম্ব (রজনী ৩/২)। চক্ষুর ভিতরের আবরণের নাম রেটিনা (Retina)। অসংখ্য অক্ষি-স্নায়ু (optic nerves) দ্বারা এটি গঠিত। বাহ্য বস্তুর প্রতিবিম্ব এতে পড়ে মস্তিষ্কে চেতনা জাগায়, তবেই আমরা দেখতে পাই।

লঙ্কা (দেবী: ২/৬)। রাবণের রাজ্য লঙ্কা বা স্বর্ণলঙ্কা বলে খ্যাত। বর্তমানে সিংহল দ্বীপকে লঙ্কা বলে নির্ণয় করা হয়ে থাকে।

ললিতগিরি (সীতাঃ ১/১৩)। সম্ভবতঃ উড়িষ্যার খণ্ডগিরির কথা বলা হয়েছে। দ্রঃ উদয়গিরি।

ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরে (রজনী ১/২)। জয়-দেবের "গীতগোবিন্দ" কাব্য থেকে উদ্ধৃত শ্লোকাংশ।

লা-ওয়ারেশ (রজনী ৩/৪)। আববী শব্দ। উত্তরাধিকারীশূন্য বা মালিকবিহীন।

লাস্ট ডেজ্ অব্ পম্পেই (রজনী/বিজ্ঞাপন)। লর্ড লিটনেব এই উপন্যাস-খানি ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয। বিসুবিয়সের অগ্ন্যুৎপাতে পম্পে নগরীর ধ্বংসের ঐতিহাসিক পটভূমিকায লিটনের উপন্যাসখানি রচিত। উপন্যাসেব মূল বিষযবস্তু কিন্তু প্রেম। গ্রীক যুবক গ্লকাস ভালবাসে আইযোনকে। কিন্তু ইজিপ্টবাসী আর্বেসিস আইয়োনকে বিযে কবার জন্য তাকে নিজের গৃহে বন্দী ক'রে রাখে এবং তার ভাইকে হত্যা করে। তারপর হত্যাকাবী হিসাবে গ্লকাসকে অভিযুক্ত করে। নিদিযা নামে এক কানা ফুলওয়ালীর চেষ্টায় উভযে রক্ষা পায। এই নিদিযা গ্লকাসকে ভালবাসে। কিন্তু গ্লকাস নিদিযাকে স্নেহ করে বোনের মতো। শেষ পর্যন্ত যেদিন বিসুবিয়সের অগ্ন্যুপাতে চারিদিক অন্ধকার, তখন অন্ধ নিদিযা গ্লকাস ও আইযোনকে নিরাপদ সমুদ্রতীরে নিয়ে আসে। গ্লকাস ও আইযোনের মিলনে নিদিযা সমুদ্র-জলে আত্মত্যাগ করে। নিদিযার আত্মত্যাগ তারা কোনদিন ভোলেনি। নিত্য সমুদ্রতীরে এসে তারা নিদিযাকে স্মরণ করে।

শ্রীক্ষেত্র (সীতাঃ ১/১১)। পুরীর অপব নাম শ্রীক্ষেত্র। উডিষ্যায সমুদ্রতীরে অবস্থিত স্বাস্থ্যকর স্থান ও তীর্থক্ষেত্র।

শুম্ভনিশুম্ভের যুদ্ধ (দেবীঃ ২/৬)। শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে অসুর ভ্রাতৃদ্বয় প্রবল পরাক্রান্ত হয়ে স্বর্গরাজ্য অধিকার করে। দেবতাগণ তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হযে আদ্যাশক্তি ভগবতীর স্তব করেন। ভগবতী যুদ্ধে তাদের বধ করেন। চণ্ডীতে এই কাহিনী আছে।

শ্রুতি (কপাঃ ১/১)। কর্ণ অর্থাৎ মনোযোগ।

শৃঙ্গিনাং শাস্ত্রপাণিনাং ইত্যাদি চাণক্যপ্রদত্ত সদুপদেশ (দেবীঃ ৩/৭)। এটি চাণক্যের একটি সদুপদেশের অংশবিশেষ। পুরোটি হল—

"শৃঙ্গিনাঞ্চ নদীনাঞ্চ নখিনাং শস্ত্রপাণিনাং।
বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ ॥"

শৈলেশ্বর, শৈলেশ্বর শিব (দুর্গেঃ ১/১)। শিবের অপর নাম শৈলেশ্বর। শিবের বিশেষণরূপেও ব্যবহৃত হয়। শৈল-র অর্থাৎ পর্বতের ঈশ্বর যিনি—এই অর্থে

কথাটি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু হিমালয়ের কন্যা উমার পতি হিসাবেও শৈলেশ্বর নামটি আসতে পারে। শৈলেশ কথাটির অর্থ হিমালয়। মহাদেবের আলয় পর্বতশিখরে বলে কল্পিত হয়। সেইজন্যই শৈলেশ্বর নাম।

শৈলেশ্বরের মন্দির (দুর্গেঃ ১/১)। গড়-মান্দারণের অদূরে কাঁঠালী গ্রামে এখনো একটি মন্দিরের ভিত্তি বর্তমান। লোকে তাকেই শৈলেশ্বরের মন্দির বলে জানে। পাশেই একটি মাটির কুঁড়েঘরে শিব আছে। শিবলিঙ্গটি কালো পাথরের। সামনে ত্রিশূল পোঁতা। অথচ বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনায় শৈলেশ্বর শিবটি শ্বেতবর্ণ।

প্রবীণ সাহিত্যিক হাবাধন দত্ত মহাশয়ের মতে, মেদিনীপুর জেলার উত্তরাংশে অবস্থিত নেড়াদেউলের শিবমূর্তিই বঙ্কিম-বর্ণিত শৈলেশ্বর শিব। আবার, শ্রীযুক্ত তারকনাথ বিশ্বাস লিখেছেন, "তাহা সম্ভব নহে, কেননা নেড়াদেউল মান্দারণ হইতে ৭/৮ ক্রোশ দূরে। বিমলা, বীরেন্দ্রসিংহের নিকট হইতে বিদায় লইয়া দিগ্‌গজের সঙ্গে রঙ্গ সমাপন করিয়া, পদব্রজে কি ৮ ক্রোশ যাইয়া আবার ৮ ক্রোশ ফিরিয়া আসিতে পারেন? সম্ভবতঃ সে শিবলিঙ্গ নাই। মুসলমানদিগের আমলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে।" (বঙ্কিমবাবুর জীবনকথা—তারকনাথ গ্রন্থাবলী)

সক্রেতিস্ অপযশহেতু বধদণ্ডার্হ হইয়াছিলেন (রজনী ২/৩)। বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক সক্রেতিস্ (Socrates, ৪৬৯ খ্রীষ্টপূর্ব—৩৯৯ খ্রীষ্টপূর্ব)-এর কথা বলা হয়েছে। তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্য বহু ব্যক্তি তাঁর শিষ্য হন। প্লেটো তাঁর শিষ্যদের অন্যতম। তাঁর শিষ্যরা রাজদরবারের প্রতি বিদ্রোহ-ভাবাপন্ন হওয়ায় সক্রেতিস্ রাজ-রোষে পতিত হন। তাঁর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়। তিনি কোন প্রতিবাদ না ক'রে বিষপানে আত্মত্যাগ করেন।

সখীসংবাদ (বিষঃ ৯ম পরিঃ)। সখীসংবাদ কবিগানের অংশবিশেষ। শ্রীরাধিকা বৃন্দাদূতী, ললিতা ও বিশাখা প্রভৃতি সখীদের কাছে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করছেন। এটিই সখীসংবাদের বিষয়বস্তু।

সত্যভামার তুলাব্রত (বিষঃ ৪৪ পরিঃ)। কৃষ্ণের মহিষী সত্যভামার এই ব্রতকাহিনীটি কাশীরাম দাসের মহাভারতের নিজস্ব পরিকল্পনা। সত্যভামা এক ব্রতের ফললাভের জন্য তুলাদণ্ডের একদিকে কৃষ্ণকে রেখে, অন্যদিকে সম-পরিমাণ স্বর্ণ ওজন করতে থাকেন। কিন্তু যতই সোনা চাপানো হেক, কৃষ্ণের দিকটিই ভারী থাকে। শেষ পর্যন্ত একটি তুলসীপাতায় কৃষ্ণনাম লিখে বিপরীত দিকে চাপাতেই, তা কৃষ্ণের চেয়ে ভারী হল।

কৃষ্ণনামের মাহাত্ম্য প্রচারের জন্যই পরবর্তী কালে এই কাহিনী রচিত হয়েছে বলে মনে হয়।

সপ্তগ্রাম (কপাঃ ২/৬)। "হুগলি জেলার মগরা থানার গ্রাম। হাওড়া হইতে ২৪ মা. উত্তরে বান্দেল ষ্টেশনের পরে আদি-সপ্তগ্রাম নামে ষ্টেশন আছে; পূর্বে ইহার নাম ছিল ত্রিশবিঘা। প্রাচীন সরস্বতী নদীর খাতে পূর্বে ভাগীরথীর প্রধান খাত ছিল। ইহার তীরে ছিল সপ্তগ্রাম, বর্ত্তমান সাতগাঁ। এই সপ্তগ্রাম—বাঁশবেড়িয়া, কৃষ্ণপুর, বাসুদেবপুর, নিত্যানন্দপুর, শিবপুর, সম্বচোরা, বলদঘাটি। হিন্দু রাজাদের সময় ইহার উত্থান হইলেও মুসলমানদের সময়ে এখানকার গৌরবময় যুগ। শেরশাহ সপ্তগ্রাম হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত একটি রাজসড়ক নির্ম্মাণ করেন। তাহা এখন গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড নামে পরিচিত। সরস্বতীর খাত দিয়া ভাগীরথীর অধিকাংশ জলরাশি প্রবাহিত হইত বলিয়া দেশের সামুদ্রিক বাণিজ্যেরও ইহাই ছিল পথ। ১৬৩০-এ নদী সরিয়া যায় ও সপ্তগ্রামের ফৌজদার হুগলিতে দপ্তর উঠাইয়া লইয়া যান। ১৭ শতকের মধ্যভাগ হইতে সপ্তগ্রামের বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়।"

"কপালকুণ্ডলা" উপন্যাসে সপ্তগ্রামের বর্ণনা এরূপ—"…পূর্ব্বকালে সপ্তগ্রাম মহা-সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। এক কালে যবদ্বীপ হইতে রোমক পর্য্যন্ত সর্ব্বদেশের বণিকেরা বাণিজ্যার্থ এই মহানগরে মিলিত হইত। কিন্তু বঙ্গীয় দশম একাদশ শতাব্দীতে সপ্তগ্রামের প্রাচীন সমৃদ্ধির লাঘব জন্মিয়াছিল। ইহার প্রধান কারণ এই যে, তন্নগরের প্রান্তভাগ প্রক্ষালিত করিয়া যে স্রোতস্বতী বাহিত হইত, এক্ষণে তাহা সঙ্কীর্ণশরীরা হইয়া আসিতেছিল, সুতরাং বৃহদাকার জলযান সকল আর নগর পর্য্যন্ত আসিতে পারিত না। এ কারণ বাণিজ্যবাহুল্য ক্রমে লুপ্ত হইতে লাগিল। বাণিজ্যগৌরব নগরের বাণিজ্যনাশ হইলে সকলই যায়। সপ্তগ্রামের সকলই গেল। বঙ্গীয় একাদশ শতাব্দীতে হুগলি নূতন সৌষ্ঠবে তাহার প্রতিযোগী হইয়া উঠিতেছিল। তথায় পর্তুগীসেরা বাণিজ্য আরম্ভ করিয়া সপ্তগ্রামের ধনলক্ষ্মীকে আকর্ষিতা করিতেছিলেন। কিন্তু তখনও সপ্তগ্রাম একেবারে হতশ্রী হয় নাই। তথায় এ পর্য্যন্ত ফৌজদার প্রভৃতি প্রধান রাজপুরুষদিগের বাস ছিল; কিন্তু তখনও অনেকাংশ শ্রীভ্রষ্ট এবং বসতিহীন হইয়া পল্লীগ্রামের আকার ধারণ করিয়াছিল।" (কপাঃ ২/৬)

সপ্তমাতৃকা (দেবীঃ ২/৬)। (১) ব্রাহ্মী, (২) মহেশ্বরী, (৩) ঐন্দ্রী, (৪) বৈষ্ণবী, (৫) বারাহী, (৬) ইন্দ্রাণী, (৭) চামুণ্ডা।

সমভিব্যাহারিগণ (কপাঃ ১/২)। সঙ্গীসাথীগণ।

সমাহরণ (কপাঃ ১/২)। সম্যক্‌রূপে আহরণ।

সম্বৎসর (কপাঃ ১/১)। সমস্ত বৎসর ধরে।

স্কন্দেনেবিয়া (চন্দ্রঃ ৪/১)। নরওয়ে এবং সুইডেনকে একত্রে স্কন্দেনেবিয়া বলা হয়।

সালামাঙ্কা (রাজঃ ৭/৩)। স্পেনের একটি শহর। বহুবার বিদেশীদের হাতে এই শহরটি অধিকৃত হয়। খ্রীষ্টপূর্ব ২২২ অব্দে কার্থেজের হ্যানিবল এই নগর অধিকার করেন। ১০৫৫ খ্রীষ্টাব্দ মূরগণ এই নগরে পরাজিত হয়। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে পেনিনসুলার যুদ্ধে ফরাসীগণ এই নগর জয় করে।

সালামিসে Themistocles (রাজঃ ৭/১)। থেমিস্টোক্লেশ এথেন্সের সেনাপতি। পারস্যের বিরাট নৌবাহিনীকে তিনি সালামিসের যুদ্ধে পরাজিত করেন।

সাংখ্য (চন্দ্রঃ ১/৫ ; দেবীঃ ১/১৫)। কপিলমুনি-রচিত দর্শনশাস্ত্র। এতে প্রকৃতি, বুদ্ধিতত্ত্ব, অহঙ্কার, সূক্ষ্মপঞ্চভূত, স্থূলপঞ্চভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয়—এই চব্বিশটি এবং পুরুষসহ পঁচিশটি পদার্থ কল্পিত হয়েছে।

সু ঔ জস্, অম্ ঔ শস্ (দেবীঃ ১/১৫)। সংস্কৃত কারক-বিভক্তির কতক-গুলি চিহ্ন।

সুবর্ণরেখা (দুর্গেঃ ১/৪)। উড়িষ্যার প্রসিদ্ধ নদী। রাঁচির ১০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ছোটনাগপুরের পার্বত্য মালভূমি থেকে উৎপন্ন হয়ে রাঁচি, জামসেদপুর, সিংহভূম, মেদিনীপুর জেলা অতিক্রম ক'রে বালেশ্বরের ২৮ মাইল পূর্বে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। দৈর্ঘ্য ২৯০ মাইল।

সূত্রকারস্যোভয়েন্দ্রিয়শূন্যত্বাৎ (দেবীঃ ৩/২। অর্থাৎ—সূত্রকারের জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও উভয় ইন্দ্রিয়ের অধিপতি মনও নেই।

স্মৃতি (চন্দ্রঃ ১/৫)। বিশজন ধর্মশাস্ত্রী দ্বারা বিধিবদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ। এতে ব্রত-পূজাদির নিয়ম, প্রায়শ্চিত্ত, খাদ্যবিচার, দায়ভাগ, অপরাধের দণ্ড ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে।

সেকালের মালিনীমাসী (রজনী ১/২)। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের এক উল্লেখযোগ্য চরিত্র। মালিনী রাজবাটীতে ফুল যোগাত এবং রাজকন্যা বিদ্যা ও রাজপুত্র সুন্দরের প্রণয়ে সে সাহায্য করে।

সেক্ষপিয়র গেলেরি (রজনী ৩/৩)। ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার William Shakespeare-এর বর্ণিত চরিত্রের ছবি; ই সেক্ষপিয়র গেলেরি।

সেক্ষপিয়রকে বল্‌টের ভাঁড় বলিয়াছেন (রজনী ২/৩)। অর্থাৎ—সেক্ষপীয়রকে ভল্‌তেয়ার ভাঁড় বলেছেন। বল্‌টের অর্থাৎ ভল্‌তেয়ার (Voltair)

(১৬৯৪—১৭৭৮)। ভল্‌তেয়ার ছিলেন বিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক, সমালোচক ও সমাজ-তত্ত্ববিদ্‌। তাঁর বিখ্যাত বিদ্রূপাত্মক রচনা 'ক্যান্‌ডিডা' (Candide)। তিনি ছিলেন অবাস্তব আদর্শের বিরোধী। নাটকে তিনি প্রাচীন গ্রীক নীতির সমর্থক ছিলেন। তাই তিনি সেক্সপীয়রের নাটককে সহ্য করতে পারেননি। তাঁর মতে, জনসাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য ভাঁড়ের মতো সেক্সপীয়র সস্তা নাটক রচনা করেছিলেন।

স্বেদশ্রুতি (কপাঃ ১/২)। ঘাম বের হওয়া।

সৈকতে (কপাঃ ১/২)। বেলাভূমিতে।

হরবোলা (দেবীঃ ২/৬)। যে বহুরকম কণ্ঠস্বর (বিশেষভাবে পশু-পক্ষীর) নকল করতে পারে, তাকে হরবোলা বলে।

হলদীঘাটে ঐরকম কি একটা হইয়াছিল (রাজঃ ৪/৪)। এখানে হলদীঘাটের যুদ্ধের কথা স্মরণ করা হয়েছে। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে এই যুদ্ধ হয়। মানসিংহের নেতৃত্বে বিরাট মোগলবাহিনী হলদীঘাটের গিরিবর্ত্মে প্রতাপের ক্ষুদ্র বাহিনীর সম্মুখে যুদ্ধে যথেষ্ট বিব্রত হয়।

হারাম (রাজঃ ২/১)। আরবী শব্দ। অর্থ—অস্পৃশ্য বা অশুচি।

হাবসী (দেবীঃ ১/৯)। আবিসিনিয়াবাসীদের বলা হয় হাবসী।

হেকামৎ (রাজঃ ৬/৫)। সাহস।

বঙ্কিম সুভাষিত

১। "বয়সে কি যৌবন যায়? যৌবন যায় রূপে আর মনে; যার রূপ নাই, সে বিংশতি বয়সেও বৃদ্ধা; যার রূপ আছে, সে সকল বয়সেই যুবতী। যার মনে রস নাই, সে চিরকাল প্রবীণ; যার রস আছে, সে চিরকাল নবীন।" (দুর্গেঃ ১/১০)

২। "অগ্নি আর পাপ অধিক দিন গোপন থাকে না।" (দুর্গেঃ ২/৬)

৩। "আশা মধুরভাষিণী। অতি দুর্দ্দিনে মনুষ্য-শ্রবণে মৃদু মৃদু কহিয়া থাকে, "মেঘ ঝড় চিরস্থায়ী নহে, কেন দুঃখিত হও? আমার কথা শুন।" (দুর্গেঃ ১/১৬)

৪। "এ সংসারের প্রধান ঐন্দ্রজালিক স্নেহ! ব্যাধি-প্রতিকারে প্রধান ঔষধ প্রণয়। নহিলে হৃদয়-ব্যাধি কে উপশম করিতে পারে?" (দুর্গেঃ ২/২১)

৫। "তীর্থদর্শনে যেরূপ পরকালের কর্ম্ম হয়, বাটী বসিয়াও সেরূপ হইতে পারে।" (কপাঃ ১/১)

৬। "বাঙ্গালীরা আপন গৃহিণীকে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী দেখে।" (কপাঃ ২/২)

৭। "তুমি অধম—তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন?" (কপাঃ ১/২)

৮। "প্রণয় কর্কশকে মধুর করে, অসৎকে সৎ করে, অপুণ্যকে পুণ্যবান্ করে, অন্ধকারকে আলোকময় করে।" (কপাঃ ২/৫)

৯। "মনুষ্যহৃদয় অনন্ত সমুদ্র, যখন তদুপরি ক্ষিপ্ত বায়ুগণ সমর করিতে থাকে, কে তাহার তরঙ্গমালা গণিতে পারে?" (কপাঃ ৪/৩)

১০। "তুমি আমি প্রাণত্যাগ করিতে চাহি না। রাগ করিয়া তাহা বলি। এ সংসার সুখময়। সুখের প্রত্যাশাতেই বর্ত্তুলবৎ সংসারমধ্যে ঘুরিতেছি—দুঃখের প্রত্যাশায় নহে। কদাচিৎ যদি আত্মকর্ম্মদোষে সেই প্রত্যাশা সফলীকৃত না হয়, তবেই দুঃখ বলিয়া উচ্চ কলরব আরম্ভ করি। তবেই দুঃখ নিয়ম নহে, সিদ্ধান্ত হইল; নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র। তোমার আমার সর্ব্বত্র সুখ। সেই সুখে আমরা সংসারমধ্যে বদ্ধমূল; ছাড়িতে চাহি না। কিন্তু এ সংসার-বন্ধনে প্রণয় প্রধান রজ্জু।" (কপাঃ ৪/৮)

১১। "যাহার বন্ধন নাই, তাহারই অপ্রতিহত বেগ। গিরিশিখর হইতে নির্ঝরিণী নামিলে, কে তাহার গতি রোধ করে? একবার বায়ু তাড়িত হইলে কে তাহার সঞ্চার নিবারণ করে?" (কপাঃ ৪/৮)

১২। "যখন মনুষ্যহৃদয় কোন উৎকট ভাবে আচ্ছন্ন হয়, চিন্তার একাগ্রতায় বাহ্য সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য থাকে না, তখন অনৈসর্গিক পদার্থও প্রত্যক্ষীভূত বলিয়া বোধ হয়।" (কপাঃ ৪/৮)

১৩। "বেগবান্ হৃদয়কে বিশ্বাস নাই।" (মৃণাঃ ১/৪)

১৪। "আত্মশ্লাঘা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ।" (মৃণাঃ ২/১)

১৫। "মূর্খ তিন জন। যে আত্মরক্ষায় যত্নহীন, যে সেই যত্নহীনতার প্রতিপোষক, আর যে আত্মবুদ্ধির অতীত বিষয়ে বাক্যব্যয় করে, ইহারাই মূর্খ।" (মৃণাঃ ২/১)।

১৬। "স্বদেশবৈরিতা মহাপাপ।" (মৃণাঃ ২/৬)

১৭। "যে পরকে প্রতারণা করে, সে বঞ্চক মাত্র। যে আত্মপ্রতারণা করে, তাহার সর্ব্বনাশ ঘটে।" (মৃণাঃ ৩/৬)

১৮। "পাপাসক্তকে ভালবাসিতে হইবে। প্রণযের পাত্রাপাত্র নাই। সকলকেই ভালবাসিবে, প্রণয় জন্মিলেই তাহাকে যত্নে স্থান দিবে; কেন না প্রণয় অমূল্য।" (মৃণাঃ ৩/৬)

১৯। "স্ত্রীলোকের সতীত্বের অধিক আর ধর্ম্ম নাই; যে স্ত্রীর সতীত্ব নাই, সে শূকরীর অপেক্ষাও অধম। সতীত্বের হানি কেবল কার্য্যেই ঘটে, এমন নহে, স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষের চিন্তামাত্রও সতীত্বের বিঘ্ন।" (মৃণাঃ ৩/৬)

২০। "ধর্ম্ম ভিন্ন প্রেম জন্মে না।" (মৃণাঃ ৩/৬)

২১। "বাসনা হইতে ভ্রান্তি জন্মে, ভ্রান্তি হইতে অধর্ম্ম জন্মে।" (মৃণাঃ ৩/৬)।

২২। "যে কখনও রোদন করে নাই, সে মনুষ্যমধ্যে অধম। তাহাকে কখনও বিশ্বাস করিও না। নিশ্চিত জানিও, সে পৃথিবীর সুখ কখনও ভোগ করে নাই—পরের সুখও কখনও তাহার সহ্য হয় না। এমন হইতে পারে যে, কোন আত্মচিত্তবিজয়ী মহাত্মা বিনা বাষ্পমোচনে গুরুতর মনঃপীড়া সকল সহ্য করিতেছেন, এবং করিয়া থাকেন; কিন্তু তিনি যদি কস্মিন্ কালে, একদিন বিরলে একবিন্দু অশ্রুজলে পৃথিবী সিক্ত না করিয়া থাকেন, তবে তিনি চিত্তজয়ী মহাত্মা হইতে পারেন, কিন্তু আমি বরং চোরের সহিত প্রণয় করিব, তথাপি তাঁহার সঙ্গে নহে।" (মৃণাঃ ৩/৯)

২৩। "যাহার ধৈর্য্য নাই, যে ক্রোধের জন্মমাত্র অন্ধ হয়, সে সংসারের সকল সুখে বঞ্চিত।" (মৃণাঃ ৩/১০)

২৪। "স্ত্রীলোকের ক্রোধ একেবারে হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না।" (বিষঃ ১ম পরিঃ)

২৫। "প্রথম যৌবনসঞ্চারের অব্যবহিত পূর্ব্বেই যেরূপ মাধুর্য্য এবং সরলতা থাকে, পরে তত থাকে না।" (বিষঃ ৫ম পরিঃ)।

২৬। "প্রেমের পাক বিচ্ছেদে।" (বিষঃ ২০ পরিঃ)।

২৭। "দুঃখী না হইলে লোভে পড়িতে হয় না। যাহার যাহাতে অভাব, তাহার তাহাতেই লোভ।" (বিষঃ ২৯ পরিঃ)

২৮। "অবিচ্ছিন্ন সুখ, দুঃখের মূল ; পূর্ব্বগামী দুঃখ ব্যতীত স্থায়ী সুখ জন্মে না।" (বিষঃ ২৯ পরিঃ)

২৯। "সকল সুখেরই সীমা আছে।" (বিষঃ ৩১ পরিঃ)

৩০। "মনের অনেকগুলি ভাব আছে, তাহার সকলকেই লোকে ভালবাসা বলে। কিন্তু চিত্তের যে অবস্থায়, অন্যের সুখের জন্য আমরা আত্মসুখ বিসর্জ্জন করিতে স্বতঃ প্রস্তুত হই, তাহাকে প্রকৃত ভালবাসা বলা যায়। "স্বতঃ প্রস্তুত হই," অর্থাৎ ধর্ম্মজ্ঞান বা পুণ্যাকাঙ্ক্ষায় নহে। সুতরাং রূপবতীর রূপভোগলালসা ভালবাসা নহে। যেমন ক্ষুধাতুরের ক্ষুধাকে অন্নের প্রতি প্রণয় বলিতে পারি না, তেমনি কামাতুরের চিত্ত-চাঞ্চল্যকে রূপবতীর প্রতি ভালবাসা বলিতে পারি না। সেই চিত্তচাঞ্চল্যকেই আর্য্য কবিরা মদনশরজ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যে বৃত্তির কল্পিত অবতার বসন্তসহায় হইয়া, মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ করিতে গিয়াছিলেন, যাঁহার প্রসাদে কবির বর্ণনায় মৃগেরা মৃগীদিগের গাত্রে গাত্রকণ্ডূয়ন করিতেছে, করিগণ করিণীদিগকে পদ্মমৃণাল ভাঙ্গিয়া দিতেছে, সে এই রূপজ মোহমাত্র। এই বৃত্তিও জগদীশ্বরপ্রেরিতা ; ইহার দ্বারাও সংসারের ইষ্টসাধন হইয়া থাকে, এবং ইহা সর্ব্বজীবমুগ্ধকারী। কালিদাস, বাইরণ, জয়দেব ইহার কবি,—বিদ্যাসুন্দর ইহার ভেঙ্গান। কিন্তু ইহা প্রণয় নহে। প্রেম বুদ্ধিবৃত্তিমূলক। প্রণয়াস্পদ ব্যক্তির গুণসকল যখন বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা পরিগৃহীত হয়, হৃদয় সেই সকল গুণে মুগ্ধ হইয়া তৎপ্রতি সমাকৃষ্ট এবং সঞ্চালিত হয়, তখন সেই গুণাধারের সংসর্গলিপ্সা, এবং তৎপ্রতি ভক্তি জন্মে। ইহার ফল, সহৃদয়তা, এবং পরিণামে আত্মবিস্মৃতি ও আত্মবিসর্জ্জন। এই যথার্থ প্রণয় ; সেক্সপীয়র, বাল্মীকি, শ্রীমদ্ভাগবতকার ইহার কবি। ইহা রূপে জন্মে না। প্রথমে বুদ্ধিদ্বারা গুণগ্রহণ, গুণগ্রহণের পর আসঙ্গলিপ্সা ; আসঙ্গলিপ্সা সফল হইলে সংসর্গ, সংসর্গফলে প্রণয়, প্রণয়ে আত্মবিসর্জ্জন। আমি ইহাকেই ভালবাসা বলি। নিতান্ত পক্ষে স্ত্রীপুরুষের ভালবাসা আমার বিবেচনায় এইরূপ। আমার বোধ হয়, অন্য ভালবাসারও মূল এইরূপ ; তবে স্নেহ এক কারণে উপস্থিত হয় না। কিন্তু সকল কারণই বুদ্ধিবৃত্তিমূলক। নিতান্ত পক্ষে বুদ্ধিবৃত্তিমূলক কারণজাত স্নেহ ভিন্ন স্থায়ী হয় না। রূপজ মোহ তাহা নহে। রূপদর্শনজনিত যে সকল চিত্তবিকৃতি, তাহার তীক্ষ্ণতা পৌনঃপুন্যে হ্রস্ব হয়। অর্থাৎ পৌনঃপুন্যে পরিতৃপ্তি জন্মে। গুণজনিতের পরিতৃপ্তি নাই। কেন না, রূপ এক—প্রত্যহই তাহার এক প্রকারই বিকাশ, গুণ নিত্য নূতন নূতন ক্রিয়ায় নূতন নূতন হইয়া প্রকাশ পায়। রূপেও প্রণয় জন্মে, গুণেও প্রণয় জন্মে—কেন না, উভয়ের দ্বারা আসঙ্গলিপ্সা জন্মে। যদি উভয় একত্রিত হয়, তবে প্রণয় শীঘ্রই জন্মে ; কিন্তু

একবার প্রণয়সংসর্গ ফল বদ্ধমূল হইলে, রূপ থাকা না থাকা সমান। রূপবান্ ও কুৎসিতের প্রতি স্নেহ ইহার নিত্য উদাহরণস্থল।

গুণজনিত প্রণয় চিরস্থায়ী বটে—কিন্তু গুণ চিনিতে দিন লাগে। এই জন্য সে প্রণয় একেবারে হঠাৎ বলবান্ হয় না—ক্রমে সঞ্চারিত হয়। কিন্তু রূপজ মোহ এককালীন সম্পূর্ণ বলবান্ হইবে। তাহার প্রথম বল এমন দুর্দ্দমনীয় হয় যে, অন্য সকল বৃত্তি তদ্দ্বারা উচ্ছিন্ন হয়। এই মোহ কি—এই স্থায়ী প্রণয় কি না—ইহা জানিবার শক্তি থাকে না। অনন্তকালস্থায়ী প্রণয় বলিয়া তাহাকে বিবেচনা হয়।" (বিষঃ ৩২ পরিঃ)

৩১। "ভালবাসাতেই মানুষের একমাত্র নির্ম্মল এবং অবিনশ্বর সুখ। ভালবাসাই মনুষ্যজাতির উন্নতির শেষ উপায়—মনুষ্যমাত্রে পরস্পরে ভালবাসিলে আর মনুষ্যকৃত অনিষ্ট পৃথিবীতে থাকিবে না।" (বিষঃ ৩২ পরিঃ)

৩২। "যাহারা পরোপকারী, পরমপ্রেমে বলবান্, তাহারা কখনও শারীরিক বলের অভাব জানিতে পারে না।" (বিষঃ ৩৪ পরিঃ)

৩৩। "স্ত্রীজাতি বড় আপনার বুঝে।" (ইন্দিরা ২য় পরিঃ)

৩৪। "অন্ধকারে প্রদীপের মত, অবগুণ্ঠনমধ্যে রমণীর কটাক্ষ অধিকতর তীব্র দেখায়।" (ইন্দিরা ১ম পরিঃ)

৩৫। "ভবিতব্য কে খণ্ডাইতে পারে? যাহা ঘটিবার তাহা অবশ্য ঘটিবে। তাই বলিয়া পুরুষকারকে অবহেলা করা কর্ত্তব্য নহে। যাহা কর্ত্তব্য, তাহা অবশ্য করিব।" (চন্দ্রঃ ২/৩)

৩৬। "দুঃখ বলিয়া একটা স্বতন্ত্র পদার্থ নাই। সুখ দুঃখ তুল্য বা বিজ্ঞের কাছে একই।" (চন্দ্রঃ ৩/১)

৩৭। "আশা, সংসারের অনেক সুখের কারণ বটে, কিন্তু আশাই দুঃখের মূল।" (চন্দ্রঃ ৩/২)

৩৮। "সুন্দর মুখের জয় সর্ব্বত্র।" (চন্দ্রঃ ৩/৫)

৩৯। "বৎসরে কি কালের মাপ। ভাবে ও অভাবে কালের মাপ।" (চন্দ্রঃ ৩/৬)

৪০। "তুমি জড় প্রকৃতি! তোমায় কোটি কোটি প্রণাম! তোমার দয়া নাই, মমতা নাই, স্নেহ নাই,—জীবের প্রাণনাশে সঙ্কোচ নাই, তুমি অশেষ ক্লেশের জননী—অথচ তোমা হইতে সব পাইতেছি—তুমি সর্ব্বসুখের আকর, সর্ব্বমঙ্গলময়ী, সর্ব্বার্থ-সাধিকা, সর্ব্বকামনাপূর্ণকারিণী, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী। তোমাকে নমস্কার। হে মহাভয়ঙ্করি নানারূপরঙ্গিণি! কালি তুমি ললাটে চাঁদের টিপ পরিয়া, মস্তকে নক্ষত্রকিরীট ধরিয়া, ভুবন-মোহন হাসি হাসিয়া, ভুবন মোহিয়াছ। গঙ্গার ক্ষুদ্রোর্ম্মিতে পুষ্পমালা গাঁথিয়া

পুষ্পে পুষ্পে চন্দ্র ঝুলাইয়াছ; সৈকত-বালুকায় কত কোটি কোটি হীরক জ্বালিয়াছ; গঙ্গার হৃদয়ে নীলিমা ঢালিয়া দিয়া, তাতে কত সুখে যুবক যুবতীকে ভাসাইয়াছিলে! যেন কত আদর জান—কত আদর করিয়াছিলে। আজ এ কি? তুমি অবিশ্বাসযোগ্যা সর্ব্বনাশিনী। কেন জীব লইয়া তুমি ক্রীড়া কর, তাহা জানি না—তোমার বুদ্ধি নাই, জ্ঞান নাই, চেতনা নাই—কিন্তু তুমি সর্ব্বময়ী, সর্ব্বকর্ত্রী, সব্বনাশিনী এবং সর্ব্বশক্তিময়ী। তুমি ঐশী মায়া, তুমি ঈশ্বরের কীর্ত্তি, তুমিই অজেয়। তোমাকে কোটি কোটি প্রণাম করি।" (চন্দ্রঃ ৩/৮)

৪১। "মনুষ্যের ইন্দ্রিয়ের পথ রোধ কর—ইন্দ্রিয় বিলুপ্ত কর—মনকে বাঁধ,—বাঁধিয়া একটি পথে ছাড়িয়া দাও—অন্য পথ বন্ধ কর—মনের শক্তি অপহৃত কর—মন কি করিবে? সেই এক পথে যাইবে—তাহাতে স্থির হইবে—তাহাতে মজিবে।" (চন্দ্রঃ ৪/৩)

৪২। "যাঁহার প্রকৃতিতে দয়া এবং ন্যায়পরতা নাই—তাঁহার দ্বারা রাজ্যস্থাপনাদি মহৎ কার্য্য হইতে পারে না—কেন না, তাঁহার প্রকৃতি উন্নত নহে—ক্ষুদ্র। এ সকল ক্ষুদ্রচেতার কাজ নহে।" (চন্দ্রঃ ৬ ৪)

৪৩। "স্ত্রীজাতিই সংসারের রত্ন।" (চন্দ্রঃ ৬/৫)

৪৪। "যে ঈশ্বরকে না মানে, সেও বিপদে পড়িলে তাঁহাকে ডাকে—ভক্তিভাবে ডাকে।" (চন্দ্রঃ ৬/৭)

৪৫। "রূপ দ্রষ্টার মানসিক বিকার মাত্র—শব্দও মানসিক বিকার। রূপ রূপবানে নাই, রূপ দর্শকের মনে - নহিলে একজনকে সকলেই সমান রূপবান দেখে না কেন? একজনে সকলেই আসক্ত হয় না কেন? সেইরূপ শব্দও তোমার মনে রূপ দর্শকের একটি মনেব সুখ মাত্র, শব্দও শ্রোতার একটি মনের সুখ মাত্র, স্পর্শও স্পর্শকের মনের সুখ মাত্র।" (রজনী ১/৩)

৪৬। "ঐশিক নিয়ম বিচিত্র—মনুষ্যের বুদ্ধির অতীত—আমরা যাহাকে দয়া বলি, ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞানের কাছে তাহা দয়া নহে—আমরা যাহাকে পীড়ন বলি—ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞানের কাছে তাহা পীড়ন নহে। এই সংসারের অনন্ত চক্র দয়াদাক্ষিণ্যশূন্য, সে চক্র নিয়মিত পথে অনতিক্ষুণ্ণ রেখায় অহরহ চলিতেছে, তাহার দারুণ বেগের পথে যে পড়িবে—অন্ধ হউক, খঞ্জ হউক, আর্ত্ত হউক, সেই পিষিয়া মরিবে।" (রজনী ১/৬)

৪৭। "দুঃখ কি? অভাব। সকল দুঃখই অভাব। রোগ দুঃখ; কারণ স্বাস্থ্যের অভাব। অভাবমাত্রই দুঃখ নহে,—তাহা জানি। রোগের অভাব দুঃখ নহে। অভাববিশেষই দুঃখ।" (রজনী ২/৩)

৪৮। "পৃথিবীতে এমন কেহ নাই, যাহার যশ নাই। যে পাকা জুয়াচোর, তাহারও বুদ্ধি সম্বন্ধে যশ আছে। আমি একজন কশাইয়েরও যশ শুনিয়াছি—মাংস সম্বন্ধে সে কাহাকেও প্রবঞ্চনা করিত না। সে কখন মেষমাংস বলিয়া কাহাকেও কুক্কুরমাংস দেয় নাই। যশ সকলেরই আছে। আবার কাহারও যশ সম্পূর্ণ নহে। বেকনের ঘুষখোর অপবাদ—সক্রেতিস্ অপযশহেতু বধদণ্ডার্হ হইয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির দ্রোণবধে মিথ্যাবাদী—অর্জ্জুন বভ্রুবাহন কর্ত্তৃক পরাভূত। কাইসরকে যে বিথী'নয়ার রাণী বলিত, সে কথা অদ্যাপি প্রচলিত,—সেক্সপিয়রকে বল্‌টের ভাঁড় বলিয়াছেন।" (রজনী ২/৩)

৪৯। "এ সংসারে কেহ কখন বুদ্ধির অভাব আছে মনে করে নাই। সকলেই আপনাকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ বলিয়া জানে।" (রজনী ২/৩)

৫০। "……অতীতশৈশব অথচ অপ্রাপ্তযৌবনার সৌন্দর্য্য এবং অস্ফুটবাক্ শিশুর সৌন্দর্য্য, ইহাই মনোহর—যৌবনের সৌন্দর্য্য তাদৃশ নহে। যৌবনে বসনভূষণের ঘটা, হাসি চাহনির ঘটা,—বেণীর দোলনি, বাহুর বলনি, গ্রীবার হেলনি, কথার ছলনি—যুবতীর রূপের বিকাশ একপ্রকার দোকানদারি। আর আমরা যে চক্ষে সে সৌন্দর্য্য দেখি, তাহাও বিকৃত। যে সৌন্দর্য্যের উপভোগে ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত চিত্তভাবের সংস্পর্শমাত্র নাই, সেই সৌন্দর্য্যই সৌন্দর্য্য।" (রজনী ২/১)

৫১। "বাঙ্গালির উইল প্রায় গোপনে থাকে না।" (কৃঃ উঃ ১/১)

৫২। "যাহার চাকরাণী নাই, তাহার ঘরে ঠকামি, মিথ্যা সংবাদ, কোন্দল এবং ময়লা, এই চারিটি বস্তু নাই। চাকরাণী নামে দেবতা এই চারিটির সৃষ্টিকর্ত্তা।" (কৃঃ উঃ ১/৬)

৫৩। "হিন্দুর মেয়ে, মরা বড় সহজ মনে করে।" (কৃঃ উঃ ১/২০)

৫৪। "যাহাকে ভালবাস, তাহাকে নয়নের আড় করিও না। যদি প্রেমবন্ধন দৃঢ় রাখিবে, তবে সূতা ছোট করিও। বাঞ্ছিতকে চোখে চোখে রাখিও। অদর্শনে কত বিষময় ফল ফলে। যাহাকে বিদায় দিবার সময়ে কত কাঁদিয়াছ, মনে করিয়াছ, বুঝি তাহাকে ছাড়িয়া দিন কাটিবে না,—কয় বৎসর পরে তাহার সহিত আবার যখন দেখা হইয়াছে, তখন কেবল জিজ্ঞাসা করিয়াছ—"ভাল আছ ত?" হয়ত সে কথাও হয় নাই—কথাই হয় নাই—আন্তরিক বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। হয়ত রাগে, অভিমানে আর দেখাই হয় নাই। তত নাই হউক, একবার চক্ষের বাহির হইলেই, যা ছিল তা আর হয় না। যা যায়, তা আর আসে না। যা ভাঙ্গে, আর তা গড়ে না। মুক্তবেণীর পর যুক্তবেণী কোথায় দেখিয়াছ?" (কৃঃ উঃ ১/২৪)

৫৫। "এ সংসারে বিশেষ দুঃখ এই যে, মরিবার উপযুক্ত সময়ে কেহ মরে না। অসময়ে সবাই মরে।" (কৃঃ উঃ ২/১১)

৫৬। "রমণী ক্ষমাময়ী, দয়াময়ী, স্নেহময়ী,—রমণী ঈশ্বরের কীর্ত্তির চরমোৎকর্ষ, দেবতার ছায়া, পুরুষ দেবতার সৃষ্টিমাত্র। স্ত্রী আলোক, পুরুষ ছায়া।" (কৃঃ উঃ ২/১৫)

৫৭। "দুর্ব্বলের অবলম্বন মিথ্যা কথা।" (রাজঃ ৩/৩)

৫৮। "বিপৎকালে যে ইতস্ততঃ করে, সেই মারা যায়।" (রাজঃ ৩/৩)

৫৯। "মনুষ্য স্ত্রীজাতির প্রেমে অন্ধ হইলে, আর তাহার হিতাহিত ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান থাকে না। তাহার মত বিশ্বাসঘাতক, পাপিষ্ঠ আর নাই।" (রাজঃ ৮/১৩)

৬০। "অবস্থাবিশেষে মনুষ্য হিংস্র জন্তু মাত্র।" (আনন্দঃ ১/৩)

৬১। "মায়া কাটাইতে পারে কে? যে বলে, আমি মায়া কাটাইয়াছি, হয় তার মায়া কখনই ছিল না বা সে মিছা বড়াই করে।" (আনন্দঃ ১/১০)

৬২। "অপ্সরোগণের ভ্রূবিলাসযুক্ত কটাক্ষের জ্যোতি লইয়া অতি যত্নে নির্ম্মিত যে সম্মোহন শর, পুষ্পধন্বা তাহা পরিণীত দম্পতির প্রতি অপব্যয় করেন না। ইংরেজ পূর্ণিমার রাত্রে রাজপথে গ্যাস জ্বালে, বাঙ্গালী তেলা মাথায় তেল ঢালিয়া দেয়, মনুষ্যের কথা দূরে থাক, চন্দ্রদেব সূর্য্যদেবের পরেও কখনও কখনও আকাশে উদিত থাকেন, ইন্দ্র সাগরে বৃষ্টি করেন, যে সিন্দুকে টাকা ছাপাছাপি, কুবের সেই সিন্দুকেই টাকা লইয়া যান, যম যার প্রায় সবগুলিকেই গ্রহণ করিয়াছেন, তারই বাকিটাকে লইয়া যান। কেবল রতিপতির এমন নির্ব্বুদ্ধির কাজ দেখা যায় না। যেখানে গাঁটছড়া বাঁধা হইল—সেখানে আর তিনি পরিশ্রম করেন না, প্রজাপতির উপর সকল ভার দিয়া, যাহার হৃদয়শোণিত পান করিতে পারিবেন, তাহার সন্ধানে যান।" (আনন্দঃ ২/১)

৬৩। "বৃথা মৃত্যু বীরের ধর্ম্ম নহে।" (আনন্দঃ ৪/৬)

৬৪। "ঈশ্বর অনন্ত জানি। কিন্তু অনন্তকে ক্ষুদ্র হৃদয়পিঞ্জরে পুরিতে পারি না। সান্তকে পারি। তাই অনন্ত জগদীশ্বর, হিন্দুর হৃৎপিঞ্জরে সান্ত শ্রীকৃষ্ণ। স্বামী আরও পরিষ্কাররূপে সান্ত। এই জন্য প্রেম পবিত্র হইলে, স্বামী ঈশ্বরে আরোহণের প্রথম সোপান। তাই হিন্দুর মেয়ের পতিই দেবতা। অন্য সব সমাজ, হিন্দুসমাজের কাছে এ অংশে নিকৃষ্ট।" (দেবীঃ ১/১৩)

৬৫। "পুরুষমানুষ স্ত্রীলোকের তৈজসের মধ্যে। না থাকিলে ঘর-সংসার চলে না—তাই রাখিতে হয়। কথায় কথায় সকড়ি হয়—মাজিয়া ঘষিয়া ধুইয়া ঘরে তুলিতে নিত্য প্রাণ বাহির হইয়া যায়।" (দেবীঃ ২/৭)

৬৬। "কুলিনের ছেলের আর অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যের "বিদায়" বা "মর্য্যাদা" গ্রহণে লজ্জা ছিল না—এখনও বোধহয় নাই।" (দেবীঃ ২/৮)

৬৭। "হায় লাঠি! তোমার দিন গিয়াছে! তুমি ছার বাঁশের বংশ বটে, কিন্তু শিক্ষিত হস্তে পড়িলে তুমি না পারিতে, এমন কাজ নাই। তুমি কত তরবারি দুই টুক্‌রা করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছ, কত ঢাল-খাঁড়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়াছ—হায়! বন্দুক আর সঙ্গীন তোমার প্রহারে যোদ্ধার হাত হইতে খসিয়া পড়িয়াছে। যোদ্ধা ভাঙ্গা হাত লইয়া পলাইয়াছে। লাঠি! তুমি বাঙ্গালায় আব্রু পর্দ্দা রাখিতে, মান রাখিতে, ধান রাখিতে, ধন রাখিতে, জন রাখিতে, সবার মন রাখিতে। মুসলমান তোমার ভয়ে ত্রস্ত ছিল, ডাকাইত তোমার জ্বালায় ব্যস্ত ছিল, নীলকর তোমার ভয়ে নিরস্ত ছিল। তুমি তখনকার পীনাল কোড ছিলে—তুমি পীনাল কোডের মত দুষ্টের দমন করিতে, পীনাল কোডের মত শিষ্টেরও দমন করিতে এবং পীনাল কোডের মত রামের অপরাধে শ্যামের মাথা ভাঙ্গিতে। তবে পীনাল কোডের উপর তোমার এই সর্‌দারি ছিল যে, তোমার উপর আপীল চলিত না। হায়! এখন তোমার সে মহিমা গিয়াছে! পীনাল কোড তোমাকে তাড়াইয়া তোমার আসন গ্রহণ করিয়াছে—সমাজ-শাসন-ভার তোমার হাত হইতে তার হাতে গিয়াছে। তুমি, লাঠি! আর লাঠি নও, বংশখণ্ড মাত্র! ছড়িত্ব প্রাপ্ত হইয়া শৃগাল-কুক্কুর-ভীত বাবুবর্গের হাতে শোভা কর; কুক্কুর ডাকিলেই সে ননীর হাতগুলি হইতে খসিয়া পড়। তোমার সে মহিমা আর নাই। শুনিতে পাই, সেকালে তুমি নাকি উত্তম ঔষধ ছিলে—মানসিক ব্যাধিব উত্তম চিকিৎসকদিগের মুখে শুনিতে পাই, "মূর্খস্য লাঠৌষধং।" এখন মূর্খের ঔষধ "বাপু" "বাছা"—তাহাতেও রোগ ভাল হয় না। তোমাব সগোত্র সপিণ্ডগণের মধ্যে অনেকেরই গুণ এই দুনিয়াতে জাজ্বল্যমান। ইস্তক আড়া বাঁকারি খুঁটি খোঁটা লাগাযেৎ শ্রীনন্দনন্দনের মোহন বংশী, সকলেরই গুণ বুঝি—কিন্তু লাঠি! তোমার মত কেহ না। তুমি আর নাই—গিয়াছ। ভরসা করি, তোমার অক্ষয় স্বর্গ হইয়াছে; তুমি ইন্দ্রলোকে গিয়া নন্দনকাননের পুষ্পভারাবনত পারিজাত-বৃক্ষশাখার টেক্‌না হইয়া আছ, দেবকন্যারা তোমার ঘায় কল্পবৃক্ষ হইতে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ ফল সকল পাড়িয়া লইতেছে। এক আধটা ফল যেন পৃথিবীতে গড়াইয়া পড়ে।" (দেবীঃ ৩/১)

৬৮। "······রাজত্ব স্ত্রীজাতির ধর্ম্ম নয়। কঠিন ধর্ম্মও এই সংসারধর্ম্ম; ইহার অপেক্ষা কোন যোগই কঠিন নয়।" (দেবীঃ ৩/১৩)

৬৯। "গৃহধর্ম্মে বিদ্যা প্রকাশের প্রয়োজন নাই। গৃহধর্ম্ম বিদ্বানেই সুসম্পন্ন করিতে পারে বটে, কিন্তু বিদ্যা প্রকাশের স্থান সে নয়। যেখানে বিদ্যা প্রকাশের স্থান নহে,

সেখানে যাহার বিদ্যা প্রকাশ পায়, সেই মূর্খ। যাহাব বিদ্যা প্রকাশ পায না, সেই যথার্থ পণ্ডিত।" (দেবীঃ ৩/১৪)

৭০। "যাহাকে ইহজগতে খুঁজিয়া পাইলাম না, ইহজীবনে সেই প্রিয়।" (সীতাঃ ১/৮)

৭১। "স্ত্রীপুরুষে পরস্পর ভালবাসাই দাম্পত্য সুখ নহে, একাভিসন্ধি—সহৃদয়তা—ইহাই দাম্পত্য সুখ।" (সীতাঃ ১/১০)

৭২। "প্রেম কি, তাহা আমি জানি না। দেখিল আর মজিল, আব কিছু মানিল না, কই এমন দাবানল ত সংসাবে দেখিতে পাই না। প্রেমের কথা পুস্তকে পড়িয়া থাকি বটে, কিন্তু সংসাবে "ভালবাসা", স্নেহ ভিন্ন প্রেমেব মত কোন সামগ্রী দেখিতে পাই নাই, সুতবাং তাহার বর্ণনা করিতে পারিলাম না। প্রেম, যাহা পুস্তকে বর্ণিত, তাহা আকাশকুসুমের মত কোন একটা সামগ্রী হইতে পাবে, যুবক-যুবতীগণের মনোরঞ্জন জন্য কবিগণ কর্তৃক সৃষ্ট হইযাছে বোধ হয। তবে একটী কথা স্বীকাব কবিতে হয। ভালবাসা বা স্নেহ, যাহা সংসারে এত আদরেব, তাহা পুরাতনেরই প্রাপ্য, নূতনের প্রতি জন্মে না। যাহাব সংসর্গে অনেক কাল কাটাইযাছি, বিপদে, সম্পদে, সুদিনে, দুর্দ্দিনে যাহার গুণ বুঝিযাছি, সুখ দুঃখেব বন্ধনে যাহার সঙ্গে বদ্ধ হইযাছি, ভালবাসা বা স্নেহ তাহারই প্রতি জন্মে। কিন্তু নূতন আর একটী সামগ্রী পাইযা থাকে। নূতন বলিযাই তাহার একটা আদর আছে। কিন্তু তাহা ছাডা আবও আছে। তাহার গুণ জানি না, কিন্তু চিহ্ন দেখিযা অনুমান করিয়া লইতে পাবি। যাহা পরীক্ষিত, তাহা সীমাবদ্ধ, যাহা অপবীক্ষিত, কেবল অনুমিত, তাহার সীমা দেওযা না দেওযা মনের অবস্থাব উপব নিভর কবে। তাই নূতনের গুণ অনেক সময়ে অসীম বলিয়া বোধ হয। তাই সে নূতনের জন্য বাসনা দুর্দ্দমনীয় হইযা পড়ে। যদি ইহাকে প্রেম বল, তবে সংসারে প্রেম আছে। সে প্রেম বড উন্মাদকর বটে। নূতনেরই তাহা প্রাপ্য। তাহার টানে পুরাতন অনেক সময়ে ভাসিয়া যায।

হায নূতন! তুমিই কি সুন্দর? না, সেই পুবাতনই সুন্দর। তবে, তুমি নূতন! তুমি অনন্তের অংশ। অনন্তেব একটুখানিমাত্র আমরা জানি। সেই একটুখানি আমাদের কাছে পুবাতন, অনন্তেব আব সব আমাদেব কাছে নূতন। অনন্তের যাহা অজ্ঞাত, তাহাও অনন্ত। নূতন, তুমি অনন্তেরই অংশ। তাই তুমি এত উন্মাদকব।" (সীতাঃ ১/১০)

৭৩। "···· যন্ত্রণা সব এই পারেই। ও পাবে যে যন্ত্রণার কথা শুনিতে পাও, সে আমরা এই পার হইতে সঙ্গে করিয়া লইযা যাই। আমাদেব এ জন্মেব সঞ্চিত পাপগুলি

আমরা গাঁটরি বাঁধিয়া, বৈতরণীর সেই ক্ষেয়ারীর ক্ষেযায় বোঝাই দিয়া, বিনা কড়িতে পার করিয়া লইয়া যাই। পরে যমালয়ে গিয়া গাঁটরি খুলিয়া ধীরে সুস্থে সেই ঐশ্বর্য্য একা একা ভোগ করি।" (সীতাঃ ১/১১)

৭৪। "শিশু যেমন মার কোলে উঠিলে মাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী দেখে, মনুষ্য পর্ব্বতারোহণ কবিয়া পৃথিবী দর্শন করিলে সেইরূপ দেখে।" (সীতাঃ ১/১৩)

৭৫। "যে ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু স্থিব করিতে না পাবে, তাহার শেষ ভবসা জগদীশ্বর। সে বলে, "জগদীশ্বর যা করেন।" (সীতাঃ ২/১১)

৭৬। "ঈশ্বব সর্ব্বভূতে আছেন। ঈশ্ববে প্রীতিই জীবের সুখ বা ধর্ম্ম। তাই সর্ব্বভূতকে ভালবাসিবে। কিন্তু ঈশ্বর নির্ব্বিকার, তাঁর সুখ-দুঃখ নাই। ঈশ্ববের অংশ-স্বরূপ যে আত্মা জীবে আছেন, তাঁহারও তাই। ঈশ্ববে অর্পিত যে প্রীতি, তাহাতে তাঁহার সুখ-দুঃখ নাই। তবে যে, কেহ ভালবাসিলে আমরা সুখী হই, সে কেবল মায়ার বিক্ষেপ।" (সীতাঃ ৩/৭)

৭৭। "ধর্ম্মার্থে ভিন্ন যে ইন্দ্রিযপরিতৃপ্তি, তাহা অধর্ম্ম। ইন্দ্রিযতৃপ্তি পশুবৃত্তি। পশুবৃত্তির জন্য বিবাহের ব্যবস্থা দেবতা কবেন নাই। পশুদিগের বিবাহ নাই। কেবল ধর্ম্মার্থেই বিবাহ।...ইন্দ্রিয়বশ্যতা মাত্রই পাপ।" (সীতাঃ ৩/৭)

৭৮। "একটা মানুষ মরা, জীবিতেব পক্ষে একটা পর্ব্বের সমান।" (সীতাঃ ১/৪)

৭৯। "যে অপবিত্র, সে পবিত্রকেও আপনার মত বিবেচনা করিযা কাজ করে, বুঝিতে পারে না যে, পবিত্র মানুষ আছে, সুতরাং তাহার কার্য্য ধ্বংস হয।" (সীতাঃ ২/৭)

৮০। "মানুষ চিরকাল একরকম থাকে না। ঐশ্বর্য্য সম্পদ্ বাড়িলে, মনটাও কিছু এদিক্ ওদিক্ হয।" (সীতাঃ ৩/৯)।

৮১। "রাজার বাজ্য, আব বিধবার ব্রহ্মচর্য্য সমান। যত্নে রক্ষা না করিলে থাকে না।" (সীতাঃ ৩/১০)

৮২। "যাকে ভালবাসে, তাহার উপর বলপ্রযোগ বড পাথবেও পারে না।" (সীতাঃ ৩/১৫)

বঙ্কিম-সম্বন্ধীয় আলোচনা-গ্রন্থের তালিকা

[অদ্যাবধি বঙ্কিমচন্দ্র-সম্বন্ধীয় যে সমস্ত আলোচনা-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলির একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত করবার চেষ্টা করেছি। কিছু কিছু প্রবন্ধের নামও উল্লিখিত হয়েছে, কিন্তু সমস্ত প্রবন্ধগুলির তালিকা নির্ধারণ বহু সময়সাপেক্ষ। প্রবন্ধের ক্ষেত্রে বিষয়-বস্তুটি উদ্ধৃতি-চিহ্নের মধ্যে দেওয়া হয়েছে এবং পাশে গ্রন্থের বা সাময়িক পত্রের নাম দেওয়া আছে। যে গ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচনা স্থান পেয়েছে, সেখানে "প্রাসঙ্গিক আলোচনা" কথাটি লেখা আছে। তালিকাটি লেখকের নামের বর্ণানুক্রমে সাজানো হয়েছে।]

অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত—বঙ্কিমচন্দ্র, ১৩২৭।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার—অক্ষয় সাহিত্যসম্ভার: ১ম খণ্ড (প্রাসঙ্গিক আলোচনা)।

অচ্যুত গোস্বামী—বাংলা উপন্যাসের ধারা, ১৩৪৬ (প্রাসঙ্গিক আলোচনা)।

অজরচন্দ্র সরকার—বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা, ১৯৪৯, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়—'ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র', আধুনিক সাহিত্য জিজ্ঞাসা, ১৩৬১।

অরবিন্দ ঘোষ—Rishi Bankim Chandra, চন্দননগর, ১৯২৩।

অরবিন্দ পোদ্দার—বঙ্কিমমানস, ১৯৫১।

অলোক রায়—প্রবন্ধকার বঙ্কিমচন্দ্র ও ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সমাজ-মন।

অশোক কুণ্ডু—বঙ্কিমের গল্প, আশ্বিন, ১৩৭৫।

অসিতকুমার ভট্টাচার্য—বাংলার নবযুগ ও বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারা, ফাল্গুন, ১৩৭০।

আবুল হুসেন—১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত বঙ্কিমবিষয়ক কিছু প্রবন্ধ (দ্রঃ হরপ্রসাদ মিত্রের 'বঙ্কিমসাহিত্য পাঠ')।

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়', পূর্ণিমা, ১৩০১।

এককড়ি দে—শিশু বঙ্কিম, ১৯১২।

কমলা দেবী—ভারতগৌরব বঙ্কিমচন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথ।

কালিদাস রায়—বঙ্গসাহিত্য পরিচয় (প্রাসঙ্গিক আলোচনা)।

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ—বঙ্গীয় সমালোচক (কাব্য), ১২৮৭।

Kalish Chandra Mukherjee—A Few Saying Opinions of Bankim Chardra

কেদারনাথ মজুমদার—গদ্যসাহিত্য, ১৯০৮।

ক্ষীরোদকুমার দত্ত—বঙ্কিমসাহিত্যের ধারা, ১৩৫০।
গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী—বঙ্কিমচন্দ্র (২ খণ্ড), ভাদ্র, ১২৯৩।
ঐ —বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, ১৮৮৬, ১৮৯০, ১৯০১।
গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী—শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙ্গালায় স্বদেশী যুগ, ১৫ই আগস্ট, ১৯৫৬ গ্রন্থে অরবিন্দের লেখা 'Bankim Chandra Chatterjee' প্রবন্ধ—১৩ই আগস্ট, ১৮৯৪।
গোপালচন্দ্র রায়—অলৌকিক কাহিনী (প্রাসঙ্গিক আলোচনা), ১৩৬৮।
ঐ —বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র।
ঐ —বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ, ১৩৭০।
ঐ —বঙ্কিমচন্দ্রের বিচারক জীবনের গল্প।
ঐ —আলাপ-আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র।
ঐ —ভৌতিক কাহিনী (প্রাসঙ্গিক আলোচনা)।
গৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ—বঙ্কিমের গল্প, ১৯৫১।
জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়—'বঙ্কিমবাবু' প্রভৃতি প্রবন্ধ, প্রবন্ধ লহরী, ১৩০৩ সাল।
ডঃ জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত—A Critical Study of the Life and Novels of Bankim Chandra, 1937.
জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত—বিষবৃক্ষ।
ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়—সাহিত্যমঙ্গল (প্রাসঙ্গিক আলোচনা), ১২৯৫।
ঐ —'বঙ্কিমবাবু সম্বন্ধীয় স্মৃতি', সাহিত্য, পৌষ, ১৩১৯।
ঐ —'স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র', নারায়ণ, বৈশাখ ১৩২২।
তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্কিম জিজ্ঞাসা, ১৩৬৬।
তারকনাথ বিশ্বাস—বঙ্কিমবাবুর জীবনকথা।
দেবীপদ ভট্টাচার্য—উপন্যাসের কথা (প্রাসঙ্গিক আলোচনা), ১৯৬১।
ঐ —বাংলা চরিত সাহিত্য (প্রাসঙ্গিক আলোচনা), ১৯৬৪।
দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—বঙ্কিমচন্দ্র, ১৩২৪/১৯১৭।
নবীনচন্দ্র সেন—আমার জীবন (প্রাসঙ্গিক আলোচনা)।
'নারায়ণ' পত্রিকা—বঙ্কিম-স্মৃতি সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২২।
নিত্যকৃষ্ণ বসু—'সাহিত্য সেবকের ডায়েরী', সাহিত্য, অগ্রহায়ণ ১৩১০।
নিবারণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—Rādhārāni, ১৯১৯ (বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের রোমান হরফে রূপান্তর)।

নিমাইসাধন বসু—দি ইন্‌ডিয়ান এওয়েকেনিং এণ্ড বেঙ্গল (প্রাসঙ্গিক আলোচনা)।

নীরেন্দ্রনাথ রায়—'মার্ক্‌সবাদী বঙ্কিম বিচার', সাহিত্যবীক্ষা, ১৯৫৫।

পাঁচকড়ি ঘোষ—বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাসৌন্দর্য, ১৯৪০।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় -'স্মৃতিকথা : বঙ্কিমচন্দ্র', প্রবাহিনী, ১০ই মাঘ ১৩২০।

ঐ —'বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী', নারায়ণ, বৈশাখ ১৩২২।

পুলকেশ দে সরকার—স্বদেশী গ্রন্থের চার অধ্যায় (প্রাসঙ্গিক আলোচনা)।

পূর্ণচন্দ্র বসু—কাব্যসুন্দরী, ১৮৮০।

ঐ —সাহিত্যচিন্তা, ১৮৯৬।

প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত—উপন্যাস-সাহিত্যে বঙ্কিম, মহালয়া ১৩৬৮।

প্রবোধচন্দ্র সেন—বাংলার ইতিহাস সাধনা (প্রাসঙ্গিক আলোচনা), ১৩৬০।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—রবীন্দ্রজীবনী (৪ খণ্ড)—(প্রাসঙ্গিক আলোচনা)।

ঐ —'বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনপঞ্জী'. মানসী, চৈত্র ১৩২১।

প্রথমনাথ বিশী—বঙ্কিম-সরণী, ১৩৭৩।

ঐ —বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যচিন্তা, চৈত্র ১৩৭৫।

প্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়—বঙ্কিম-সাহিত্য সমাজ ও সাধনা, ১৯৬৭।

প্রিয়রঞ্জন সেন—Western Influence in Bengali Literature (প্রাসঙ্গিক আলোচনা), ১৯৩২।

বঙ্কিম-পরিচয়—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত ১৯৩৮।

বঙ্কিম সাহিত্যের ভূমিকা—বিবিধ লেখক—ওরিয়েন্ট বুক কোং।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত—সাহিত্যসাধক চরিতমালা (২য় খণ্ড)

ঐ ঐ সম্পাদিত—বঙ্কিম-গ্রন্থাবলী।

বিজিতকুমার দত্ত—বাংলাসাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস (প্রাসঙ্গিক আলোচনা)।

বিনয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য—বঙ্কিমবাণী, ১৯৫৪।

বিপিনচন্দ্র পাল—নবযুগের বাংলা—বঙ্কিম-সম্বন্ধীয় কয়েকটি প্রবন্ধ।

বিপিনবিহারী গুপ্ত—পুরাতন প্রসঙ্গ (১ম ও ২য়)—(প্রাসঙ্গিক আলোচনা)।

বিমলচন্দ্র সিংহ সম্পাদিত—বঙ্কিম-প্রতিভা—বঙ্কিম শতবার্ষিকী মুদ্রণ, ১৯৩৮।

বিমলচন্দ্র সিংহ—বঙ্কিম-কণিকা, ১৯৪১।

বিমানবিহারী মজুমদার—History of Political Thought from Rammohun to Dayananda, 1934 (প্রাসঙ্গিক আলোচনা)।

বীরেশ্বর পাঁড়ে—'বঙ্কিমচন্দ্র ও হিন্দুর আদর্শ' সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০২।
ভবতোষ দত্ত—চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র, এপ্রিল ১৯৬১।
ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত—ঈশ্বর গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব, ভাদ্র ১৩৭৫।
ভবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—কপালকুণ্ডলা চরিত্র সমালোচনা, ১৯১৪।
ঐ —দুর্গেশনন্দিনী চরিত্র সমালোচনা ১৯১১।
মণি বাগচী—বঙ্কিমচন্দ্র, আগস্ট ১৯৬৫।
মণীন্দ্রমোহন বসু—কৃষ্ণকান্তের উইল, ১৯৪১।
মতিলাল দাস—Bankim Chandra, Prophet of the Indian Renaissance, His Life & Art, 1938
মনোমোহন ঘোষ—বাঙ্গালা গদ্যের চারি যুগ (প্রাসঙ্গিক আলোচনা)।
মনোরঞ্জন জানা—বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে নারী, ১৩৫৯।
মন্মথনাথ ঘোষ—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' —অঞ্জলি, আষাঢ় ১৩২৮।
ঐ —'বঙ্কিমচন্দ্রের রাজকার্যের ইতিহাস'—সচিত্র শিশির, ১১ই ফাল্গুন ১৩৩০।
ঐ —'বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যরচনা'—মানসী ও মর্মবাণী, কার্তিক ও চৈত্র ১৩৩৩।
ঐ 'বঙ্কিমচন্দ্র'—বঙ্গশ্রী, চৈত্র ১৩৪২।
ঐ —'বঙ্কিমচন্দ্র ও রোম্যান হরফ'—ভারতবর্ষ, ফাল্গুন ১৩৬০।
মাখনলাল রায়চৌধুরী—কৃষ্ণকান্তের উইল, ১৩৬১।
মুকুট রায়—লিপিকৌশলের বৈশিষ্ট্য : বঙ্কিমচন্দ্র, ১৯৩৬।
মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়—'বঙ্কিমবাবুর কথা', আমার দেখা লোক।
মোহিতলাল মজুমদার—বঙ্কিম বরণ, ১৩৫৬।
ঐ —আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য (প্রাসঙ্গিক আলোচনা)।
ঐ —বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, ১৯৫৫।
ঐ —বাংলার নবযুগ, ১৯৬৫ (প্রাসঙ্গিক আলোচনা)।
মোহিতলাল মজুমদার ও শ্রীশচন্দ্র দাস সম্পাদিত—বঙ্কিম স্মৃতি, ১৩৪৬।
মৌলভি একরামদ্দিন—কৃষ্ণকান্তের উইলে বঙ্কিমচন্দ্র, ১৩৩৭।
যতীন্দ্রমোহন চৌধুরী—বঙ্কিমসাহিত্য পরিচিতি ১৯৫০।
যদুনাথ সরকার—বঙ্কিম প্রতিভার ক্রমবিকাশ, ১৯৩৮।
J C. Ghosh—Bengali Literature, 1948 (প্রাসঙ্গিক আলোচনা)।
যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ—'বিষবৃক্ষ', সমালোচনামালা, ১৮৮৫।
যোগেশচন্দ্র বসু—বঙ্কিমের স্মৃতিচিহ্ন।

যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত—বঙ্কিম রচনাবলী (৩ খণ্ড)—সাহিত্য সংসদ।
রজনীকান্ত গুপ্ত—প্রতিভা (প্রাসঙ্গিক আলোচনা), ১৩০৩।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—জীবনস্মৃতি (প্রাসঙ্গিক আলোচনা)।
ঐ —আধুনিক সাহিত্য (বঙ্কিমচন্দ্র, কৃষ্ণচরিত্র ও রাজসিংহ প্রবন্ধ) ১৩১৪।
রমেশচন্দ্র দত্ত—The Literature of Bengal (প্রাসঙ্গিক আলোচনা) ১৮৯৫।
ঐ —প্রবন্ধ সংকলন (প্রাসঙ্গিক আলোচনা), ১৯৫৯।
রাজেন্দ্রলাল মিত্র—'দুর্গেশনন্দিনী'—রহস্য সন্দর্ভ, ২য় পর্ব ২১ খণ্ড, পৃ. ১৩৯— ৪৪।
ঐ —'মৃণালিনী'—রহস্য সন্দর্ভ, ৫ম পর্ব, ৫৭ খণ্ড, পৃ ১৪১—১৪৪।
রাধারমণ চক্রবর্তী ও সত্যকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়—চন্দ্রশেখরতত্ত্ব, ১৩৩৯।
রামগতি ন্যায়রত্ন—বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব (প্রাসঙ্গিক আলোচনা)।
রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী—বঙ্কিমচিত্র, ১৯২৭।
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—চরিতকথা (প্রাসঙ্গিক আলোচনা), ১৩২০।
রেজাউল করিম বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ।
ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—সখী, ১৩২৮/১৯২১।
ঐ —কপালকুণ্ডলাতত্ত্ব, ফাল্গুন ১৩২২।
ঐ —কাব্যসুধা (প্রাসঙ্গিক আলোচনা), ১৯১৬।
ঐ —কৃষ্ণকান্তের উইলের আলোচনা, ১৩৩৪।
লালবিহারী দে—'বিষবৃক্ষ' উপন্যাস সম্বন্ধে মন্তব্য—Bengal Magazine, January 1874
শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বঙ্কিম-জীবনী—৩য় সংস্করণ, ১৩৩৮।
ঐ —বঙ্কিম-কাহিনী, ১৯১১।
শনিবারের চিঠি—বঙ্কিম-সংখ্যা—আষাঢ় ১৩৪৫, জুন ১৯৩৮।
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—স্বদেশ ও সাহিত্য (প্রাসঙ্গিক আলোচনা)।
শশাঙ্কমোহন সেন—বঙ্গবাণী (প্রাসঙ্গিক আলোচনা), ১৯১৫।
শশিভূষণ দাশগুপ্ত—বাংলা সাহিত্যের নবযুগ (প্রাসঙ্গিক আলোচনা), ৬ষ্ঠ সং ১৩৭২।
শিবানন্দ—বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, ২য় সংস্করণ, ১৩৭২।
শিশিরকুমার নিয়োগী সম্পাদিত—রজনী—কলিকাতা ১৩৫৫/১৯৪৮।
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা (প্রাসঙ্গিক আলোচনা)—৩য় সংস্করণ, ১৩৬২।
সতীশচন্দ্র মিত্র—যশোহর-খুলনার ইতিহাস : ২য় খণ্ড (প্রাসঙ্গিক আলোচনা)।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা উপন্যাসের কালান্তর (প্রাসঙ্গিক আলোচনা), ১৩৬৮।
সুকুমার সেন—বাংলা সাহিত্যে গদ্য (প্রাসঙ্গিক আলোচনা)—৩য় সং, ১৩৫৬।
ঐ —বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস : ২য় খণ্ড (প্রাসঙ্গিক আলোচনা) ৩য় সংস্করণ, ১৩৬২।
ঐ —History of Bengali Literature (প্রাসঙ্গিক আলোচনা)—সাহিত্য অ্যাকাডেমী, ১৯৬০।
সুধাকর চট্টোপাধ্যায়—কথাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র, ১৩৭০।
সুবোধচন্দ্র মজুমদার—বঙ্কিমচন্দ্র।
সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত—বঙ্কিমচন্দ্র, ১৩৪৫।
ঐ —'Bankim Chandra Chatterjee'/Studies in the Bengal Renaissance, 1958.
সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য—রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব (বঙ্কিমবাবুর 'কৃষ্ণচরিত্রে'র প্রতিবাদ), ১৩১৩।
সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত—বঙ্কিম প্রসঙ্গ, ১৯২১।
সুরেশচন্দ্র সমাজপতি—'উপাধি উৎপাতে বঙ্কিমবাবু'—সাহিত্য, ভাদ্র ১২৯৯।
সোমেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত—কাছের মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র, ১৯৬৪।
সৌরীন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়—বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা রামমোহন থেকে মানবেন্দ্রনাথ (প্রাসঙ্গিক আলোচনা)।
হরপ্রসাদ মিত্র—বঙ্কিমসাহিত্য পাঠ—মহালয়া ১৩৭০/১৭ই অক্টোবর ১৯৬৩।
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—'বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি'—বঙ্গদর্শন ১২৮৫।
হারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বঙ্কিমচন্দ্র, ১৩৩৮ ফাল্গুন।
হারাণচন্দ্র রক্ষিত—বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম, ১৮৯৯।
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র, ১৩৪৭।
হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—মানব-প্রকৃতি (বিষবৃক্ষের আলোচনা), ১৯২১।
হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র—নূতন সংস্করণ, ১৯৬২।
ঐ —বঙ্কিমচন্দ্র (১ম ও ২য়)।
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—বঙ্কিমচন্দ্র, ১৯০৮।

বিদেশী ভাষায় বঙ্কিম-গবেষণা গ্রন্থ

আমেরিকান মহিলা মিস্ রেচেল ভ্যানোমিটার-এর বঙ্কিমের উপর গবেষণা
অধ্যাপক শাস্ত্রীর কানাড়া ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্রের উপর গবেষণা।

নির্দেশিকা

নাম	খণ্ড/পরিচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
কুবের	রাজঃ ২/৩	১৯৮
কুমার	দেবীঃ ১/১৫	৩১৫
কুমুদ	বিষঃ ১১শ পরিঃ	১৯৯
কুমুদিনী	ইন্দিরা ৬ষ্ঠ পরিঃ	১৯৯
কুলতিলক	দুর্গেঃ ১/৯	৯১
কুলসম	চন্দ্রঃ ২/১	৯১
কুলসম	চন্দ্রঃ ২/১	২০০
কুলের বাহির	ইন্দিরা ১৫ পরিঃ	৯১
কুসুমনির্ম্মিতা	মৃণাঃ ২/২	৯২
কুসুমের মধ্যে পাষাণ	দুর্গেঃ ২/২	৯২
কৃতসঙ্কেত	কপাঃ ৪/৪	৯২
কৃতাভিসারা	দেবীঃ ১/৮	৩১৫
কৃষ্ণকমল চক্রবর্ত্তী	চন্দ্রঃ ২/৪	২০১
কৃষ্ণকান্ত রায়	কৃঃ উঃ ১/১	২০১
*কৃষ্ণকান্তের উইল		৯২
কৃষ্ণকান্তের গৃহিণী	কৃঃ উঃ ১/১	২০২
কৃষ্ণগোবিন্দ দাস	দেবীঃ ১/৯	২০২
কৃষ্ণগোবিন্দের বৈষ্ণবী	দেবীঃ ১/৯	২০২
কৃষ্ণদাস বসু	ইন্দিরা ৪র্থ পরিঃ	২০২
কৃষ্ণদাস বসুর স্ত্রী	ইন্দিরা ৪র্থ পরিঃ	২০২
কৃষ্ণবিহারী সেন		৩২
কৃষ্ণমোহন দত্ত	ইন্দিরা ১৮ পরিঃ	২০২
কেনারায় পড়	কপাঃ ১/১	৩১৫
কেশব	মৃণাঃ ৪/৩	২০২
কেশবচন্দ্র সেন		৩২
কেসমৎ	রাজঃ ২/১	৩১৫
কৈলাস	দেবীঃ ২/৬	৩১৫
কোম্‌ত্‌	রজনী ৩/৩	২০২
খদ্যোৎমালা পরিমণ্ডিত	বিষঃ ১ম পরিঃ	৩১৫

নাম	খণ্ড/পরিচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
ফরাশ	চন্দ্রঃ ২/৭	৩২৪
ফলভোগী রাণা	রাজঃ ৪/৬	১২৭
ফাঁদ	মৃণাঃ ২/১০	১২৭
ফাঁসির পর মোকদ্দমার তদারক	ইন্দিরা ১৭ পরিঃ	১২৭
ফিচেল খাঁ	কৃঃ উঃ ২/১০	২৪৯
ফিলিপস্, এইচ. এ. ডি.		৫০
ফুলমণি	দেবীঃ ১/৭	২৪৯
	ব	
বক ও হংসীর কথা	রাজঃ ৩/১	১২৮
বকাউল্লা খাঁ	চন্দ্রঃ ২/৭	২৪৯
বখ্‌ত খাঁ	রাজঃ ৭/৩	২৪৯
বখ্‌তিয়ার খিল্‌জি	দুর্গেঃ ১/৩ ; মৃণাঃ ১/১	২৪৯
বক্কাগ্রভাগ	বিষঃ ১০ম পরিঃ	৩২৪
বঙ্কিমচন্দ্র		১
বঙ্কিমচন্দ্রের কোলকাতার বাড়ী বা পটলডাঙ্গার বাড়ী		৫০
বঙ্কিমচন্দ্রের ১মা ও ২য়া স্ত্রী		৫০
বঙ্কিমচন্দ্রের মাতা		৫১
বজ্রাঘাত	চন্দ্রঃ ২/৬	১২৮
বনাসী	রাজঃ ৪/৪	২৫০
বন্দেআলী	সীতাঃ ২/৯	২৫০
বর মিলিল	চন্দ্রঃ উপঃ/৩	১২৮
বরেন্দ্রভূমি	দেবীঃ ১/২	৩২৪
বলনি	রজনী ২/১	৩২৪
বল্লাল সেন	মৃণাঃ ২/৯	২৫০
বসন্তকুমার	ইন্দিরা ১৮ পরিঃ	২৫০
বসন্তকুমারী	রাধাঃ ৩য় পরিঃ	২৫০
বস্ত্রহরণ	দেবীঃ ২/৬	৩২৫
বহর	কপাঃ ১/১	৩২৫
বহরমপুর		৫১

নাম	খণ্ড/পরিচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
	ম	
মণিমালিনী	মৃণাঃ ১/২	২৬০
মন্ত্রণার পর উদ্যোগ	দুর্গেঃ ১/১০	১৩৬
মতিবিবি	কপাঃ ২/১	২৬১
মদনসেন	মৃণাঃ ৪/১	২৬২
মদনদেব	মৃণাঃ ৪/১	২৬২
মনাইম খাঁ	দুর্গেঃ ১/৩	২৬২
মনোরমা	মৃণাঃ ২/২	২৬২
মনোরমা	ইন্দিরা	২৬২
মনোহর দাস	রজনী ২/২	২৬২
মবারক	রাজঃ ২/১	২৬২
মবারক ও দরিয়া ভস্মীভূত	রাজঃ ৮/১৫	১৩৬
মবারকের দাহনারম্ভ	রাজঃ ৮/১৩	১৩৬
ময়ূরতক্ত	রাজঃ ১/১	৩২৮
মসীবুদ্দীন	চন্দ্রঃ ৩/৩	২৬৩
মহম্মদ আলি	মৃণাঃ ২/৬	২৬৩
মহম্মদ আলির প্রায়শ্চিত্ত	মৃণাঃ ৪/১৩	১৩৬
মহম্মদ ইর্‌ফান	চন্দ্রঃ ৬/৩	২৬৩
মহম্মদ ঘোরি	মৃণাঃ ২/৬	২৬৩
মহম্মদ তকি	চন্দ্রঃ ৩/৩	২৬৪
মহম্মদীয় জয়ধ্বজা	দুর্গেঃ ১/৩	৩২৮
মহাপুরুষ	আনন্দঃ ৪/৭	২১৬
মহাসমর	বিষঃ ১৩ পরিঃ	১৩৬
মহিষাসুরের যুদ্ধ	দেবীঃ ২/৬	৩২৮
মহেন্দ্র সিংহ	আনন্দঃ ১/১	২৬৪
মহোরগ	রাজঃ ৪/৩	৩২৮
মার্ক আন্তনি	রাজঃ ৭/২	২৬৫
মাণিকলাল	রাজঃ ৩/৪	১৩৬

নাম	খণ্ড/পরিচ্ছেদ	
সোনা	কৃঃ উঃ ২/৬	৩০৪
সোপেনহয়র	রজনী ৩/৩	৩০৪

হ